নারায়ণচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

নারায়ণ চন্দ্রের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

১। আকালের মা, ২। বৈরাগী, ৩। সুখের মিলন, ৪। উত্তরাধিকারী, ৫। ত্যাজ্যপুত্র, ৬। মানরক্ষা।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত



শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে'
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ১॥০ টাকা]

আকালের মা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদা ভাগিনেয়ী

শ্রীমতী হরিভাবিনী দেবী

চিরায়ুষ্মতীষু—

মা। একদিন স্নেহে কন্যাস্থান অধিকার করিয়াছিলে, আজ মাতৃহীনের মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছ। মামার লেখা পড়িতে তোমার বড় মিষ্ট লাগে, তাই 'আকালের মা'কে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। মামার আশীর্ব্বাদের দান গ্রহণ কর।

১লা শ্রাবণ, ১৩৫৭

আশীর্ব্বাদক

মামা।

আকালের মা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকালের বৎসরে জন্ম বলিয়া বাপ-মা ছেলের নাম রাখিয়াছিল আকাল। নিঃস্ব কৃষকের গৃহে অভাবের কঠোর তাড়নার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আকাল যথা-সম্ভব সুখে স্বচ্ছন্দে লালিত পালিত হইয়াছিল। বেশী বয়সের ছেলে, তার উপর মরা-হাজা, সুতরাং মাতা-পিতার স্নেহ-যত্নটা সে খুব বেশী পরিমাণেই ভোগ করিতে পাইয়াছিল।

প্রবীণ দৈবজ্ঞ রামহরি আচার্য্য ছেলের ঠিকুজি প্রস্তুত করিয়া দিয়া বলিলেন, "ওহে চিন্তামণি, ছেলেটার লক্ষণ মন্দ নয়, লগনচাঁদা, তার উপর একাদশে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি আছে। তোমার এ ছেলে বাঁচে তো বড় লোক হবে।"

চিন্তামণি সহর্ষে দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে তিন পালি ধান মাপিয়া দিল এবং পত্নীকে দৈবজ্ঞ ঠাকুরের ভবিষ্যদ্-বাণী শুনাইয়া দিয়া আহ্লাদগদ্গদ-কণ্ঠে বলিল, "শুনলে বড় বৌ?"

বড় বৌ ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হাঁ হাঁ, তুমিও যেমন। এ ছেলে আবার বাঁচবে, বেঁচে বড় লোক হবে।"

চিন্তামণি জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হবে না কি, আলবৎ বড় লোক হবে। কুষ্ঠির কথা কি মিছে হয়? আর তার লক্ষণ দেখলে না? এ বছর তল্লাটে কারো জমীতে ধান হ'লো না, কিন্তু আমার মনসা-ডাঙ্গার ধারে তিন বিঘেতে কি রকম ফসলটা হ'লো?"

বড় বৌ মুখে আহ্লাদের হাসি হাসিল, কিন্তু স্বরে তিরস্কারের তীব্রতা আনিয়া কহিল, "হাঁ হাঁ, তোমার আর লক্ষণ দেখতে হবে না, কাজ থাকে তো উঠে যাও। বড় লোকে কাজ নাই, বাছা আমার অমনি পাঁচ দোরের ভিখিরী হয়ে বেঁচে থাক্।"

মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কা ও আশার দ্বন্দ্ব বুঝিয়া চিন্তা-মণি পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ইহার উপর আকাল তিন-বৎসরে পা দিয়াই যখন নানাপ্রকারে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগিল, মা-বাবা ছাড়া গরুকে গউ, লাঙ্গলকে আগল এবং হুঁকাকে উয়া বলিতে শিখিল, তখন মাতাপিতা তাহার ধীশক্তির প্রাখর্য্য দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইল। মা বলিত, "গরু-লাঙ্গল নিয়েই কাটাতে হবে কি না, তাই ঐগুলোই আগে চিনেছে।"

চিন্তামণি মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিত, "তা হবে না বড় বৌ, আকাল যদি বাঁচে, ওকে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। আমার আকালকে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, লাঙ্গল ধরতে দেব না।"

স্বামীর আশাপ্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বড় বৌ সহাস্যে উত্তর করিত, "হাঁ হাঁ, চাষার ছেলে আবার মানুষ হবে?"

চিন্তামণি বাঁ-হাতে আকালকে জড়াইয়া ধরিয়া ডানহাতে ধরা হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার স্বরে বলিল, "হবে না? নিশ্চয়ই হবে। দেখো তুমি আকাল যদি বাঁচে, আর আমিও যদি বেঁচে থাকি, তবে ভিক্ষে করেও—"

আকালকে স্বামীর বাহুবেষ্টন হইতে টানিয়া লইয়া বড় বৌ তাড়াতাড়ি বলিল, "তাই হবে গো, তাই হবে, তোমার ছেলে তখন হাকিম দারোগাই হবে।"

মায়ের মুখে কচি হাতখানি চাপড়াইতে চাপড়াইতে আকাল অস্ফুটস্বরে বলিত, "দোগ্‌গা অব।" ছেলের কথা শুনিয়া পতি-পত্নী উভয়েই হাসিয়া উঠিত।

চিন্তামণি কিন্তু আশা পূর্ণ করিবার অবসর পাইল না। আকালের বয়স চারি বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। সে একদিন ছিন্ন মলিন রোগশয্যায় শুইয়া, আকালের হাতের এক গণ্ডূষ জল পান করিয়া আশা-নিরাশার অতীত দেশে চলিয়া গেল। যাইবার সময় রোরুদ্যমানা পত্নীকে বলিয়া গেল, "আকালকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রো, তোমার কষ্ট দূর হবে।"

স্বামীর মৃত্যুতে আকালের মা দিনকতক খুব কাঁদাকাটা করিল, তার পর আকালের মুখের দিকে চাহিয়া, বুক বাঁধিয়া সংসারের ভার মাথায় তুলিয়া লইল।

সংসার চলিবার তেমন কোন উপায় ছিল না। জমী-জমা সামান্যই ছিল, খাজনা দিতে না পারায় তাহারও অধিকাংশ হস্তান্তরিত হইয়া গেল। যে দুই-এক বিঘা রহিল, তাহাতে দুই-তিন মাসের মাত্র অন্ন-সংস্থান হইতে পারে। কিন্তু চাষার মেয়ে ইহাতে ভয় পাইল না। সে গোবর কুড়াইয়া, ঘুঁটে বেচিয়া, পরের ধান ভানিয়া আপনার ও পুত্রের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। খাওয়া-পরার জন্য সে একটুও ভাবিল না, তাহার শুধু প্রধান ভাবনা হইল সে কি উপায়ে স্বামীর শেষ আদেশ পালন করিবে। অসহায়া, দরিদ্রা বিধবা কিরূপে ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবে? যে এই প্রস্তাব করিয়াছিল, সে আর ইহজগতে নাই, কিন্তু আকালের মা তো আছে? সে থাকিতে আকাল মূর্খ হইবে?

আকাল পাঁচ বৎসরে পড়িলে, বিধবা পুরোহিত ডাকাইয়া, ছেলের হাতে খড়ি দিয়া তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিল।

মা শুধু ছেলেকে পাঠশালায় দিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না, তাহার শিক্ষালাভের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিল। মাতার শাসনে আকালের এক বেলাও পাঠশালাকে ফাঁকি দিবার উপায় ছিল না। এক-এক দিন সে পাঠশালায় যাইতে ঘোর আপত্তি জানাইত; কিন্তু তাহার সে আপত্তি টিকিত না। পুত্রের সকল মিনতি, সকল ওজর-আপত্তি উপেক্ষা করিয়া আকালের মা নিজে রোরুদ্যমান পুত্রকে পাঠশালায় ধরিয়া দিয়া আসিত, পুত্রের করুণ ক্রন্দনে তাহার মাতৃহৃদয় একটুও বিচলিত হইত না। মাঝে মাঝে সে পাঠশালায় গিয়া দেখিয়া আসিত, আকাল তথায় উপস্থিত আছে কি না।

পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য কৃষক-রমণীর এই প্রকার আগ্রহ ও তীব্র শাসন দেখিয়া পাড়ার অনেকে টিট্‌কারী দিয়া বলিত, "চাষার ছেলে এবার বিদ্যাসাগর হবে।" কেহ বা আকালের মা'র মুখের উপর তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিত, "ও আকালের মা, তোর ছেলে না জজ হবে?"

আকালের মা এক গাল হাসিয়া বলিত, "তাই আশীর্ব্বাদ কর বাবা, তাই আশীর্ব্বাদ কর।"

সন্ধ্যার সময় পাঠশালা হইতে প্রত্যাগত হইয়া আকাল যখন মাতাকে স্বীয় অঙ্গে গুরুমহাশয়ের নিষ্করুণ বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখাইত, তখন বিধবা তাহার উপর স্নেহকোমল হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে বলিত, "মার না খেলে কি লেখাপড়া হয় বাবা?" কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতৃহৃদয় এমনই একটা গভীর বেদনায় আকুল হইয়া উঠিত যে, পুত্রের সাক্ষাতেও সে চোখের জল রোধ করিতে পারিত না। মায়ের চোখে জল দেখিয়া আকাল সান্ত্বনার স্বরে বলিত, "তুই কাঁদিস্ না মা, আমাকে বেশী লাগেনি।"

মাতা উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে পুত্রের মুখখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিত।

গুরু মহাশয় চাষার ছেলে আকালকে প্রথম-প্রথম অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিতেন। কিন্তু ক্রমে চাষার ছেলের বুদ্ধির নিকট অনেক বামুন-কায়েতের ছেলের বুদ্ধিও যখন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহাকে আপনার ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে হইল, "ব্যাটা যেন গোবরে পদ্মফুল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নয় বৎসর বয়সে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া আকাল গ্রামের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইল। আকালের মা স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট অনেক কাঁদা-কাটা করিয়া এবং বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহার বাড়ীর ধান ভানিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া আকালকে অবৈতনিক ছাত্র করিয়া লইল।

স্কুলে মাহিনা দিতে না হইলেও ছেলের স্কুলের বই, কাগজ, জামা, কাপড় প্রভৃতি যোগাইতেই বিধবাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। ঘুঁটে বেচা, ধান ভানা ছাড়া সে বাড়ীতে শাকসব্জী, লাউ-কুমড়ার গাছ প্রভৃতি জন্মাইয়া বিক্রয় করিত। একটি গাই ছিল, ঘাস কাটিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইত, এবং তাহার দুধটুকু বিক্রয় করিয়া ছেলের বই কিনিবার পয়সা যোগাড় করিত। কিন্তু এততেও সব সময় কুলাইত না, অনেক সময় তাহাকে উপবাস দিয়া খোরাকীর চাল বাঁচাইয়া বেচিতে হইত। টানাটানির সময় নিজে ফেনটুকু খাইয়া ভাতগুলি ছেলের জন্য

তুলিয়া রাখিত। এত কষ্ট সহ্য করিতে হইলেও সে ছেলেকে মানুষ করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিত না।

আকাল মায়ের কষ্ট কতক বুঝিতে পারিত, সময়ে সময়ে প্রতিবাদ করিত। কিন্তু উচ্চাশয়া বিধবা তাহার সে প্রতিবাদে কর্ণপাত করিত না, বলিত, "আগে বাবা, তুই মানুষ হ', তার পর আমাকে ক্ষীর, সর, ছানা খাওয়াস্। তখন যদি তোর কথা না শুনি, তবে আমি কৈবর্ত্তের মেয়েই নই।"

কথাগুলা বলিবার সময় ভাবী সুখের আশায় বিধবার মুখখানা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আকালও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় মন বাঁধিয়া সঙ্কল্প করিত, 'মানুষ হয়ে যদি কোন দিন মায়ের এই কষ্ট দূর করিতে পারি, তবেই আমার জন্ম সার্থক।'

সে দিন ঘোর বর্ষা। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা হইতে যে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আর থামিল না। শুধু বৃষ্টি নয়, বৃষ্টির সঙ্গে একটু একটু ঝড়ও চলিতেছিল। আকালের মা'র ঘরে চাউল ছিল না, বাক্সে পয়সাও ছিল না। দেওয়ালের আধ-শুক্‌না ঘুঁটেগুলা বৃষ্টির ছাটে গলিয়া পড়িতেছিল। শাকের খেতে জল দাঁড়াইয়াছিল। ঝিঙ্গে-গাছগুলি ঝড়ের চোটে ডালের আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া ফল সমেত মাটীতে লুটাইতেছিল, কিন্তু সে বর্ষায় ঝিঙ্গা কিনিবার জন্য কেহই ঘরের বাহির হইতে পারিতেছিল না।

আকালের মাকে কিন্তু ঘরের বাহির হইতে হইল। সে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আধ সের চাউলের জন্য প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিল, কিন্তু এই বাদলায় দুঃস্থ প্রতিবেশীদের কেহই চাউল ধার দিতে পারিল না। নিরাশ-চিত্তে ঘরে ফিরিয়া আকালের মা, এ হাঁড়ি সে হাঁড়ি ঝাড়িয়া পোয়াটাক চাউল বাহির করিল, এবং তাহাই লইয়া রান্না চাপাইল।

রান্না হইলে মা ভাত বাড়িয়া আকালকে খাইতে ডাকিল। আকাল বলিল, "তোমার শুদ্ধ ভাত বাড় মা, মায়ে পোয়ে একসঙ্গে ব'সে খাব।"

মা বলিল, "না না, তুই খেয়ে নে, আমার খেতে দেরি আছে।"

আকাল বলিল, "আমিও না হয় একটু দেরিতেই খাব। আজ আর তো স্কুলে যাওয়া হবে না।"

মা বড় ফাঁপরে পড়িল। কতকটা রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল, "তোর সকাল সকাল খাওয়া অভ্যাস, বেলায় খেলে পিত্তি পড়্‌বে। আয় খেয়ে নে।"

আকাল মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু।"

মা রাগিয়া তিরস্কার করিয়া বলিল, "তোর সব-তাতেই জেদ। এমন অবাধ্য ছেলে কোথাও দেখিনি।"

হাসিতে হাসিতে আকাল বলিল, "তোমার মত অবাধ্য মা-ও আমি কোথাও দেখিনি।"

ছেলের কথায় মা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

শেষে মাকে ফেলিয়া আকাল যখন কিছুতেই খাইতে চাহিল না, তখন অগত্যা সেই এক পোয়া চা'লের ভাত কয়টিই মাতা-পুত্রে ভাগ করিয়া খাইল। আহার-শেষে আকাল গভীর তৃপ্তির সহিত বলিল, "আজ ভাত খেয়ে যেমন পেট ভর্‌লো মা, এমন কিন্তু একদিনও ভরে নি।"

মা রাগিয়া বলিল, "হাঁ, ভারী পেট ভরেচে, আধ-পেটাও হয়নি তোর। আচ্ছা ছেলে তুই যা হোক্।"

মা মুখে রাগ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু পুত্রের এই স্নেহভক্তির আতিশয্যে চোখ দুইটা যে আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া আসিল, পুত্রের সম্মুখেও তাহা চাপিতে পারিল না। ছেলে অনেক হয় বটে, কিন্তু এমন ছেলে কাহার আছে যে, এই বয়সে আপনার পেটের খোরাক কাটিয়া মাকে উপবাসের হাত হইতে রক্ষা করে? পুত্রগৌরবে মাতার হৃদয় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। পুত্রের আহারের ত্রুটিজনিত ক্ষোভ সে গর্ব্বের নিকট যেন ম্লান হইয়া আসিল।

এইরূপ দুঃখ-কষ্ট, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া অনেকগুলা বৎসর কাটিয়া গেল। শেষে, আঠার বৎসর বয়সে, আকাল যে দিন এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে স্থান অধিকার করিল, সে দিন আকালের মা'র উচ্চ আশা সফলতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইল। বিধবা সে দিন যোড়া পাঁঠা দিয়া গ্রাম্য-দেবতা শীতলাদেবীর মানসিক শোধ করিল।

এইবার কিন্তু আকালের মা এমন একটা ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যে পতিত হইল যে, সে কোনদিকেই কূলকিনারা দেখিতে পাইল না। এবার আকালের পড়া আর গ্রামের স্কুলে চলিবে না, কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতে হইবে। সে পড়ার খরচ ঘুঁটে-কাঠ বেচিয়া, ধান ভানিয়া চালান যাইবে না; এমন কি, আকালের মা আপনাকে বিক্রয় করিলেও

তাহাতে কুলাইয়া উঠিবে কি না সন্দেহ। তবে উপায়?

আকালের মা ভাবিল, "হায়, এতদূরে আসিয়া মাঝ-দরিয়ায় হাল ছাড়িতে হইল!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"তোমার পায়ে পড়ি মা, ওখানে আমি বিয়ে কর্‌ব না।" সস্নেহে আকালের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আকালের মা বলিল, "তা কি হয় বাপ, আমি যে কথা দিয়েছি।"

আকাল একটু রাগিয়া বলিল, "কেন কথা দিলে? বিষয় দেখে বুঝি?"

হাসিতে হাসিতে আকালের মা বলিল, "পাগল! বিষয় আমার কি হবে? তুই যে আমার সাতরাজার ধন মাণিক।"

"তবে কেন কথা দিতে গেলে?"

"সাধে কি দিয়েছি? তোর পড়ার সুবিধে হবে ব'লেই এ কাজ করেছি।"

ছেলে মায়ের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া ছিল, রাগিয়া উঠিয়া বসিল, এবং জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ছাই হবে। আমি তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।"

পুত্রের অসম্মতির কারণ বুঝিয়া মায়ের মুখ আনন্দে প্রফুল্ল হইল, বুকটা গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। স্নেহগদগদ-কণ্ঠে মা বলিল, "কি করবি বাপ, আমার কাছে থাক্‌লে তো পড়াশুনা হবে না।"

আকাল বলিল, "না হয় না হবে।"

আকালের মা বলিল, "ছিঃ আকাল, এতদিনে তোর এই বুদ্ধি হ'ল? তিনি স্বর্গে গেছেন, আমি মহাপাতকী প'ড়ে আছি। তাঁর আশা ছিল, তোকে মানুষ কর্‌তে হবে। সেজন্য আমি না খেয়ে, না প'রে তোকে মানুষ করবার চেষ্টা কচ্ছি। তুই মানুষ হ'লে আমার সব কষ্ট সার্থক হবে। কিন্তু তুই আমাকে সে আশায় নিরাশ কর্‌বি?"

আকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিধবা মৃদু হাসিয়া বলিল, "হাঁ রে আকাল, আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে তোর কষ্ট হবে, কিন্তু তোকে ছেড়ে দিতে আমার কি কষ্ট হবে, তা বুঝতে পারিস্ কি? তুই যে আমার—"

বিধবার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, এক ফোঁটা জল চোখের কোণ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। মায়ের চোখে জল দেখিয়া, তাহার সেই স্নেহভরা কাতরোক্তি শুনিয়া আকাল আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ কর মা, তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌ব।"

মাতা নীরবে পুত্রের মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিল।

হাজারিপাড়ার বৃন্দাবন সামন্ত বেলেঘাটায় গুড় ও চাউলের কারবার করিয়া অল্পদিনের মধ্যে অনেক টাকার মালিক হইয়া পড়িয়াছিল। দেশে বাড়ী, বাগান, পুকুর, জমীজমা প্রভৃতি যাহা করিয়াছিল, তাহা একজন জমীদারেরই অনুরূপ। লোক বলিত, "বৃন্দাবন লক্ষপতি হইয়াছে।" ইহার উপর বৃন্দাবন যখন ন'পাড়ার চৌধুরী বাবুদের নিকট হইতে হাজারী-পাড়া মহলটা ইজারা লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল, তখন অনেকেই বলিল, "বৃন্দাবন টাকার কুবের।" কেহ বলিল, "টাকার কুমীর।"

কিন্তু একমাত্র কন্যা কালীতারা ছাড়া বৃন্দাবনের এই কুবেরসদৃশ ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী আর কেহ ছিল না। পুত্রলাভের জন্য যাগযজ্ঞ, তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতি কার্য্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলেও যখন অদৃষ্টের রুদ্ধদ্বার কিছুতেই উন্মুক্ত হইল না, এবং দেহস্থৌল্যে গৃহিণী সন্তান-সম্ভাবনার সম্পূর্ণ অসম্ভাব্যতা জানাইয়া দিল, তখন বৃন্দাবন হতাশ হইয়া ভাবিল, বিধাতার উপরে কলম চলিবে না। কেহ কেহ বৃন্দাবনকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের পরামর্শ দিল। শুনিয়া গৃহিণী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "এতদিন তো কারো কিছু কর নি, এখন মর্‌বার বয়সে বিয়ে ক'রে যদি পাঁচজনের কিছু উপকার ক'রে যেতে পার, তা বড় মন্দ হবে না।"

অগত্যা বৃন্দাবনকে লোকের পরামর্শ হাসিয়া উড়াইয়া দিতে হইল। তখন পতিপত্নীতে মিলিয়া পরামর্শ স্থির করিল, যাহা হইবার নয়, তাহা যখন হইবে না, তখন যাহা আছে, তাহাকেই অবস্থায় উপযোগী করিয়া লইয়া সুখী হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সুতরাং তাহারা মেয়েটিকে একটি সৎপাত্রের হাতে দিয়া জামাইটিকে আপনাদের পুত্রস্থলে অভিষিক্ত করিবে, পরের ছেলেকে আপনার করিয়া পুত্রস্নেহের প্রবল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি-সাধন করিতে হইবে, ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কালীতারার বয়সও

একাদশ অতিক্রম করিয়াছিল। সুতরাং পাত্রের অনুসন্ধানের জন্ম চারিদিকে ঘটক ছুটিল।

চাষীর ঘরে লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে সহজে পাওয়া যায় না। যে দুই-একটি পাওয়া গেল, তাহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল, সুতরাং তাহারা ঘরজামাই হইতে স্বীকার হইল না। ঘটকেরা গ্রামের পর গ্রাম তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

অবশেষে তাহারা আকালের সন্ধান পাইল। বৃন্দাবন যেমন চায়, ঠিক তেমনটি। আকালের মা কিন্তু ছেলেকে ঘরজামাই করিয়া রাখিতে স্বীকৃত হইল না। ঘটকও ছাড়িল না, সে নানাপ্রকার যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, ইহাতে আকালের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ উজ্জ্বল, আকাল দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্ত লোক হইবে, বৃন্দাবনের অবর্ত্তমানে সে এই কুবেরের ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়া বসিবে। ঘটকের বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আকালের মা সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিল না। তবে এই সর্ত্ত করিয়া লইল যে, আকাল টাকার মালিক হউক বা না হউক, তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইতে হইবে। ঘটক তাহাতেই রাজি হইয়া গেল।

আকাল শুনিয়া ইহাতে আপত্তি করিল, কিন্তু মাতার মঙ্গলেচ্ছাপূর্ণ জেদের নিকট তাহার আপত্তি টিকিল না। বৃন্দাবন আসিয়া ছেলে দেখিল; এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিল। কিন্তু ভাবী জামাতার বাড়ী-ঘরের অবস্থা দেখিয়া সে প্রস্তাব করিল যে, বিবাহটা তাহার নিজের বাটীতেই সম্পন্ন হইবে। তাহার একমাত্র কন্তার বিবাহে যেরূপ উৎসব-আড়ম্বরের সম্ভাবনা, এই ক্ষুদ্র গৃহে তাহার স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। অতএব বিবাহ সেইখানেই হইবে। বেহান সেইখানেই গিয়া পুত্রের বিবাহে আমোদ-প্রমোদ করিবেন।

আকালের মা বৃন্দাবনের প্রস্তাবে সম্মতি দিল, কিন্তু নিজে সেখানে যাইতে স্বীকার করিল না। পুত্রের বিবাহ তাহার অগোচরে হইবে, ইহাতে তাহার একটু কষ্ট হইল, কিন্তু পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্ম যখন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তখন এই কষ্টটুকুও একেবারে অসহ্য হইবে না।

বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বৃন্দাবন পাল্কী-বেহারা পাঠাইল। যাত্রার পূর্ব্বদিন রাত্রে মা ভাল করিয়া ছেলেকে খাওয়াইল। রাত্রিতে ঘুমাইল না; আকালকে পরের ঘরে কিরূপে চলিতে হইবে, বড়লোকের জামাই হইলেও একাগ্রচিত্তে লেখাপড়া শিখিয়া কিরূপে তাহার পরলোকগত পিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে, অসুখ-বিসুখ হইলে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবে, ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া উপদেশ দিল। তার পর সকালবেলা ছেলেকে খাওয়াইয়া তাহার কপালে দধির টিপ দিল, এবং ছেলেকে পাল্কীতে তুলিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিল।

বামুন-পিসী কাঁধে গামছা, হাতে ঘটী লইয়া স্নানে যাইতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "আকালের মা, বড় ঘরে ছেলের বিয়ে দিলি বটে, কিন্তু ছেলে শেষে পর না হয়!"

আকালের মা বলিল, "ছেলে কি কখন পর হয় মা-ঠাকরুণ ?"

বামুন-পিসী বলিলেন, "হয় বৈ কি, অনেক কাঠ-কুড়ুনীর ছেলে রাজগদী পেয়ে মা-বাপকে চিন্‌তে পারে না।"

আকালের মা সহাস্তে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর মা, আকাল আমার রাজাই হোক্, সেই আমার চার-পো সুখ।"

"মাগী কি হাবা" বলিয়া বামুন-পিসী স্নান করিতে গেলেন। আকালের মা একা ঘরে ফিরিয়া অন্তরে বাহিরে একটা বিরাট্ শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আকাল চলিয়া গেল, আকালের মা দরজার বাজু ধরিয়া শূন্য দৃষ্টিতে পাল্কীর দিকে চাহিয়া রহিল। পাল্কী বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হইল, বেহারাদের অস্ফুট শব্দ বাতাসে মিলাইয়া গেল, প্রতিবাসিনী যাহারা আকালের ভাবী শ্বশুরালয়ে যাত্রা দেখিবার জন্ম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিল, আকালের মা স্তব্ধ নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে ছুটিয়া গিয়া আকালকে ফিরাইয়া আনে। কাজ নাই তাহার উচ্চ শিক্ষায়, কাজ নাই তাহার ঐশ্বর্য্যে! বৃদ্ধা বিধবা মাতার বুকের ভিতর যে স্নেহসম্পদ্ রহিয়াছে, তাহার অপেক্ষা পার্থিব কোন্ ঐশ্বর্য্য মূল্যবান্? এমন স্বর্গীয়

সম্পদে বিভূষিত পুত্রকে সে আজ কাহার দ্বারে ভিখারী করিয়া পাঠাইল। এখনও পাল্কী গ্রামের সীমা পার হয় নাই, এখনও ছুটিয়া গেলে আকালকে ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়।

আকালের মা কিন্তু ছেলেকে ফিরাইয়া আনিতে গেল না, কর্ত্তব্য আসিয়া মাতৃত্বের এই দুর্ব্বলতাকে সবলে চাপিয়া রাখিল।

প্রভাতের সূর্য্য আকাশের অনেকটা উপরে উঠিয়া যখন বৃদ্ধার মুখে তীব্র কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন সে ধীরে ধীরে আসিয়া ঘরের দাবার উপর বসিল।

বামুন-পিসী স্নানান্তে ফিরিয়া যাইতে যাইতে আকালের মা'র বাড়ীতে ঢুকিলেন, এবং আকালের মাকে তদবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "ও আকালের মা, এখনো ব'সে আছিস্?"

আকালের মা শূন্য দৃষ্টিতে বামুন-পিসীর মুখের দিকে চাহিল। বামুন-পিসী বলিলেন, "ব'সে আর কর্‌বি কি, ডুব দিয়ে আয়। আজ তো আর রাঁধতে বাড়্‌তে পার্‌বি না, আমাদের ঘরে না হয় এক মুঠো খেয়ে আসবি।"

আকালের মা ভারী গলায় বলিল, "রাঁধ্‌তে-বাড়্‌তে হবে বৈকি মা, পোড়া পেট তো আছে। না খেয়ে ক'দিন থাক্‌বো?"

"তবে আর বেলা করিস্ না। ডুবটা দিয়ে এসে যা হয় এক মুঠো চাপিয়ে দে।"

বামুন-পিসী প্রস্থান করিলেন। আকালের মা উঠিয়া গামছাখানা লইয়া ডুব দিতে চলিল।

গ্রামের প্রান্তভাগে স্নানের পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পরেই মাঠ, মাঠের পরপারে বৃক্ষাবলীবেষ্টিত গ্রামের ক্ষীণরেখা বনানী প্রান্তের ন্যায় দৃষ্ট হয়। সেই মাঠের উপর দিয়াই হাজারিপাড়ায় যাইবার পথ। আকালের মা পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া, চোখের উপর হাত রাখিয়া মাঠের দিকে আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। রৌদ্রদগ্ধ শস্যহীন বিশাল প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে; বহুদূরে ভিন্ন গ্রামের বৃক্ষাবলীর অস্পষ্ট রেখামাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বহুক্ষণ পরে আকালের মা হতাশ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া পুকুরে স্নান করিতে নামিল।

স্নান করিয়া আকালের মা রান্না চাপাইল। কিন্তু রান্না শেষ করিয়া যখন ভাত বাড়িতে গেল, তখন তাহার প্রাণটা কেমন হু হু করিয়া উঠিল। চিরদিন আকালকে আগে খাওয়াইয়া তার পর নিজের ভাত বাড়িয়াছে। কিন্তু আজ আগেই নিজেই ভাত বাড়িতে হইতেছে। আজকে ছেলেকে পরের ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছে। সেখানে কে আকালকে তাহার মনোমত করিয়া ভাত বাড়িয়া দিবে? আকাল সহজে পেট ভরিয়া খাইতে চাহে না, কাছে বসিয়া জোর করিয়া খাওয়াইতে হয়। কে তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইবে? হয় তো আকাল পেট ভরিয়া খাইবে না, লজ্জায় খাইতে পারিবে না। কোন দিন তো সে পরের কাছে বসিয়া খায় নাই। আজ আঠার বৎসর যাবৎ সে শুধু মায়ের কাছে বসিয়াই খাইয়াছে, মা ছাড়া যে জগতে আর কেহ আছে, এ পর্য্যন্ত সে জানে না। এই জন্যই তো আকাল মাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে নাই। কিন্তু রাক্ষসী মা যে এমন মাতৃগতপ্রাণ ছেলেকে জোর করিয়া আপনার কাছ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। ছেলে দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু সে পাষাণে বুক বাঁধিয়া তাহার কোমল বাহুবেষ্টন হইতে সবলে আপনাকে ছিনাইয়া লইয়াছে। হায় রে রাক্ষসী মায়ের প্রাণ! আকালের মা'র দুই চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। সে ভাতের হাঁড়ীতে চাপা দিয়া দাবায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

আহারান্তে বামুন-পিসী আসিয়া ডাকিলেন, "ও আকালের মা, খাওয়া হয়েছে?" আকালের মা উত্তর দিল, "এখনো হয় নি।"

বামুন-পিসী বলিলেন, "কেন, রাঁধিস্‌নি বুঝি?"

"রেঁধেছি।"

"তবে?"

আকালের মা'র চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। বামুন-পিসী তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "মর মাগী, এতই যদি, তবে ছেলেকে পাঠালি কেন বল্ দেখি?"

আকালের মা নিরুত্তরে আঁচলে চোখ মুছিল। বামুন পিসী বলিলেন, "দেখ আকালের মা, স্পষ্ট কথা বলি, ছেলে বড়লোক হবে ব'লে যখন তাকে পরের ঘরে দিলি, তখন আর এগুলো করা ভাল দেখায় না। এতে যে ছেলেরই অকল্যাণ হয়।"

আকালের মা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সভয়ভাবে বলিল, "অকল্যাণ হয়?"

বামুন-পিসী বলিলেন, "তা হয় না ? এ রকম কাঁদাকাটা, না খাওয়া না দাওয়া—এ সব কি ভাল ?"

আকালের মা ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িতে চলিল ।

বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে সকালে উঠিয়া আকালের মা আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "আজ আমার আকালের বিয়ে।"

আকালের মা লোক-মুখে সংবাদ পাইতেছিল, কন্যার বিবাহে বৃন্দাবন সামন্ত প্রচুর উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছে, তিন দিন পূর্ব্বে নহবত বসিয়াছে, দেশের যত বাদ্যকর তাহার বাটীতে সমবেত হইয়াছে, দেশ-বিদেশের আত্মীয়-কুটুম্ব, স্বজাতি সকলে নিমন্ত্রিত হইয়াছে। পলাশপুরের স্বজাতি কুটুম্বগণের নিকটেও নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়াছে। শুনিতে শুনিতে আকালের মা'র বুক আনন্দে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কেন না, এ উৎসবের অর্দ্ধেক অংশীদার তাহার আকাল।

গ্রামে যাহাদের নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়াছিল, তাহারা দলে দলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিয়া গেল। আকালের মা এক পোয়া চাউল, দুইটা কলা এবং এক পয়সার বাতাসা কিনিয়া গ্রাম্য-দেবতা বিশালাক্ষীর পূজা দিয়া আসিল, এবং সকাল সকাল রাঁধা-খাওয়া শেষ করিয়া সমস্ত দিন গ্রামের এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া কাটাইয়া দিল।

রাত্রিতে আকালের মা আপনার ঘরের দাবায় বসিয়া দণ্ডের পর দণ্ড ভাবিতে লাগিল, এতক্ষণ বিবাহের সময় হইয়াছে, এইবার আকালকে ছাঁদনা তলায় আনা হইয়াছে, এতক্ষণে স্ত্রী-আচার হইতেছে, একপাল মেয়ে সাতাশ কাঠি জ্বালিয়া, হুলুধ্বনি দিয়া, শাঁথ বাজাইয়া আকালকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। পাটের যোড়, মাথায় টোপর, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনের টিপ—আকালকে কেমন সাজাইয়াছে! তাহার রূপ দেখিয়া মেয়েরা তাহাকে সাক্ষাৎ কার্ত্তিকের সঙ্গে তুলনা করিতেছে। কিন্তু এত আনন্দ, এত উৎসব-কোলাহলের মধ্যেও আকাল মাকে ভুলিতে পারে নাই, সব উৎসব, সব আনন্দ ছাপাইয়া হয় তো মায়ের কথাটাই তাহার মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতেছে, আর মাকে না দেখিয়া বাছার চাঁদমুখখানি মলিন হইয়া আসিতেছে। আকালের মা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ দুইটা ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিল।

তার পর সম্প্রদানের কথা, শুভদৃষ্টির কথা, বাসরঘরের কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা কখন্ দাবার ধূলার উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা বুঝিতে পারিল না।

দুই দিন পরে নিমন্ত্রিত প্রতিবেশীরা ফিরিয়া আসিলে, আকালের মা সংবাদ পাইল যে, খুব ধুমধামের সহিত বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এমন ধুমধাম অনেক বামুন-কায়েতের ঘরেও দেখা যায় না। শুনিয়া আকালের মা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ঘরে ফিরিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আকাল কলিকাতায় যাইবার প্রায় একমাস পরে মাকে একখানা পত্র দিয়াছিল। তাহার পর তিন চারি মাস কাটিয়া গেল, আকালের মা পুত্রের আর কোন চিঠিপত্র পাইল না। ডাক-পিয়ন পাড়ায় আসিলেই আকালের মা তাহার পাছু-পাছু ছুটিত, কিন্তু পিয়নের মুখে 'পত্র নাই' শুনিলেই ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিত। ঘরে আসিয়া সে ক্ষুব্ধ হৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার জন্য ভাবিত, "পড়াশোনার জন্য আকাল চিঠি লিখতে সময় পায় না। তাই হোক, সে পড়া-শোনাই করুক, আমার চিঠিতে দরকার নাই।" কিন্তু পিয়নকে দেখিলেই সে তাহার পশ্চাতে না ছুটিয়া থাকিতে পারিত না।

পত্র না আসিলেও আকালের মা মাঝে মাঝে পুত্রের সংবাদ পাইত। হাজারিপাড়ার দুই চারি জন চাষী পলাশপুরের হাটে তরকারী বেচিতে আসিত। তাহারা সময়ে সময়ে আসিয়া আকালের মা'র ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিত, এবং বৃন্দাবন বাবুর জামাই যে ভাল আছে, এ সংবাদ শুনাইয়া যাইত। সম্মুখে গ্রীষ্মের ছুটী। সে ছুটীতে আকাল নিশ্চয়ই মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে।

আকালের মা এখন আর গাইয়ের সব দুধটুকু বেচিত না, কতকটা ঘরে রাখিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিত, আকাল আসিলে খাইবে। গাছের নারিকেল সব না বেচিয়া কয়েকটা তুলিয়া রাখিল, আকাল নারিকেলনাড়ু খাইতে ভালবাসে। একটা ডাঙ্গা জমীতে কিছু

সরু ধান হইয়াছিল, আকালের মা চাউল প্রস্তত করিয়া সে সরু চাউলগুলি পুত্রের জন্য তুলিয়া রাখিল।

গ্রীষ্মের বন্ধ আসিল। স্কুলের লম্বা ছুটী পাইয়া ছেলের দল পাড়া যেন মাথায় করিয়া তুলিল। আকালের মা পুত্রের আগমন-প্রত্যাশায় পথের দিকে চাহিয়া রহিল। চাষীদের মুখে সংবাদ পাইল, তাহাদের জামাই বাবু আসিয়াছে এবং নূতন পুকুরে ছিপ ফেলিয়া বড় বড় মাছ ধরিতেছে। কিন্তু আকালের মা ছেলের দেখা পাইল না।

ছুটী ফুরাইল। পাড়ার ছেলেরা খেলা ছাড়িয়া স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল। ভাঁড়ের ঘিয়ে দুর্গন্ধ হইল, নারিকেল পচিয়া গেল, চাউলে পোকা ধরিল, কিন্তু আকাল আসিল না। আকালের মা পচা জিনিসগুলা ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন জিনিস সংগ্রহে মনোযোগ দিল।

গ্রীষ্মের ছুটীর পর পূজার ছুটী। আকালের মা পূজার ছুটীর আশায় দিন গণিতে লাগিল।

বর্ষা গেল, শরৎ আসিল, পূজাও নিকট হইল। চারিদিকে ঢাকে কাঠি পড়িল। প্রবাসীরা দলে-দলে আসিয়া গ্রাম জাঁকাইয়া তুলিল। ছেলেরা নূতন কাপড়, নূতন জামা, জুতা পরিয়া বাহির হইল। আকালের মা উদ্বেগ-চঞ্চল-হৃদয়ে পথের দিকে চাহিয়া প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিতে লাগিল, কিন্তু আকাল আসিল না। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, বিজয়া কাটিয়া গেল, আকালের মা ছেলের দেখা পাইল না।

আকালের মা আর থাকিতে পারিল না। ভাবিল, "আকাল নাই আসুক, আমিই তাহাকে দেখিতে যাইব। কুটুমবাড়ী, তাতে কি? ছেলের চেয়ে কি মান-লজ্জায় ভয় বেশী?"

ক্ষার-মাটী কিনিয়া আনিয়া আকালের মা আপনার ময়লা কাপড়খানি কাচিয়া লইল। পরদিন সেই কাপড়খানি পরিয়া ঘরে চাবী দিয়া হাজারিপাড়া অভিমুখে যাত্রা করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছোট ডোবার মাছ হঠাৎ বড় দীঘিতে আসিয়া পড়িলে, সে সেই দীর্ঘিকার বিশালতা, জলরাশির স্বচ্ছতা ও গভীরতা, ক্ষুদ্র বৃহৎ মৎস্যকুলের উল্লম্ফন ও আস্ফালন দর্শনে প্রথমটা যেমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, এই অগাধ-জলসঞ্চারী প্রাণিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় কিরূপে আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবে, ইহাই ভাবিয়া অস্থির হয়, গরীবের ছেলে আকাল বড় মানুষ বৃন্দাবন সামন্তের বড় বাড়ীতে আসিয়া তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িল। এত বড় বাড়ী, বাড়ীতে এত লোকজন, তাহাদের গর্ব্বমাখান বড়মানুষী চালচলন, এ সকলই তাহার কাছে শুধু নূতন নয়, যেন খুব অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল। ইহাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করিলেও সে আপনার প্রতি কথায়, প্রত্যেক চালচলনে নিজের দৈন্য প্রকাশ পাইতেছে মনে করিয়া খুব লজ্জিত ও সাবধান থাকিল।

বৃন্দাবন নিজে আদৌ বিলাসী ছিল না বটে, এত টাকার মালিক হইলেও বাড়ীতে আট-হাতি ধুতির বেশী ব্যবহার করিত না সত্য, কিন্তু নিঃস্ব অবস্থা হইতে লাখপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে আপনার এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার গৌরব প্রদর্শনের জন্য সকলেরই একটা আগ্রহ থাকে। বৃন্দাবনেরও সে আগ্রহ যে ছিল না, এমন নহে, কিন্তু আপনার উপর দিয়া এই আগ্রহের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিল না, জামাতার উপর দিয়া ইহা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই আকারে-প্রকারে, বেশভূষায় আকালের এত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল যে, সে অনেক সময় আপনিই আপনাকে চিনিয়া উঠিতে পারিত না।

এই পরিবর্ত্তনেও আকাল কিন্তু আপনার পূর্ব্ব অবস্থা বিস্মৃত হইতে পারিত না। সে কিছুতেই ভুলিতে পারিত না যে, সে গরীব চাষীর ছেলে, তাহার মা ধান ভানিয়া, গোবর কুড়াইয়া খায়। কথাটা স্মরণ হইলেই এই বড়মানুষী রঙ্গমঞ্চের হাস্যজনক অভিনয়, এবং এই বেশভূষা সেই অভিনয়েরই উপযোগী খোলস ছাড়া আর কিছুই তাহার মনে হইত না। অথচ সুনিপুণ অভিনেতা যেমন আপনার কৃত্রিম অভিনয়কে দর্শকগণের নিকট বাস্তব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, আকালও তদ্রূপ আপনার এই বড়-মানুষী চালচলনকে ঠিক স্বাভাবিকতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে চাহিত।

বৃন্দাবন জামাতাকে কলিকাতায় আনিয়া কলেজে

ভর্ত্তি করিয়া দিল। আকাল শ্বশুরের চাউলের গদীতে থাকিতে রাজী হইল না, হারিসন রোডে একটা ভাল মেসে আশ্রয় লইল এবং শ্বশুরের পয়সায় ভোজের পর ভোজ দিয়া মেসের ছাত্রবর্গকে শীঘ্রই আন্তরিক বন্ধু করিয়া লইল।

কলিকাতায় আসিয়া আকাল প্রথম প্রথম মাকে দুই একখানা পত্র লিখিল, কিন্তু মাস দুই পরে যখন চিঠি লিখিতে বসিয়া "আমি ভাল আছি" ছাড়া লিখিবার আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না, তখন সে বিরক্ত হইয়া চিঠি লেখা ছাড়িয়া দিল।

গ্রীষ্মের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হইলে বৃন্দাবন জামাতাকে লইয়া দেশে ফিরিল। তাহার আগমনে বাড়ীতে যেন উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। সে উৎসবের মধ্যে মাকে দেখিবার কথা আকালের মনেই আসিল না। সে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত খোসগল্প করিয়া, নদীতে বাচ খেলিয়া, পুকুরে ছিপ ফেলিয়া এবং অবকাশকালে কালীতারাকে উপন্যাস শুনাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তার পর এ আমোদগুলার উত্তেজনা যখন কমিয়া আসিল, তখন হঠাৎ একদিন তাহার মাকে দেখিতে যাইবার কথা মনে হইল। বৃন্দাবন গৃহিণীর নিকট ইহা শুনিয়া সানন্দে বলিল, "বেশ বেশ, মায়ের ছেলে, মায়ের কাছে যাবে বৈ কি। আমি নফরকে পাল্কীর বন্দোবস্ত করতে ব'লে দিচ্ছি। সঙ্গে গোপলা আর কেলো এই দু'জন চাকর গেলেই হবে। পাড়ে পৌঁছে দিয়েই চ'লে আসবে, আবার আসবার দিনে নিয়ে আসতে যাবে।"

যাত্রার আয়োজনের বন্দোবস্ত শুনিয়াই আকালের যাইবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। হায়, বড়মানুষীর এই সব আড়ম্বর লইয়া সে কোথায় যাইবে? তাহার ক্ষুদ্র ভগ্ন কুটীর-দ্বারে এই সব আড়ম্বর লইয়া সে কোন্ লজ্জায় উপস্থিত হইবে? লোকে কি বলিবে? অথচ আকাল এই সকল লইয়া যাইতে পারিবে না, এমন কথা বলিতেও লজ্জিত হইল।

পরদিন প্রাতে পাল্কী প্রস্তুত বলিয়া যখন আকালের কাছে সংবাদ আসিল, তখন সে মাথা ধরার ওজর করিয়া চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিল। শাশুড়ী উদ্বিগ্নচিত্তে নিজে আসিয়া বাতাস করিতে বসিলেন, ক্ষীরী দাসী মাথায় অডিকলোন ছিটাইতে লাগিল।

যাত্রার জন্য আরও দুইটা দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু এইরূপ পেটবেদনা, মাথাভার ইত্যাদি অছিলাতে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। এ দিকে কলেজের ছুটী ফুরাইয়া আসিল। আকাল পুনরায় কলিকাতা যাত্রা করিল।

কলিকাতা-যাত্রার দুই দিন আগে কালীতারা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাকে দেখ্‌তে যাবে যাবে কর্‌লে, একবার গেলে না?"

উদাসস্বরে আকাল উত্তর করিল "কৈ আর যাওয়া হ'লো?"

কালীতারা বলিল, "এখনো তো মাঝে একটা দিন আছে। লোকজন না নিয়ে নিজেই না হয় এক দৌড়ে গিয়ে দেখে এস না।"

আকা। হেঁটে?

কালী। দোষ কি?

ঈষৎ বিরক্তির সহিত আকাল বলিল, "আমি এত পথ হাঁট্‌তে পারব না।"

কালীতারা নীরবে মৃদু হাসিল। সে মৃদু হাসিটুকু যে তীব্র শ্লেষ ছাড়া আর কিছুই নয়, ইহা বুঝিলেও আকাল পত্নীকে আর কিছু বলিল না।

পূজার ছুটীতে আকাল আসিল বটে, কিন্তু মা'র কাছে যাওয়া হইল না। শ্বশুরের বাড়ীতে পূজা, সুতরাং দশমী পর্য্যন্ত পূজার গোলমালে কাটিয়া গেল। একাদশী দ্বাদশী পর্য্যন্ত তাহার জের চলিল। তার পর ভূষণ দাসের যাত্রা ও রামনগরের সখের থিয়েটার পার্টি, উভয়ের মধ্যে কে অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল, এবং এই পাড়াগেঁয়ে থিয়েটারের সহিত কলিকাতার মিনার্ভা, ষ্টার প্রভৃতি থিয়েটারের কত প্রভেদ, নরীসুন্দরী, তারাসুন্দরী ও তিনকড়ি দাসী ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে কে শ্রেষ্ঠ, এই সকল মনোমুগ্ধকর আলোচনার মধ্য দিয়া দিনগুলা এমনই সহজ ও সুন্দরভাবে কাটিয়া যাইতে লাগিল যে, ইহারই মধ্যে একটা দিন এই সকল আলোচনা স্থগিত রাখিয়া যে মাকে দেখিতে যাইতে হইবে, এ কথাটা আকালের স্মৃতিপথে আদৌ প্রবিষ্ট হইবার অবসর পাইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হাজারিপাড়া প্রায় চারি ক্রোশ দূরে। আকালের মা আহারাদি করিয়া বাহির হইয়াছিল, সুতরাং সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বেই সে হাজারিপাড়ায় পৌছিল, এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বৃন্দাবন সামন্তের বাটীতে উপস্থিত হইল। বাড়ী দেখিয়াই তাহার তাক্ লাগিয়া গেল। এত বড় দোতালা পাকাবাড়ী, আর তাহার ছেলে এই বাড়ীর জামাই, ভবিষ্যতে ইহার মালিক! পুত্রের গৌরবে বৃদ্ধার হৃদয় গৌরবপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে আনন্দোৎফুল্ল-হৃদয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীতে ঢুকিতেই এক মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

বৃদ্ধা বলিল, "আমি আকালের মা।"

প্রশ্নকর্ত্রী বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অদূরে এক স্থুলাঙ্গী প্রৌঢ়া বসিয়া ছিলেন, তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "কে লা ক্ষীরি?"

ক্ষীরী বা ক্ষীরোদা মুখ ফিরাইয়া বিস্ময়সূচক স্বরে বলিল, "বলে, জামাইবাবুর মা!"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "দূর!"

তখন আরও কয়েকজন যুবতী, প্রৌঢ়া, বালিকা ছুটিয়া আসিল, এবং এই সমাগতা বৃদ্ধা কে, তাহা জানিবার জন্য তাহারা এমন একটা অবজ্ঞাসূচক ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল যে, আকালের মা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহার ন্যায় দীনা নারী জামাই বাবুর মা, ইহার অপেক্ষা সেই রমণী মণ্ডলীর নিকট আশ্চর্য্যের বিষয় যেন আর কিছুই নাই।

সহসা অদূরে জুতার শব্দ শুনিয়া আকালের মা সেই দিকে চাহিল। দেখিল, আকাল সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছে। তাহার পরণে কালাপেড়ে ধুতি, তাহার কোঁচা জুতার উপর লুটাইতেছে, গায়ে ফুল কাটা মিহি কাপড়ের পাঞ্জাবি, পায়ে পম্প-সু, মাথায় তেড়ি, হাতে রূপা-বাঁধান ছড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের জনতা দেখিয়া আকাল সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল। চাহিতেই বৃদ্ধার চোখে তাহার চোখ পড়িল। মুহূর্ত্তের জন্য আকালের মুখখানা হর্ষ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাহা ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। আকাল অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। বৃদ্ধার বুকে কে যেন সপাং করিয়া ছেলের হাতের সেই ছড়ির এক ঘা বসাইয়া দিল।

পুত্রের ব্যবহারে আকালের মা খানিকটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। আকাল—যে আকাল মাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে বলিয়া বিবাহে রাজী হয় নাই, সেই আকাল আজ এক বৎসরের পর মাকে দেখিয়াও দেখিল না, চিনিয়াও চিনিতে পারিল না। বৃদ্ধার ক্ষুব্ধ ব্যথিত হৃদয় আলোড়িত করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুকের কাছে ঠেলিয়া উঠিল, সেটাকে সবলে চাপিয়া রাখিয়া বৃদ্ধা সংজ্ঞাহীনার ন্যায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তার পর ধীরে ধীরে যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন বৃদ্ধা বুঝিতে পারিল, এরূপ দীনবেশে ধনী কুটুম্বের বাড়ীতে আসিয়া সে ভাল কাজ করে নাই। ইহাতে শুধু নিজের অবমাননা নয়, সে পুত্রকেও যথেষ্ট অবমানিত করিয়াছে, কুটুম্বের ঘরে তাহার উঁচু মাথা নীচু করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যত দোষই হউক, সে মা তো বটে। মাতার স্নেহ-দুর্ব্বল হৃদয়ে এত মান-অপমান-বিবেচনার শক্তি না থাকিলেও পুত্র হইয়া তাহাকে এতটা অবজ্ঞা করা কি উচিত হইয়াছে? একটা নিদারুণ ক্ষোভের উচ্ছ্বাসে মাতৃ-হৃদয়টা যেন ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য। মুহূর্ত্ত পরেই সে বুঝিতে পারিল, পুত্রের দিক্ দিয়া এই ব্যবহারটা অনুচিত হইলেও মাতার দিক্ দিয়াও তাহার নিজের ব্যবহারের সমর্থন করা যায় না। সে শুধু মাতৃত্বের দাবীতে পুত্রের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত করিবে, তাহার গৌরবোন্নত মাথাটা নীচু করিয়া দিবে, ইহা আরও অসঙ্গত, আরও বেশী অন্যায় নয় কি?

অদূরোপবিষ্টা প্রৌঢ়াই গৃহিণী, তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে কর্ত্তৃত্বের সুরে অভ্যাগতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা বাছা তুমি? কোথা হ'তে আসছ?"

আকালের মা তৎক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছে, সুতরাং গৃহিণীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "আমার পলাশপুরে বাড়ী গো, তোমাদের জামাই বাবুকে দেখতে এসেছি।"

"ওঃ, জামাইবাবুর মা পাঠিয়েছেন?"

"তা নয় তো আর কে পাঠাবে বল। মা ছাড়া আর ওর সেখানে কে আছে?"

গৃহিণী সংবর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন, "তা বটে। এস মা, বস।"

রোয়াকের উপর একখানা আসন পাতিয়া দিলে আকালের মা গিয়া বসিল। সমাগত রমণীগণ তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী জিজ্ঞসা করিলেন, "জামাই বাবুর মা ভাল আছেন ?"

ঈষৎ হাসিয়া আকালের মা বলিল, "তার আর থাকাথাকি কি, গেলেই হ'লো।"

পাশ হইতে জনৈকা প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিল, "এরি মধ্যে যাবে কেন গা ? বৌ-বেটা নাতি-পুতি নিয়ে ঘর-ঘরকন্না করুক।"

একটা বিষাদের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকালের মা বলিল, "অত্য আর কাজ নাই মা, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, ওরা আমার বেঁচে থাক্।"

তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া আকালের মা বলিল, "এখন ওদের রেখে বুড়ী যেতে পারে, তাই তার স্বগগ।"

গৃহিণীও যেন আপনার পরিণাম চিন্তা করিয়া সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, "সে কথা আবার বল্তে।"

আকালের মা বলিল, "বুড়া অনেক দিন ছেলেকে দেখে নি, খবরও পায় নি, তাই—"

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "তাই দেখতে পাঠিয়েছে ? আহা, মায়ের প্রাণ ত বটে।"

দণ্ডায়মানা ক্ষীরোদা বলিল, 'তার ঐ একটি-মাত্র ছেলে।"

আকালের মা দণ্ডায়মানা যুবতী ও বালিকাগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিল, "আমাদের বৌমা কোন্‌টি ?"

ক্ষীরোদা তাহাদের মধ্যে হইতে এক কিশোরীকে দেখাইয়া বলিল, "এই যে।"

কিশোরী লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইল। আকালের মা সহাস্যে মস্তক-সঞ্চালন করিয়া বলিল, "দিব্যি মেয়ে! বেঁচে থাক, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক।"

গৃহিণী বলিলেন, 'তাই তোমরা আশীর্ব্বাদ কর মা, বেঁচে থাক্। আমারও ঐ এক শিবরাত্রিরের সল্‌তে।"

অতঃপর গৃহিণী বসিয়া জামাতার মাতার সম্বন্ধে দুই এক কথার আলোচনা করিয়া আপনার সুখদুঃখের গল্প হইয়া বসিলেন। সে গল্পের মধ্যে তাঁহার সুখ-সৌভাগ্যের কাহিনীর সহিত প্রচ্ছন্ন গর্ব্বটা মাঝে মাঝে এমন বীভৎসভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল যে, আকালের মা মুখ টিপিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সে খুব সামলাইয়া সংক্ষেপে কথার উপর দিতে লাগিল।

দলের মধ্য হইতে এক যুবতী বলিল, "হাঁ গা, তবে যে তুমি আগে বল্‌লে, আমি আকালের মা ?"

আকালের মা হাসিয়া বলিল, "তামাসা ক'রে বলেছিলাম। আর তামাসাই বা এমন কি, ধর্‌তে গেলে আমিও তোমাদের জামাইবাবুর মা। ও তো আমারই মাই খেয়ে, আমারই কোলে মানুষ হয়েছে। হয় নয়, তোমাদের জামাই বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো।"

রাত্রিতে আকালের মা কিছু খাইল না, কেবল একঘটি জল খাইয়া দাবায় একটা মাদুর পাতিয়া পড়িয়া রহিল। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্তা যুবতী আসিয়া তাহাকে কহিল, "হাঁ গো বাছা, তোমার কথাই ঠিক।"

আকালের মা বলিল, "কি কথা মা ?"

যুবতী বলিল, "জামাইবাবুও বল্‌লে যে, তুমিই তাকে মানুষ করেছ বটে। ছেলেবেলায় তার মায়ের শক্ত ব্যারাম হয়, সে সময়ে জামাই বাবু তোমার কোলেই মানুষ হয়েছে।"

বৃদ্ধা মৃদু হাসিল। তাহার হাসির অন্তরালে যে একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস লুক্কায়িত ছিল, যুবতী তাহা দেখিতে পাইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা শুনিতে পাইল, উপরে ঘরে বসিয়া আকাল হার্ম্মোনিয়মের সুরের সহিত গলা মিশাইয়া গাহিতেছে,—

"বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার
আমার দেশ,
কেন গো মা তোর রুক্ষ বদন কেন গো মা তোর
মলিন বেশ।"

তাহার এই গান শুনিয়া দেশ-মাতাও হাসিয়া উঠিয়াছিলেন কি না, বলা যায় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রত্যূষে গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া আকালের মা যখন বাড়ীর বাহিরে আসিল, তখন আকাল সমুখের ছোট ফুলবাগানে পাদচারণা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া আকালের মা থমকিয়া

দাঁড়াইল ; তার পর পুত্রের দিকে স্নেহাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বেশ সহজ সহাস্যকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবা, ভাল আছ ত ?"

আকাল মাথা হেঁট করিয়া উত্তর করিল, "হাঁ।"

বৃদ্ধা বলিল, 'তোমার মাকে কিছু বলবার আছে ?"

আকাল শঙ্কিতে দৃষ্টিতে একবার এদিকে ওদিকে চাহিল। অদূরে মালী গাছে জল দিতে দিতে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল। আকাল ধরা-গলায় বলিল, "ব'লো, ভাল আছি।"

"হরি করুন সুখে থাক বাবা, রাজরাজেশ্বর হও।"

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কথাগুলি বলিয়া বৃদ্ধা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কিছুদূর গিয়া পাছু ফিরিয়া আর একবার উৎসুক-দৃষ্টিতে আকালের দিকে চাহিল। তার পর আর তাহাকে দেখা গেল না। আকাল একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। তখনও যেন কে দূর-দূরান্তর হইতে স্নেহকাতর কণ্ঠে বলিতেছিল, "রাজরাজেশ্বর হও।"

হায়, কি ভীষণ প্রতিদান এই স্নেহভরা আশীর্ব্বাদ। তীব্র অবজ্ঞা, নিদারুণ অকৃতজ্ঞতা। তাহার প্রতিদানে স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ—'সুখে থাক, রাজ্যেশ্বর হও।' স্নেহের ভিতর এ কি কঠোর শাস্তি। আশীর্ব্বাদের অন্তরালে এ কি ভীষণ বজ্রজ্বালা! সে জ্বালায় আকালের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল!

তাহার মনে পড়িল সেই ক্ষুদ্র ভগ্ন কুটীর, মনে পড়িল, স্নেহময়ী কল্যাণময়ী জননী, মনে পড়িল, তাহার জন্য তাঁহার সেই কঠোর পরিশ্রম, অর্দ্ধাশন, অনশন, পুত্রের মঙ্গলের জন্য জননীর সেই মহান্ আত্মত্যাগ। মনে পড়িল, পুত্রের উন্নতির জন্য, সুখের কামনায় পরের হস্তে তাহাকে সমর্পণ—মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব্ব বলিদান। আর সেই পুত্র? তুচ্ছ মানের ভয়ে, লজ্জার খাতিরে, সেই দীনা, হীনা, কল্যাণময়ী জননীর প্রতি পুত্রের তীব্র অনাদর-প্রকাশ, তাহাকে মাতা বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা, একবার মা বলিয়া ডাকিয়া দুঃখিনীর সকল দুঃখ-দৈন্য মুছাইয়া দিতেও অক্ষমতা! তথাপি ক্রোধ নাই, ক্ষোভ নাই, বিরাগ নাই। তথাপি সে হৃদয় হইতে স্নেহের তেমনই ক্ষীরধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া পুত্রকে প্লাবিত করিয়া দিতে চায়; অকৃতজ্ঞ পুত্রের মুখের উপর তেমনই করুণাভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্নেহবিগলিত-কণ্ঠে বলিতে পারে—"সুখে থাক বাবা, রাজ্যেশ্বর হও।" কি দুজ্জের্য় মাতৃহৃদয়!

আকালের ইচ্ছা হইল, একবার চীৎকার করিয়া ডাকে, "মা, মা, দুখিনী মা আমার!"

চাকর আসিয়া বলিল, "বাবু, চা তৈরী।"

আকাল উঠিয়া স্খলিত পদে ভৃত্যের অনুগমন করিল।

সে দিন আকালের কিছুই ভাল লাগিল না। খাইতে বসিয়া তরকারীগুলাকে পাতের এক পাশে ঠেলিয়া রাখিল। শাশুড়ী তাড়াতাড়ি আসিয়া জামাতার খাওয়া না হওয়ায় পাচিকার উপর তর্জ্জন আরম্ভ করিলে, আকাল বিরক্তির সহিত "ক্ষুধা নাই" বলিয়া উঠিয়া পড়িল। মধ্যাহ্ন-নিদ্রার পর মাথার চুল ফিরাইতে গিয়া বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইতেই নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেই লজ্জায় ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল, আয়নাখানাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলে। রাগে হাতের হেয়ার-ব্রাসটা মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া আকাল দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, এবং বৈঠকখানা-ঘরে গিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল।

দুই চারি জন বন্ধুবান্ধব আসিয়া জুটিল, গল্প-গুজব আরম্ভ হইল। আকাল কিন্তু সে গল্পে যোগ দিতে পারিল না, তাহাদের সরস গল্পের একটা কথাও তাহার কানে আসিল না। বিশ্বের সকল শব্দ - সকল কোলাহল চাপা দিয়া তাহার কানে শুধু একটি ক্ষীণ কোমল সুর অবিশ্রান্তভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—"সুখে থাক বাবা, রাজ্যেশ্বর হও।" আকালের সমগ্র চিত্তটা সেই ক্ষীণ সুরটুকুর দিকেই যেন উন্মুখ হইয়াছিল।

গল্প করিতে করিতে সহসা জনৈক বন্ধু বলিয়া উঠিল, "বেলা গেল, উঠি ভাই, সন্ধ্যা হয়ে গেলে মা বড় রাগ করে।"

আকাল মনে মনে হাসিয়া মনে মনেই বলিল, "মূর্খ। মা কি কখন রাগ করিতে পারেন?"

আকাল কিছুতেই চিত্ত স্থির করিতে পারিল না। সে যে দিকে যায়, সেই দিকেই যেন একখানা বিরাগ-লেশশূন্য স্নেহভরা প্রফুল্ল মুখ দেখিতে পায়। সংসারের সকল কথার মধ্যেই যেন শুনিতে পায়—'সুখে থাক বাবা।' আকালের বুকের ভিতর সাগরের তরঙ্গ উঠিতে-পড়িতে লাগিল।

রাত্রিতে কালীতারা বলিল, "দেখ গা, তোমাদের দেশের মেয়েটা সকালে যাবার সময় আমার মাথায় হাত দিয়ে মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল, দেখে আমার ভয় হ'ল। মাগী যেন—"

আকাল এমনই তীব্র দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল যে, সে আর কথা শেষ করিতে পারিল না।

জামাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বাড়ীর সকলেই উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু ইহার কারণ কি, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

আকালের উদ্বেগ ও অশান্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া গিয়া মাতার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে, কিন্তু সে সাহস হইল না। এত বড় অপরাধ করিয়া সে কোন্ মুখে মাতার সম্মুখে দাঁড়াইবে!

কিন্তু পাঁচ ছয় দিন এই অরুন্তুদ যাতনা ভোগ করিবার পর যখন তাহা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল, এবং শাশুড়ী ঠাকুরাণী জামাতার চিকিৎসার জন্য সহর হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন, তখন আকাল একদিন সকালে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া একবস্ত্রে পলাশপুর অভিমুখে ছুটিল।

দশম পরিচ্ছেদ

বেলা যখন প্রায় প্রহরাতীত, তখন আকাল বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা, মা, মা!" উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া কোন উত্তর না পাইয়া আকাল আবার আকুলকণ্ঠে ডাকিল, "মা, মা গো।" শূন্য গৃহ উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া উত্তর দিল, হো হো হো হো। আকাল স্তম্ভিত-হৃদয়ে হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

বামুন-পিসী স্নান করিয়া বাড়ীর সম্মুখ দিয়া ফিরিতেছিলেন। আকালের ডাক শুনিয়া তিনি দরজায় মাথা গলাইয়া বলিলেন, "কে রে আকাল? কখন্ এলি?"

আকাল হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আমার মা, মা কোথায়?"

বামুন-পিসী হাতের মালাছড়াটা গলায় ফেলিয়া বলিলেন, "তোর মা? সে যে বৃন্দাবনে গেছে?"

"এঁ্যা" বলিয়া আকাল উঠানের উপর বসিয়া পড়িল। বামুন-পিসী নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "কেন, হয়েছে কি? এই তো সে দিন সে তোকে দেখে ফিরে এল। এসে তোর কতই সুখ্যাতি করলে। তুই খুব সুখে আছিস্, মানুষের মত মানুষ হয়েছিস্—ব'লে কত আহ্লাদ তার। তার পর বুড়ী বললে, 'মাঠাকরুণ, আর এ বয়সে ঘুঁটে কুড়িয়ে মরি কেন?' গোকুল মিত্তিরের মা পশ্চিম গেল। জমী-জায়গা ভিটে সব সাড়ে বাইশ গণ্ডা টাকায় হারু মোড়লকে বেচে বুড়ী তার সঙ্গে কাল সকালে বৃন্দাবনে চলে গেছে। কপাল ভাল, বুড়ীর কপাল ভাল।"

আকালের বাক্য-স্ফূর্তি হইল না। সে বুঝিতে পারিল, তাহারই সুখের জন্য মাতা স্বেচ্ছায় এই কঠোর নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিলাস, বিভব সকলই যেন বীভৎস মূর্ত্তিতে উপহাসের তীব্র হাসি হাসিতে লাগিল। আকাল ভয়ে, ঘৃণায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পাশের বাড়ীর দরজায় বসিয়া ভিখারী বৈষ্ণব একতারা বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"হরি তুমি মাতৃরূপ সর্ব্বরূপ সার।
কাঁদে ছেলে মা মা ব'লে, পিতা যদি লয় হে কোলে,
ছেলে তাতে না ভোলে;
মায়ের ছেলে মাকে পেলে পিতার কোলে
যায় না আর॥"

আকালের দুই চোখ দিয়া ঝর-ঝর জল গড়াইতে লাগিল।

বামুন-পিসী আকালের মা'র সৌভাগ্য এবং আপনাদের ভাগ্যহীনতা কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ক্ষমাহীন অপরাধের গুরুভার হৃদয়ে চাপিয়া আকাল অলস মন্থর-পদে বাটীর বাহির হইল। শূন্য গৃহখানা যেন পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "সুখে থাক বাবা, রাজ্যেশ্বর হও।"

সমাপ্ত

বৈরাগী

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বরূপ বৈরাগীর মেয়ে পরাণী আঠার বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া যখন স্বামীর পরিত্যক্ত মণিহারীর বাক্সরা মাথায় তুলিয়া লইল, তখন প্রতিবাসী অভিরাম দাস কন্ঠিবদলের আশায় নিরাশ হইয়া নরোত্তম দাসের কড়চায় মনঃসংযোগ করিল।

পরাণীর বাপ ছিল না, মাও ছিল না, ঘরে শুধু বুড়ী আয়ী ছিল। বাপের মা নয়, মায়ের মা। অল্প বয়সে মা মারা গেলে আয়ীই জামাই-বাড়ীতে আসিয়া পরাণীকে মানুষ করিয়াছিল। আয়ীর সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, বিধবা পরাণী কন্ঠিবদল করিয়া পুনরায় সংসার-ধর্ম্ম করে। এই বয়সে মাথায় মোট করিয়া তাহার হাটে বাজারে যাতায়াত কি ভাল দেখায়? পরাণী কিন্তু কন্ঠিবদলের চেয়ে এই কাজটাকেই ভাল বলিয়া পছন্দ করিল।

পরাণীর স্বামী চিন্তামণি বৈরাগী ঘরজামাই হইয়াছিল। সে জাতি-ব্যবসায় ভিক্ষা ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য মণিহারী জিনিসের ফেরী করিয়া বেড়াইত। চিন্তামণির মৃত্যুর পর পরাণী স্বামীর বৃত্তি গ্রহণ করিল।

আয়ী কিন্তু ইহাতে বড় গোল বাধাইল। এমন সোমত্তবয়সে হাটে বাজারে যাওয়ায় যে কত বিপদ, আয়ী তাহা জানিত। সুতরাং সে ইহার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। পরাণী কিন্তু সে প্রতিবাদে কান দিল না। সে হাটের দিন খুব সকালে উঠিয়া স্নান করিয়া আসিত। তার পর একখানি ধোপদস্ত থান-কাপড় পরিয়া, নাসাগ্রে একটি সূক্ষ্ম রসকলি কাটিয়া দোক্তাভরা পান গালে দিয়া, মোট মাথায় কৃষ্ণনগরের হাটের দিকে যাত্রা করিত। পথিকেরা এই ষোড়শী পসারিণীর মত্তগজেন্দ্রগতিদর্শনে মুগ্ধ হইত, যুবকেরা তাহার দিকে হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিত, বৃদ্ধেরা হুঁচোট খাইত; আর গ্রামের অনেক লোক, শুধু পরাণীকে নয়, বুড়ীকেও ছি ছি করিত।

গ্রামের লোকের নানা অনুযোগ শুনিয়া বুড়ী একদিন রাগিয়া পরাণীকে বলিল, "দেখ্ পরাণী, তুই যদি এমন মোট মাথায় ক'রে হাটে বাজারে যাবি, তা' হ'লে আমি তোর হাতের জল পর্য্যন্ত খাব না।"

পরাণী বলিল, "তা হ'লে ত আমি বেঁচে যাই আয়ী, এই দু'কোশ পথ ভেঙ্গে এসে আমাকে আর জল-খল তুল্‌তে হয় না।"

আয়ী রাগিয়া বলিল, "আমি এবার মাথামুড় খুঁড়ে মরবো পরাণী।"

পরাণী হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি তোমায় তুলসীতলায় গোর দিয়ে নিশ্চিন্দি হব।"

রাগে চোখ কপালে তুলিয়া আয়ী বলিল, "তুই আবার হাস্‌চিস্ লা ছুঁড়ী?"

পরাণী বলিল, "কি করি আয়ী, আমার যে কান্না আস্‌চে না।"

আয়ী মাথা নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীরভাবে বলিল, 'এখন কান্না আস্‌বে কেন, 'এখন না বুঝলে বঁধু যৌবনের ভরে, পশ্চাৎ কাঁদিতে হবে অঝর ঝরে।' তখন এই বুড়ীর কথা সোঙরাবি।"

মৃদু হাসিয়া পরাণী বলিল, "পরে কাঁদ্‌তে হবে ব'লে এখন থেকে তার আখড়া দিতে হবে নাকি আয়ী?"

আয়ী রাগে. ফুলিতে লাগিল। কোনও উত্তর করিতে পারিল না। শুধু কঠোরদৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আয়ীর রাগের বৃদ্ধি দেখিয়া পরাণী হাস্য সংবরণ করিল, বলিল, "তা হ'লে তুমি কি কর্‌তে বল?"

আয়ী কোন উত্তর দিল না, রাগে গুম্ হইয়া রহিল। পরাণী বলিল, "তা হ'লে কি তুমি উপোস দিয়ে শুকিয়ে মত্তে বল?"

"উপোস দিতে যাবি কেন লা?"

"দু'পয়সা যোগাড় ক'রে না আন্‌লে কাজেই উপোস দিতে হবে।"

"উপোস অমনি সবাই দিচ্ছে। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।"

"তিনি তো আর মুখে তুলে দিয়ে যাবেন না। চেষ্টা ক'রে আনতে হবে।"

"হাটে বাজারে গিয়ে ?"

"না, ঘরে ব'সে থাকলে মুখে গুঁজে দিয়ে যাবে।"

"তা এতেও লোকে মুখে নুড়ো গুঁজে দিচ্ছে।"

পরাণী এবার রাগিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কেন দেবে ? আমি কার পাকা ধানে মই দিয়েছি ? নিজের গতর খাটিয়ে খাব, তাতে লোকের কি ?"

পরাণীর রাগ দেখিয়া আয়ী একটু নরম হইল, ধীরে কোমল স্বরে বলিল, "পোড়া লোকের স্বভাবই ঐ পরাণী, শুধু ছুতো খুঁজে বেড়ায়।"

পরা। আমি এমন ছুতোর কাজ কি করেছি ?

আয়ী। কর্‌বি আবার কি, তবে এই বয়স নিয়ে ভাল কি হাটে বাজারে যাওয়া দেখায় ?

পরা। আমি তো হাটে বয়স বিক্রী কর্‌তে যাই না, জিনিস বিক্রী কর্‌তে যাই।

আয়ী। সে জন্যই হোক্, যাস্ তো। তুই-ই বুঝে দেখ না, এতে পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা বল্‌তে পারে কি না ?

পরাণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "বেশ কা'ল থেকে যদি হাটে যাই, তবে আমার নাম পরাণীই নয়। ঘরে প'ড়ে উপোস দিয়ে ম'লেই যদি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তাই কর্‌বো।"

আয়ী ব্যগ্রভাবে বলিল, "ও আবার কি কথা পরাণী, বালাই, ষাট।"

পরাণী রাগে গুম্ হইয়া রহিল। আয়ী বলিল, "নিজের গোঁ ছেড়ে দে, আমার কথা শোন্।"

পরাণী বলিল, "তোমার আর কি কথা ? সাঙ্গা তো ?"

আয়ী বলিল, "সাঙ্গা কেন, কন্তিবদল। আমাদের জাতে তো আছে।"

পরাণী বলিল, "সে যারা ভেকধারী বোষ্টম, তাদের ঘরে আছে। আমি জাত বোষ্টমের মেয়ে।"

আয়ী শ্লেষের স্বরে বলিল, "আরে আমার জাত রে। জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাবি ?"

উচ্চস্বরে পরাণী বলিল, "জাত নিয়ে ধুয়ে খাব না তো কি বাপ-ঠাকুদ্দার মুখে কালি দেব ?"

আয়ী বলিল, "না, হাটে গিয়ে নিজের মুখে বেশ ক'রে চুণ-কালি মাখবি। আমার তো মরণ নাই, তাই ব'সে ব'সে এই সব দেখতে হচ্ছে।"

পরাণী কোনও উত্তর করিল না। আয়ী উঠিয়া পেরেকে ঝুলান জপের ঝুলী পাড়িতে পাড়িতে বলিল "আমার কথা শোন্ পরাণী। আজও অভিরাম এসেছিল। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ না।"

পরাণী এবার বুঝিতে পারিল, আয়ীর প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি। সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিল, অভিরামই এই সকল যুক্তির মূল, সে-ই আসিয়া আয়ীকে উত্তেজিত করিয়া গিয়াছে। তাহার মুখ বন্ধ করিতে না পারিলে আয়ীর তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালির কাগজের ছেঁড়া খাতাখানা সম্মুখে ধরিয়া অভিরাম সুরের সহিত নরোত্তম দাসের কড়চা আবৃত্তি করিতেছিল,—

"রাম নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে,
বিফলে মনুষ্য-জন্ম যায় দিনে দিনে।
যায় রে মনুষ্য-জন্ম গেল রে বহিয়ে,
কি কর পামর মন কৃষ্ণ না ভজিয়ে।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ জপ কৃষ্ণ কর সার,
কৃষ্ণ বিনে সংসারে গতি নাহি আর।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু,
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হৈনু।
দিনে দিনে সংসারের পাপবৃক্ষ বাড়ে,
ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।"

অভিরাম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাগজখানা চোখের সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইল। হায়, মায়ারূপী স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আসিয়া তাহার সংসার-বৃক্ষকে এক দিন এমনই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে, অভিরাম ভাবিয়াছিল, "হা গোবিন্দ! এ মায়ামোহ হ'তে আমায় উদ্ধার কর, মহা পাতকী আমি, আমায় পথ দেখাও।" কিন্তু গোবিন্দ যে দিন তাহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, সহসা একটা কালের ঝড় আসিয়া অভিরামের সংসার-বৃক্ষের ডালপালাগুলা

নির্ম্মূল করিয়া দিল, সে দিন বিশাল প্রান্তরে শাখা-প্রশাখা-বিহীন শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় দাঁড়াইয়া অভিরাম শোকবিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "হা গোবিন্দ, এ কি করিলে ?" আগে যে অভিরাম স্ত্রী-পুত্রকেই সাধনপথের প্রধান কণ্টক স্থির করিয়াছিল, সেই কণ্টক উন্মূলিত হইলে, মায়ার বন্ধন খসিয়া গেলে, সে আর পথ দেখিতে পাইল না। সমগ্র বিশ্বটাই যেন তাহার নিকট বিকট শ্মশান বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এ মহাশ্মশানে বসিয়া রুদ্র কাপালিক কপাল-মালিনীর সাধনা করিতে পারে, কিন্তু অভিরামের মত সাধক ভক্তির কোমল সুরে তাহার প্রেমের দেবতাকে কিরূপে ডাকিবে ?

চিত্তকে দৃঢ় করিয়া অভিরাম জপে বসিত, কিন্তু মন জপে বসিতে চাহিত না ; দুইটা মালা না ঘুরিতেই যেন কাহার কলহাস্যপূর্ণ মুখখানি দেখিবার জন্য পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিত। অভিরাম জোর করিয়া চোখ দুইটা মুদ্রিত করিত। কিন্তু স্মৃতি শত চক্ষু প্রসারিত করিয়া দেখিতে পাইত, ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিতেছে, প্রদীপের সম্মুখে এক তন্বঙ্গী যুবতী দেড় বছরের ছেলেটিকে কোলে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছে। ছেলে ঘুমাইতে চাহিতেছে না, মা তাহাকে জোরে কোলে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মাথায় মৃদু চাপড়াইতে চাপড়াইতে, হাঁটু নাচাইতে নাচাইতে, ঘুমপাড়ানোর সুরে বলিতেছে,—"আয় রে আয়, আমার সোনার যাদু ঘুম যায়।" ছেলে মাথা নাড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, মা মুখে তাহাকে তিরস্কার করিতেছে, কিন্তু চোখ দুইটা দিয়া স্নেহের অমৃতধারা উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে। ছেলে অর্দ্ধস্ফুটকণ্ঠে বলিতেছে, "আ বা বা বা।" মা তর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "হাঁ, হাঁ, সে এখন জপে বসেছে, তোর তরে কি ভগবান্‌কেও একটু ডাক্‌বে না ?" ছেলে কিন্তু ভগবান্‌কে ডাকিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিল না, সে বা-বা-বা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "এমন ছেলেও তো দেখিনি" বলিয়া মা তাহাকে ধমক দিল। অভিরাম চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ব্যস্তভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে শূন্য ঘরখানা উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। অভিরাম মালা ফেলিয়া, দুই হাত দিয়া চক্ষু আবৃত করিল। হায় দেবতা! তোমার মায়ার এ কি কঠোর বিদ্রূপ!

অভিরাম দিন-রাত ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিত, "হে দীনদয়াল, মায়ার বন্ধন যখন ছেদন করিয়া দিয়াছ, তখন মনের এই মোহটুকু কাটাইয়া দাও ঠাকুর! দাবদাহে বৃক্ষ দগ্ধ হইয়াছে, তাহার শুষ্ক মূলটুকু আর থাকে কেন ?"

কেন যে থাকে, তাহা অভিরাম জানিত না কিন্তু সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী জানিতেন। তিনি জানিতেন বর্ষার স্নিগ্ধধারাসম্পাতে এক দিন এই দগ্ধ বৃক্ষের নীরস মূল সরস হইয়া উঠিবে, বসন্তের মৃদুমলয়স্পর্শে সে পুনরায় নবীন শিহরণ অনুভব করিবে। তখন আবার এই দগ্ধ বৃক্ষ নবোদ্গত শাখাপ্রশাখায় নবীন পত্রপুষ্পে সুভূষিত হইয়া শ্যামসৌন্দর্য্য বিস্তার করিবে।

গ্রামের ঘরে ঘরে নামগানই অভিরামের জীবিকা ছিল। নামগান করিয়া গৃহস্থদিগের নিকট যাহা পাইত, তাহাতেই তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। সকালে উঠিয়া করতাল লইয়া নামগানে বাহির হইত, এবং মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘরে ফিরিত। তার পর স্নান ও ইষ্টপূজা-সমাপনান্তে স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিত। গ্রামের কোনও বাটীতে যে দিন ক্রিয়াকর্ম্ম থাকিত, সে দিন আর তাহাকে পাক করিতে হইত না, ব্রাহ্মণ কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণের সহিত অভিরামের নিমন্ত্রণও বাদ যাইত না। শুধু বাসগ্রামে নয়, পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারিখানা গ্রামেও অভিরামের যাতায়াত ছিল।

সে দিন কেশবগঞ্জে নামগান করিয়া ফিরিতে একটু বেশী বেলা হইয়াছিল। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে পৃথিবী যেন দগ্ধ হইতেছিল, রাস্তার ধূলাগুলা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত পায়ে ঠেকিতেছিল। পথ প্রায় জনশূন্য, ক্বচিৎ দুই এক জন হাটুরিয়া ভিজা কাপড় গায়ে দিয়া শূন্য বাজরা-মাথায় ঘরে ফিরিতেছিল। সেই রৌদ্রতপ্ত নির্জ্জন পথে অভিরাম একা দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়াছিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "বৈরিগী ঠাকুর!"

অভিরাম চমকিতভাবে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। আবার ডাক আসিল, "এ দিকে বৈরাগী ঠাকুর, এ দিকে।"

রাস্তা হইতে অনতিদূরে একটা শুষ্কপ্রায় পুষ্করিণী তীরে দুইটা গাছ—অশ্বত্থ ও বট জড়াজড়ি করিয়া স্থানটাকে ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছিল। অভিরাম দেখিল, সেই ছায়াময় স্থানে বৃক্ষতলে এক স্ত্রীলোক। সে স্ত্রীলোক তাহাদেরই গ্রামের স্বরূপ দাসের মেয়ে

পরাণী। অভিরাম বিস্ময়পূর্ণচিত্তে ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইল, এবং নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে, পরাণী ?"

মৃদু হাসিয়া পরাণী বলিল, "হাঁ, আমি। তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"

অভিরাম গাছতলায় ঘাসের উপর বসিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কেশবগঞ্জে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুই পরাণী, তুই এখানে ?"

পরাণী বলিল, "আমি কেষ্টনগরের হাটে গিয়েছিলাম।"

অভিরাম একটু বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "হাটে ?"

সম্মুখবর্ত্তী বাজরার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পরাণী সহাস্যে বলিল, "আমি যে মণিহারীর দোকান করেছি।"

অভিরাম একবার পরাণীর দিকে, আর বার বাজরার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। পরাণী বলিল, "আজ যে কাঠ-ফাটা রোদ, তার উপর এই ভারী মোট, একটু না জিরিয়ে আর পার্‌লাম না। কিন্তু মোট নামিয়ে এক বিপদে পড়েছি, তুলে দেবার লোক পাইনি। একা মেয়ে মানুষ কি এত বড় মোট তুল্‌তে পারি ?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভিরাম বলিল, "এ সব কি তোর কাজ পরাণী ?"

ঈষৎ হাসিয়া পরাণী বলিল, "সে ত তুমিও বল, আমিও বলি, কিন্তু পেট তো সে কথা শোনে না।"

অভিরাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া পরাণীর কানের পাশে চুলগুলায় দোল দিয়া গেল। গাছের খুব উঁচু ডালে বসিয়া একটা পাখী উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, ফটি-ই-ক্‌ জ-ল। অভিরাম ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া রৌদ্রদগ্ধ মাঠের দিকে চাহিল।

পরাণী উঠিয়া কাপড়টা বেশ গুছাইয়া পরিল, এবং আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া অভিরামের দিকে চাহিয়া বলিল, "মোটটা তুলে দাও দেখি।"

অভিরাম উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কাঁধের গামছাখানা কোমরে বাঁধিয়া বলিল, "ওটা আমি নিচ্ছি।"

পরাণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁহুঁ।"

সতৃষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অভিরাম ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তাতে দোষ কি পরাণী ?"

পরাণী দুই হাত দিয়া মোটের একটা পাশ ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "নাও, তুলে দাও।"

অভিরাম আর কিছু না বলিয়া মোট তুলিয়া দিল। মোট লইয়া পরাণী আগে আগে চলিল, অভিরাম তাহার পশ্চাদ্‌গামী হইল। যাইতে যাইতে পরাণী বলিল, "আমার সঙ্গে তোমাকে আস্তে আস্তে যেতে হচ্ছে। কিন্তু রাস্তায় জনপ্রাণী নাই, আমার একা যেতে কেমন ভয় করে।"

অভিরাম কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে রহিল। আরও কিছু দূর গিয়া পরাণী বলিল, "একা হ'লে তুমি এতক্ষণ বাড়ী পৌঁছাতে। তোমার দেরী হয়ে গেল।"

অভিরাম বলিল, "তা হোক্।"

সেই দিন বাড়ী পৌঁছিয়া অভিরাম দেখিল, তাহার প্রাণের উপর দিয়া একটা ঝড় চলিয়া গিয়াছে। সে ঝড়ে তাহার মনের বৃত্তিগুলা এমন ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করা দুষ্কর।

অপরাহ্নে অভিরাম বৈষ্ণবগ্রন্থগুলা পাড়িয়া তাহাদের ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া বৈরাগ্যসূচক পদগুলা বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিল। সন্ধ্যায় জপ ও বন্দনার শেষে অভিরাম দেখিল, তাহার চেষ্টা সফল হইয়াছে, মনের নেশার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। সেখানে শুধু পরাণীর জন্য একটু করুণামাত্র জাগিতেছে।

পরদিন অভিরাম পরাণীর আয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিল যে, পরাণীর এরূপ হাটে বাজারে যাওয়া ভাল নয়। কণ্ঠিবদল করিয়া পুনরায় তাহার সংসারী হওয়া উচিত।

আয়ী অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "তা বাছা, ও হতভাগা মেয়ে কি আমার কথা শোনে ? তুমি একটু বুঝিয়ে দেখ না।"

অভিরামের বুকটা ধড়-মড় করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি আয়ীর কাছ হইতে পলাইয়া আসিয়া নরোত্তম দাসের কড়চা খুলিয়া বসিল, এবং খুব জোরে জোরে পড়িতে লাগিল,—

"রাম নাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে,
বিফলে মনুষ্যজন্ম যায় দিনে দিনে।
যায় রে মনুষ্যজন্ম গেল রে বহিয়ে,
কি কর পামর মন কৃষ্ণ না ভজিয়ে।"

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ,
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।"

কাগজখানা কপালে ছোঁয়াইয়া অভিরাম অন্য পদ পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় পরাণী হেলিতে দুলিতে আসিয়া ডাকিল, "বৈরিগী ঠাকুর।"

অভিরাম মহাজনপদাবলী হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া সবিস্ময়ে পরাণীর দিকে চাহিল। পরাণী আবদারের সুরে বলিল, 'আমাকে নাম শোনাবে বৈরিগী ঠাকুর?"

পরাণী অভিরামের সম্মুখে একটু দূরে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। অভিরাম হতবুদ্ধি হইয়া শুধু বিস্ময়ে স্তব্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পরাণী সহাস্যে অথচ তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্ছো?"

দৃষ্টি নত করিয়া অভিরাম ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার সঙ্গে এ বিদ্রূপ কেন পরাণী?"

পরাণী বলিল, "নাম শুনতে চাওয়া কি বিদ্রূপ?"

অভিরাম বলিল, "সত্যই কি তুমি সেইজন্য এসেছ?"

"তবে কি তোমার সঙ্গে কণ্ঠিবদল কর্‌তে এসেছি?"

অভিরাম শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্তকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া মুখ তুলিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "ছিঃ, পরাণী।"

পরাণী কিন্তু এ তিরস্কারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না, সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ছি কেন বৈরিগী ঠাকুর? তোমারও তো কণ্ঠিবদল দরকার হয়ে পড়েছে।"

অভিরাম বিরক্তিপূর্ণদৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরাণী বলিল, "কি দেখ্‌চো? আমার রূপ?"

অভিরাম একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এ রূপ ক'দিনের জন্য পরাণী?"

সহাস্যে পরাণী বলিল, "যে ক'দিন থাকে।"

অভিরাম বলিল, "বড় বেশী দিন থাকে না, দু'দিন মাত্র। তার পর—"

পরাণী বলিল, "তার পর কি? মাটীর দেহ মাটী হবে, না?"

পরাণী হাসিয়া উঠিল; অভিরাম ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে পরাণী পুঁথিগুলার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এগুলা তোমার বৈরাগ্যের দপ্তর নাকি?"

অভিরাম বলিল, "এ সব মহাজন-পদাবলী।"

"তাতে কি লিখ্‌চে? মেয়েমানুষগুলাই যত আপদ্, পায়ের বেড়ী, পথের কাঁটা, আর পুরুষগুলি সব সাধু সন্ন্যাসী, না?"

অভিরাম ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। পরাণী বলিল, "একটু শোনাও না।"

অভি। ও সব তোমার ভাল লাগ্‌বে না।

পরা। তোমার ভাল লাগে?

অভি। ভাল লাগে ব'লে পড়ি।

পরা। শুধু পড়? টিয়ে পাখীর মত?

অভিরাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। পরাণী বলে কি? এ তো পরিহাসের কথা নয়, এ যে অন্তরের কথা, অনেক উচ্চশিক্ষার কথা! সত্যই তো শুধু টিয়াপাখীর মত আবৃত্তি করিয়া কি হইবে? সে যে আজীবন এই সকল উপদেশ আবৃত্তি করিয়া আসিতেছে, আবৃত্তি করিয়া লোককে শুনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু ফলে কি হইয়াছে? কিছুই হয় নাই। প্রথমে এই সকল মহাজনবাক্যকে যেরূপ জীবিকার সহায়রূপে আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিল, এখনও ঠিক তাহাই আছে। এই সকল উপদেশের একটি অক্ষরও তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয় নাই, ইহার একটি আদেশও সে পালন করে নাই। একটা অরুন্তুদ যাতনায় অভিরামের বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া আসিল, তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

পরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচো বৈরিগী ঠাকুর?"

অভিরাম অশ্রুকাতর দৃষ্টি তুলিয়া পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। সবিস্ময়ে দেখিল, পরাণীর মুখে আর হাসি নাই, তাহার হাস্যচঞ্চল মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে, চঞ্চল দৃষ্টির মধ্যে তিরস্কারের ভীষণ তীব্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাতরস্বরে অভিরাম বলিল, "আমায় মাপ কর পরাণী, আমি ঘোর পাতকী।" অভিরাম কাঁদিয়া ফেলিল। পরাণী আবার হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "ছি বৈরিগী ঠাকুর, কেঁদে ফেল্‌লে যে।"

অভিরাম কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি অতি হতভাগ্য পরাণী, আমার উদ্ধার নাই।"

পরাণী একটু তীব্রস্বরে বলিল, "তোমার উদ্ধার আছে কি না, সে কথা তোমার উদ্ধারকর্ত্তাই জানেন। তবে বস্তিবদলের যদি ইচ্ছা হয়, আমার কাছে যেও, আয়ীকে মিছে জ্বালিও না।"

পরাণী উঠিয়া ধীরগম্ভীরপদক্ষেপে চলিয়া গেল। অভিরাম স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। দিবার আলোক নিবিয়া আসিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে গৃহপ্রাঙ্গণ আচ্ছন্ন হইল। উঠানের আমগাছে বসিয়া একটা পেঁচা চীৎকার করিয়া উঠিল। অভিরাম চমকিত হইয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার কি হবে গোবিন্দ!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অভিরামের মুখ বন্ধ করিয়া পরাণী যে শুধু নিশ্চিন্ত হইল, তাহা নহে, মনের ভিতর বেশ একটু গর্ব্বও অনুভব করিল। তাহার এমন একটা ঐশ্বর্য্য আছে, যাহাতে অনেকেই ভিক্ষাপাত্রহস্তে দ্বারস্থ হইয়া তাহার কৃপা ভিক্ষা করে, তাহার রূপ-যৌবনের পদে আপনার সর্ব্বস্বঢোলিয়া দিবার জন্য লালায়িত হয়। কিন্তু হৃদয়ের অসামান্য দৃঢ়তার প্রভাবে সে লোকের সেই সকাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে, দাতার অযাচিত সর্ব্বস্বদানকেও অকাতরে ফিরাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমনই তাহার হৃদয়বল, এতই তাহার চিত্তের দৃঢ়তা।

চিত্তের এই কঠোর দৃঢ়তায় অধিকতর উৎফুল্ল হইয়া, লোকের নিন্দা-গ্লানিতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পরাণী পুনরায় মোট-মাথায় হাটে বাজারে যাতায়াত করিতে লাগিল। আয়ী হতাশচিত্তে পরাণীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে করিতে হরিনামে মনঃসংযোগ করিল।

আয়ী কিন্তু বিধাতার নিকট মৌরসী পাট্টা লইয়া সংসারে আসে নাই। আর সকলের ন্যায় সেও মেয়াদী দলীল লিখিয়া দিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং পরাণী এক দিন হাট হইতে ফিরিয়া দেখিল, আয়ীর দলীলের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবং তাহারই নোটিশ দিবার জন্য জয় ও অতিসার নামক দুই পেয়াদা উপস্থিত হইয়াছে। পরাণী বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

পরাণী ঔষধ খাইবার জন্য আয়ীকে অনুরোধ করিল। আয়ী কিন্তু তুলসীতলার মাটী আর গঙ্গা-জল ছাড়া অন্য ঔষধ খাইতে চাহিল না। পরাণী হাট-বাজার বন্ধ করিয়া আয়ীর সেবা করিতে লাগিল। তার পর আয়ী যখন অন্তরে তাহার চিন্তা ও মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলোকের চিন্তার অতীত স্থানে চলিয়া গেল, তখন পরাণী যেন সংসার শূন্য দেখিল। সে উঠানের ধুলায় পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অভিরাম ও অন্যান্য স্বজাতীয়গণ আসিয়া বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিল। আয়ীর পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য পরাণী দশ টাকা খরচ করিয়া বৈষ্ণবভোজন করাইল। দধি-চিপিটক-সংযোগে স্ফীতোদর বৈষ্ণববৃন্দ পরাণীর ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। পরাণী শূন্যগৃহে বসিয়া আপনার অসহায় অবস্থা-স্মরণে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল, অভিরামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু ছিঃ, একদিন যে তাহারই দ্বারে ভিক্ষুক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং গর্ব্বের সহিত যাহাকে দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহারই নিকট আজ ভিক্ষা চাহিবে? পরাণী ভাবিল, অসহায়ের সহায় ভগবান্, ভগবান্‌কে ছাড়িয়া সে কেন মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে? পরাণী ভগবানের উপরেই নির্ভর করিয়া চিত্তে দৃঢ়তা আনিল, এবং পুনরায় মোট-মাথায় হাটে যাতায়াত করিতে লাগিল।

ভগবানের উপর নির্ভর করিলেও পরাণী কিন্তু পূর্ব্বের মত কেনা-বেচা করিতে পারিল না। খরিদ্দার জিনিসের দর করিতে করিতে মুখের দিকে চাহিলেই পরাণী যেন লজ্জায় মরিয়া যাইত; কেহ হাসিয়া কথা কহিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত; জিনিসের মূল্যাধিক্যের জন্য কেহ তাহার বয়সের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কথা কহিলে পরাণীর ইচ্ছা হইত, সে বাজরা শুদ্ধ জিনিস সেইখানে আছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া পলায়, কিন্তু পলাইলে চলিবে কেন? বাজরা আছড়াইলে খাইবে কি? সুতরাং এই সাময়িক উত্তেজনা দমন করিয়া সে অসীম ধৈর্য্যসহকারে দোকানদারীতে

মর্ম দিত। বিরক্ত হইলেও সে আগেকার মতই নিয়মিত-রূপে হাটে যাইত, সস্তা দরে জিনিস কিনিয়া চড়া দরে বেচিবার চেষ্টা করিত; খরিদ্দারের সমক্ষে পাঁচ পয়সার জিনিসকে তিন আনায় কেনা বলিয়া শপথ করিতেও ছাড়িত না। তবে আগে পরাণী যে কাজটা প্রবল আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করিত, এখন যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কোনরূপে তাহা চালাইয়া যাইত। এক এক সময় ভাবিত, "দূর হোক্, না খেয়ে মরতে হয়, সেও ভাল, তবু এমন ঝকমারীর কাজ আর করবো না।"

ইহার উপর পাড়ার ছোঁড়ারা বঁড়শী সূচ, সূতা, সাবান, চিরুণী কিনিতে আসিয়া যখন বাজে গল্প পাড়িয়া বসিত, এবং তিন পয়সার জিনিস কিনিতে আসিয়া তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট করিতেও ইতস্ততঃ করিত না, তখন অগত্যা পরাণীকে কখনও মিষ্ট সুরে, কখনও বা একটু চড়া গলায় তাহাদের এই সময়ের অপব্যবহারটুকু স্মরণ করাইয়া দিতে হইত। সেই সঙ্গে নিজের ঝকমারীর কাজের বোঝাটা ক্রমশঃ বত ভারী হইয়া উঠিতেছে, তাহাও নিজে ভাবিয়া লইত।

সকলেই আসিত, আসিত না শুধু অভিরাম। পরাণী ভাবিত, "তার কি আস্‌বার আর মুখ আছে? বেড়ালতপস্বী সেজে পরাণী বোষ্টমীর সঙ্গে এসেছ চালাকী করতে।"

দৈবাৎ কোনও দিন হাট হইতে ফিরিবার সময় পরাণী একটু ঘুরিয়া অভিরামের বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইত। বাহির হইতে উঁকি দিয়া দেখিত, অভিরাম সর্বাঙ্গে গোপীচন্দনের ছাপ পরিয়া, তুলসীমঞ্চের সম্মুখে বসিয়া তদগতচিত্তে ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছে,—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর,
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর।
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে,
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন,
কবে হায় হেরব শ্রীবৃন্দাবন।
রূপ রঘুনাথ পদে হ'বে আকুতি,
কবে নেহারিব সেই যুগল মুরতি।"

পরাণীর মনে হইত, এটা যেন নেহাৎ ফাঁকা প্রার্থনা নয়; ইহার সঙ্গে যেন তাহার অন্তরের বাস্তব যোগ আছে, এবং সে যোগে অনেকখানি কান্না অভিরামের কণ্ঠা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে। পরাণীর মনে হইত, এই সময় যদি সে একবার কঠোর বিদ্রূপের স্বরে ডাকে—বৈরিগী ঠাকুর! মনে উঠিলেও পরাণী কিন্তু ডাকিত না, ডাকিতে সাহস হইত না। সে ডাকে পাছে অভিরামের এই তন্ময়তাটুকু নষ্ট হইয়া যায়; পাছে সে তেমনই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলে—"আমি ঘোর পাতকী পরাণী, আমি ঘোর পাতকী।"

পরাণী মোট মাথায় দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া অভিরামের আকুল-কণ্ঠোচ্চারিত প্রার্থনা-সঙ্গীত শুনিত, তার পর ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সে স্থান ত্যাগ করিত। যাইবার সময় জোরে পা ফেলিত না, পদশব্দে যদি অভিরামের ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়; যদি তাহার এই আকুল প্রার্থনার সূক্ষ্ম সুরটুকু প্রার্থিতের কানে গিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হয়।

একটু দূরে গেলেই কিন্তু পরাণীর মনের এই সঙ্কোচটুকু তিরোহিত হইয়া যাইত, সে আপনার মনে আপনি হাসিয়া বলিত, "মর্ পোড়ারমুখী, এই বেড়াল-তপস্বীর আবার তপ-জপ, আর সেই তপ-জপকে এত ভয়!" পরাণী খুব জোরে জোরে পা ফেলিয়া, পদশব্দে নির্জ্জন পল্লীপথ শব্দিত করিয়া চলিয়া যাইত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঝড়ের বেগে গাছটা খুব খানিক ওলট-পালট খাইয়া আবার যেমন স্থির হইয়া দাঁড়ায়, অভিরামও তদ্রূপ মোহের ধাক্কায় খানিকটা লুটোপুটি খাইয়া শেষে বৈরাগ্যের জোরে মনটাকে খাড়া করিয়া লইল। আবার সে নামকীর্ত্তন, ভিক্ষা ও জপ-আহ্নিক লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু রোগ সারিলেও দৈহিক দুর্ব্বলতাটুকু সারিতে যেমন অনেক দিন লাগে, সেইরূপ অভিরামের মোহমুক্ত চিত্তের মধ্যে একটু দুর্ব্বলতা রহিয়া গেল, সেইটুকুর শাস্তির জন্ত অভিরাম জপ-আহ্নিকের মধ্যে চিত্তটাকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টিত হইল।

অভিরাম সাধ্যপক্ষে পরাণীর বাড়ীর দিকে যাইত না। দৈবাৎ পথে দেখা হইলে, লোকে সাপ দেখিলে যেমন বিশ হাত দূরে ছুটিয়া পলায়, অভিরামও সেইরূপ ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিত। পরাণী কৌতুকের

হাসি হাসিয়া পরিহাস-তরল-কণ্ঠে ডাকিত, "বৈরিগী ঠাকুর, ও বৈরিগী ঠাকুর।" সে বিদ্রূপপূর্ণ আহ্বানে অভিরাম লজ্জিত হইত, কিন্তু ফিরিয়া চাহিত না।

তার পর পরাণী যখন অনেকটা অগ্রসর হইত, তখন অভিরাম সহসা দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া নির্নিমেষ-নেত্রে পরাণীর মত্তগজেন্দ্রগতির দিকে চাহিয়া থাকিত। চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত, 'হায়, রক্তমাংসগঠিতা নারী, সত্যই তুই মহামায়ার অংশ। নতুবা শ্যামসুন্দরকে ছাড়িয়া তোর এই নশ্বর সৌন্দর্য্যের প্রতি চিত্ত এত আকৃষ্ট হয় কেন?' অভিরাম নশ্বর সৌন্দর্য্যমুগ্ধ দৃষ্টিটাকে ফিরাইতে না পারিয়া আপনার উপর আপনি রাগিয়া উঠিত। তাহার ইচ্ছা হইত, সাধু বিল্বমঙ্গলের মত সর্ব্বনাশের মূল চোখ দুইটাকে উপড়াইয়া ফেলে। হায় প্রভু, রমণীর রূপলাবণ্য ছাড়িয়া কবে এই লুব্ধ দৃষ্টি দুইটাকে তোমার চরণে নিবদ্ধ করিতে পারিব?

হৃদয়ে গভীর বিষাদ ও আত্মগ্লানি লইয়া অভিরাম ঘরে ফিরিত, এবং সংসারটাকে দূরে সরাইয়া, সমগ্র অন্তঃকরণ দিয়া শ্যামসুন্দরকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রাণপণ করিত। কিন্তু ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারিত না, কোথা হইতে পরাণী আসিয়া তাহাকে যেন বিশ ক্রোশ ব্যবধানে টানিয়া লইয়া যাইত।

এইরূপে এক দিকে পরাণী, অন্য দিকে শ্যামসুন্দর, একদিকে মোহ, অন্যদিকে বিবেক, একদিকে নরক, অন্যদিকে স্বর্গ, এই উভয়ের মাঝে পড়িয়া অভিরাম যখন নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিত, তখন সে সকাতরে শ্রীগোবিন্দকে ডাকিতে থাকিত, আর এই প্রলোভনপূর্ণ মায়াময় গৃহবাস ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের পবিত্র রজে গড়াগড়ি দিবার জন্য প্রাণের ভিতর একটা আকুল বাসনা পোষণ করিত। মাঝে মাঝে পাঁজির বিজ্ঞাপন খুলিয়া রেলের ভাড়া হিসাব করিত। হিসাবে দেখিত, যাইবার খরচটা যোগাড় হইতে পারে, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার খরচের অভাব। অভিরাম ভাবিত, নাই বা আসিলাম। এখানে ভিক্ষা করিয়া খাই, সেখানেও ভিক্ষা করিয়া খাইব। কিন্তু অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য কখন ঘটিবে কি?

সুযোগ উপস্থিত হইল। দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে গ্রামের বিস্তর লোক বৃন্দাবন-যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল। অভিরামও তাহাদের সঙ্গী হইবার কল্পনা করিল; যাত্রার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিল, অভিরামের উৎকণ্ঠা ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। আহা, শ্রীবৃন্দাবন! শ্যামসুন্দরের লীলানিকেতন, কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলা গোপীদিগের পাদস্পর্শে পবিত্র ব্রজধাম! সেই যমুনা, সেই কেলিকদম্ব, সেই বংশীবট, সেই গিরিগোবর্দ্ধন। সেই—

দ্বাদশ রাখাল মিলি শ্যামরায় কুতূহলী
আগে পিছে ধায় সব ধেনু,
শিরেতে মোহন চূড়া কটিতটে পীতধড়া
রাধা রাধা বোলে ডাকে বেণু,

ভাবিতে ভাবিতে অভিরাম পুলকিতচিত্তে আপন মনে গাহিয়া উঠিত,—

"হরি বল্‌বো আর মদনমোহন হেরবো গো।
যাব রাজেন্দ্রপুর হব গোপিকার নূপুর গো,
তাদের রাঙ্গা পায়ে রুণু ঝুনু বাজ্‌বো গো।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অভিরামের বৃন্দাবন-যাত্রার কথায় আর কেহ তেমন মনোযোগ না দিলেও পরাণী কথাটা খুব আগ্রহের সহিতই শুনিল। শুনিয়া সে একদিন অভিরামকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বৈরিগি ঠাকুর, তুমি নাকি বৃন্দাবন যাবে?"

নতমুখে গম্ভীরভাবে অভিরাম উত্তর করিল, "সেই রকমই তো মনে কচ্ছি পরাণী।"

"মনে যখন কচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই যাবে।"

"অদৃষ্টে যদি থাকে।"

"আমাকে সঙ্গে নেবে?"

"তোকে।"

অভিরাম খুব বিস্ময়ের সহিত পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। মৃদু হাসিয়া পরাণী বলিল, "হাঁ, আমাকে।"

"তুই বৃন্দাবনে যাবি?"

"যেতে নাই কি?"

অভিরাম এ কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না, মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরাণী বলিল, "আমার যেতে কোন দোষ আছে কি বৈরিগী ঠাকুর?"

অভিরাম একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দোষ আর কি? কিন্তু তুই—তুই কেন যাবি পরাণী?"

"তুমিই বা কেন যাচ্ছ ?"

"আমি ? আমার কথা আলাদা।"

"আলাদা কি রকম ? তার মানে তুমি খুব ধর্ম্মিষ্টি হ'লেই যাচ্ছ, না ?"

ক্ষুণ্নস্বরে অভিরাম বলিল, "আমি মহাপাপিষ্ঠ পরাণী।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া পরাণী বলিল "আর আমিই বুঝি পুণ্যবতী ?"

অভিরাম চুপ করিয়া রহিল। পরাণী গম্ভীরভাবে বলিল, "সত্যি কথা বল্‌তে কি বৈরিগী ঠাকুর, আমার আর এ সব ভাল লাগে না।

"কোন্ সব ?"

"এই মাথায় মাট ক'রে হাটে বাজারে যাওয়া। এ সব কি মেয়েমানুষের কাজ ? শুধু পোড়া পেটের তরেই তো এত কর্ম্মভোগ।"

অভিরাম বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। পরাণী বলিল, "তাই ক'দিন ধরেই ভাব্‌চি, দূর হোক, আর এ সব পারি না। তার চেয়ে জাত-বাষ্টমের মেয়ে, হরিবোল ব'লে যদি ভিক্ষে করেও খেতে হয়, তাও স্বীকার, তবুও আর এমন ঝক্‌মারীর কাজ কর্‌বো না।'

অভিরামের বুকটা গুরগুর্ করিতে লাগিল, মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না, চোখ তুলিয়া চাহিতেও পারিল না। পরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের যাওয়ার কত দেরী আছে ?"

অভিরাম জড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল, 'একমাস।"

পরাণী একটু ভাবিয়া বলিল "তুমি আর এদিকে আস না কেন বৈরিগীঠাকুর ?"

বলিয়াই পরাণী অভিরামের মুখের উপর একটা চঞ্চল কটাক্ষপাত করিল।

ইতস্ততঃ করিয়া অভিরাম উত্তর দিল, "সময় পাই না—দরকার হয় না।"

ঈষৎ অভিমানের সুরে পরাণী বলিল, "দরকার হ'লেই বুঝি আস্‌তে হয় ? হাজার হোক স্বজাতের মেয়ে বটে তো। একা প'ড়ে থাকি—"

বাধা দিয়া ব্যস্তস্বরে অভিরাম বলিল, "এবার আস্‌বো।"

বলিয়াই অভিরাম দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। জ্যোৎস্নায় গ্রাম্য পথটা যেন হাসিয়া উঠিয়াছিল, মুকুলিত আম্রশাখায় বসিয়া কোকিল ডাকিতেছিল—কু-উ, কু-উ। বুকের ভিতর পূর্ণ আবেগটাকে চাপিয়া অভিরাম ছুটিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিল।

সেই দিন হইতে অভিরাম প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পরাণীর ঘরে আসিত, এবং কতকটা রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প গুজব করিয়া উঠিয়া যাইত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে তাড়াতাড়ি জপ-আহ্নিকটা সারিয়া লইত, কার্য্যবশতঃ কোন দিন তাহা ঘটিয়া না উঠিলে রাত্রিতে আসিয়া নিয়মিত কার্য্য শেষ করিত। পরাণীও সন্ধ্যার প্রদীপটি জ্বালিয়া দাওয়ায় বসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিত, কোনদিন অভিরামের আসিতে একটু বিলম্ব হইলে তাহার মনটা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিত।

অভিরাম ব'সিয়া ব'সিয়া বৃন্দাবনের কত অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণন করিত কত মহাজনের পদ গান করিয়া শুনাইত, সাধু বৈষ্ণবগণের পবিত্রকাহিনী ভক্তিগদগদকণ্ঠে বিবৃত করিতে থাকিত, গৌরাঙ্গদেবের অপূর্ব্ব প্রেমকাহিনী বর্ণন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। পরাণী সে সকল শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িত, এবং এমন ভক্তিমান লোকটিকে ঘৃণা করিয়া সে যে অন্যায় কাজ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহার মনে অনুতাপ উপস্থিত হইত।

একদিন গল্প করিতে করিতে পরাণী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বৈরিগী ঠাকুর, এক কাজ কর্‌লে হয় না ?"

অভিরাম উৎসুকভাবে বলিল, "কি কাজ পরাণী ?"

পরাণী বলিল, "বৃন্দাবনে না গিয়ে তুমি কণ্ঠিবদল ক'রে সংসারী হও।"

অভিরাম জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল "এ বয়সে আর কেন পরাণী ?"

পরাণী বলিল, "বয়স তোমার এমন কি হয়েছে ?"

অভিরাম চুপ করিয়া রহিল, পরাণী বলিল, "যদি মত হয় তো বল ?"

অভিরাম দৃষ্টিতে যেন একটা ব্যাকুলতা লইয়া পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। পরাণী বলিল, "কেষ্টগঞ্জের ছিদেম দাসের একটা মেয়ে আছে। বয়স তেইশ চব্বিশ, দেখতে মন্দ নয়।" বলিয়া সে অভিরামের মুখের উপর একটা সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

মৃদু হাসিয়া অভিরাম বলিল, "আমার চেয়ে তো তোর বয়স অনেক কম পরাণী, তুই কেন কণ্ঠিবদল ক'রে—"

পরাণীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে একটু তীব্রস্বরে বলিল, "ছি. বৈরিগী ঠাকুর!"

অভিরামের মাথাটা লজ্জায় নীচু হইয়া পড়িল। পরাণী স্বরটাকে আরও একটু তিক্ত করিয়া বলিল, "তোমার যাওয়ার আর ক'দিন বাকী?"

অভিরামের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে যে বৃন্দাবনযাত্রার সঙ্কল্প করিয়াছে, এবং সে যাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিবসের আর তিনটা দিন মাত্র বাকী, ইহা তাহার যেন খেয়ালই ছিল না। সে যেন এই একটা নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া দিন কাটাইতেছিল, আজ হঠাৎ পরাণীর জিজ্ঞাসায় সে নেশাটা যেন চট্ করিয়া কাটিয়া গেল। সে পরাণীর কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না, আর একটু বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

পরাণী সে দিন বিছানায় পড়িয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। সত্যই তো, তাহার কতই বা বয়স। এখনও তাহাকে কত দিন বাঁচিতে হইবে, আর সেই তত দীর্ঘ জীবনকালটা কি এমন মাথায় মোট বহিয়া এমনই নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটাইতে পারিবে? মানুষের দেহ, সুখ অসুখ আছে, তখন কে তাহাকে দেখিবে? যখন মোট বহিবার সামর্থ্য থাকিবে না, তখন কি হইবে? তখন যে সত্যই ভিক্ষা ছাড়া উপায় নাই। ছি ছি, কি ঘৃণিত অভিশপ্ত জীবন।

কিন্তু একদিন যাহাকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, এবং এখনও যাহাকে পদে পদে মর্ম্মাহত করিতে ছাড়ে না, তাহারই সঙ্গে কণ্ঠিবদল! কিন্তু অভিরাম কি তাহার কণ্ঠিবদলের অনুপযুক্ত? উপযুক্ত হইলেও সে যে তাহার দ্বারে ভিখারী, তাহার একটু ইঙ্গিতে উঠে বসে। ভিখারীকে সে প্রভুর পদে বসাইবে? যে তাহার কৃপাকণার প্রার্থী, তাহার দাসীত্ব স্বীকার করিবে? অসম্ভব। কিন্তু যদি কণ্ঠিবদলই করিবে না, তবে সে হঠাৎ তাহাকে লইয়া এতটা জড়াইয়া পড়িল কেন? ইহাতে কি তাহার নিজের কিছু ক্ষতি হয় নাই? ক্ষতি বোধ হয় একটু হইয়াছে। কিন্তু অভিরামের ক্ষতির তুলনায় তাহা কিছুই নয়। সে নিরীহ লোকটিকে যে ক্ষতিটা সহ্য করিতে হইয়াছে, পরাণী ততটা ক্ষতি মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে পারিত কি না সন্দেহ। ছি ছি, লোকের প্রাণ লইয়া খেলা,—কাজটা কি ভাল হইয়াছে? আহা, নিরীহ বেচারা।

পরাণীর চোখ দুইটা কর্ কর্ করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রিতে অভিরামও নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। পরাণী চলিয়া গেলে সে চৈতন্য-মঙ্গল খুলিয়া পড়িতে বসিল। কিন্তু একটা মর্ম্মান্তিক বেদনায় তাহার অন্তরটা তখন এমনই ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, চৈতন্যমঙ্গলের মধুর উপদেশাবলী তথায় স্থান পাইল না। সে পুঁথি বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং কোন্ কাজে ব্যাপৃত করিয়া মনটাকে স্থির করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু তেমন কোন কাজই খুঁজিয়া পাইল না। সে দিন সকল কাজই তাহার নিকট তিক্ত বোধ হইতেছিল, সমগ্র সংসারটা তাহার চক্ষে যেন বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক কাজের মধ্য হইতেই যেন একটা তীব্র উপেক্ষা, নিদারুণ লাঞ্ছনা ফুটিয়া উঠিয়া তাহার ইন্দ্রিয়-গুলাকে অবসন্ন করিয়া দিতেছিল।

বেলাও তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অভিরাম স্নান করিয়া আসিয়া সান্ধ্যজপে মনোনিবেশ করিল। জপ বেশী হইল না, গোবিন্দকে ডাকিতে গেলেই অভিমানের অশ্রুধারায় বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই। অভিরাম ভাতে ভাত রাঁধিয়া কোনরূপে আহার কার্য্য শেষ করিল। তার পর দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না, ঘুম চোখে আসিল না।

আর কেন? অপমান, লাঞ্ছনা যতদূর হইবার, তাহা তো হইল। কিন্তু কি পাপ মন আমার, এখন সে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরাণীর কাছে ছুটিয়া যাইতে চায়। আরে মন, পরাণী কে, পরাণী কি? শুধু রক্ত, মাংস আর হাড় কয়খানা। ঐ রক্তমাংসটুকু ছাড়িয়া দিলে উহার ভিতর থাকে কি? শুধু একটা শুষ্ক অস্থি-পঞ্জর,—যাহা দেখিলেই আতঙ্কের উদয় হয়। সে অস্থি-পঞ্জরে একটুও সৌন্দর্য্য নাই, বিলোল কটাক্ষ, চটুল হাস্য, মনোহর অঙ্গভঙ্গী, কিছুই তাহাতে নাই। এই অস্থি-পঞ্জরের উপর এত মোহ! রমণীর রূপ আর সাপের মাথার মণি, দুই-ই যে এক পদার্থ। লোভ করিয়া হাত বাড়াইলেই প্রাণসংশয়। এই জন্যই মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন, রমণী কালসাপিনী। হা গোবিন্দ! আমার পাপ মনকে এই কালসাপিনীর আকর্ষণ হইতে মুক্ত করিয়া দাও।

অনেক ভাবিয়া অভিরাম স্থির করিল আর এখানে থাকা নয়, অপর যাত্রীদের এখনও যাত্রার দুই তিন দিন বিলম্ব আছে। আমি তাহাদের আগে কালই যাত্রা করিব। অন্ততঃ এ গ্রাম ছাড়িয়া পথে কোথাও অপেক্ষা করিব। কল্যকার রাত্রি আর এখানে কাটাইব না।

সঙ্কল্প যখন স্থির হইল, তখন রাত্রিও শেষ হইয়া আসিয়াছে। জানালা দিয়া ভোরের আলো ঘরে ঢুকিয়াছে, পাখীগুলা ডাকিতে সুরু করিয়াছে। অভিরাম উঠিয়া অভ্যাসমত ভজন গাহিতে গাহিতে স্নান করিতে চলিল।

স্নান করিয়া যখন ফিরিল, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। অভিরামের চিত্তও অনেকটা স্থির, শুধু বৃন্দাবন যাত্রার জন্য একটু ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। অভিরাম তিলকসেবা করিয়া আহ্নিকের পূর্ব্বেই আগে গাঁটরী বাঁধিতে বসিল। আজ আর সে রাঁধিবে না। আহ্নিক সারিয়াই যাত্রা করিবে, এবং রাইপুরে তাহার পিসীর বাড়ীতে গিয়া খাইবে। তার পর সেখান হইতে সুলতানগঞ্জে গিয়া অপেক্ষা করিবে।

হায়, কতদিনের সাধ এই বৃন্দাবনযাত্রা! বৃন্দাবনে গিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই যমুনাতটে বিচরণ করিবে, সেই বংশীবট দেখিবে, সেই গিরিগোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করিবে, ব্রজের রজে প্রাণ ভরিয়া গড়াগড়ি দিবে, মাধুকরী করিয়া খাইবে, এ সব তাহার কতদিনের আকাঙ্ক্ষা। আজ সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার প্রথম ক্ষণ। একটা অব্যক্ত পুলকে অভিরামের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু এই শিহরণের মধ্যে দেশত্যাগ করার যে একটা বিষাদ থাকিয়া থাকিয়া তাহার সকল উৎসাহকে ম্লান করিয়া দিতেছিল, এত বড় আনন্দ দিয়াও অভিরাম সেটাকে চাপিতে পারিল না। এই আবাল্যপরিচিত গৃহ, এই গ্রাম, গ্রামের লোক-জন পশুপক্ষী, এমন কি, অচেতন পথ-ঘাটগুলা পর্য্যন্ত যে তাহাকে এমনই একটা দৃঢ় মমতার বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, অভিরাম পূর্ব্বে তাহা একটুও অনুভব করিতে পারে নাই। আজ যখন তাহাদের মমতার দৃঢ় বন্ধন ছেদন করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখনই সে ইহার দৃঢ়তা অনুভব করিল এবং সংসারের এত কঠোরতার মধ্যেও যে কতখানি কোমলতা আছে, এই মায়াবাজির ভিতরেও প্রাণ দিয়া অনুভব করিবার যে কতটা জিনিস আছে, তাহা বুঝিতে পারিল।

কিন্তু তাহাকে গ্রাম ত্যাগ করিতেই হইবে, বৃন্দাবনে যাইতেই হইবে এই কঠোর সঙ্কল্পে মন বাঁধিয়া সে ব্যস্ত-হস্তে গাঁঠরী বাঁধিতে লাগিল, আর মনটাকে স্থির করিবার জন্য গুনগুন করিয়া গাহিতে থাকিল—

"আমার হয় না মনোযোগ, তোমার এমনি মায়াযোগ,
শুধু ভূতের ব্যাগার খেটে মরি দিন গেল হে হরি!"

উঠানে দাঁড়াইয়া পরাণী ডাকিল, "বৈরিগী ঠাকুর!"

অভিরাম চমকিয়া উঠিল, এবং খুব প্রয়োজনীয় কাজে যাত্রার সময় কেহ পাছু ডাকিলে লোকে যেমন তাহার উপর বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, অভিরাম তেমনই বিরক্তিসূচক দৃষ্টিতে পরাণীর দিকে চাহিল। পরাণী কিন্তু যে বিরক্তিটুকু লক্ষ্য করিয়াই ঘরের দাবায় উঠিল, এবং দরজার কাছে আসিয়া ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গাঁঠরী বাঁধচো যে? কোথায় যাবে?"

অভিরাম দড়ি দিয়া গাঁঠরীটাকে জড়াইতে জড়াইতে উত্তর দিল, 'শ্রীবৃন্দাবন।"

পরাণী বলিল, "পরশু তো যাবার দিন। আজ যে তল্পী বাঁধচো?"

পরাণীর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা দেখিয়া অভিরাম গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি আজই যাত্রা করবো।"

"একা?"

"হুঁ।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন? রাগ হয়েছে বুঝি?"

অভিরাম এ কথার কোন উত্তর দিল না। পরাণী তখন ঘরের ভিতর আসিয়া গাঁঠরীটা টানিতে টানিতে বলিল, "দেখি কি কি জিনিস বেঁধেছ? সেই পুঁথিগুলো নিয়েচো তো?"

অভিরাম মুখ তুলিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "ছেড়ে দে পরাণী।"

পরাণী গাঁঠরী ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল, অভিরাম গুম্ হইয়া দড়ি দিয়া তাহা কষিয়া বাঁধিতে লাগিল। কিন্তু বাঁধনটা কিছুতেই শক্ত হইল না, এক দিক্ টানিলে অপর দিক্টা আল্‌গা হইয়া পড়িতে লাগিল। অভিরাম একবার খুলিয়া আবার জড়াইয়া, আবার খুলিয়া বাঁধাটাকে শক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে থাকিল।

পরাণী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "হলো না বৈরিগী ঠাকুর, তোমার মূলেই যে আল্‌গা। শুধু রাগ কল্লেই কাজ হয় না। আমাকে দাও দেখি।"

পাশে বসিয়া পড়িয়া পরাণী গাঁঠরীটা টানিয়া লইল। এবার আর অভিরাম আপত্তি করিল না। পরাণী গাঁঠরীর গায়ে জড়ান দড়িগুলা খুলিতে খুলিতে বলিল, "তা হ'লে সত্যই চল্লে?"

অভিরাম উত্তর দিল, "হু।"

পরাণী আস্তে আস্তে দড়িটা খুলিল, যে কাপড় খানা দিয়া বাঁধা হইয়াছিল, সেখানা খুলিয়া ভিতর-কার জিনিসগুলা দেখিতে লাগিল। তার পর আস্তে আস্তে এক একটা জিনিস লইয়া সেগুলা যেখানে থাকিত, সেইখানে রাখিতে আরম্ভ করিল। অভি-রাম বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

পরাণী পুঁথিগুলাকে তাকের উপর তুলিল, কাপড়গুলা আল্‌নায় রাখিল, তিলকসেবার সজ্জা কুলুজিতে রাখিয়া দিল, ঘটী বাটি থালা লইয়া জল চৌকির উপর তুলিল। তার পর অভিরামের দিকে ফিরিয়া মৃদুহাস্যের সহিত বলিল, "ছি বৈরিগী ঠাকুর, রাগ ক'রে কোথাও যেতে আছে?"

অভিরাম গম্ভীরভাবে বলিল, "যেমন ক'রেই হোক, আমাকে যেতেই হবে?"

পরাণী বলিল, "স্বচ্ছন্দে যাও, কিন্তু ছিঃ, রাগ নিয়ে বৃন্দাবনে যেতে আছে?"

অভিরাম মাথা নীচু করিল। সহাস্যমুখে পরাণী বলিল, "আমার উপর তোমার খুব রাগ হচ্চে, না?"

অভিরাম বলিল, "আমাকে আবার ওগুলো বাঁধতে হবে।"

পরাণী হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

অভিরাম বলিল. "আমাকে আজ যেতেই হবে পরাণী "

পরাণী তাহার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "যেতে হয় যাও না, ওগুলো নাই বা বাঁধ্‌লে?"

অভিরাম চুপ করিয়া রহিল। পরাণী বলিল,— "তোমার যে খুব বৈরাগ্য হয়েচে, তা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বৈরিগী ঠাকুর, মহাপ্রভু যখন ঘর ছেড়ে যান, তখন তিনি কত ঘটী-বাটি, কত কাপড়-চাদর বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন?"

অভিরাম চমকিত হইয়া পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। পরাণী শ্লেষতীব্র-কণ্ঠে বলিল, "ঘটী নিয়েছ, থালা নিয়েছ, কাপড় নিয়েছ, কম্বল নিয়েছ, বোধ হয় বোষ্টমী থাক্‌লে তাকেও সঙ্গে নিতে।"

অভিরামের দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া আসিল, আবেগরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুই কে পরাণী?"

পরাণী বলিল, "আমি যেই হই, কিন্তু জিজ্ঞেস করি বৈরিগী ঠাকুর, বৃন্দাবনে না গেলে সংসারে থাক্‌লে কি গোবিন্দকে পাওয়া যায় না?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভিরাম বলিল, খুব পাওয়া যায়।"

"তবে?"

"আমার পাপ মন যে আমার বশ নয়।"

"বৃন্দাবনে গেলেই কি বশ হবে মনে কর?"

"কি জানি।"

শ্লেষকঠোরস্বরে পরাণী বলিল, "এর আর জানা-জানি কি, সেখানে গিয়ে পরাণী বোষ্টমীর মুখখানা ভাব্‌বে, নয় তো একটা সেবাদাসী কেড়ে বৃন্দাবন-বাস সার্থক কর্‌বে।"

অভিরাম সকাতর দৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। পরাণী বলিল, "পাপ মন নিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার চেয়ে ঘরে থেকে মনটাকে বশ কর। তার পর পবিত্র-মনে বৃন্দাবনে যাও না?"

বিষাদ-গম্ভীরকণ্ঠে অভিরাম বলিল, "ঘর? আমার যে ঘর আর পথ সব সমান পরাণী।"

পরাণী বলিল, "বেশ, সেইটাই যদি তোমার সব চেয়ে বেশী দুঃখ হয়, তার উপায় ক'রে দিচ্ছি।"

রুদ্ধশ্বাসে অভিরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়?"

মৃদু কটাক্ষে তাহার চিত্তটাকে চমকিত করিয়া দিয়া পরাণী বলিল, "আমার সঙ্গে কণ্ঠিবদল ক'রে পথটাকে ঘর ক'রে ফেল।"

যেন প্রবল বিদ্যুতের আঘাতে অভিরামের সর্ব্ব-শরীর একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; বক্ষের স্পন্দন যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরাণী মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই, আর আমি তামাসা কচ্চি না। আমার সঙ্গে কণ্ঠিবদল তোমার অনেক দিনের সাধ, এবার আমি তোমার সে সাধ পূর্ণ কর্‌বো।"

অভিরাম আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল; ধীর-গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "মানুষের সাধ সব সময় এক রকম

থাকে না পরাণী, এখন আর আমার কণ্ঠিবদলের সাধ নাই. এখন একমাত্র সাধ—বৃন্দাবনের পবিত্র রজে এই পাপ দেহটাকে লুটোপুটি খাওয়াব ।"

পরাণীর মুখখানা যেন কালি হইয়া আসিল। তাহার এত বড় সৌভাগ্যের দানটা ফিরাইয়া দিয়া অভিরাম যে এমন ভাবে তাহার গর্ব্ব চূর্ণ করিতে পারে. ইহা পরাণী একবারও ভাবে নাই। যাহা ভাবে নাই, তাহাই যখন ঘটিল, তখন সে আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে অভিরামের পায়ের কাছে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। অভিরাম স্নিগ্ধ-গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, "পরাণি।"

পরাণী তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি তোমাকে অনেক মন্দ কথা ব'লেছি বৈরিগী ঠাকুর, আমাকে মাপ কর, তোমার পায়ে ঠাঁই দাও।"

অভিরামের মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরাণী বলে কি? সে জীবনভোর যে আকাঙ্ক্ষাকে বুকে লইয়া মনের সহিত যে তুমুল সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, এবং সে সংগ্রামে জর্জ্জরিত হইয়া, পরাজয়কে বরণ করিয়া লইয়া দুঃখশীর্ণ হৃদয় শ্রীগোবিন্দের চরণে উৎসর্গ করিতে চলিয়াছে, তখন সহসা পরাণী তাহার জীবনব্যাপী নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষাকে এমন অদ্ভুতরূপে সফল করিয়া দিতে আসিল! হা গোবিন্দ, তোমার এ কি মায়া মায়াময়। অধম পাতকীর উপর তোমার এ কি ভয়ানক পরীক্ষা!

পরাণী সহসা পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বাষ্প-জড়িত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "তা হবে না বৈরিগী ঠাকুর, আমাকে ঠাঁই দিতেই হবে। আজ আমি বুঝেছি, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই। বল, আমাকে পায়ে ঠাঁই দেবে?"

পরাণী কাতরতাপূর্ণ সজল দৃষ্টিতে অভিরামের মুখের দিকে চাহিল। তাহার আকাঙ্ক্ষা-চঞ্চল মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অভিরাম প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল, "তবে তাই হোক পরাণী, কিন্তু আর কণ্ঠিবদল নয়, তুই গুরু, আমি শিষ্য, আমি বাপ, তুই মেয়ে, তুই মা, আমি ছেলে, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা, দ্বেষ অভিমান, সব মুছে ফেলে আয় পরাণী, এইখানে ব'সেই শ্রীগোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করি। আর আমার বৃন্দাবনে যাবার দরকার নাই।"

পরাণী উপুড় হইয়া পড়িয়া অভিরামের পায়ের ধুলা লইল, হর্ষগদ্গদ-কণ্ঠে বলিল, "তোমার মনের ভিতরেই যে বৃন্দাবন, বৈরিগী ঠাকুর।"

সমাপ্ত

সুখের মিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

পার্ব্বতী যে ঠিক রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ছিল, তাহা নহে, তথাপি লোকে বলিত, "মেয়েটি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, এ মেয়ে রাজরাণী হবে।" ছেলেবেলা হইতে লোকের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিতে শুনিতে পার্ব্বতীরও ধারণা হইয়াছিল, বাস্তবিকই সে রাজরাণী হইবে, ইহাই তাহার অদৃষ্টের লিখন, সৌন্দর্য্যের পুরস্কার। যতই বয়স হইতেছিল, পার্ব্বতী ততই আপনাকে এই উচ্চ পুরস্কারের উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। রাজরাণীর মত গাম্ভীর্য্য, রাজারাজড়ার ঘরের মত উচুদরের কথা শুনিয়া পাড়ার মেয়েরা তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইতে সাহস করিত না। কাছে আসিলে পার্ব্বতী তাহাদের সহিত মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া কথা কহিত না।

কিন্তু রাজারাজড়া দূরে থাক্, একটা জমীদারও জুটিল না। শেষে গ্রামের হরনাথ রায়ের ছেলে যতীন রায়ের সঙ্গে বিবাহের কথা উঠিল। হরনাথ জাহানাবাদের মুন্সেফী আদালতের নাজির ছিলেন। সুতরাং দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া তিনি গ্রামে একটু বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছেলে যতীনকে মানুষ করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যতীন কিন্তু তেমন মানুষ হইতে পারিল না, তিনবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ফেল হইয়া চতুর্থ বৎসরে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। অগত্যা রায় মহাশয় মুন্সেফ বাবুকে ধরিয়া যতীনকে আদালতেই ঢুকাইয়া লইলেন। তখনও যতীনের মাহিনা হয় নাই। তবে লোকে জানিত, তাহার বেশ মোটা মাহিনাই হইবে, এবং রায় মহাশয় পেন্সন লইলে যতীনই নাজীরের পদ পাইবে।

অনেক স্থান হইতে দেড় হাজার দুই হাজার টাকার সম্বন্ধ আসিলেও রায় মহাশয় পার্ব্বতীর বাপের কাঁদা-কাটায় এবং ভাল মেয়েটি দেখিয়া সাড়ে সাত শত টাকাতেই রাজি হইলেন। রাজি হইবার আরও একটু গুহ্য কারণ ছিল। তিনি গৃহিণীর নিকট শুনিয়াছিলেন, যতীন নাকি পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক। কথাটা শুনিয়া রায় মহাশয় প্রথমে রাগিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণীর কথায় যখন বুঝিলেন, আজকালকার ছেলেদের বিশ্বাস নাই, তাহারা সঙ্কল্পে বাধা পাইলে সব করিতে পারে, আফিং খায়, গলায় দড়ী দেয়, সন্ন্যাসী হয়, ইত্যাদি, তখন রায় মহাশয় অগত্যা মত দিলেন।

লোকে বলিল, "বেশ হবে, যেমন মেয়ে, তেমনি ঘর বর। পার্ব্বতীর কপাল ভাল।"

পার্ব্বতী কিন্তু ভাবিল, 'ছাই কপাল! হায় কোথায় রাজারাজড়া, আর কোথায় আদালতের কেরাণী যতীন রায়।' ছেলেবেলা হইতে যতীনের সঙ্গে তাহার একটু ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল বটে। কতবার যতীন নিজের জন্য খাবার কিনিয়া তাহাকে অর্দ্ধেক খাওয়াইয়াছে, বাগানের গোলাপফুল আনিয়া অন্যান্য বালিকাদের সকাতর প্রার্থনাসত্ত্বেও পার্ব্বতীর খোঁপায় পরাইয়া দিয়াছে, ঘোষেদের বাগানের কাঁচা-মিঠে আম, পাকা লিচু চুরি করিয়া তাহার জন্য আনিয়াছে, খেলায় সময় কেহ পার্ব্বতীকে একটা কথা বলিলে সে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছে। কিন্তু ছেলেবেলার এই ভালবাসাটুকুর জন্যই কি যতীন তাহার স্বামী হইবার উপযুক্ত! পার্ব্বতী জানিত যে, যতীন তাহাকে পাইলে ধন্য-কৃতার্থ হইবে। কিন্তু তাহাতে তাহার কি! তাহার এই যে লক্ষ্মীর মত রূপ, ইহা কি একজন কেরাণীর উপভোগের জন্য? পার্ব্বতীর মনের ভিতর বড়ই অশান্তি বোধ হইতে লাগিল।

ভ্রাতৃবধূ একদিন পরিহাস করিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, তোর যতীন দাদাই শেষে বর হ'লো। তোর কপাল ভাল।"

পার্ব্বতী মুখ ভার করিয়া ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বলিল, "পোড়া কপাল!"

শ্রাতৃবধূ অবাক্ হইয়া পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে দিন অপরাহ্নে পার্ব্বতী যখন গা ধুইয়া আসিতেছিল, তখন মধ্যপথে যতীন তাহার পথ আগ্‌লাইয়া ডাকিল, "পারু!"

পার্ব্বতী তাহার দিকে ঘৃণাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। যতীন সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া হর্ষপ্রফুল্ল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার না কি বিয়ে?"

পার্ব্বতী রাগিয়া উত্তর দিল, "না মরণ।"

বিস্মিত-কণ্ঠে যতীন বলিল, 'সে কি পারু?"

পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, রাস্তা ছেড়ে দাও।"

যতীন বলিল, "কিন্তু বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে।"

কঠোরস্বরে পার্ব্বতী বলিল, "আমিও দড়ি-কলসীর যোগাড় ক'রে রেখেছি।"

পাশ কাটাইয়া পার্ব্বতী সগর্ব্ব পদক্ষেপে চলিয়া গেল। যতীন স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পার্ব্বতীকে কিন্তু গলায় দড়ি দিতে হইল না। পাকা দেখা হইবার পূর্ব্বেই পার্ব্বতীর বাপ তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গেল। রায় মহাশয় বলিলেন, "বিয়ের কথা হ'তে না হ'তে, যখন মেয়ের বাপ মারা গেল, তখন কুষ্ঠী মিলিয়ে দেখা দরকার।"

কোষ্ঠী মিলাইতে গিয়া দেখা গেল, মেয়ে বিপ্রবর্ণ, ছেলে শূদ্রবর্ণ। বর্ণশ্রেষ্ঠ কন্যার সহিত হীনবর্ণ ছেলের বিবাহের ফল মৃত্যু। রায় মহাশয় দুর্গা দুর্গা বলিয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। পার্ব্বতীর ভাই শরৎ চৌধুরী প্রমাদ গণিল।

পিতার মৃত্যুতে সংসারের ভার শরতের ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বাপের দেনাও কিছু ছিল। ভগ্নীও চতুর্দ্দশ অতিক্রম করে। শরৎ অকূলপাথারে পড়িয়া কোনরূপে ভগ্নীকে পার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টার পর হরিশচকে একটি পাত্র পাওয়া গেল। পাত্রটি দোজ-বর। সুতরাং কিছুই দিতে হইবে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া শরৎ এই সম্বন্ধই স্থির করিয়া ফেলিল।

পার্ব্বতী শুনিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সে বিষ খাইবে, কি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। তখনও কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া আত্মহত্যা করিবার সহজ উপায়টা আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং বিষ বা দড়ি সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। পার্ব্বতী নিরুপায় হইয়া ভাবিল, "দূর হউক, এই বিবাহই তো মরণ, তবে আর আত্মহত্যার প্রয়োজন কি?"

ছাদনাতলায় সকলের অনুরোধে পার্ব্বতী শঙ্কা-কম্পিত হস্তে বরের গলায় মালা তুলিয়া দিল বটে, কিন্তু কাহার গলায় মালা দিল, তাহা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিল না। শুভদৃষ্টির সময় সে আদৌ চোখ খুলিল না।

পরদিন সে পাল্কী চড়িয়া যতীনদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া নূতন শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় দেখিল, যতীন রাস্তার ধারে বসিয়া খড়ের আগুনে ছিপ সেঁকিতেছে। পাল্কীর দিকে চাহিয়া যতীন যেন মৃদু হাসিল। পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল।

পাল্কীর পিছনে রসনচৌকীর সানাই প্রভাতগগন প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল :—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু,
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পক্ষ হইলেও গোকুল চক্রবর্ত্তীর বয়স যে তেমন বেশী হইয়াছিল, তাহা নহে, বয়স একত্রিশ বৎসর মাত্র। চার পাঁচ বৎসর আগে তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর আর তাহার বিবাহ করিতে মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সে আমলা-গঞ্জের সিংহ বাবুদের জমীদারীতে গোমস্তাগিরি করিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিত। জমীজমাও কিছু ছিল। সংসারে ছোট ভাই অমূল্য ছিল, অমূল্যের স্ত্রী এবং একটি মেয়ে ছিল, বিধবা ভগ্নী অন্নদা ছিল, বৃদ্ধা পিসীমা ছিল। চাষের জন্য দুটি বলদ এবং দুধের জন্য দুইটি গাই ছিল। তাহাদের দেখা-শোনার জন্য একটি চাকর ছিল। সংসারের এতগুলি জীবের প্রতিপালনের ভার ছিল একা গোকুলের উপর। বারো টাকা মাহিনার গোমস্তাগিরিতে মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করিলেও তাহা এতগুলি পোষ্য-প্রতিপালনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং লোকে তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেও গোকুল

ইহার উপর আর পোষ্যসংখ্যা বাড়াইতে ইচ্ছুক ছিল না।

ছোট ভাই অমূল্যও চাকরী করিত। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দুইবার ফেল হইলেও গোকুল ছোট ভাইকে পুনরায় পড়িবার জন্য অনুরোধ করিল। অমূল্য কিন্তু আর পড়িল না, স্কুল ছাড়িয়া দিল। অগত্যা গোকুল কলিকাতাবাসী বন্ধু যোগীনকে অনুরোধ করিয়া অমূল্যর একটি চাকরী জুটাইয়া দিল। ছয় মাস এপ্রেন্টিস খাটিবার পর অমূল্য পঁচিশ টাকা করিয়া মাহিনা পাইতে লাগিল। এক বৎসর পরে বেতন বৃদ্ধি হইয়া ত্রিশ টাকা হইল।

ত্রিশ টাকা বেতন পাইলেও অমূল্য কিন্তু সংসারে এক পয়সাও দিতে পারিত না। কলিকাতার মেসের খরচ, প্রতি শনিবারে বাড়ী আসার গাড়ী-ভাড়া, জলখাবার প্রভৃতিতেই সব খরচ হইয়া যাইত। বরং তাহার জামা-জুতার জন্য মাঝে মাঝে গোকুলকে কিছু কিছু দিতে হইত।

সেটা গোকুল নিজের হাতে দিত না, দিতেন পিসীমা। পিসীমাই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। মা যখন মারা যান, তখন গোকুলের বয়স বারো, অন্নদার বয়স আট, আর অমূল্যর বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। সেই সময় হইতেই পিসীমা সংসারের গৃহিণীপনার ভার লইয়াছিলেন এবং এ যাবৎ স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিলেন। গোকুল মাসে যাহা উপার্জ্জন করিত, সমস্তই আনিয়া পিসীমার হাতে তুলিয়া দিত, একটি পয়সাও হাতে রাখিত না। এক পয়সার তামাক কিনিবার দরকার হইলে পিসীমার কাছে হাত পাতিত।

অন্নদা একবার বলিয়াছিল, "ভাল দাদা, পান-তামাকের খরচের জন্য নিজের হাতে দু'টো টাকাও তো রাখলে পার।"

গোকুল হাসিয়া উত্তর করিল, "দরকার কি, চাইলেই তো পাই।"

অন্নদা। সব সময়ে পাও কি ?

গোকুল। যখন পিসীমার হাতে থাকে না, তখনই পাই না।

অন্নদা। একটা টাকাও হাতে রাখলে সে সময়ে তো তোমার চলতে পারে ?

গোকুল। কিন্তু সংসার যে অচল হবে, অনি। এইতেই কষ্টে-সৃষ্টে চলছে, এ হ'তে আবার দুটো টাকা তাড়লে সংসার চলবে কেন ?

অন্নদা রাগিয়া বলিল, "না চলে তো তোমার কি ? এই যে অমূল্য চাকরী করছে, একটা পয়সা কখন সংসারে দেয় না।"

গোকুল হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও ছেলেমানুষ, কত টাকাই বা রোজগার করে যে দেবে।"

তীব্র-কণ্ঠে অন্নদা বলিল, "দেবে বুঝি শুধু তুমি ?"

সহাস্যে গোকুল বলিল, "তা না দিলে সংসার চলবে কিসে অনু ?"

ক্রোধরুদ্ধ স্বরে অন্নদা বলিল, "তুমি মানুষ না কি দাদা ?"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গোকুল বলিল, "কি জানি। সেও মাঝে মাঝে এ কথা বলতো অনি।"

সে অর্থে পরলোকগতা স্ত্রী। তাহার কথা বলিতে গেলে গোকুলের স্বরটা যেন ভারী হইয়া আসিত।

আপনার উপার্জ্জিত অর্থ সমস্ত দিয়াও গোকুল কিন্তু সব সময়ে পিসীমার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিত না। সে মাহিনার উপর যাহা পাইত, তাহা উপরি পাওনা—পার্ব্বণী, পাট্টা সেলামী, নজরানা ইত্যাদি। উপরি পাওনা কিন্তু সব মাসে সমান হয় না। কোন মাসে দুই টাকা কম, কোন মাসে দুই টাকা বেশী হইত। যে মাসে কিছু কম হইত, সে মাসে পিসীমা টাকা হাতে লইয়া তিনবার চারিবার গণিয়া অপ্রসন্ন-মুখে বলিতেন, "টাকা এত কম যে রে গোকুল ?"

গোকুল মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে উত্তর করিত, "হাঁ পিসীমা, এ মাসটায় কিছু হ'লো না।"

পিসীমা রাগতভাবে বলিতেন, "তা তো হ'লো না, কিন্তু এতে সংসার চলবে কি রকমে ?"

গোকুল কোন উত্তর করিতে পারিত না, নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। পিসীমা রাগিয়া ঝন্-ঝন্ শব্দে টাকাগুলা বাক্সে ফেলিতেন, এবং চাবী বন্ধ করিতে করিতে বলিতে থাকিতেন, "না বাবু, এমন ক'রে আমি চালাতে পারব না, তোমাদের সংসার তোমরা হাতে নাও। এই তো ক'টি টাকা দিলে, এইতে সংসারই চালাব, না গেল মাসে কান্ত পিসীর কাছে যে সাত টাকা ধার করেছি, তাকেই দেব। তার উপর এখনই তুমি এসে হাত পাতবে—তামাকের পয়সা দাও, ছোট বৌমা বলবেন, খোকা চাই। অমূল্যর জুতো ছিঁড়েছে, সে এসে বলবে, জুতোর টাকা দাও পিসীমা। আমি এ সব আর পারব না বাবু।"

পিসীমাকে রাগিতে দেখিয়া গোকুল ভয়ে ভয়ে সরিয়া যাইত। অন্নদার কিন্তু এতটা সহ্য হইত না, স্পষ্ট কথা বলা তাহার একটা রোগ ছিল। সুতরাং এক এক সময় অসহ্য হইলে সে বলিয়া ফেলিত, "কেন পিসীমা, দাদাই কি চোরের দায়ে বাঁধা পড়েছে? অমূল্যও তো চাকরী করে, অথচ সংসারে একটি পয়সা দেয় না। তবু সে নিজের জুতো-জামাটাও কি নিজের পয়সায় কর্‌তে পারে না?"

অন্নদার কথায় পিসীমা রাগে জ্বলিয়া উঠিতেন। চীৎকার করিয়া বলিতেন, "বটে লো অনি বটে! সে দুধের বাছা কত টাকা উপায় করে বল্ তো? যা পায়, তাতে বাছার খেতেই কুলায় না। কলকেতায় থাওয়ার কত খরচ, তা জানিস্। বাছা আমার দু'বেলা পেট পুরে খেতেই পায় না। তবু বাছার মুখে কথাটি নাই। বলে, কি কর্‌ব পিসীমা, কষ্টের সংসার, কাজেই কষ্ট ক'রে থাক্‌তে হয়। তবু তোরা দু'টি ভাই-বোনে তার হিংসাতেই পাতাল গেলি। তাড়াতাড়ি তাই মধ্যস্থ কর্‌তে এসেছিস্।"

অন্নদা বলিত, "কি করি পিসীমা, মানুষ থাক্‌লেই উচিত কথা বল্‌তে হয়। সবাই তো তোমার মত এক-চোখো বিচার জানে না।"

পিসীমা রাগে চোখ কপালে তুলিয়া, হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতেন, "কি, আমার এক-চোখো বিচার? আমি যদি এক-চোখো হ'তাম অনি, তা হ'লে সংসার কোন্ দিন উচ্ছন্নে যেত। আমি যাই মেয়ে, তাই এত দিন চারচাল বজায় রেখে সব চালিয়ে আস্‌ছি।"

পিসীমার রাগে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্নদা সহাস্যে বলিত, "তা বটে পিসীমা, তোমার মত মেয়ে খুঁজে পাওয়া দায়।"

পিসীমা রাগে মাথা-মুড় খুঁড়িতে যাইতেন। গোকুল আসিয়া পায়ে হাতে ধরিয়া তাঁহাকে শান্ত করিত। তার পর অন্নদাকে কাছে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিত, "ছিঃ অনি; এ সব কি কথা?"

অন্নদা বলিত, "উচিত কথা।"

গোকুল ক্রোধের ভাব দেখাইয়া বলিত, "তোর মাথা! খবরদার, আর এমন সব কথা বলিস্ না।"

অন্নদাও রাগিয়া উত্তর করিত, "কেন, তোমাদের ভাত খাই ব'লে নাকি?"

গোকুল বলিত, "ভাত খাস্ আর নাই খাস্, তোর এ সকল কথায় কাজ কি?"

অভিমানে অন্নদার মুখখানা ভারী হইয়া আসিত, চোখ দু'টা ছল-ছল করিতে থাকিত। সে অভিমান-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিত, "তা বটে দাদা, কিন্তু আমি তোমার বোন্ ব'লেই আমার এ সকল কথায় কাজ ছিল। আমি যে শুধু তোমাদের দয়ার পাত্রী, তোমাদের সংসারে এক মুঠা ভাতের ভিখারী, তা জান্‌তাম না। আমার ঘাট হয়েছে, ঝকমারী করেছি দাদা, আমায় মাফ কর।"

অন্নদার চোখ দিয়া ঝর-ঝর জল গড়াইয়া পড়িত; সে উপুড় হইয়া দাদার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিত। গোকুল ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সে তাড়াতাড়ি অন্নদার হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিত, "ছিঃ অনি, তোর ছেলেমানুষী আর গেল না। আমি কি তোকে তাই বল্‌ছি? আমি বল্‌ছি, পিসীমা গুরুজন, তাঁকে কোন কথা বলা কি ভাল? ওতে যে পাপ হয়।"

অন্নদা ক্রন্দন রক্তিম চোখ দুইটা তুলিয়া রোষক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিত, "পাপ হয়, আমার হবে, তাই ব'লে তোমার উপর এ সব অত্যাচার আমি সইতে পার্‌ব না। এতে তোমরা আমাকে ভাত দিতে হয় দেবে, না হয় না দেবে।"

অন্নদা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইত। গোকুল মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আপন মনে বলিত, "নাঃ, অনির আর বুদ্ধি-শুদ্ধি হ'লো না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোকুলের উপর পিসীমার যে কিছুমাত্র বিদ্বেষ বা ঈর্ষা ছিল, তাহা নহে। তবে তিনি অমূল্যকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার সমস্ত স্নেহ ভালবাসাটা যেন অমূল্যর উপরেই আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার স্নেহান্ধ দৃষ্টি অমূল্যর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যতটা লক্ষ্য রাখিত, গোকুল বা অন্নদার দিকে ততটা রাখিতে পারিত না। তাঁহার স্নেহ-দুর্ব্বল চিত্তের নিকট অমূল্যর শত দোষ উপেক্ষণীয় হইত, কিন্তু অপরের সামান্য ত্রুটীও তাঁহার লক্ষ্য অতিক্রম করিতে পারিত না।

এতটা স্নেহাতিশয্যের ফলে বালকের চরিত্র যেরূপ গঠিত হয়, অমূল্যরও তাহাই হইল। সে ছেলেবেলা

হইতেই দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখিল, সংসারের যত ভালবাসা, যত সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সকলই তাহার প্রাপ্য। কেহই তাহাকে এই অবশ্যপ্রাপ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকারী নহে।

একজন সংসারে সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে, অপরে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, ইহাতে পরস্পর একটা বিদ্রোহ বাধিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু সে বিদ্রোহ বাধিল না। কেন না, গোকুলের প্রকৃতিটা সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে গঠিত ছিল।

বাল্যে মাতাপিতার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া, স্নেহ-যত্ন সব হারাইয়া দারিদ্র্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে গোকুল দুঃখ-কষ্টকে এত সহজে বরণ করিয়া লইয়াছিল যে, সে সংসারের নিকটে স্নেহ বা ভালবাসার দাবী আদৌ রাখিত না, কোনরূপ দুঃখকষ্টই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। বিশালকায় বনস্পতি যেমন উন্নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া শীতবাতাতপের উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করে, গোকুলও তেমনই স্থির-ধীর-ভাবে সংসারে দুঃখ-ঝঞ্ঝাবাত সহিয়া যাইত, কোন ক্লেশেই ভ্রূক্ষেপ করিত না। তাহাকে দেখিলে বোধ হইত, প্রলয়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবও বুঝি তাহার অটল গাম্ভীর্য্যকে তিলমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ নহে।

শুধু একদিন এই গোকুলের অবিচল ধৈর্য্য—অটল গাম্ভীর্য্য একটু বিচলিত হইয়াছিল। সে দিন তাহার পতিগতপ্রাণা পত্নী একটি মৃত সন্তান প্রসবান্তে সূতিকাগৃহে কাল-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং চিকিৎসার অভাবে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান রোগের যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। গোকুল তাহার চিকিৎসা করাইতে পারে নাই, একবিন্দু ঔষধ দিয়া আপনার মনের ক্ষোভ দূর করিতে পারে নাই। অন্নদা ডাক্তার আনিবার জন্য তাহার পায়ে ধরিয়াছিল, তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল, গালাগালি পর্য্যন্ত দিয়াছিল, তথাপি গোকুল পিসীমার অমতে ডাক্তার ডাকিতে পারে নাই। পিসীমা ঝাড়-ফুক তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা রোগের উপশম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ডাক্তার আনিয়া অনাচারের সৃষ্টি করিতে দেন নাই।

তার পর যে দিন তাহার সম্মুখে স্ত্রী সূতিকাগৃহেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রোগের নিদারুণ যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল, সেই দিন গোকুল পত্নীর মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া খুব খানিকটা চোখের জল ঢালিয়াছিল। হায়! সে যে সংসারের সকল কষ্ট, স্বামীর সকল উপেক্ষা অনাদর এত কাল মুখ বুজিয়া যেমন সহিয়া আসিতেছিল, এখনও তেমনই মুখ বুজিয়া চলিয়া গেল। গোকুল কিছুতেই সে দিন চোখের জল রাখিতে পারিল না। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বা পরে আর কেহ কখনও তাহাকে চোখের জল ফেলিতে দেখে নাই।

সংসারের সহিত যেটুকু স্নেহ-সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল, স্ত্রীর মৃত্যুতে যখন সেটুকুও ছিন্ন হইল, তখনও গোকুল সংসারের উপরে কিছুমাত্র বিতৃষ্ণা দেখাইল না। সে পূর্ব্বের মত চাকরী করিত, টাকা আনিত, খাইত পরিত। তবে এ সকল বিষয়ে তাহার তেমন আগ্রহ ছিল না। কলের পুতুলের মত কাজ করিয়া যাইত। শুধু সে সংসারকে যেন একটু ভয় করিয়া চলিত। তাহার জন্য যদি কাহাকেও একটু ব্যস্ত হইতে বা কষ্ট স্বীকার করিতে হইত, তাহা হইলে গোকুল মনে যেন বড়ই সন্ত্রস্ত, বড়ই ভীত হইয়া পড়িত। সে এই ব্যাপার হইতে সর্ব্বদাই আপনাকে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিত। তাহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন কোন সংসারবিরাগী কর্ম্মযোগী নির্লিপ্তভাবে সংসারের কাজ করিয়া যাইতেছে, সংসারে তাহার কিছুমাত্র আকর্ষণ নাই।

বন্ধনহীন সংসারে গোকুলের কিন্তু একটি আকর্ষণ ছিল। সে আকর্ষণ অন্নদা। সকল স্নেহসম্বন্ধের অতীত হইলেও গোকুল অন্নদার স্নেহের আকর্ষণটুকু ছিন্ন করিতে পারে নাই। এই আকর্ষণটিই যেন তাহাকে সংসারের সঙ্গে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। গোকুল ছেলেবেলা হইতেই অন্নদাকে ভালবাসিত। ইহার উপর অন্নদা যে দিন বিধবা হইয়া অসহায়ভাবে ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় লইল, সেই দিন হইতে এই বিধবা ভগিনীর উপর গোকুলের ভালবাসাটা আরও একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়িল। সে যেন আপনার সমগ্র হৃদয় দিয়া দুঃখিনী বিধবার সকল শোক—সকল দুঃখ-দৈন্য মুছাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। আর অন্নদাও এই সুখ-দুঃখে উদাসীন নিরীহ ভাইটির জন্যই যেন সংসারের সকল দুঃখ-কষ্ট মাথায় পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

গোকুলের দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না, বাহিরের লোকে এজন্য অনুরোধ করিলেও বাড়ীতে পিসীমা বা ভ্রাতার নিকট হইতেও গোকুলকে কিছুমাত্র উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত না। শুধু অন্নদাই এজন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে তাড়া দিত। গোকুলও "দেখি,

চ্ছে, হবে, আসচে মাসটা যাক" ইত্যাদি স্তোক-বাক্যে ভগ্নীকে ভুলাইয়া রাখিত। অন্নদা পিসীমাকে ধরিত। কিন্তু পিসীমা বলিতেন, "বেশ তো, বিয়ে করবে, করুক্ না, আমি কি বারণ করেছি, না ধ'রে রেখেছি।"

পিসীমার অভিপ্রায় বুঝিয়া অন্ন শেষে দাদাকেই চাপিয়া ধরিল। জোর করিয়া বলিল, "তুমি বিয়ে করবে কি না তাই বল।"

গোকুল হাসিয়া বলিল, "কেন বল দেখি?"

অন্নদা বলিল, "কেন আবার কি? বিয়ে না ক'রে কি চিরকাল সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে?"

গোকুল বলিল, "থাকলে দোষ কি? এক রত্তি মেয়ে তুই, তুই যদি সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকতে পারিস্, তবে তিরিশ বছরের বুড়ো আমি, আমি থাকতে পারব না?"

মুখ নীচু করিয়া অন্নদা বলিল, "আমি মেয়েমানুষ, আর তুমি ব্যাটাছেলে।"

গোকুল সহাস্যে বলিল, "বেটাছেলের কি সন্ন্যাসী হ'তে নাই?"

মুখ তুলিয়া ভ্রূকুটী করিয়া অন্নদা বলিল, "না:। তুমি বিয়ে করবে কি না তাই বল।"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গোকুল বলিল, "এ বয়সে আর কেন অনি?"

অন্নদা রাগিয়া বলিল, "ভারী বয়স। ষাট বছরের বুড়োরা যে বিয়ে করে?"

গোকুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অন্নদা একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "তোমাকে বিয়ে করতেই হবে দাদা। বল করবে কি না।"

গোকুল বলিল, "আচ্ছা ভেবে দেখি। কিন্তু আমার বিয়ের জন্ম তোর এত মাথাব্যথা কেন অনি?"

অন্নদার মুখখানা রাগে লাল হইয়া উঠিল। অভিমানরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "তা বলবে বই কি দাদা, আমি তোমার কে? আমার মরতে জায়গা নেই, তাই তোমাদের কাছে এসে পড়েছি। আমার অন্যায় হয়েছে দাদা, আর যদি কখনও তোমাকে বলি, তবে আমার নাম অনি বামনীই নয়।"

রাগে জোরে জোরে পা ফেলিয়া অন্নদা ভ্রাতার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। সে দুই তিন দিন দাদার সহিত কথা কহিল না, তাহার কাছে পর্য্যন্ত আসিল না। গোকুল বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে একদিন অন্নদাকে ডাকিয়া বলিল "রক্ষা কর অনি, আমি সাতটা বিয়ে করতে রাজি আছি, কিন্তু তুই আর মুখ ভার ক'রে থাকিস্ না।"

অন্নদা ভারী গলায় বলিল, "সাতটা কর, পাঁচটা কর, সে তোমার খুসী। আমাকে সে কথা শুনিয়ে লাভ কি? আমি তোমার কে?"

গোকুল হাসিয়া বলিল, "তুই অনি পোড়ারমুখী।"

অন্নদা বলিল, "আমি পোড়ারমুখী, পোড়ারমুখীর মতই থাকব। আমি তো বলেছি, তোমাকে যদি আর কখন বিয়ে করতে বলি, তবে আমার নাম অনি বামনীই নয়।"

গোকুল সহাস্যে বলিল, 'আর আমিও যদি এই মাসের মধ্যে বিয়ে না করি, তবে আমার নাম গোকুল চক্রবর্ত্তী নয়।"

অন্নদা মনে মনে হাসিল, কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ করিল না।

তার পর সেই বৈশাখের শেষেই গোকুল যখন বিবাহ করিয়া পার্ব্বতীকে ঘরে আনিল, তখন অন্নদা হাসিতে হাসিতে বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্যায় জিনিষটা এমনই বিশ্রী যে, তাহা শত্রু মিত্র যে পক্ষেই প্রযুক্ত হউক, লোকে তাহার বিরুদ্ধে একটা কথাও না বলিয়া থাকিতে পারে না। অতি বড় শত্রুর প্রতিও অন্যায় আচরণ দেখিলে লোকে আনন্দ-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একটু মুখ বাঁকাইয়া বলে, "কাজটা কিন্তু অন্যায় হচ্চে।" ইহা মানুষের নিজের কথা নয়—বিবেকের শাসন।

বিবাহের পর কয়েক মাস পিত্রালয়ে থাকিয়া পার্ব্বতী যখন স্বামিগৃহে আসিল, তখন সে নূতন লোকদের নূতন আচার-ব্যবহার দেখিয়া যেমন আশ্চর্য্যান্বিত হইল, তেমনিই বিরক্তও হইল। "যে এলো চ'ষে, সেই রইল ব'সে" প্রবাদটার এমন নিষ্ঠুর সার্থকতা যে দেখা যাইতে পারে, তাহা পার্ব্বতীর ধারণাতেই ছিল না। এখন কিন্তু চোখের উপর নিত্য তাহা দেখিতে দেখিতে তাহার মনের ভিতর কেমন একটা অব্যক্ত বেদনা উপস্থিত হইল।

পার্ব্বতী যে স্বামীকে ভালবাসিত বলিয়াই এই

মানসিক যাতনাটুকু অনুভব করিল, শ্রদ্ধা নহে। এ পর্য্যন্ত সে স্বামীকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই, বরং তাহার উপর বিরক্তির ভাগটুকুই যথেষ্ট ছিল। স্পষ্ট প্রকাশ না করিলেও তাহার কথায় কার্য্যে সে বিরক্তিটুকু বেশ ফুটিয়া উঠিত। সে প্রায় দুই তিন মাস এখানে আসিয়াছে, স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তাও হইয়াছে, কিন্তু মন খুলিয়া একটা কথাও বলে নাই। স্বামী কথা কহিতে গেলে সে হয় মুখ ফিরাইয়া লয়, নয় তাচ্ছীল্যের সহিত সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, আদর দেখাইলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তাহাতে গভীর উপেক্ষা প্রদর্শন করে। তথাপি স্বামীর উপর বাড়ীর লোকদের এই অন্যায় আচরণ দর্শনে পার্ব্বতী যে একটু ব্যথা পাইল, তাহা ভালবাসার খাতিরে নয়, প্রকৃতিদত্ত বিবেকের তাড়নায়।

পার্ব্বতীর এক এক সময়ে ইচ্ছা হইত, সে স্পষ্ট করিয়া বলে, "হাঁগা, ঐ নিরীহ লোকটার উপর তোমাদের এ কিরূপ আচরণ?" কিন্তু দুই তিন মাসের ক'নে-বৌ হইয়া গৃহিণীপণা দেখাইতে সে সাহস করিত না, আপনার মনে আপনি জ্বলিতে থাকিত।

এক শনিবারে পার্ব্বতী দেখিল, গোকুল ও অমূল্য উভয়ে একসঙ্গে বাড়ীতে আসিল। অমূল্যর জন্য গাড়ু, গামছা, কাপড় সব প্রস্তুত ছিল। অমূল্য কাপড় ছাড়িয়া হাত-পা ধুইল। ছোট-বৌ ঘোমটা দিয়া তামাক সাজিয়া আনিল। অমূল্য ঘরের ভিতর বসিয়া তামাক খাইল। তার পর জলযোগ করিয়া চটী-জুতা পায়ে দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে বাহির হইল।

আর গোকুল—সে আপনার কাপড়খানাই খুঁজিয়া পাইল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ উঠানের আলনা হইতে একখানা ছেঁড়া ময়লা কাপড় লইয়া কাপড় ছাড়িল। তার পর পুকুর-ঘাট হইতে হাত-পা ধুইয়া আসিয়া, হুঁকা-কলিকা লইয়া তামাকের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। তামাক কিন্তু মিলিল না, তামাকের ভাঁড়ে একটুও তামাক ছিল না। গোকুল তখন চাকরটাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। পিসীমা বলিলেন, "সে এখন গরুর কাজে আছে। দোকান থেকে এক পয়সার তামাক নিয়ে আয় না।"

গোকুল হুঁকা-কলিকা রাখিয়া বলিল, 'পয়সা দাও।"

পিসীমা পয়সা আনিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "অমনি ময়দা ঘি আর পাম নিয়ে আসবি!"

অন্নদা নিকটে ছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘি-ময়দা কি হবে পিসীমা?"

পিসীমা বলিলেন, "অমূল্যর জন্যে খানকতক পরোটা ক'রে দেব। গেল শনিবারে দেখলি না, ভাত দেখে জ্বলে উঠ্‌লো। ও কি কলকেতায় রাত্তিরে ভাত খায়?"

অন্নদা। তবে কি খায়?

পিসী। সেখানে আবার খাবার ভাবনা? লুচী, কচুরী, মেঠাই, মণ্ডা যা খুঁজবে তাই পাবে, পয়সা ফেললেই হলো।

ঈষৎ হাসিয়া অন্নদা বলিল, "পয়সা ফেল্‌লে এখানেও সব পাওয়া যায়, পিসী-মা।"

পিসীমা তাহার দিকে একটা সরোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। গোকুল পয়সা লইয়া তাড়াতাড়ি দোকানে চলিয়া গেল।

পার্ব্বতী রন্ধনশালায় বসিয়া বসিয়া সকলই দেখিল, সকলই শুনিল, রাগে তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রি-রি করিতে লাগিল। যাহা হইতে সংসারে একটা পয়সার উপকার নাই, তাহার সুখস্বচ্ছন্দ্যের জন্য সকলেই ব্যস্ত। আর যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মুঠা মুঠা টাকা আনিয়া গুষ্টীশুদ্ধ লোকের পেট চালাইতেছে, তাহার দিকে কেহই ফিরিয়া চায় না। সে যেন চাকরেরও অধম। খাটিয়া-খুটিয়া আসিয়া সে একটু তামাক পর্য্যন্ত পাইল না। পার্ব্বতী জানিত, ছোট কর্ত্তার ঘরে কলিকাতার ভাল তামাক যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু কেহই তো তাহার একটুও দিল না। এই ঘৃণিত পক্ষপাতিত্বে পার্ব্বতী এক দিকে যেমন বাড়ীর লোকের উপর রাগিয়া উঠিল, অন্য দিকে তেমনই এই নীরব স্বামী বেচারার প্রতি তাহার সহানুভূতি প্রবৃত্তিটা জাগিয়া উঠিল।

আর এক দিন গোকুল সন্ধ্যার সময় কাছারী হইতে ফিরিয়া জানাইল যে, তাহার শরীরটা বড় ভাল নয়, রাত্রে ভাত খাইবে না। পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খাবি তবে?"

গোকুল বলিল "যা হয়।"

পিসীমা বলিলেন, "যা হয় কি খুলে বল্। রুটী খেতে হ'লে তো ময়দা আন্‌তে হবে, দু'পয়সার ঘি চাই। আট দশটা পয়সার কমে তো হবে না। এ মাসে যে হাতটানা চলেছে।"

গোকুল তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, ঘি-ময়দা

আনাতে হবে না। একমুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে প'ড়ে থাক্‌ব।"

গোকুল হাত-পা ধুইয়া আহ্নিক সারিয়া ঘরে আসিলে, পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি খাবে?"

গোকুল বলিল, "কি আর খাব? এক মুঠো মুড়ি—"

বাধা দিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তাই বা খাওয়া কেন?"

কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া গোকুল স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পার্ব্বতী বলিল, "দু'গণ্ডা পয়সা আমায় দিতে পার্‌বে?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গোকুল বলিল, "পয়সা, পয়সা কি হবে?"

পার্ব্বতী বলিল, "আমি ঘি-ময়দা আনাব।"

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "পাগল আর কি।"

পার্ব্বতী গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "তাই। এখন পয়সা দু' গণ্ডা আমায় দাও।"

ম্লান মুখে গোকুল বলিল, "দু'গণ্ডা পয়সা? পয়সা আমি কোথায় পাব?"

পার্ব্বতী। তুমি কি রোজগার কর না?

গোকুল। যা রোজগার করি, তা তো পিসীমাকে দিই।

পার্ব্বতী। দু'গণ্ডা পয়সাও হাতে রাখ না?

মৃদু হাসিয়া গোকুল বলিল, 'একটা পয়সাও নয়।"

পার্ব্বতী বলিল, "এখন হ'তে রাখ্‌বে?"

গোকুল বলিল, "দরকার কি? তবে তোমার যদি দরকার হয়—"

স্বামীর উপর একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আমার কিছুই দরকার নাই।" বলিয়াই সে ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পর এক দিন গোকুল কাছারী হইতে ফিরিয়া দেখিল, তাহার জন্য গাড়ু, গামছা, কাপড় সব প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। গোকুল কাপড় ছাড়িয়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া ঘাটে পা ধুইতে চলিল। অন্নদা বলিল, "ঘাটে যাচ্ছো কেন দাদা, বৌ যে গাড়ুতে জল তুলে রেখেছে।"

হাসিতে হাসিতে গোকুল বলিল, "পাগল আর কি। ঐ এক ফোঁটা জলে পা ধোওয়া হয়? হাঁটু পর্য্যন্ত ধুলো।"

গোকুল ঘাটে চলিয়া গেল। অন্নদা আপন মনে বলিল, "দাদা যেন কি!"

পার্ব্বতী রন্ধনশালায় বসিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল। গোকুল পা ধুইয়া ফিরিয়া আসিলে সে ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল। ছোট-বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও দিদি?"

পার্ব্বতী মৃদুস্বরে বলিল, "তামাকটা সেজে দিয়ে আসি।"

পিসীমা রান্না-ঘরের ভিতরে ছিলেন। কথাটা তাঁহার কানে গেল। তিনি একটু জোর গলায় বলিলেন, "তামাক সেজে দিতে হবে কেন? নিজে সেজে খেতে পারে না। এত বাবু হয়ে পড়েছে নাকি?"

পার্ব্বতীর সহ্য হইল না। সে মৃদু অথচ একটু উদ্ধত স্বরে বলিল, 'এ বাড়ীতে বাবু আর নয় কে?"

পার্ব্বতী চলিয়া গেল। ছোট-বৌ পিসীমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ঐ যে আমি তোমার ছেলেকে তামাক সেজে দিই কি না, পিসীমা।"

পিসীমা বলিলেন, 'ও! তাই তামাক সাজ্‌তে ছুটলেন। ছেলেটার বিয়ে দিয়েই না বাতাস দাখিল হ'লো।"

পার্ব্বতী গিয়া তামাক সাজিবার জন্য কলিকা হাতে লইতেই গোকুল আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তাহার দিকে চাহিল, একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "ও কি, তুমি তামাক সাজ্‌তে গেলে কেন? না না, আমায় দাও, আমি সাজ্‌ছি।"

পার্ব্বতী তীব্র দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে চাহিল, তার পর কলিকাটা আছড়াইয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। ছোট বৌ মুখ টিপিয়া হাসিল। পার্ব্বতী দাঁতে দাঁত চাপিয়া আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

গোকুল বলিয়া উঠিল, "ধঃ, কল্‌কেটা যে চুরমার ক'রে দিয়ে গেল? তাই তো, এখন তামাক খাই কিসে?"

পিসীমা রাগে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার মাথায় ক'রে খাও। আমি কিন্তু কল্‌কে কিন্‌তে পয়সা দিতে পার্‌ব না, তা ব'লে দিচ্ছি। যে ভেঙ্গেছে, সে তার বাপের বাড়ী হ'তে এনে দেবে।"

সহাস্যে গোকুল বলিল, "তা এক্ষুণি। এখন তুমি একটা আধলা দাও পিসী-মা, একটা কল্কে দেখি।"

রাত্রিতে পার্ব্বতী শয়ন করিতে গেলে গোকুল

বলিল, "আজ ব্যাপার কি পারু, পা ধোয়ার জল তুলে রেখেছিলে, তামাক সেজে দিতে গেলে ?"

পার্ব্বতী হাত দুইটা জড় করিয়া অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "অন্যায় হয়েছে গো, আমার ঝকমারী হয়েছে। এখন তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে বল্‌ছি, একটা পয়সা দিয়ে আমায় এ লাঞ্ছনা হ'তে উদ্ধার কর।"

পার্ব্বতী স্বামীর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া সত্য সত্যই মেঝেয় মাথা খুঁড়িতে লাগিল। গোকুল ব্যস্তভাবে তাহাকে তুলিয়া বলিল, "ছি ছি, কর কি পারু ?"

পার্ব্বতী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"হাঁ লা বৌ !"

"কেন ঠাকুরঝি ?"

"সত্যি বল্‌বি ?"

"যদি লুকাবার মত না হয়।"

"দাদাকে তোর মনে ধরে না,—না ?"

মৃদু হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তোমার ধরে ?"

অন্নদা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। সে চুলের গোছায় একটা মৃদু টান দিয়া বলিল, "মরণ আর কি ! আমার মা'র পেটের ভাই, আমার আবার মনে ধরাধরি কি ?"

হাসিতে হাসিতে পার্ব্বতী বলিল, "ধরাধরিটা বুঝি শুধু আমাকে নিয়ে ?"

অন্নদা। তোর যে সোয়ামী।

পার্ব্বতী। সত্য না কি ?

অন্নদা। সত্যি না কি মিথ্যে, তা তুই জানিস্।

পার্ব্বতী। আমি তো জান্‌তাম, আমার—

গালে একটা মৃদু ঠোনা দিয়া অন্নদা রাগতভাবে বলিল, "তোমার মাথা। এ দিকে তো কথার ভটচায্যি খুব দেখছি।"

সহাস্যে পার্ব্বতী বলিল, "কোন্ দিকেই বা কম দেখলে ?"

অন্নদা। শুধু সোয়ামীকে ভালবাসার বেলায়।

পার্ব্বতী। ও জিনিসটা আমার কুষ্টীতেই লেখে না।

অন্নদা। তা হ'লে দেখ্‌ছি, তুই শিমুল-ফুলটি।

পার্ব্বতী। ঘেঁটু-ফুল হ'তেও রাজী আছি।

অন্নদা। তবু একটু ভালবাস্‌তে পার্‌বি না ?

পার্ব্বতী চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "ভালবাসার মত হ'লে পার্‌তাম।"

অন্নদা চুলের গোছা ছাড়িয়া দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌লি ?"

পার্ব্বতী নীরবে নত-মুখে বসিয়া রহিল। অন্নদা ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "আমার দাদা তোর ভালবাসার উপযুক্ত নয় ?"

পার্ব্বতী মুখ তুলিল, ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "তোমার দাদা তোমার কাছে খুব বড় হ'তে পারে, কিন্তু পরের কাছেও কি তাই ?"

অন্নদা রাগে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "পর কে ? তুই স্ত্রী, তুই পর ?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আপনার মত তো কিছু দেখ্‌তে পাই না।"

অন্নদা। চোখ থাক্‌লে দেখতে পেতিস্।

অন্নদা বাঁ হাতে চুলের গোছা, ডান হাতে চিরুণী লইয়া জোরে জোরে চুল আঁচড়াইতে লাগিল। পার্ব্বতী বলিল, "দেখো ঠাকুরঝি, তোমার ভালবাসার চোটে চুলগুলো যেন আজ না যায়।"

অন্নদা একটু লজ্জিত হইল। সে নীরবে অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে চিরুণী চালাইতে লাগিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পার্ব্বতী বলিল, "রাগ কর্‌লে ঠাকুরঝি ?"

অন্নদা বলিল, "তোর কথা শুন্‌লে মরা মানুষেরও রাগ হয়।"

সহাস্যে পার্ব্বতী বলিল, "কিন্তু যার জন্য তোমার এত মাথা-ব্যথা, তার তো একটুও রাগ হয় না ?"

অন্নদা বলিল, "কে, দাদা ? তার শরীরে রাগ থাক্‌লে তো ?"

শ্লেষপূর্ণ স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "মানুষ হ'লে রাগ থাক্‌তো।"

অন্নদা। দাদা মানুষের মত মানুষ।

পার্ব্বতী। শুধু দু'টো হাত, দু'টো পা থাক্‌লেই, আর ছাই-পাঁশ যা হয় এক মুটো পেটে দিতে পার্‌লেই মানুষ হয় না।

অন্নদা রাগিয়া বলিল, "তবে কি সকলকে বক্তৃতা

'রে যথাসর্ব্বস্ব নিজের পেটে দিতে পারলে, নিজের খটুকু চার-পো বজায় করতে পারলেই মানুষ হয় ?"

পার্ব্বতী চুপ করিয়া রহিল। অন্নদা বলিল, "দেখ্ বৌ, পশু-পাখীতেও নিজের সুখ-সুবিধাটুকু বজায় করে, কিন্তু যে মানুষ, সে সেটুকু ত্যাগ ক'রে পরের সুখ-সুবিধার জন্য ব্যস্ত হয়। আমার দাদা মানুষ, মানুষের মত মানুষ।"

আনন্দে গর্ব্বে অন্নদার মুখখানা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পার্ব্বতী সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল, "সাধু-সন্ন্যাসী না কি ?"

অন্নদা বলিল, "ঠিক তাই।"

পার্ব্বতী একটু নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তা হ'লে ঠাকুরঝি, এ রকম সাধু-সন্ন্যাসীর আবার বিয়ে-করা উচিত হয় নি কিন্তু।"

অন্নদা সহাস্যে বলিল, "কপাল আমার। ও কি বিয়ে করতে চেয়েছিল ?"

পার্ব্বতী। তবে করলে কেন ?

অন্নদা। আমার তাড়নায়। ধরতে গেলে আমিই তো ধ'রে বেঁধে বিয়ে দিয়েছি।

মৃদু হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তুমি ধ'রে বেঁধে বিয়ে দিয়েছ, তোমায় আমি ভালবাসচি। তবে তোমার আর রাগ কিসের ঠাকুরঝি ?"

অন্নদা। তাই ব'লে সোয়ামীকে ভালবাসবি না ?

পার্ব্বতী। সোয়ামী তো তা চায় না।

অন্নদা। ও তোর কাছে ভালবাসা চাইবে, কপাল তোর! ও জগতের কারো কাছে কিছু চায় না।

পার্ব্বতী। যে যা চায় না, তাকে সে জিনিস জোর ক'রে দিয়ে ফল কি ?

উত্তেজিত-কণ্ঠে অন্নদা বলিল, "ফল এই—তোর জন্ম সার্থক হবে। তুই হিঁদুর ঘরের মেয়ে, তোর অন্য ঠাকুর-দেবতা নাই, স্বামীই তোর ঠাকুর-দেবতা। সোয়ামীকে ভালবাসা, সোয়ামীর সেবা করা, এই তোর স্বর্গ।"

হাসিতে হাসিতে পার্ব্বতী বলিল, "তা হ'লে দেখছি, আমার কপালে নরক।"

অন্নদা রাগিয়া বলিল, "তোর মত পাপিষ্ঠার নরকেও স্থান নাই। কিন্তু দেখ বৌ, তোর এ তেজ চিরদিন থাকবে না। তুই হিঁদুর ঘরের মেয়ে। একদিন না একদিন তোকে সোয়ামীর পায়েই লুটিয়ে পড়তে হবে, এই আমি ব'লে রাখছি।"

"সে তখন দেখা যাবে" বলিয়া পার্ব্বতী আরসী-খানা সম্মুখে ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া-ঘুরাইয়া মাথা বাঁধার পরীক্ষা করিতে লাগিল।

পার্ব্বতীর সীঁথায় কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়া হাতের লোহায় সিঁদুর ছোঁয়াইয়া অন্নদা রাগতভাবে উঠিয়া গেল। পার্ব্বতী একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা বাঁধিবার সরঞ্জাম গুছাইতে লাগিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় গোকুল বাড়ী আসিয়াই শুইয়া পড়িল। অন্নদা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শুলে যে দাদা ?"

গোকুল বলিল, "না, এই শুয়ে পড়লাম আর কি। দেহটা একটু কেমন হয়েছে, মাথাটাও টিপটিপ করছে।"

অন্নদা তাহার গায়ে হাত দিয়াই বলিয়া উঠিল, "ও মা, গা দিয়ে যে আগুন ছুটছে। তোমার যে জ্বর হয়েছে দাদা।"

মৃদু হাসিয়া গোকুল বলিল, "জ্বর ? তা হবে।"

অন্নদা বলিল, "হবে কি ? ভয়ানক জ্বর হয়েছে। যাই, বৌকে ডেকে দিই।"

ব্যস্তভাবে গোকুল বলিল, "সে এসে কি করবে ?"

অন্নদা। তোমার গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দেবে, মাথাটা টিপে দেবে।

গোকুল। না না, তার দরকার নাই।

অন্নদা। তোমার আবার দরকার কিসে থাকে দাদা ? আমি যাই, তাকে ডেকে দিই।

গোকুল ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "রক্ষে কর্ অনি, তাকে ডেকে দিতে হবে না। তা হ'লে আমি বৈঠকখানায় গিয়ে শুই গে।"

অন্নদা রাগতস্বরে বলিল, "না দাদা, তোমার আর বৈঠকখানায় যেতে হবে না, ঘরেই শুয়ে থাক। আমি আজ বৌকে এ ঘরে ঢুকতে দেব না।"

গোকুল উঠিতেছিল, আবার শুইয়া পড়িল। অন্নদা ভাবিল, "যা হোক মানুষ! সত্যি, বোয়েরই বা দোষ কি ?"

দরজার দিকে চাহিতেই অন্নদা দেখিতে পাইল, পার্ব্বতী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া টিপি-টিপি হাসিতেছে। অন্নদা মাথাটা নীচু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্নদা যথার্থই বলিয়াছিল, 'পার্ব্বতী ছিচ্‌ড় ঘরের মেয়ে।' পার্ব্বতীও যে তাহা জানিত না, এমন নয়। সে প্রাণহীনাও ছিল না, তাহার হৃদয় ছিল, হৃদয়ে ভক্তি ছিল, ভালবাসা ছিল, স্নেহ, মমতা, কোমলতা সবই ছিল। কিন্তু প্রতপ্ত মরুভূমিতে পতিত বারি-বিন্দু যেমন অধিকক্ষণ আপনার সরসতা বজায় রাখিতে পারে না, অবস্থান্তরে পতিত পার্ব্বতীর হৃদয়বৃত্তিগুলাও সেইরূপ প্রকাশ পাইয়াও স্থায়ী হইতে পারিতেছিল না। একে সে তাহার প্রকৃতিগত সংস্কারের বিপরীত অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহার যে রূপ রাজমুকুটে স্থান পাইবার উপযুক্ত মনে করিয়াছিল, তাহা দরিদ্রের গৃহে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর যাহাকে লইয়া সে পূর্ব্বসংস্কার ভুলিয়া নূতন জীবন গঠন করিবে, তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পার্ব্বতী ভক্তি করিবে, ভালবাসিবে কাহাকে? যে তাহার সেবা চায় না, আদর চায় না, ভালবাসা চায় না তাহাকে ভাল-বাসিতে, সেবা করিতে যাইবে? ভালবাসা দেখাইতে গিয়া,সেবা করিতে গিয়া উপেক্ষার তীব্র কশাঘাত লাভ করিবে? যে দেবতা তাহার পূজার প্রার্থী নয়, তাহার পূজা করিয়া সে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে? তাহার ভক্তিপ্রদত্ত উপহার দেবতার পদতলে পিষ্ট হইয়া তাহার অন্তরের ব্যথাকে কি আরও বাড়াইয়া তুলিবে না?

পার্ব্বতী জানিত না, পূজারীর পূজাই লক্ষ্য, তাহা-তেই তাহার সুখ। দেবতার প্রসন্নতা অপ্রসন্নতায় তাহার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

এতটা না জানিলেও পার্ব্বতী নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে স্বামীর উপর যেটুকু শ্রদ্ধাযত্ন দেখাইতে যাইত, স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া ক্রমে তাহার সে প্রবৃত্তিটুকুও লোপ পাইবার উপক্রম হইল। ইহাতে যে সে সুখী হইল, তাহা নহে, তাহার বিষম অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। যাহার যাহা স্বাভা-বিক প্রবৃত্তি, সে প্রবৃত্তিতে বাধা পাইলে কাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত না হয়? তাহার সে অন্তর্দাহ ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইল, হৃদয় ক্রমে কঠোর হইয়া আসিতে লাগিল।

ছোট বোয়ের সঙ্গে পার্ব্বতীর তেমন মনোমালিন্য ছিল না। পার্ব্বতী একটু লিখিতে পড়িতেও জানিত। প্রায় প্রত্যহই আহারাদির পর সে ছোট বোয়ের কাছে বসিয়া বই পড়িত। যে দিন রামায়ণ-মহাভারত পড়া হইত, সে দিন অন্নদাও আসিয়া তাহাদের কাছে বসিত। কিন্তু যে দিন নাটক নভেল পড়া হইত, সে দিন অন্নদা বোসেদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইত। অমূল্যর অনেক নাটক-নভেল সংগ্রহ করা ছিল। পার্ব্বতী তাহা পড়িয়া ছোটবৌকে শুনাইত।

সে দিন শনিবারে একখানা উপন্যাস পড়া হইতে-ছিল। উপন্যাসের গল্পটা যখন বেশ জমিয়া আসিয়াছিল, তখন সহসা ছোট-বৌ বাহিরে রোদের দিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "যাও কোথায়?"

ছোটবৌ বলিল, "আজ থাক্ ভাই, বেলা গেছে।"

পার্ব্বতী বলিল, "এখনো ঢের বেলা আছে। আর খানিকটা শোন।"

ছোটবৌ বলিল, "না ভাই, আজ শনিবার, বা[illegible] আসবে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আঃ গো, এ[illegible] বা বাড়ী?"

ছোটবৌ যেন একটু শঙ্কিতস্বরে বলিল, "সকা[illegible] সকাল কাজ-কর্ম্ম সেরে রাখি ভাই, জান তো তাঁকে[illegible] সে কি বড়ঠাকুরের মত? তাল থেকে তিলটি খস[illegible] যো নাই।"

পার্ব্বতী রাগিয়া বলিল, "চুলোয় যা, তবে আ[illegible] আপনিই পড়ি।"

ছোটবৌ চলিয়া গেল, পার্ব্বতী নিজে মনে মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার আর পড়িতে ভাল লাগিল না। একটু পড়িয়াই বইখানা মুড়িয়া ফেলিল। তার পর বইখানা হাতে করিয়া জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছোটবোয়ের 'বড়-ঠাকুরের মত' কথাটা তাহার মনের ভিতর যেন কাঁটা বিঁধিতেছিল। এই কথাটির মধ্যে যে কতখানি শ্লেষ, কতটা বিদ্রূপ আছে, তাহা সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনের কাঁটাটা যেন শেলের মত হইয়া বুকে আঘাত করিতে লাগিল। ছোটবোয়ের স্বামীও মানুষ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! একজন মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লইয়া, ভালবাসা দিয়া ও ভালবাসা পাইয়া সুখময় জীবন যাপন করে, আর একজন মানুষের অবজ্ঞ-ভোগ্য সুখদুঃখে উদাসীন হইয়া সকলের ঘৃণা ও লাঞ্ছনা লইয়া, বন্য পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতে ভালবাসে। মানুষ হইলেও কি অপদার্থ

মানুষ সে, যাহাকে বাড়ীর এই ছোটবৌটাও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে না। পার্ব্বতীর সমগ্র হৃদয়টা ঘৃণায় লজ্জায় ভরিয়া উঠিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সে রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া রহিল।

পার্ব্বতী স্বামীর যে দুই একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ করিত, ক্রমে তাহাও ছাড়িয়া দিল। ছাড়িতে ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল এই রাগদ্বেষশূন্য লোকটাকে একটু রাগাইবার জন্যই বোধ হয় ছাড়িল। কিন্তু সে স্বামীকে রাগাইতে পারিল না।

পার্ব্বতী রাত্রিতে স্বামীর জন্য পান-জল ঘরে রাখিয়া আসিত, গোকুল আহারান্তে ঘরে গিয়া তাহা খাইয়া শুইয়া পড়িত। কিন্তু দিনকতক পরে গোকুল ঘরে গিয়া আর তাহা পাইল না। না পাইয়াও কোন উচ্চবাচ্য করিল না। যে দিন তৃষ্ণার জোর থাকিত, সে দিন রান্না-ঘরে গিয়া জল খাইয়া আসিত।

একদিন পার্ব্বতী আহারাদির পর পান চিবাইতে চিবাইতে এক খিলি পান হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিল। গোকুল শুইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "পান এনেছ পারু?"

পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি হাতের পানটা মুখে পুরিয়া বলিল, "পান নাই।"

গোকুল বলিল, "নাই? সন্ধ্যার সময় যে পান নিয়ে এলাম।"

ভ্রূকুটী করিয়া তীব্র শ্লেষপূর্ণ স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "এনেচ, খরচ হয়ে গেছে। ঠাকুরপোর রাত্রে চার গণ্ডা পান না হ'লে চলে না, তা জান না বুঝি? ন্যাকা।"

মৃদু হাসিয়া গোকুল বলিল, "তা বটে, ও ছোঁড়া একটু বেশী পান খায়।"

কি আশ্চর্য্য! এতেও লোকটা রাগিল না, আবার হাসিল! এ কি মানুষ? পশুতেও বোধ হয় এত উপেক্ষা সহ্য করিতে পারে না। পার্ব্বতীর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

গোকুল বলিল, "আজ জল খেয়ে আস্‌তে ভুলে গেছি, এক গ্লাস জল এনে দিতে পার?"

পার্ব্বতী ধড়াস্‌ করিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পরুষকণ্ঠে বলিল, "উঠে গিয়ে খেয়ে এলেই তো পার। আমি আর যেতে পারব না।"

পার্ব্বতী দাঁতে দাঁত চাপিয়া বিছানার এক পাশে গিয়া শুইয়া পড়িল। গোকুল পাখার বাতাস দিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল।

খানিক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে পার্ব্বতী দেখিল, ঘামে তাহার গায়ের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, স্বামী মাথার কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। পার্ব্বতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। গোকুল বলিল, "উঠলে কেন পারু?"

তীব্র-কণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "কে তোমাকে বাতাস কর্‌তে বলেছে?"

স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে গোকুল বলিল, "পাগল আর কি। বল্‌বে আবার কে? ঘামে যে তুমি নেয়ে উঠেছ। বড় গরম, শুয়ে পড়, আমি বাতাস কর্‌ছি।"

পার্ব্বতী স্বামীর হাত হইতে পাখাখানা কাড়িয়া লইয়া মেঝেয় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। পাশে গোকুল গালের উপর হাত রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সহসা চাপা কান্নার শব্দ পাইয়া গোকুল ধীরে ধীরে ডাকিল, "পারু!"

পার্ব্বতী নিরুত্তর। গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদ্‌ছ পারু?"

পার্ব্বতী মুখটাকে বিছানায় গুঁজিয়া জোর গলায় উত্তর দিল, "না।"

গোকুল তাহার কপালে হাত দিয়া শান্ত কোমল-স্বরে বলিল, "কি হয়েছে পারু?"

পার্ব্বতী তাহার হাতটা সবলে ঠেলিয়া দিয়া রুক্ষ-কণ্ঠে বলিল, "দেখ, এমন যদি জ্বালাতন কর, তা হ'লে আমি মেঝেয় আলাদা বিছানা ক'রে শোব।"

গোকুল কুণ্ঠিতভাবে হাত সরাইয়া লইয়া এক পাশে শুইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য-প্রণয়ের কিছুমাত্র অস্তিত্ব না থাকিলেও পিসীমা কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভালবাসার এমন আতিশয্য দেখিতে পাইতেন, যাহা গৃহিণী-মাত্রেরই চক্ষুঃশূল। এই ভালবাসার আতিশয্য যে একদিন সংসারে বিষম অশান্তি আনয়ন করিবে, এবং তাঁহার সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া দিবে, এরূপ আশঙ্কাও ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তিনি পাড়ার প্রবীণাদের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা গো মা, ঢের ঢের স্ত্রী-পুরুষ

দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর দেখি নাই ! হোক্ না মা, আমরাও তো এক সময়ে সোয়ামী নিয়ে ঘর-ঘরকন্না করেছি, কিন্তু এমন বাড়াবাড়ি তো আমার সাত পুরুষে দেখে নি।"

শ্রোত্রীও আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হায় মা, আমাদের সে এক কালই গেছে। দিনে তো চুলোয় যাক্, রাত্তিরেও সোয়ামী কখন মুখটি দেখতে পায় নি। যদি কখনও মাথার-কাপড় একটু আল্‌গা হয়ে পড়তো, তা হ'লে লাঞ্ছনার সীমা থাক্‌তো না। এখনকার কালে সব বেহায়া মা, সব বেহায়া। ছুঁড়ীগুলোও যেমন, ছোঁড়াগুলোও তেমনি হয়েছে। আমিও বৌ-বেটা নিয়ে ঐ জ্বালায় জ্ব'লে মরছি মা।"

পিসীমা বলিলেন, "তা মা, একালে সকলেই যে এমন বেহায়া, তা তো নয়। ঐ তো ছোট-বৌটাও রয়েছে, কিন্তু সে তো এমন নয়। এ গুণ করেছে মা, গুণ করেছে। ওষুধ খাইয়ে ভেড়া বানিয়েছে। উঠতে বললে ওঠে, বসতে বসলে বসে।"

শ্রোত্রী বলিলেন, "যে ষোল বছরের ধেড়ে মেয়ে ঘরে এনেছ ? তখনই তো তোমাকে বলেছিলাম, বামুন পিসী, অমন ধেড়ে মেয়ে ঘরে এনো না। তুমি তো তা শুন্‌লে না।"

পিসীমা দুঃখ পকাশ করিয়া বলিলেন, "আর মা, আমি শুনে করবো কি, ও হতভাগা কি কথা শুন্‌লে ? মেয়ের রূপ দেখে একেবারে গ'লে গেল।"

শ্রোত্রী বলিলেন, "এখন ঘর না ভাঙ্গে দেখো।"

পিসীমা কপালে হাত চাপড়াইয়া বলিলেন, "পোড়াকপাল আমার। ভাঙ্গবে কি, ভেঙ্গে ব'সে আছে। সারা রাত গুজু-গুজু ফুসুর-ফাসুর। কে এত খবর রাখে মা ? সে দিন ভারী রাত্তিরে ঘুমটা ভেঙ্গে যেতে বাইরে গেলাম। ও মা, গিয়ে দেখি, তখনও দুটোতে ঘুমোয় নি, ফুসুর-ফাসুর চলেছে। আড়ি পেতে কারো কথা শোনা কখনো অভ্যাস নাই মা, তবু সে দিন কেমন মনে হ'লো, দেখি দু'জনে কি যুক্তি আঁটছে। পা টিপে টিপে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি, গিন্নী রাগ ক'রে পায়ের দিকে শুয়ে চোখে আমানী ঢাল্‌ছেন, আর কর্ত্তা—বললে না পেত্যয় যাবে মা, গিন্নীর পায়ের কাছে ব'সে এই খোসামুদী আর কি।"

শ্রোত্রী। রাগটা হ'লো কেন ?

পিসীমা নাসা কুঞ্চিত করিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "কে জানে মা, তবে তাবে বোধ হ'লো, গি[illegible] পৃথক্ হবার জন্ম ধরেছেন, কিন্তু খোকলো তো সে রীতের নয়, হয় তো স্বীকার করে নি, এই আর গিন্নী আছে কোথায়, রাগে গর-গর।"

শ্রোত্রী। তার পর ?

পিসী। তার পর আর কি, সাধ্যসাধনা কিছু-তেই গিন্নীর রাগ আর ভাঙ্গলো না, ছোঁড়া আস্তে আস্তে এসে শুয়ে পড়লো। আমি আর দাঁড়াতে পাল্লাম না মা, বুক গুর-গুর করতে লাগ্‌লো, পা ঠক্‌-ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে থাক্‌লো, পা টিপে টিপে নিজের ঘরে পালিয়ে এলাম। কত মেয়ে আড়ি পেতে শোনে, আমি কিন্তু মোটেই তা পারি না মা।"

শ্রোত্রী বলিলেন, "আমারও ঐ রোগ মা, আমিও পারি না। একটু দাঁড়িয়ে শুন্‌লেই ভয়ে সারা হয়ে যাই, পালিয়ে আস্‌তে পথ পাই না। কত দিন বোয়ের মাথার শিয়রে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু পাঁচটা কথা কানে না আস্‌তেই ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এসেছি। জানি না মা, মাগীরা কি ক'রে আড়ি পাতে।"

বধূর সম্বন্ধে উক্তরূপ ধারণা লইয়া পিসীমা যখন সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিতচিত্তে দিন কাটাইতেছিলেন, তখন গোকুল মাসকাবারে টাকা আনিয়া পিসীমার হাতে দিল, এবং পিসীমা তাহা গণ্ডা গণ্ডা করিয়া গণিয়া বাক্সে তুলিতে গেলে গোকুল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "পিসীমা, আমাকে একটা টাকা দাও।"

পিসীমা আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিলেন, "তোকে টাকা দেব ? কেন ?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গোকুল বলিল, "ওকে —ওকে দিতে হবে।"

"কা'কে ? বড় বৌমাকে ?"

"হাঁ।"

পিসীমা কিয়ৎক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে গোকুলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তার পর সব টাকা আনিয়া গোকুলের সম্মুখে ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। গোকুল বিস্মিতভাবে পিসীমার দিকে চাহিল।

টাকা ফেলিয়া পিসীমাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া গোকুল বলিল, "সব দিলে যে পিসীমা ?"

পিসীমা অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "সব দেব না তো কি করব বল্। আজ মিষ্টিমুখে না দিই, কা'ল অপমান হয়ে ঝাঁটা খেয়ে দিতে হবে। কাজ কি বাবু

আমার সে লাঞ্ছনায়, আগে থাক্‌তে মানে মানে ফেলে দিচ্চি।"

গোকুল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসীমা মুখ ঘুরাইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "আমি সব বুঝি রে গোকুল, আমি সব বুঝি। আর চোখকে আঁখি ঠার কেন? তুই আজ বল্‌বি কি, যে দিন তুই ঐ ছোট লোকের ঘরের মেয়েকে এনেছিস্, সেই দিনেই বুঝেছি, আমার সোনার সংসারে আগুন লেগেছে।"

নত-মস্তকে গোকুল বলিল, "রাগ কর কেন পিসীমা, এ মাসে তো তিন টাকা বেশী এনেছি। একটা টাকা দিলে কি চল্‌তো না?"

পিসীমা রাগিয়া উত্তর করিলেন, "চলে না চলে, সে তোমরা বুঝবে, তোমাদের নতুন গিন্নীরা বুঝবে। আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, আমার আর এখন এত বোঝাবুঝির দরকার কি?"

পিসীমা প্রস্থানোদ্যত হইলেন। গোকুল বলিল, "তবে থাক্ পিসীমা, সব টাকা তুমি নাও।"

পিসীমা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কক্‌খনো না। তোর টাকায় যদি আমি হাত দিই, তবে ও গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত।"

গোকুল টাকাগুলা তুলিয়া লইল, পিসীমার কাছে গিয়া তাঁহার হাতে টাকাগুলা গুঁজিয়া দিতে গেল। পিসীমা সেগুলা ছুড়িয়া ফেলিলেন। টাকাগুলা ঝন্‌ঝন্ শব্দে উঠানময় ছড়াইয়া পড়িল। পিসীমা ক্রোধ-প্রদীপ্ত-কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ গোকুল, তুই যদি আমাকে টাকা দিতে আসিস্, তবে তোকে আমার দিব্যি, আমারই রক্তে তুই পা ধুবি।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পিসীমা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। গোকুল উঠানে নামিয়া একটি একটি করিয়া টাকাগুলি কুড়াইয়া লইল, এবং তাহা লইয়া ধীরে ধীরে আপনার ঘরে ঢুকিল।

ঘরে পার্ব্বতী ছিল। কিন্তু গোকুল তাহার হাতে এ টাকা দিতে সাহসী হইল না। তাহার নিজের বাক্সপেটরাও ছিল না। সে টাকাগুলি মাথার বালিসের নীচে রাখিয়া অবসন্নভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িল।

পিসীমা রন্ধনশালার দরজায় বসিয়া প্রথমতঃ আপনার দগ্ধ অদৃষ্টকে বিস্তর ধিক্কার দিলেন, তার পর এই গৃহবিচ্ছেদের মূলীভূত পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া এমন সব কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, তাহা পার্ব্বতীর অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না, একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াই নীরবে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পিসীমা কিন্তু নিরস্ত হইলেন না, তিনি পার্ব্বতীকে ছাড়িয়া তাহার পিতা-মাতার উদ্দেশে অভিসম্পাত প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, শেষে যখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এমন ভাইপোকে ঘরে এনেছিলাম যে, দশটা দিনও ভায়ে ভায়ে মিল দেখতে পাবলে না" তখন পার্ব্বতীর আর সহ্য হইল না। সে বাহিরে আসিয়া রোষগম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "দেখ পিসীমা, আমাকে যা ইচ্ছা তয় বল, কিন্তু বারণ ক'রে দিচ্ছি, আমার ভাই তুলে কথা কয়ো না, তা হ'লে ভাল হবে না বল্‌ছি।"

পিসীমার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। তিনি আরও দ্বিগুণ উৎসাহে পার্ব্বতীর পিতা ও ভ্রাতার উদ্দেশে বিস্তর কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীও তাহার উত্তর দিতে ছাড়িল না। পিসীমা চীৎকারে গলা ফাটাইয়া শেষে দরজার চৌকাঠের উপর মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। গোকুল ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বাটীর বাহিরে চলিয়া গেল।

ঝগড়ার সময় অন্নদা উপস্থিত ছিল না, বোসেদের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। বাড়ীতে ফিরিয়া সে সকল কথা শুনিল। শুনিয়া পার্ব্বতীর ঘরে গিয়া ডাকিল, "হাঁ বৌ।"

পার্ব্বতী উত্তর দিল, "কেন ঠাকুরঝি?"

অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি তুমি পৃথক্ হবে?"

ম্লান হাসি হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "যদিই হই?"

অন্নদা বলিল "হ'লে তেমন দোষ নাই, আর হওয়াই উচিত, কিন্তু বৌ।"

পার্ব্বতী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ভয় নাই ঠাকুরঝি, পিসীমার মুখে শোন্‌বার আগে এ কথা একবারও আমার মনে উঠে নাই।"

অন্নদা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই তো বলি, আমার এমন বৌ, সে কি কখনও এত ছোটলোক হ'তে পারে?"

পার্ব্বতী হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর এমন ঠাকুরঝি কাছে থাকতে কি আমি পৃথক্ হ'তে পারি?"

পার্ব্বতী দুই হাত দিয়া অন্নদাকে জড়াইয়া ধরিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"দাদা।"

"কেন রে অমূল্য?"

"বড়বৌ নাকি পিসীমাকে যা ইচ্ছে তাই বলেছে?"

সহাস্যে গোকুল বলিল, "তা বলেছে বটে।"

অমূল্য রাগে চীৎকার করিয়া বলিল, "বলেছে বটে। কেন বল্‌বে? পিসীমা কি তাঁর বাবার কিছু খান, না পরেন?"

গোকুল বলিল "ছি ভাই, এ সব কথা বল্‌তে আছে?"

অমূল্য চোখ-মুখ ঘুরাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তোমায় বল্‌তে নাই, কিন্তু আমায় আছে। তুমি কি হ'লে দাদা?"

গোকুল। কি হলাম?

অমূল্য। বড় বৌয়ের পোষা ভেড়া। বড়বৌ তোমাকে একবারে আস্ত ভেড়া বানিয়েছে।"

গোকুলের বক্ষের স্পন্দন যেন সহসা থামিয়া গেল। সে কোন উত্তর করিল না, শুধু স্থির-দৃষ্টিতে কনিষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমূল্য তীব্রকণ্ঠকে আরও তীব্র করিয়া বলিল, "দ্বিতীয় পক্ষে অনেকেই বিয়ে করে দাদা, কিন্তু তোমার মত স্ত্রীর ভেড়া কেউ হয় না।"

গোকুলের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। পিসীমা যাহা বলে বলুক,-কিন্তু অমূল্য যে মুখের উপর তাহাকে এমন কথা বলিতে পারে, ইহা তাহার ধারণাতেই ছিল না। ধারণার অতীত কথা শুনিয়া গোকুলের আজীবন সযত্ন-রক্ষিত ধৈর্য্যের বাঁধ সহসা যেন ভাঙ্গিয়া গেল। সে বজ্রগম্ভীর-স্বরে ডাকিল, "অমূল্য।"

সে স্বর শুনিয়া বাড়ীর সকলেই যেন চমকিয়া উঠিল। গোকুলের কণ্ঠ হইতে এমন স্বর বাহির হইতে আর কেহ কখন শুনে নাই। অমূল্য কিন্তু তাহাতে একটু বিচলিত হইল না, সে সমান উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিল, "চোখ রাঙ্গাচ্চ কি দাদা, চুরি-চামারি ক'রে দশ টাকা রোজগার কর ব'লে তোমার যে অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না, তা বুঝেছি। কিন্তু উপায় শুধু তুমি একা কর না, আমিও উপায় করতে জানি। আর না জান্‌লেও যে তোমার লাথি-ঝাঁটা, বড়বৌয়ের মুখ নাড়া খেয়ে থাকব, তা মনেও ক'রো না। অমূল্যচরণ সে পাত্রই নয়।"

গোকুল স্থিরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করবি?"

অমূল্য চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি করবো কি আবার? পৃথক্ হবার জন্য তোমরা দু'জনে উঠে প'ড়ে লেগেছ, বেশ, পৃথক্ হও।"

অন্নদা অগ্রসর হইয়া বলিল, "হাঁ রে অমূল্য, তুইও কি মেয়েমানুষ হ'লি?"

অমূল্য ক্রোধরক্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ দিদি, তুমি এ সব কথায় থেকো না। থাক্‌লে ভাল হবে না বল্‌ছি।"

অন্নদা রাগিয়া বলিল, "মন্দটা কি হবে শুনি?"

চীৎকার করিয়া অমূল্য বলিল, "ঝাঁটা মেরে বাড়ীর বা'র ক'রে দেব।"

গোকুল বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। অমূল্যকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে কবে পৃথক্ হবি?"

অমূল্য বলিল, "আজই, এখনই,—এই মুহূর্ত্তে।"

"বেশ, তাই হোক্" বলিয়া গোকুল প্রস্থানোদ্যত হইল। অন্নদা ডাকিল, "দাদা।"

গোকুল ফিরিয়া দাঁড়াইল। অন্নদা বলিল, "তুমিও কি পাগল হ'লে দাদা?"

ক্রোধকম্পিত স্বরে গোকুল বলিল "দেখ অনি, তোর অদৃষ্টে নেহাৎ ঝাঁটা আছে দেখছি।"

অন্নদা মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোকুল দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

পার্ব্বতী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি পৃথক্ হবে?"

গোকুল উত্তর দিল, "হাঁ।"

পা। কেন?

গো। আমার ইচ্ছা।

পা। এ ইচ্ছাটা তোমায় ছাড়তে হবে।

গো। কেন তা শুনি।

পা। লোকে আমাকেই দোষ দেবে, বল্‌বে, বৌটা এসেই সংসার ভাঙ্গলে।

গো। আমি সকলকে বুঝিয়ে দেব, তোমার কোন দোষ নাই।

ভ্রূকুটি করিয়া গোকুল বলিল, "শুনেছি, আমি তোমার পোষা ভেড়া।"

পার্ব্বতী বলিল, "পৃথক্ হ'লে লোকে আরও কিছু বেশী বল্‌বে।"

গো। লোকের কথায় কিছু আসে যায় না।

পা। তোমার আসে যায় না বটে, কিন্তু আমি লোকনিন্দাকে ভয় করি।

গো। ভয় ক'রেই বা কি করবে?

পা। আমি পৃথক্ হ'তে পারব না।

গো। তুমি না পার, আমাকে পৃথক্ হ'তেই হবে।

পা। হঠাৎ তোমার এত জেদ কেন?

"কেন?" স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া গোকুল ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "কেন? কেন, তা তুমি কি বুঝবে, পারু? যাকে হাতে ক'রে মানুষ করেছি, সে আমাকে চোর অপবাদ দেয়, সে আমাকে বলে—"

গোকুলের চক্ষু দুইটা ভারী হইয়া আসিল, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। ঈষৎ হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তোমার এ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তো নূতন নয়।"

গম্ভীরস্বরে গোকুল বলিল, "কেউ কখন আমাকে চোর অপবাদ দেয় নি।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পার্ব্বতী বলিল, "অনেক দিন এসেছি, একবার বাপের বাড়ী যাব।"

মুখ না ফিরাইয়া গোকুল বলিল, "কবে যাবে?"

পার্ব্বতী বলিল, "যত শীঘ্র হয়, কা'লই।"

গোকুল বলিল, "উত্তম, কা'ল সকালে পাল্কী বেহারা ডেকে দেব।"

স্বামি-স্ত্রীতে আর কোন কথা হইল না।

সেই সময়ে অন্য ঘরে পিসীমার সঙ্গে অমূল্যর বাদানুবাদ হইতেছিল। পিসীমা বলিতেছিলেন, "তুই জানিস্ না অমু, মৌ-টুসকি বৌটি কম নয়, হারামজাদার হাড়।"

অমূল্য বলিল, "শুধু ওকেই দোষ দাও কেন পিসীমা, তোমরাই বা কোন্ কম? একজন সহ্য করলে তো আর এতখানি হ'তো না।"

পিসীমা রাগিয়া বলিলেন, "সহ্য করতে হয়, তোরা করবি, আমি কেন সইতে যাব রে? রূপসী বৌ এসেছে, তোর ভাই দু'বেলা তার চরণামৃত খাচ্ছে, তুইও খা। আমার কি এত গরজ?"

অমূল্যও রাগিয়া বলিল, "গরজ কারো নয়, কিন্তু ভরসা তো পঁচিশ টাকা। ডান হাত চলবে কিসে?"

পিসীমা বলিলেন, "কিসে চলবে, তা তুই জানিস্। না চলে, গিয়ে বড় গিন্নীর পায়ে পড়, নাকে খত দিয়ে মাফ চা, চলাচলির জন্য ভাবতে হবে না।"

অমূল্য দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কোন উত্তর দিল না। পিসীমা একটু বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেলেন। তখন ছোটবৌ কাছে আসিয়া স্বামীকে বলিল, "যাই বল তুমি, দোষটা যত পিসীমার। উনিই তো এতখানি বাধালেন।"

অমূল্য সনিশ্বাসে বলিল, "দোষ কারো নেই, দোষ যত আমার।"

অমূল্য যে বাস্তবিকই পৃথক্ হইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহা নহে। দাদার রোজগারে সংসার চলিতেছে বলিয়াই সে দিব্য বাবুয়ানা করিয়া গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়াইতে পারিতেছে। সেই দাদার সঙ্গে পৃথক্ হইয়া সংসারের ভার ঘাড়ে লওয়া যে বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, ইহা সে ভালই বুঝিত। পিসীমার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া সে শুধু দাদাকে উপলক্ষ করিয়া বড়বৌকে পাঁচ কথা শুনাইয়া দিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরিণাম বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। রাগের মাথায় সে বড়বৌয়ের পরিবর্ত্তে দাদাকেই এমন সব কথা শুনাইল যে, তাহাতে তাহার চিরসহিষ্ণু দাদাও বিচলিত হইয়া পড়িল। দাদার অটল ধৈর্য্যেরও বিচ্যুতি আছে, ইহা জানিলে অমূল্য কখনই পিসীমার কথায় কান দিত না।

কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় কি? উপায় ছিল, পায়ে হাতে ধরিয়া দাদাকে শান্ত করা। অমূল্য কিন্তু এতটা অপমান স্বীকার করিতে পারিল না। ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তথাপি সে দাদার পায়ে ধরিতে গিয়া বড়বৌয়ের কাছে আপনার হীনতা প্রকাশ করিতে পারিবে না। তাহার কি এতটুকু আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই?

সারা রাত্রির মধ্যে অমূল্য ঘুমাইতে পারিল না, পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। পনরো বিঘা জমী আছে, ভাগ হইলে অৰ্দ্ধেক দাদার, অৰ্দ্ধেক তাহার নিজের ভাগে পড়িবে। কিন্তু এই পনরো বিঘাই যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার ধান, খড় আর চাকরীর পঁচিশ টাকা, সংসার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু দাদা ছাড়িবে কেন? স্বেচ্ছায় না ছাড়িলেও তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাহাতে জমীগুলা হাত করিতে পারা যায়, অমূল্য তাহারই উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কোন সহজ উপায়ই তাহার মাথায় আসিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল, সকালে উঠেই একবার গুপী

সরকারের কাছে যেতে হবে। ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাত্রিতে অমূল্য ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অমূল্য স্বপ্নে দেখিল, যেন সে দাদার সহিত পৃথক্ হইয়াছে, জমীজমা সব দাদা লইয়াছে; অমূল্যর চাকরীটি গিয়াছে। তাহার দিনটি পর্য্যন্ত চলে না, উপবাস দিয়া দিন কাটাইতে হইতেছে। মেয়েটা ক্ষুধায় হা হা করিতেছে, ছোটবৌ তিন দিনের অনাহারে মরার মত পড়িয়া আছে, পিসীমা তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন, গালাগালি দিতেছেন। অমূল্য উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে ছুটিয়া গিয়া দাদার পা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিতে কাঁদিতে দাদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। বড়-বৌ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অমূল্য ভয়ে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, এ কি, সে কাহার পায়ে ধরিয়াছে? এ তো দাদা নয়, এ যে বড়বৌ। ঘৃণায় লজ্জায় অমূল্য গলায় দড়ি দিয়া মরিবার জন্য ছুটিল। পশ্চাৎ হইতে পিসীমা চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "অমূল্য, ওরে অমূল্য!"

অমূল্যর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘর্ম্মাক্তদেহে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, তাহার বুকটা গুর-গুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পিসীমা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, "ঢঙ দেখ্ সে রে অমূল্য, বড় গিন্নী যে বাপের বাড়ী চল্লেন।"

অমূল্য কোন উত্তর করিল না, সে দুই হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

গোপীনাথ সরকার গ্রামের মধ্যে এক জন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি যে দান-ধ্যান ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, পরোপকার-প্রবৃত্তি দ্বারাই তিনি সাধারণের নিকট সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন। লোকের আপদে বিপদে সাহায্য করাই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। লোকে যখন পরস্পর বিবাদ করিয়া, কি উপায়ে বিবাদে জয়লাভ করিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া চিন্তার অকূল সমুদ্রে কূল দেখিতে পাইত না, তখন সরকার মহাশয় আসিয়া তাহাদিগকে মোকদ্দমাস্বরূপ কূল দেখাইয়া দিতেন, এবং স্বয়ং প্রাণপণে তাহার তদ্বির করিয়া পরোপকার-প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। সুদক্ষ সাক্ষীর অভাবে যখন কাহারও মোকদ্দমা নষ্ট হইবার উপক্রম হইত, তখন তিনি আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথাকে প্রত্যক্ষীভূত সত্য বলিয়া প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এজন্য লোকে কিছু বলিতে গেলে সরকার মহাশয় বলিতেন, "কি করি বাপু, লোকের কান্না আমি সহ্য করতে পারি না।"

ইহা ছাড়া সরকার মহাশয়ের কাছে ১২৬০ সাল হইতে ১৩০৫ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক সালের ষ্ট্যাম্প-কাগজ ছিল, নবাবী আমলের ও কোম্পানীর আমলের শীল-মোহর ছিল, অপরের স্বাক্ষরের অনুকরণ করিবার সাজসরঞ্জাম ছিল, ছোট আদালত ও জেলা-কোর্টের বিস্তর নথীপত্র সংগৃহীত ছিল। সরকার মহাশয় সুবিধামত পরোপকারার্থে এই সকলের প্রয়োগ করিতেন। এই পরোপকার-ব্রতের ফলে তাঁহাকে জীবিকার জন্য অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত না।

তাই বলিয়া সরকার মহাশয় যে কেবল ঐহিক কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে, দিবা-রাত্রির মধ্যে কতকটা সময় তিনি পারলৌকিক কার্য্যে—ঈশ্বর আরাধনায় ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার গলায় তুলসী-কাঠের (দুষ্ট লোকে বলিত গেঁড়ো কাঠের) ত্রিকণ্ঠী মালা ছিল, মস্তকে দীর্ঘ শিখা ছিল। নাসাগ্রে সর্ব্বদাই গোপীচন্দনের তিলক বিরাজ করিত। সকালে সন্ধ্যায় সরকার মহাশয় অষ্টোত্তর-সহস্র হরিনাম করিতেন। মোকদ্দমার তদ্বির করিতে গিয়াও নদীতে স্নান করিতে নামিয়া পূর্ণ এক ঘণ্টা কাল জপ-আহ্নিকে কাটাইতেন। বাদী বা প্রতিবাদী একটু সত্বর আহ্নিক সারিবার জন্য তাড়া দিলে তিনি উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "বাপু, তোমরা আমাকে পরকালের কাজটাও করতে দেবে না? এখানে আমি তোমাদের মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে এসেছি বটে, কিন্তু সেখানকার আদালতে কি তোমরা আমার পক্ষে সাক্ষী দিতে যাবে?" সেই সর্ব্বোচ্চ আদালতে মহাবিচারকের নিকট জবাব দিবার জন্য সরকার মহাশয় দিনে রাত্রে অন্ততঃ দুই শত বার শ্রীহরিকে আপনার কৃত কর্ম্মের সাক্ষী হইবার জন্য আহ্বান না করিয়া ছাড়িতেন না। সরকার মহাশয় প্রায়ই বলিতেন, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

সংসারে বিধবা মেয়ে ব্রহ্মকালী ছাড়া আর কোন

আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ ছিল না। শুধু একটি গাভী আর একটি চন্দনা পাখী ছাড়া আর কোন দায় ছিল না। বয়স পঞ্চাশ পার হওয়ায় দেহখানিকে সুদৃঢ় রাখিবার অভিপ্রায়ে সরকার মহাশয় নিয়মমাত্রায় অহিফেন সেবন করিতেন। গাভীটি পয়স-প্রদান দ্বারা অহিফেনের মৌতাত রক্ষা করিত, পাখীটি তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ বুলি শুনাইত। আর নৃত্যকালী তাঁহাকে বাঁধিয়া খাওয়াইত, গরুর সেবা করিত, পাখীকে ছোলা খাওয়াইত, আর অবসরমত ধোপদস্ত থান-কাপড় পরিয়া, মাথায় খোঁপা বাঁধিয়া, ঠোঁটের আগায় হাসি লইয়া পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। শুধু ঘুরিয়া বেড়াইত না, ঘোষেদের বায়ের দোষ-গুণ বোসেদের বাড়ীতে এবং বোসেদের বায়ের দোষ-গুণ চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতে সমালোচনা করিয়া আপনার সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিত।

নৃত্যকালী ষোল বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। এখন তাহার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। যৌবনের শেষ প্রান্তে পদার্পণ করিলেও কিন্তু নৃত্যকালীর যৌবননদীতে এখনও ভাটার টান একটুও পড়ে নাই। সে পেড়ে কাপড় অনেক দিন ছাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বেশ মিহি ধোপদস্ত থান পরিত, সীথায় সিঁদুর দিত না, কিন্তু পেটি পাড়িয়া প্রত্যহ চুল বাঁধিত, কপালে টিপ পরিত না, কিন্তু নাসাগ্রে বেশ সূক্ষ্ম একটি রসকলি কাটিত, মাছ খাইত না, কিন্তু তাম্বুলরসে অধর রাঞ্জত করিয়া রাখিত। একাদশীতে উপবাস করিত, কিন্তু নির্জ্জলা নহে, ফলমূল বা গুড়-মুড়ি খাইত। পরপুরুষের সহিত হাসিয়া কথা কহিত না, কিন্তু কথা কহিবার সময় চোখের তারার মধ্যে যেন একটু বিদ্যুৎ খেলিত। তাহার চরিত্রের উপর এ পর্য্যন্ত কেহ দোষারোপ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু লোকে যেন তাহাকে কেমন একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিত।

কন্যার সম্বন্ধে কেহ কোন সন্দেহের আভাস প্রকাশ করিলে সরকার মহাশয় জোরে মাথা নাড়িয়া বলিতেন, "না না, আমার নেত্য তেমন মেয়ে নয়। সে হরিনাম না ক'রে জল গ্রহণ করে না।" নৃত্যকালী পিতার নিকটে হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

"সরকার মশায় বাড়ীতে আছেন? সরকার মশায়!"

সরকার মহাশয় তখন বাড়ীতে ছিলেন না। নৃত্যকালী ঘরের দাবায় দাঁড়াইয়া পাখীটাকে আদর করিতেছিল। সে বাঁ-হাতে দাঁড় ধরিয়া ডান-হাতটা আস্তে আস্তে পাখীর মাথায় বুলাইতেছিল। পাখীটা ঘাড়টি ঈষৎ হেলাইয়া, তাহার রাঙ্গা ঠোটের উপর নিজের রক্তিম ঠোঁ টটি রাখিয়া কি এক অপূর্ব্ব সুখের আবেশে চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়াছিল। এমন সময় বাহির হইতে অমূল্যচরণ ডাকিল, "সরকার মশায় বাড়ীতে আছেন? সরকার মশায়!"

চমকিত হইয়া নৃত্যকালী উত্তর দিল, "কে গা?"

পাখীটা ডাকিয়া উঠিল, ক্যাঁ ক্যাঁ।

উত্তর পাইবার পরে অমূল্যচরণ বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াছিল, নৃত্যকালীর অঙ্গবস্ত্র অনেকটা স্থানচ্যুত হইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহা সামলাইয়া লইল। অমূল্য উঠানের মাঝখানে আসিয়াই থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিল, "সরকার মশায় বাড়ীতে নাই?"

নৃত্যকালী পাখীর দাঁড়টা ছাড়িয়া দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, তিনি হুগলী গেছেন।"

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরবেন কখন?"

নৃত্যকালী বলিল, "কি তে বোধ হয় সন্ধ্যা হবে। কেন গা?"

"একটু দরকার ছিল" বলিয়া অমূল্য মাথা চুলকাইতে লাগিল। নৃত্যকালী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি গোকুল-ঠাকুরের ভাই না?"

অমূল্য নত-মস্তকে উত্তর দিল, "হাঁ।"

নৃত্যকালী বলিল, "বসবেন কি? বসুন না।"

নৃত্যকালী সম্মুখের আলনা হইতে একখানা ক্ষুদ্র কম্বলাসন লইয়া পাতিয়া দিল। অমূল্য বসিবে কি পলাইবে, স্থির করিতে না পারিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু নৃত্যকালী পুনরায় যখন মৃদু হাসিয়া "বসুন না" বলিয়া বসিতে অনুরোধ করিল, তখন সে না বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে আসিয়া থপ করিয়া আসনের উপর বসিয়া পড়িল। নৃত্যকালী জিজ্ঞসা করিল, "আপনি না কলকেতায় চাকরী করেন?"

অমূল্য মুখ নীচু করিয়াই উত্তর দিল, "হাঁ।"

নৃত্য। আজ যে তবে বাড়ীতে আছেন?

অমূ। আজ আমাদের মহরমের ছুটী।

নৃত্য। সে তো মুসলমানদের পরব। তাতে আপনাদের ছুটী কেন?

অমূ। ইংরাজ, মুসলমান, হিন্দু সকলের পরবেই ছুটী পাওয়া যায়।

সহাস্যে নৃত্যকালী বলিল, "বেশ তো আপিস!"

অমূল্য কোন উত্তর করিল না। নৃত্যকালী তখন সে আপিসে কত মাহিনা পায়, তাহার ছেলে-মেয়ে কয়টি, স্ত্রীর বয়স কত, বড় ভাই গোকুলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দেখিতে কেমন, তাহার স্বভাব-চরিত্র কিরূপ, গোকুল বোয়ের বাধ্য কি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিয়া অমূল্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অমূল্য প্রথমটা সলজ্জভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। ক্রমে লজ্জা ভাঙ্গিয়া আসিল। তখন সে বেশ সোজা হইয়া বসিয়া মুখ তুলিয়া সহজ কণ্ঠে নৃত্যকালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। নৃত্যকালী তাহাদের সংসারের সব খুঁটিনাটি কথা জানিয়া লইয়া বলিল, "তা হ'লে আপনি এখন আসুন, সন্ধ্যার পর এলে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।"

অমূল্য উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে মনের ভিতর কেমন যেন একটা গোলযোগ লইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে নৃত্যকালী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "ছোকরার মতলবখানা কি? ভায়ের সঙ্গে পৃথক্ হবে; বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কুমতলব আছে।"

পাখীটা দাঁড় হইতে ঝুলিয়া পড়িয়া দুলিতে দুলিতে কঠোর স্বরে ডাকিল, "ক্যাঁ ক্যাঁ।" নৃত্যকালী পাখীটার দিকে তীব্র ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিল।

সন্ধ্যার পর অমূল্য আসিয়া সরকার মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইল। সরকার মহাশয় তখন হুগলী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক হরিনামে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিনামে মন থাকিলেও কাজের কথা কহিতে কোন বাধা নাই। জপ মনের জিনিস, আর কথাবার্ত্তা মৌখিক। মন চাঙ্গা থাকিলে সকলই হয়। সুতরাং তাঁহার হাতের মালা যেমন ঘন ঘন ঘুরিতে লাগিল, অমূল্যচরণের সহিত কাজের কথার পরামর্শও তেমনই অবিরামভাবে চলিল। নৃত্যকালী আড়ি পাতিয়া এই গুপ্ত পরামর্শের রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পরামর্শটা এত মৃদুস্বরে হইতেছিল যে, সে দলীল, টাকা, গোকুল, এইরূপ ছাড়া ছাড়া দুই একটা কথা ভিন্ন আর কিছু শুনিতে পাইল না।

অমূল্য পরামর্শ শেষ করিয়া চলিয়া গেলে সরকার মহাশয় জপ সমাপন করিয়া উঠিয়া আসিলেন। নৃত্য-কালী পিতাকে ভাত দিয়া পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও গোকুল ঠাকুরের ভাই নয়?"

সরকার মহাশয় উত্তর দিলেন, "হাঁ।"

নৃত্য। কেন এসেছিল বাবা?

সরকার। একটু কাজ ছিল।

নৃত্যকালী একটু রাগিয়া বলিল, "কাজ না থাক্‌লে কি কেউ বেকার আসে? কাজটা কি?"

মৃদু হাসিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "রাগ করিস্ কেন? এমন কিছু ভারী কাজ নয়, গোকুল পৃথক হচ্ছে কি না, তাই বিষয়টা যাতে ন্যায্যমতে ভাগ-বখরা হয়, তারি জন্যে আমাকে অনুরোধ করতে এসেছিল।"

নৃত্যকালী বলিল, "তা বাবা, তুমি না ভাগ-বখরা ক'রে দিলে কি ন্যায্যমতে ভাগ হবে না?"

সহাস্যে সরকার মহাশয় বলিলেন, "হ'লে কি আমার কাছে আসে? এখন ঘোর কলিকাল। এখন কি আর লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় আছে? ফাঁকি দিতে পার্‌লে কেউ ছাড়ে না। হরি হে, তুমিই সত্য!"

নৃত্যকালী বুঝিল, পিতা কথাটা গোপন করি-লেন। সে যেন একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সন্ধ্যার অল্পপূর্ব্বে নৃত্যকালী যখন সদর-দরজার বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তখন গোকুল সেই পথে কাছারী হইতে ফিরিতে-ছিল। গোকুল তাহার সন্নিহিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে দাঁড়িয়ে যে নেত্য?"

নৃত্যকালী বলিল, "তোমার সঙ্গে দেখা করব ব'লে।"

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "হঠাৎ আমার এতটা সৌভাগ্য হ'ল কেন?"

নৃত্যকালী গম্ভীরভাবে বলিল "তোমায় গোটা-কতক দুর্ভাগ্যের কথা শোনাবার জন্য। একবার বাড়ীতে আসবে?"

গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা কোথায়?"

নৃত্য। ভবানীপুরে গিয়েছেন।

গোকুল নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

নৃত্যকালী একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই, আমি তোমাকে যাদু ক'রে ফেল্‌ব না। আর নেহাৎ যদি সে ভয় হয়, তবে চ'লে যাও।"

"না, চল" বলিয়া গোকুল নৃত্যকালীর পশ্চাৎ বাড়ীতে ঢুকিল, নৃত্যকালী তাহাকে বসিতে আসন দিল। গোকুল আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা কি নেত্য?"

নৃত্যকালী বলিল, "একটু ঠাণ্ডা হও না, বল্‌ছি।"

গোকুল বলিল, "আমি ঠাণ্ডাই আছি, তুমি কি বল্‌বে বল।"

নৃত্যকালী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটা সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বল্‌ছিলাম, আমি তোমায় ভালবাসি।"

গোকুল ভ্রূকুটি করিয়া উঠিতে গেল। নৃত্যকালী তখন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "রক্ষা কর গো ঠাকুর, রক্ষা কর, আমি তোমার মত অরসিক লোককে একটুও ভাল-বাসি না, বরং ঘৃণা করি, চক্ষুঃশূল মনে করি।"

গোকুল তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তুমি পাপিষ্ঠা।"

নৃত্যকালী পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি পাপিষ্ঠা, আমি সয়তানী, আমি পোড়াকপালী, হতভাগী, পোড়ারমুখী। এখন ধর্ম্মঠাকুর, দয়া ক'রে আমার কথা কটা শুনে যাও।"

সহাস্যে গোকুল বলিল, "ছি নেত্য, এখনও তুমি সেই ছেলেমানুষ।"

নৃত্যকালী বলিল, "তাই আশীর্ব্বাদ কর ঠাকুর মশায়, আমি যেন চিরকাল ছেলেমানুষই থাকি, আমার যেন চুল না পাকে, দাঁত না পড়ে, (আপনার দেহের দিকে লক্ষ্য করিয়া) এমন গোলগাল দেহখানির মাংস কুঁচকে কোমর ভেঙ্গে যেন ডাইনী বুড়ী না সাজতে হয়।"

গোকুল হাসিয়া বলিল, "ভাল, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরযৌবনা কুন্তী হয়ে থাকবে।"

মুখে কাপড় চাপা দিয়া নৃত্যকালী গোকুলের পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া একটা গড় করিল। গোকুল বলিল, "সাবিত্রী সমান হও। এখন কথাটা কি বল দেখি?"

নৃত্যকালী তাহার পাশে একটু ব্যবধানে চাপিয়া বসিল। তার পর হাসি চাপিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি নাকি দ্বিতীয় পক্ষের ভেড়া হয়েছ শুন্‌ছি?"

গোকুল সহাস্যে বলিল, "তুমি মিথ্যা শোন নি।"

নৃত্য। সেই দ্বিতীয় পক্ষের হুকুমে ভায়ের সঙ্গে পৃথক হবে।

গো। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

নৃত্য। কোন্‌টা? পৃথক হওয়া?

গো। না, দ্বিতীয় পক্ষের হুকুম।

নৃত্য। তবে পৃথক্ হবে কেন?

গো। আমার নিজের খেয়াল।

নৃত্য। বিশ্বাস হ'লো না ঠাকুর মশায়।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া গোকুল বলিল, "তুমি বিশ্বাস না করলে আমার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার কথায় তুমি অবিশ্বাস করতে শিখলে কত দিন হ'তে?"

নৃত্যকালী রুক্ষ স্বরে বলিল, "যত দিন হ'তে তুমি ভাইকে ফাঁকি দিতে শিখেছ।"

গোকুল কঠোর দৃষ্টিতে নৃত্যকালীর মুখের দিকে চাহিল। নৃত্যকালী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমাকে রাগে ভস্ম করলে কি হবে, গ্রাম শুদ্ধ লোককে—নিজের ভাইকে পর্য্যন্ত ভস্ম করতে পারবে কি?"

গোকুল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর নৃত্যকালীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "ব্যাপার কি নিতু?"

তখন নৃত্যকালী অমূল্যর আগমন, তাহার নিকট গোকুলের বিরুদ্ধে কুৎসাকীর্ত্তন, পিতার সহিত গুপ্ত পরামর্শ একে একে সকল কথাই বলিল। শেষে সে বলিল, "দেখ, অমূল্য নিশ্চয়ই তোমাকে বিপদে ফেল-বার চেষ্টায় আছে, তুমি সাবধান হও।"

গোকুল শুনিয়া হাত দিয়া কপালটা টিপিয়া ধরিল। একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।"

ক্রুদ্ধস্বরে নৃত্যকালী বলিল, "বিশ্বাস না হয়, ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবে। আমার যা কর্ত্তব্য, তাই করলাম। পার, সাবধান হয়ো।"

গোকুল বলিল, "সাবধান হয়ে কি করবো? অদৃষ্টে বিপদ থাকে ঘটবে। তার জন্য তোমার এত ভাববার কিছুমাত্র দরকার ছিল না নিতু।"

নৃত্যকালী বসিয়াছিল, সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, রাগে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "অন্যায় হয়েছে, ঝকমারী করেছি, আর কক্ষণো ভাবব না।"

তাহার ক্রোধদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া গোকুল সহাস্যে বলিল, "রাগ করলে?"

নৃত্যকালী দুই হাতে চোখ ঢাকিল। গোকুল বলিল, "ছি', নিতু, আবার ছেলেমানুষি।"

নৃত্যকালী কোন উত্তর দিল না। গোকুল উঠিয়া দাঁড়াইল, শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "রাগ ক'রো না নিতু, তোমার কথা আমার মনে থাকবে।"

"সরকার মহাশয়।"

অমূল্য আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। গোকুল একবার তাহার দিকে চাহিয়াই পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। অমূল্য স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চোখ হইতে হাত সরাইতেই নৃত্যকালী সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে অমূল্যকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

উত্তর হইল,—"আমি অমূল্যচরণ।"

ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে নৃত্যকালী বলিল, "এখানে কেন?"

অমূল্য বলিল, "আসতে কি নাই?"

চড়া গলায় নৃত্যকালী বলিল, "না। এখন বাবা ঘরে নাই।"

মৃদু হাসিয়া অমূল্য বলিল, "এতক্ষণ কি তিনি ঘরে ছিলেন?"

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে নৃত্যকালী বলিল, "তুমি বেরিয়ে যাবে কি না বল

অমূল্য আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না, ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। নৃত্যকালী তখন পা ছড়াইয়া দাবার উপর বসিয়া পড়িল। ঘরে যে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে হইবে, সে কথাটাও তাহার মনে রহিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বামুনের ছেলে আর সদ্গোপের মেয়ে। বয়সে চার পাঁচ বৎসরের মাত্র তফাৎ। এক পাড়ায় বাড়ী, দু'জনে প্রায় একসঙ্গেই থাকিত, একসঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইত, জাতিভেদের কথা তখন মনেও আসিত না। গোকুল গাছে উঠিয়া আম পাড়িত, নৃত্য তলায় থাকিয়া তাহা কুড়াইত। তার পর দুই জনে ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া ফেলিত। গোকুল পুকুরে সাঁতার দিত, নৃত্য গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া স্তব্ধনয়নে তাহা দেখিতে থাকিত। নৃত্য বালির ভাত, খোলায় চচ্চড়ি, ইটের সুক্ত রাঁধিত, গোকুল তাহা খাইবার ভান করিয়া মহানন্দ প্রকাশ করিত। নৃত্য কাঁচা আম ছাড়াইয়া নুন-লঙ্কা মাখিয়া গোকুলকে আনিয়া দিত, গোকুল স্তব্ধ মধ্যাহ্নে আম-গাছের ছায়ায় বসিয়া সেই উপাদেয় খাদ্য উদরসাৎ করিতে করিতে নৃত্যর হাতের প্রশংসা করিতে থাকিত। বাপের কাছে গাল-বকুনি খাইয়া নৃত্য কাঁদিত, গোকুল যত্নে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিত।

চড়া দরে বিকাইবার জন্য সরকার মহাশয় মেয়েকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, নৃত্যর বয়স যখন প্রায় পনরো, তখন তিনি সাড়ে ছয় শত টাকা মূল্য পাইয়া মেয়েকে চতুর্থ পক্ষ ষষ্ঠীদাস হাজরার হাতে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। নৃত্য কাঁদিয়া গোকুলকে বলিল, "না গোকুল, তোমাকে ছাড়া আর আমি কাউকে বিয়ে করব না।"

গোকুল তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "দূর পোড়ারমুখী, তুই যে শূদ্রের মেয়ে, আর আমি বামুন।"

নেত্য রাগিয়া বলিল, "ভারী তো বামুন। তবে আমি মোটেই বিয়ে করব না।"

গোকুল বলিল, "তা হ'লে আমি দেশত্যাগী হব কিন্তু

রাগে চোখ ঘুরাইয়া নৃত্য বলিল, "তবে তো আমার বয়েই গেল।"

কথা শেষ করিয়াই নৃত্য দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গোকুল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "ছি নিতু, এ সব কি পাগলামী। তুই বিয়ে করতে চাস্ না, কিন্তু এই যে আমি বিয়ে করবো।"

নৃত্য চমকিতভাবে বলিয়া উঠিল, "বিয়ে করবে?"

গোকুল মাথা নাড়িয়া সহাস্যে বলিল, "কেন করবো না ?"

নৃত্য কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমাকে ভালবাস না, না ?"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া গোকুল বলিল, 'এ টুও না।"

নৃত্য। সত্যি ?

গো। সত্যি।

নৃত্য। মা কালীর দিব্যি ?

গো। মা কালীর দিব্যি।

নৃত্য। আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে বল।

গোকুল হাসিয়া বলিল, "তুই শুদ্দুর, আমি বামুন, তোকে ছুঁয়ে বল্‌তে আমার ভয় কি ?"

নত্য বলিল, "তবে তোমার পৈতে ছুঁয়ে বল।"

গোকুল দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আপনার উপবীত জড়াইয়া ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি তোকে ভালবাসি না।"

তার পর আঙ্গুলের পৈতা খুলিয়া নৃত্যর দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গোকুল বলিল, "এখন বিশ্বাস হ'লো তো ? না হয় বল্‌, আর কি দিব্যি করতে হবে।"

নৃত্য জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "চুলোয় যাও, কিন্তু যদি কখন তুমি আমার সাম্‌নে আস্‌বে, বা আমার সঙ্গে কথা কইবে, তবে তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নৃত্য চলিয়া গেল। গোকুল একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠীদাস হাজরার সহিত নৃত্যকালীর বিবাহ হইয়া গেল। তার পর শ্বশুরবাড়ী গিয়া নৃত্যকালী যখন ষষ্টিবর্ষীয় স্বামীর আদর-যত্নের আতিশয্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িল, তখন সে ভগবানের নিকট আপনার বৈধব্য কামনা করিতে লাগিল।

ভগবান্ তাহার প্রার্থনা শুনিলেন। এক বৎসরের মধ্যে ষষ্ঠীদাস যুবতী স্ত্রীকে ফেলিয়া শুধু অপূর্ণ কামনা লইয়া পরলোকে চলিয়া গেল। নৃত্যকালী হাতের শাঁখা-লোহা দূর করিয়া থান-কাপড় পরিয়া বাপের কাছে আসিল।

এখানে আসিবার পর অনেকবার তাহার সহিত গোকুলের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাতে কেহ কোন কথা বলে নাই। একবার গোকুল তাহার কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া শুধু আপনার অলঙ্কারশূন্য হাতটা উঁচু করিয়া দেখাইয়া একটু হাসিয়াছিল। গোকুল একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দ্রুত পলাইয়া গিয়াছিল। নৃত্যকালীর কিন্তু দীর্ঘশ্বাস, হা হুতাশ ছিল না; সে পূর্ব্ববৎ হাসিয়া খেলিয়া, গল্প করিয়া, পাড়া বেড়াইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। বিধবা হওয়ায় যে সে একটুও দুঃখিত বা কাতর হইয়াছে, ইহা তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিল না। সুতরাং লোকে তাহার সম্বন্ধে মনে মনে নানারূপ তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিল, কিন্তু প্রকাশ্য-প্রমাণের অভাবে কেহই মনের কথা বাহিরে প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল না।

নৃত্যকালীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা গেল না বটে, কিন্তু গোকুলের যেন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। যে দিন নৃত্য হাসিতে হাসিতে তাহার অলঙ্কারবিহীন হাতখানা গোকুলের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিয়াছিল, সেই দিন হইতে গোকুলের জীবনে যেন একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নৃত্যকালীর সেই শ্লেষপূর্ণ হাসিটুকু তাহার প্রাণে এমন তিক্তস্বাদ ঢালিয়া দিল যে, তাহাতে তাহার জীবনটা অসম্পূর্ণ অপদার্থ বলিয়া বোধ হইল, সংসারের সুখ দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ সকলই যেন উপেক্ষণীয় হইয়া আসিল। গোকুল আর এক নূতন মানুষ হইয়া উঠিল। গোকুলের এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের কারণ কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

শুধু নৃত্যকালীই ইহার কারণ বুঝিল, বুঝিয়া সে মনে মনে হাসিল। তাহা প্রতিহিংসার হাসি, কি আনন্দের হাসি, ইহা কিন্তু সে স্থির করিতে পারিল না।

এত কাল পরে আজ যেন সে সকল সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লইতে পারিল। হায় গোকুল! তাই না তুমি নৃত্যকে ভালবাস না ? ছি ছি, তুমি এত মিথ্যাবাদী!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিল। অন্ধকারে ঘর-দ্বার, গাছ-পালা সব ঢাকিয়া গেল। নৃত্যকালী উঠিল না, প্রদীপ জ্বালিল না, গাঢ় অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে সংজ্ঞাহীনার ন্যায় বসিয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাগের মাথায় গোকুল পৃথক হওয়াটাকে যত সহজ কাজ মনে করিয়াছিল, ক্রমে রাগটা কমিয়া আসিলে, উত্তেজনার তীব্রতার হ্রাস হইয়া পড়িলে সে ততই দেখিল, এই কাজটার অপেক্ষা কঠিন কাজ আর জগতে নাই, লোকে যে ভাই-ভাজদের সঙ্গে কেমন করিয়া পৃথক্ হয়, এখন সে তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল। ছি ছি রাগ না চণ্ডাল। এই রাগের বশে পৃথক্ হইতে উদ্যত হইয়াছিল ভাবিয়া গোকুল আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। অমূল্য ও পিসীমা তাহার ভাব দেখিয়া, আর কোন উচ্চবাচ্য না শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আর গোকুল সংসার ভাঙ্গিল না দেখিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল। সহসা সংসার ভাঙ্গিবার উত্তেজনাটা কেন যে তাহার মাথায় আসিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

সংসার ভাঙ্গিল না দেখিয়া গোকুল আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু তাহার এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। সহসা এমন একটা ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে পৃথক্ না হইয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

একদিন সহসা গোকুল শুনিল, তাহার সদাশয় প্রভু বৃদ্ধ ত্রিলোচন সিংহ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। পিতার মৃত্যুতে উপযুক্ত পুত্র দেবেন্দ্রনাথ জমীদারীর সুশৃঙ্খলা-বিধানে মনোযোগী হইলেন, এবং পুরাতন ঘুষখোর কর্ম্মচারীদের পরিবর্ত্তে নূতন নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে লাগিলেন। নবনিযুক্ত কর্ম্মচারীরা প্রভুর নিকট কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন মানসে পুরাতন কর্ম্মচারীদের ভ্রম-প্রমাদ, চুরী-জুয়াচুরী বাহির করিতে লাগিল। ইহার ফলে পুরাতন কর্ম্মচারীদের কেবল চাকরীই গেল না, অনেকে দেনদার হইল, অনেকে স্ত্রী-পুত্রের গহনা বিক্রয় করিয়া, জমীজায়গা বন্ধক দিয়া জমীদারের হিসাবের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। পুরাতন কর্ম্মচারিমহলে একটা ভয়ানক গোলযোগ বাধিয়া গেল।

গোকুলেরও হিসাবের তলব আসিল। গোকুল সেজন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সে দুর্গা স্মরণ করিয়া হিসাবের খাতাপত্র সদরে দাখিল করিল। কয়েক দিন পরে সে অনুসন্ধানে জানিল, হিসাবে তাহার সাত শত টাকা দেনা দাঁড়াইয়াছে। গোকুল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে শঙ্কিতচিত্তে ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিয়া অমূল্য ও পিসীমাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। পিসীমা শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে কি হ'ল রে! তোর সঙ্গে আমার অমূল্যও যে পথে বস্‌বে রে।"

গোকুল মাথায় হাত দিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল। অমূল্য পিসীমাকে চীৎকার করিতে নিষেধ করিয়া, অতঃপর উপায় কি তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন পরামর্শই যুক্তিসিদ্ধ হইল না, জমীদারের দেনার দায় হইতে জমীজমাগুলাকে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই দেখা গেল না।

অবশেষে অমূল্য বলিল, "এক কাজ কর দাদা, বিষয়-আশয় সব ভাগ ক'রে ফেল। তবু তো অর্দ্ধেক বিষয় বাঁচবে।"

গোকুল হতবুদ্ধির ন্যায় অমূল্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পিসী ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তাই কর্ গোকুল, দু'টো ভায়েই কেন পথে বস্‌বি?"

গোকুল কোন উত্তর দিল না, সে দুই হাতে মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অমূল্য পিসীমার কথা শুনিয়া গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে বলিল, "পথে আবার বসবে কে? কাউকেই পথে বস্‌তে হবে না। তারও সুন্দর যুক্তি আছে।"

পিসীমা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি যুক্তি রে অমূল্য, কি যুক্তি?"

অমূল্য তাঁহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া গোকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এক কাজ কর দাদা, এখনো তুমি প্রকাশ্যে দেনদার হওনি। তুমি নিজের অংশের দু'এক বিঘা জমী রেখে বাকী সব পিসীমার নামে বেনামী ক'রে ফেল। তা হ'লে আর তাতে কেউ দাঁত ফুটাতে পারবে না। লোকেও জানে, পিসীমার হাতে টাকা আছে, সাফ বিক্রয় কোবালা লিখে দাও।"

পিসীমা হর্ষোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিলেন, "ধন্যি তোর বুদ্ধি অমূল্য, লেখাপড়া না শিখলে কি এত বুদ্ধি ঘটে আসে?"

গোকুল কিন্তু একটুও আনন্দ প্রকাশ করিল না, সে বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু দেনা শোধ যাবে কিসে?"

অমূল্য বলিল, "কিসের দেনা ? দেনা তো মিথ্যা ! তুমি তো সত্যই আর চুরি কর নি।"

মুখটা উঁচু করিয়া গোকুল দীপ্তস্বরে বলিল,"একটা পয়সাও না। ধর্ম্ম জানেন, ঈশ্বর জানেন, মনিবের একটা পাই পয়সা আমার কাছে গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত।'

উৎসাহিত কণ্ঠে অমূল্য বলিল, "তবে আর কি, মিথ্যা দেনার জন্য তোমার এত ভয় কেন ?"

গোকুল বলিল, "দেনা মিথ্যা। কিন্তু লোকে যে দেনদার বলবে ?"

বিরক্তির সহিত অমূল্য বলিল, "লোকে বল্‌বে, তাতে হয়েছে কি ? কেউ যদি মিথ্যা ক'রে তোমার বিষয়টা কেড়ে নিতে আসে, তুমি ছেড়ে দেবে ?"

পিসীমা বলিলেন, "ওতে অমত করিস্ না, গোকুল, অমূল্য যা বলছে, তাই শোন্।"

অমূল্য বলিল, "কিন্তু দরী করলে হবে না, দেনা প্রকাশ পেলে আর বিক্রয় আইনসিদ্ধ হবে না। আজই চল, জমীজায়গা সব পিসীমার নামে রেজেষ্ট্রী ক'রে দিয়ে আসি তার পর কাল পৃথক হওয়া যাবে। আমার না হয় দু'দিন আপিস কামাই হবে।"

গোকুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমূল্য ও পিসীমার তাড়নায় গোকুলকে বেনামীতে সম্মতি দিতে হইল। সরকার মহাশয় লেখাপড়ার বয়নামা ঠিক করিয়া দিলেন। পিতৃস্বসা শ্রীমতী রাসেশ্বরী দেবীর নিকট সংসার-খরচা হিসাবে সাড়ে পাঁচ শত টাকা দেনা হওয়ায় এবং সে দেনা শোধের কোন উপায় না থাকায় গোকুল চক্রবর্ত্তী ও তস্য ভ্রাতা অমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী আপনাদের ব্রহ্মোত্তর ও খরিদা একুশ বিঘা সাত কাঠা জমীর মধ্যে চৌদ্দ বিঘা আঠার কাঠা জমী, খিড়কী পুষ্করিণী এবং বাগান সাত কাঠা তিন ছটাক রাসেশ্বরী দেবীকে সুস্থ-চিত্তে সরল অন্তঃকরণে এহাল তবিয়তে বিনানুরোধে বিনা কায়দায় বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিল।

সাবেক দেনা প্রমাণের জন্য সরকার মশাই দুইখানা পুরাতন হাণ্ডনোটও ঠিক করিয়া দিলেন। বিক্রয় কোবালা যথারীতি রেজেষ্ট্রী হইয়া গেল।

কাজ শেষ করিয়া দুই ভায়ে অপরাহ্ণে বাড়ীতে ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়া অমূল্য আহার করিতে গেল, গোকুল ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। সে দিন সে আর উঠিল না, কিছু খাইল না।

পরদিন সকালে অমূল্য পাড়ার পাঁচজনকে ডাকিয়া আনিল। গোকুল সকাতরে বলিল, "জমী-জমার তো কিনারা হয়েছে, এটা না হয় থাক্ অমূল্য।"

অমূল্য বলিল, "ভাবছ কেন দাদা গোলযোগ চুকে গেলে আবার এক হ'তে কতক্ষণ ?"

অগত্যা গোকুল আর কোন আপত্তি করিল না। তখন ঘর-ভিটা, বাসন-কোসন, এবং বিক্রয়াবশিষ্ট জমী সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। হাঁড়ী পর্য্যন্ত পৃথক্ হইল। ভাগ শেষ করিয়া মধ্যস্থেরা চলিয়া গেলেন। গোকুল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

অমূল্য স্নান করিয়া আসিয়া ভাতে বসিলে ছোট বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "বড়ঠাকুর আজ কি খাবেন পিসীমা ?"

পিসীমা বলিলেন, "তাই তো, আজ তো আর আলাদা হাঁড়ী হবে না। আজ না হয় এইখানেই খাব।"

অমূল্য মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ. অন্ততঃ আজকের দিনটা দাদার আলাদা রেঁধে খাওয়া দরকার। ভাগটা সাব্যস্ত হওয়া চাই।"

ছোট বৌ স্বামীর দিকে ভ্রূকুটিপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

গোকুল স্নান করিয়া আসিলে ছোট বৌ উনান ধরাইয়া দিল। গোকুল একটা পিতলের হাঁড়ীতে ভাতেভাত রাঁধিয়া নামাইল। তখন সূর্য্য মাথার উপর হইতে অনেকটা পশ্চিমে গড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বদিনের উপবাসে ক্ষুধায় গোকুলের সর্ব্বশরীর যেন ঝিম-ঝিম করিতেছিল। কিন্তু ভাতের কাছে বসিয়া সে এক মুঠা ভাতও খাইতে পারিল না। শুধু চোখের জলে ভাতগুলাকে ভিজাইয়া তাহা পুকুরের জলে ঢালিয়া দিয়া আসিল। তার পর ঘরে চাবী দিয়া কাছারীতে চলিয়া গেল।

কয়েক দিন পরে সদর হইতে গোকুলের ডাক আসিল। সেখানে গিয়া শুনিল, তাহার হিসাবে সাত শত তেত্রিশ টাকার গরমিল হইয়াছে। সাত দিনের মধ্যে তহবিল মিলাইয়া দিতে হইবে। নতুবা আইনসঙ্গত উপায়ে তাহা আদায় করা হইবে। গোকুল কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিল। তাহার স্থলে রামজীবনপুরের হরিশ হাজরা গোমস্তা নিযুক্ত হইল।

সাত দিনের মধ্যে গোকুল টাকার কোন কিনারাই করিতে পারিল না। তাহার নামে আদালতে নালিশ রুজু হইল, শমন আসিল। গোকুল মোকদ্দমার কোন

জবাব দিল না, মোকদ্দমা একতরফা ডিক্রী হইয়া গেল। জমীদার তাহার সমস্ত জমীজমা যায় ঘর-ভিটা পর্য্যন্ত ক্রোক দিলেন। অমূল্যচরণ রাসেশ্বরী দেবীর প্রতিনিধি হইয়া ক্রোকের বিরুদ্ধে ক্লেম দিল। সরকার মহাশয় মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। হাকিম দলিল-পত্র দেখিয়া ক্লেম মঞ্জুর করিলেন। অগত্যা জমীদারকে গোকুলের নিজস্ব সাড়ে তিন বিঘা জমী আর ভিটাটুকু নীলামে বেচিয়া লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইল। অমূল্যচরণ ধার করিয়া দুই শত টাকায় বেনামীতে নীলাম ডাকিয়া লইল। জমীদার বাকী টাকার জন্ত গোকুলের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন।

পিসীমা যুক্তি দিলেন, বড় বোয়ের গায়ে চার পাঁচ শো টাকার গহনা আছে। তাই বেচে জমীদারের দায় হ'তে মুক্ত হ'।

গোকুল শুনিয়া ভ্রূকুটি করিল। অমূল্য বলিল, "তুমিও যেমন পিসীমা, দাদা জেলে যাবে, তবু বোয়ের গয়নায় হাত দেবে না। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যে।"

পিসীমা বলিলেন, "হোক বাপু দ্বিতীয় পক্ষ, আর কেউ কি দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে না? না দায় অদায়ে স্ত্রীর গয়নায় হাত দেয় না? গয়নাগাঁটা কিসের তরে? অসময়ের জন্তই তো। গোকলো যেন অত্যন্ত করেছে।"

ছোট বউ স্বামীকে বলিল, "দেখ, না হয় দু'বিঘে জমী বেচে বড়ঠাকুরকে বাঁচাও। বড় ভাই জেলে যাবে?"

অমূল্য স্ত্রীর প্রতি একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সাত দিনের পর বাড়ী ফিরিয়া যোগেন্দ্রনাথ সকালে যখন চা খাইতে বসিয়াছিলেন, তখন সরকার সাত দিনের জমান চিঠির তাড়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। যোগেন্দ্রনাথ সাত দিন বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি ব্যবসায়ী মহাজন, ব্যবসায় উপলক্ষে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিং প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার নামের চিঠি বাড়ীতেই জমিয়াছিল।

পচিশ ত্রিশখানা চিঠি। যোগেন্দ্রনাথ এক হাতে চায়ের পেয়ালা, অপর হাতে এক একখানা চিঠি লইয়া তাহার শিরোনামার উপর চোখ বুলাইতেছিলেন। সহসা একখানা খামের উপরে পরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং ব্যগ্রভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া চিঠিখানা পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার হাতের সঙ্গে চিঠিখানা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চিঠিতে লেখা ছিল,—

"কল্যাণবরেষু,

ভাই যোগী, বোধ হয়, বছর সাতেক পরে তোমাকে চিঠি লিখছি। যে বছর তুমি জন্মের মত দেশত্যাগ কর, তার দু'বছর পরেই আমার প্রথমা স্ত্রী মারা যায়। সে আজ পাঁচ বছরের কথা। তা হ'লে ঠিক সাত বছরই বটে। যে দিন তুমি চ'লে যাও, সে দিন মনে করেছিলাম, জীবনে তোমার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখব না, তোমার সংবাদ পর্য্যন্ত নেব না। তাই তুমি মাঝে মাঝে চিঠি দিলেও আমি তার উত্তর দিই নাই, তোমার সব চিঠি পড়িও নাই। যে ধর্ম্ম ত্যাগ করলে, সমাজ ত্যাগ করলে, তার সঙ্গে আবার সম্বন্ধ। কিন্তু ভাই, মানুষের অহঙ্কার ভগবান্ চূর্ণ করেন, অভাবে অহঙ্কার চূর্ণ হয়। যার মুখ দেখব না ব'লে প্রতিজ্ঞা করি, তার শরণাপন্ন হ'তে হয়। আমারও অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। অভাবে প'ড়ে রাগ, অভিমান, গর্ব্ব, সকলি জলাঞ্জলি দিয়ে আজ সাত বছর পরে তাই তোমায় চিঠি লিখছি।

চিঠিখানা কোথায় ব'সে লিখছি জান? রামপুরের হাজতে ব'সে। চমকে উঠো না, ভয় নাই, আমি চুরি-ডাকাতি করি নাই, লোকের মাথা ফাটিয়ে হাজতে আসি নাই, এসেছি দেনার দায়ে। আমি জমীদারের কাছেই দেনদার। কখন এক পয়সা ভাঙ্গি নাই, তবু আমি সাড়ে সাত শো টাকার দেনদার। ভাই পৃথক হয়েছে, বেশীর ভাগ জমী-জায়গা পিসীমার নামে বেনামী ক'রে দিয়েছি। নিজের যা দু' এক বিঘা ছিল, তাহাত দু'শো টাকা শোধ গেছে। বাকী সাড়ে পাঁচ শো টাকার দায়ে হাজতে এসেছি। পরশু মোকদ্দমার দিন। বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয় জেলের হুকুম হবে। কত দিনের, তা হাকিমই জানেন।"

যোগেন বাবু ব্যগ্রভাবে চিঠির উপরের তারিখ দেখিলেন, আট দিনকার আগের তারিখ। চিঠিখানা

:ড়িয়া ফেলিয়া যোগেন্দ্রনাথ দুই হাতে কপালটা :পিয়া ধরিলেন।

একটু পরে আবার সোজা হইয়া বসিয়া চিঠিখানা কুড়াইয়া লইলেন, এবং তাহার অবশিষ্টাংশ পড়িতে লাগিলেন।

"জমী-জায়গা যা ছিল, তা বেচলে জেলে যেতে হ'ত না, কিন্তু ভাইটা পথে বসতো। তাই সেগুলো আগেই পিসীমার নামে লিখে দিয়েছি। মন্দ করেছি কি? দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছি। স্ত্রীর গায়ে চার পাঁচ শো টাকার গয়না ছিল, কিন্তু তাকে পথে বসাই কেন? আগে মনে হয়েছিল, জেলে যাব, তার আর ভয় কি? সংসারের চেয়ে জেলখানা কি বেশী ভয়ঙ্কর? কিন্তু আজ জেলের দরজায় পৌঁছে জেলটাকে খুব ভয়ানক বলেই মনে হচ্ছে, প্রাণে যেন কেমন আতঙ্ক আসছে। তাই আজ তোমাকে খবরটা না দিয়ে থাকতে পারলাম না। তুমি ছাড়া আর কাকে খবর দেব? এখনো তোমার উপর আমার রাগ যায় নি, এখনো আমি তোমাকে খুব ঘৃণা করি, তবু মনে হয়, তুমি ছাড়া সংসারে আমার বলতে আর কেউ নাই। এই ভয়ানক স্থান হ'তে যদি কেউ আমাকে উদ্ধার করতে পারে, সে তুমি। আমি তোমার পথ চেয়ে রইলাম। পরশু মোকদ্দমার দিন। এর ভেতর তোমার সাহায্য পাই ভাল, না পাই, তাতেও কোন আপত্তি নাই। কেন না, তখন জেলখানাটা আর এমন ভয়ানক থাকবে না, আমি হাসতে হাসতে জেলে যেতে পারব। ইতি

তোমার গোকুলদা।"

চিঠিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া যোগেন্দ্রনাথ উন্মত্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "গাড়ী! গাড়ী!"

সরকার ব্যস্তভাবে বলিল, "গাড়ী জুততে বলবো?"

ভ্রূকুটি করিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নাঃ। রামপুর যাবার গাড়ী। ক'টায় ট্রেণ আছে দেখ।"

সরকার তাড়াতাড়ি টাইম-টেবল খুলিয়া গাড়ীর সময় দেখিতে লাগিল। দেখিয়া বলিল, "তিনটে বিশ মিনিটে একখানা গাড়ী আছে।"

যোগেন্দ্রনাথ দুই হাতে চুল টানিতে টানিতে অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "তিন—টে? তার এ দিকে দেখ।"

কিন্তু তিনটার এ দিকে আর ট্রেণ ছিল না। অগত্যা যোগেন্দ্রনাথ আদেশ দিলেন, "ছ'শো টাকা নিয়ে তুমি প্রস্তুত হয়ে থাকবে। তিনটার গাড়ীতে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সরকার বলিল, "সাড়ে তিনটায় সময় বাড কোম্পানীর সাহেব মাল গস্ত করতে আসবে।"

চীৎকার করিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চুলোয় যাক মাল, চুলায় যাক সাহেব। টাকা আর তোমার ঠিক থাকা চাই।"

প্রভুর আদেশের উপর আর প্রতিবাদ করিতে সাহসী না হইয়া সরকার ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ অবনতভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া রহিলেন। অতীতের কত কথা, কত ঘটনা আসিয়া আজ তাঁহার স্মৃতির দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল।

সেই মাতুলালয়ে পালিত পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক! সেই মাতুলের তাড়না, প্রহার, মাতুলানীর তীব্র বাক্যবাণ! শৈশবে যৌবনের বার্দ্ধক্যের মধুর স্বপ্ন যে শৈশব—সেই শৈশবে একটি স্নেহহারা বালক স্নেহলাভের প্রত্যাশায় যখনই আকুল-হৃদয়ে চারিদিকে নেত্রপাত করিয়াছে, তখনই স্নেহের পরিবর্ত্তে কঠোর উৎপীড়ন আসিয়া তাহার কোমল হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, মমতার পরিবর্ত্তে শুধু তীব্র তাড়না, কঠোর তিরস্কার লাভ করিয়া কত দিন অনাহারে পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। উঃ, সেদিনের কথা মনে পড়িলে এখনও যোগেন্দ্রনাথের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

এত অযত্নে, এত অনাদরে কেহ বাঁচিতে পারে না। কিন্তু সে অনাথ বালক বাঁচিল। শুধু বিধাতার অদৃশ্য করুণার উপর নির্ভর করিতে হইলে বাঁচিত কি না সন্দেহ, কিন্তু সে করুণা মূর্তিমতী হইয়া এই উৎপীড়িত অনাদৃত অনাথ বালককে সযত্নে আপনার সুশীতল অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছিল। সে মূর্তিমতী করুণা গোকুলদার জননী।

তখন গোকুলদের অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু অর্থে কি আসে যায়? সেই দরিদ্রা রমণীর হৃদয়ে স্নেহের যে অমিয় ভাণ্ডার নিহিত ছিল, তাহা কুবেরের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মূল্যবান্, রত্নাকর অপেক্ষাও বিশাল। মাতুল-মাতুলানীর দ্বারা উৎপীড়িত অনাথ বালক সে ভাণ্ডারের দ্বারে আসিয়া কোন দিনই রিক্ত-হস্তে ফিরিয়া যাইত না, প্রাণ ভরিয়া স্নেহামৃত পান করিয়া

মাতৃস্নেহের অভাবজনিত ক্ষোভ দূর করিত। সেই দরিদ্রা রমণীর স্নেহপ্রদত্ত একটি মুঠা মুড়ি, একটু জল সেই অনাথ বালককে সুধার অপূর্ব্ব আস্বাদ প্রদান করিত। ইহার উপর গোকুলদার ভালবাসা। নিজের সহোদরের নিকটেও কি এত ভালবাসা পাওয়া যায়? গোকুলদা যখন আদর করিয়া যোগী বলিয়া ডাকিত, কোঁচড়ের এক মুঠা মুড়ির আধ মুঠা জোর করিয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিত, তখন এই দুঃখ-কষ্টময় নীরস সংসারটা মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে সরস প্রফুল্ল হইয়া উঠিত।

মাতুলের কিছুমাত্র আগ্রহ না থাকিলেও যোগেন্দ্রনাথ নিজের চেষ্টায় গ্রাম্যস্কুলে পড়িয়া এণ্ট্রান্স পাশ করিল। শুধু পাশ করিল না, দশ টাকা বৃত্তি পাইল। গোকুলদার পরামর্শে ও উৎসাহে সেই বৃত্তির টাকা সম্বল করিয়া সে কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিল। দশ টাকায় কলিকাতায় থাকিয়া পড়া চলে না। কিন্তু অধ্যবসায় ও উৎসাহের নিকট কিছুই আটকায় না। যোগেন্দ্রনাথ একটি প্রাইভেট মাষ্টারী যোগাড় করিয়া লইল। সে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা অনিলার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইল।

অনাদি বাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া যোগেন্দ্রনাথ শুধু বি এ পাশ করিল না, অনাদি বাবুর জামাতৃ-পদে বৃত হইয়া তাঁহার বিপুল সম্পত্তি ও ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইল। বিবাহের পূর্ব্বে গোকুলদার সহিত তাহার অনেক কথাকাটাকাটি তর্ক-বিতর্ক হইল। গোকুল তাহাকে ধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিতে অনেক নিষেধ করিল, কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ তাহা শুনিল না, সে গোকুলদার নিষেধ উপেক্ষা করিল, কিন্তু অনিলার গভীর অনুরাগকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। গোকুল রাগিয়া তিরস্কার করিল, গালাগালি দিল, যোগেন্দ্রনাথ সে সকলই হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তার পর সে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অনিলার পাণিগ্রহণ করিল, গোকুল স্বধর্ম্মত্যাগী সমাজদ্রোহী যোগেন্দ্রনাথের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিল।

গোকুল তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেও যোগেন্দ্রনাথ কিন্তু গোকুলদার সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিল না। সে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া তাহার সংবাদ লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু গোকুল তাহার পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দিল না। একবার যোগেন্দ্রনাথ গোকুলের বাড়ীতে আসিল, গোকুল তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। যোগেন্দ্রনাথ তাহাকে আপনার ব্যবসায়ের সাহায্যকারী করিয়া কথঞ্চিৎ ঋণ-পরিশোধের চেষ্টাও করিল, কিন্তু গোকুল তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল। যোগেন্দ্রনাথ হতাশচিত্তে ফিরিয়া আসিল।

এতকাল পর সেই গোকুলদা আজ তাহার সাহায্য-প্রত্যাশী হইয়াছে। আজ তাহার কি আনন্দ কিন্তু হায় গোকুলদা! আগে কেন সংবাদ দাও নাই? তুচ্ছ পাঁচ ছয় শত টাকার জন্য আজ তুমি জেলখানার অতিথি, আর তোমারই অন্নে—তামাদেরই স্নেহে প্রতিপালিত আমি লক্ষপতির আসনে। অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস!

অতীত স্মৃতির উচ্ছ্বাসে যোগেন্দ্রনাথ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

দশটা বাজিয়া গেল বাড়ী হইতে স্নানাহারের তাগাদা আসিতে লাগিল। যোগেন্দ্রনাথ উঠিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। অনিলা বলিল "আজ ক'দিন হ'তে বীরেনের জ্বর হচ্চে। কা'ল রাত থেকে জ্বরটা যেন বেশী। একজন ডাক্তার ডাকাও"

বিরক্তভাবে যোগেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "ডাক্তার ডাকালেই তো পার।"

অনিলা বলিল, "কে ডাকাবে? আমি?"

ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি তো হিঁদুর ঘরের পরদানশীন মেয়েমানুষ নও।"

স্বামীর মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অনিলা সরিয়া গেল।

তিনটার গাড়ীতে উঠিয়া পাঁচটার সময় রামপুরে পৌঁছিয়া যোগেন্দ্রনাথ অনুসন্ধানে জানিলেন, আজ চারিদিন হইল, গোকুল জেলে গিয়াছে। যোগেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইল, মুগুর মারিয়া নিজের মাথাটা ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

সে দিন আদালত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরদিন কাছারী না বসিলে গোকুলকে মুক্ত করা যাইবে না। ছি ছি, গোকুলদা দুই দিন আগে চিঠি লিখিল না কেন? যে দিন লিখিল, সেই দিনই বা তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন কেন? দুইটা দিন মাত্র দুইটা দিনের ব্যবধানে গোকুলদাকে জেলে ঢুকিতে হইল! সে কি বলিয়া গোকুলদার সম্মুখে দাঁড়াইবে? কোন্ লজ্জায় তাহাকে মুখ দেখাইবে?

যোগেন্দ্রনাথ একজন উকীল ঠিক করিয়া তাঁহাকে

দব বুঝাইয়া দিলেন। তার পর সরকারের কাছে টাকা রাখিয়া, তাঁহাকে যথাযথ উপদেশ দিয়া সেই রাত্রির ট্রেণেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। গোকুলকে মুখ দেখাইতেও তাঁহার লজ্জাবোধ হইল।

পরদিন সরকার কলিকাতায় পৌঁছিয়া সংবাদ দিল, গোকুল মুক্তি পাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ আশা করিয়াছিলেন, সরকারের সঙ্গে গোকুলদা আসিবে। কিন্তু গোকুল আসিল না। সরকার বলিল, "তাঁহাকে আসিবার জন্য অনেক অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আসিলেন না।" যোগেন্দ্রনাথ শুনিয়া ভ্রূকুটি করিলেন।

তিন চারি দিন পরে যোগেন্দ্রনাথ রেজেষ্টী ডাকে গোকুলের লিখিত একখানা সাড়ে পাঁচ শত টাকার হ্যাণ্ডনোট পাইয়া সেখানাকে বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বাপের বাড়ীতে আসিয়া পার্ব্বতী দিনকতক বেশ আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া দিল। কিন্তু দিনকয়েক পরে আমোদ যখন পুরাতন হইয়া আসিল, তখন তাহার মনটা শ্বশুরবাড়ীর জন্য স্বভাবতঃই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। আর কাহারও জন্য না হইলেও স্বামীর জন্য মনটা যেন কেমন করিয়া উঠিত। পার্ব্বতী ভাবিল, "এ আবার কি? যখন সেখানে ছিলাম, তখন তো তাহার সঙ্গে কথাই কহিতাম না। সাত দিন ঘরে না আসিলেও একটু ভাবনা হইত না। দূরে থাকিলেই বুঝি এমন হয়।" পার্ব্বতী আমোদে আহ্লাদে যোগ দিয়া চঞ্চল মনটাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মন কিন্তু কিছুতেই প্রফুল্ল হইল না, সকল কাজের মধ্যেই মাঝে মাঝে স্বামীর কথাটা এমন অতর্কিতভাবে মনের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইত যে, পার্ব্বতী মনের উপর না রাগিয়া থাকিতে পারিত না। তাস খেলিতে বসিয়া বিস্তী ডাকিতে ভুলিয়া যাইত, গল্প করিতে করিতে গল্পের খেই হারাইয়া ফেলিত, হাসিতে গিয়া ঠোঁট দিয়া হাসি বাহির করিতে পারিত না। পার্ব্বতী বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। যে স্বামীকে একটুও ভালবাসিতে পারে নাই, কথায় বার্ত্তায়, আকারে ইঙ্গিতে একটুও ভালবাসার চিহ্ন দেখায় নাই, তাহার জন্ত কেন যে এতটা অশান্তি, পার্ব্বতী তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রথম মাস কাটিয়া গেল, দ্বিতীয় মাসও যায় যায়। কিন্তু কেহই তাহাকে লইতে আসিল না তাহার একটা সংবাদ পর্য্যন্ত লইল না। পার্ব্বতীর অস্বস্তির সঙ্গে কেমন একটু যেন ভাবনাও হইল।

একদিন ভ্রাতৃবধূ জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই কি তোকে ভালবাসে না?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া পার্ব্বতী উত্তর দিল, "বল কি বৌ, আমি দ্বিতীয় পক্ষের ঘরণী, আমাকে ভালবাসবে না?"

ভ্রাতৃবধূ বলিল, 'তা হ'লে ভাই, তুই তো প্রায় দু মাস এসেছিস্ কৈ, ঠাকুরজামাই তো একবারও এলেন না।"

মাথাটা নীচু করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "কাজের লোক, কাজ-কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে বোধ হয় আসতে পারে নি।"

ভ্রাতৃবধূ হাসিয়া বলিল "আসতে না হয় না পারুলে, কিন্তু একখানা চিঠি লিখলেও তো পারে।"

পা। ওদের ওখানে স্ত্রীকে চিঠি লেখার রেওয়াজ নাই।

ভ্রাতৃ। তোকেই না হয় চিঠি লেখার রেওয়াজ নাই। তোর ভাইকে একখানা চিঠি লিখেও তো খবরটা নিতে পারতো?

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে পার্ব্বতী উত্তর করিল, "কি জানি।"

লজ্জায় পার্ব্বতীর মাথাটা যেন কাটা গেল। সত্যই তো, তাহার এত কি কাজ যে, সে একখানা চিঠি লিখিতেও সময় পায় না? সময় যথেষ্ট থাকিলেও বোধ হয়, চিঠি লেখাটা সে আদৌ আবশ্যক বোধ করে নাই। তাহার আবশ্যক না থাক, অন্ততঃ পার্ব্বতীকে লোকলজ্জার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যও তো একখানা চিঠি লেখা উচিত ছিল। তাহার লজ্জা, ঘৃণা, মান মর্য্যাদার ভয় কিছুই নাই, কিন্তু পার্ব্বতীর তো আছে। ছি ছি, কি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য অদ্ভুত মানুষ! আবার এই মানুষটার জন্তই পার্ব্বতীর মনের ভিতর অশান্তি আসে? পার্ব্বতীর ইচ্ছা হইল, সে এই অবাধ্য মনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

পিত্রালয়ে আসা অবধি যতীনের সঙ্গে পার্ব্বতীর মাঝে মাঝে দেখা হইত। যতীন হাসিতে হাসিতে তাহার কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। পার্ব্বতী সংক্ষেপে উত্তর দিত, "ভাল।"

দ্বিতীয় মাসও যখন যায় যায়, তখন পার্ব্বতী সহসা একদিন শুনিল, তাহার স্বামী পাঁচ শত টাকা দেনার দায়ে জেলে গিয়াছে। কথাটা শুনিয়া পার্ব্বতী যেন আকাশ হইতে পড়িল। জেলে গেল। পাঁচশো টাকার দায়ে জেল। জমী-জায়গা আছে, পিসীমার হাতে টাকা আছে। আর কিছু না থাক, তাহার গায়েই তো পাঁচ ছয় শো টাকার গহনা আছে। এগুলা বেচিলেও তো অনায়াসে দেনা শোধ হইতে পারিত। কিন্তু কৈ, কেহই তো গহনা চাহিতে আসিল না? চাহিলে পাইবে না, এই আশঙ্কাতেই কি চাহিতে আসিল না? কেন পাইবে না? ভাল না বাসিলেও স্বামী তো বটে। স্বামীকে জেল হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ত্রীর গহনা দেওয়া উচিত কি না, এ কর্ত্তব্য-বোধটুকুও কি পার্ব্বতীর নাই? চোর ডাকাতের মত জেলে গেল, তথাপি স্ত্রীর গহনা লইল না। তবে কি আমি তার কেউ নয়?

পার্ব্বতী আর ভাবিতে পারিল না, সে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল।

সংবাদটা আনিয়াছিল যতীন। যতীন কোর্টে কাজ করিত। সে পার্ব্বতীকে শুনাইয়া শুনাইয়া পার্ব্বতীর ভ্রাতাকে বলিতে লাগিল, "বুঝলে, নিমাইদা, লোকটা নেহাৎ নির্ব্বোধ। আমাদের উকীল বল্লে, যদি মোকদ্দমার একটু তদ্বির কর্‌তো, একটা উকীল দিত, তা হ'লে সব ফাঁক হয়ে যেতো। কিন্তু সে কিছুই কর্‌লে না, সুবোধ বালকটির মত চুপ ক'রে জেলে গেল।"

পার্ব্বতীর চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, "ওগো, সে নির্ব্বোধ নয়, মানুষ। সে অন্যায় অত্যাচার সহ্য কর্‌তে জানে, তার প্রতিবাদ কর্‌তে জানে না। সে কেন জেলে গিয়েছে, তা তোমরা জান না, আমি জানি। বড় দুঃখে, বড় অভিমানে আত্মহত্যা না ক'রে সে জেলে গিয়েছে।"

পার্ব্বতী ছুটিয়া আপনার ঘরে ঢুকিল, এবং দরজা বন্ধ করিয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

পাড়ার মেয়ে-মহলে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তাহারা সংবাদটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল, এবং পার্ব্বতীর এই গভীর দুঃখে সহানুভূতি জানাইবার জন্য একে একে বাড়ীতে আসিতে লাগিল। পার্ব্বতী কিন্তু তাহাদের সম্মুখে আসিল না। ভ্রাতৃবধূ সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় দিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে যতীন পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল, গোকুল কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছে। কে এক কলিকাতার বাবু—বোধ হয় বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় হইবে, আসিয়া দাবীর সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিয়াছে।

পার্ব্বতী মনে মনে সেই অজ্ঞাতনামা বাবুর উদ্দেশে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

ইহার পর আরও মাসাধিক কাল চলিয়া গেল, কিন্তু গোকুলের আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। পার্ব্বতী মনে মনে বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িতে লাগিল। ভ্রাতৃবধূ ননন্দার এই ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া, স্বামীকে বলিয়া পার্ব্বতীর শ্বশুর-বাড়ীতে একজন লোক পাঠাইয়া দিল। লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, জামাইবাবু বাড়ীতেই আছেন, কিন্তু যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। ভাই পৃথক হয়েছে। জামাইবাবু নিজেই রাঁধে বাড়ে, খায় দায়। শুনলুম, বড় কষ্টে পড়েছে, দিন চলা ভার। সে চেহারা নাই, কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা নাই, খায় আর ঘরের ভিতর উপুড় হয়ে প'ড়ে থাকে। সব দিন নাকি আবার খাওয়া-দাওয়াও হয় না।

সংবাদ শুনিয়া পার্ব্বতীর বুকের ভিতর ঢেঁকির পাড় পাড়িতে লাগিল। নিজে হাত পুড়িয়ে রাঁধে, খায়,তবু তো তাহাকে লইয়া যায় না? সে কি এতই পর? কষ্টে পড়েছে—হোক না কষ্ট, সে কি কেবল সুখের ভাগী, কষ্টের কেউ নয়? এই কি তাহার স্ত্রীর উপর বিশ্বাস—ভালবাসা?

স্বামীর উপর পার্ব্বতীর বড়ই রাগ হইল।

দিন কয়েক পরে অন্নদার একখানা পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে,—

"হাঁ বৌ, তুই নাকি এখনো বাপের বাড়ীতে? বাপের বাড়ীর ভাত কি এতই মিষ্টি? শুনলাম, অমূল্য পৃথক্ হয়েছে, দাদার কষ্টের সীমা নাই। এ খবর কি তুই পাস্ না? তুই মেয়েমানুষ, না রাক্ষসী? তোর অহঙ্কারটাই কি বড় হ'লো? কিন্তু ভগবান্ আছেন, তোর অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। তুই তা বুঝতে পারিস্ কি না, জানি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝেছি।

দাদার না কি শ'পাঁচেক টাকা দেনার দায়ে জেল হয়েছিল? তোর গায়ে এক-গা গয়না থাকতে দাদা জেলে গেল, অথচ দাদা তোর কাছে হাত পাতলে না, একটা খবর পর্য্যন্ত দিলে না। তবু তুই কিছুই বুঝতে পারিস্ না? তুই এতই কচি খুকীটি না কি? আমার তো মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

এখনো যদি ভাল চাস্, বাপের বাড়ীর মিষ্টি ভাতের মায়া ত্যাগ ক'রে তেতো ভাত খেতে ছুটে যাবি। নয় তো তোর বরাতে অনেক কষ্ট আছে। এ যদি না হয়, তবে আমার নাম অন্নদা বামনীই নয়। আমার উপর রাগ কর্‌বার আগে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়াটা ক'রে নিবি। ইতি—

তোর ঠাকুরঝি।"

চিঠি শুনিয়া ভ্রাতৃবধূ বলিল, "রাগ করিস না ঠাকুরঝি, তোর কিন্তু ভাই, এ সময়ে না যাওয়াটা ভাল দেখায় না।"

রাগে চিঠিখানা তাহার গায়ে ছুড়িয়া মারিয়া পার্ব্বতী বলিল, "যেতে হয়, তুমি যাও, আমি সেধে যেতে পার্‌ব না।"

অন্নদার তিরস্কারে,ভ্রাতৃবধূর মৃদু ভর্ৎসনায় পার্ব্বতী স্বামীর উপর আরও রাগিয়া উঠিল। ছি ছি, সে এমন কি দোষ করিয়াছে যে, তাহাকে ঘরে পরে লাঞ্ছনা দেয়? সে কি যাইতে চাহে না? তাহার নিকট কি কেহ গহনা চাহিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল? একজন ইচ্ছা করিয়া কষ্ট ভোগ করিবে, আর সে জন্য পার্ব্বতীকে লোকের গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে? ছি ছি, সে এমন স্বামীর হাতেও পড়িয়াছিল!

কিন্তু স্বামী যেমনই হউক, সে স্বামী! এ কথা পার্ব্বতী এক দিনে বুঝিল না, দুই তিন দিন অনেক রাগিয়া, অনেক কাঁদিয়া, অনেক ভাবিয়া এই সার সত্যটুকু যেন কথঞ্চিৎ হৃদয়স্থ করিল। তখন সে ভ্রাতৃবধূকে ধরিয়া বসিল, "আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দাও।"

পার্ব্বতী যে স্বামীর দুঃসময়ে তাহার সেবা করিবার জন্য যাইতে চাহিল, তাহা নয়, স্বামীকে বেশ দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া দিবার জন্য, একজনের দোষে অপরে কেন শাস্তি পায়, ইহাই বুঝাপড়া করিয়া লইবার জন্য সে যাইতে উৎসুক হইল; কিন্তু ইহার ভিতর আর একটা প্রবৃত্তি যে অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে প্রেরণা করিতেছিল, তাহা সে জানিতে পারিল না; নিজে জানিলেও অপরকে জানিতে দিল না।

যে জন্যই হউক, পার্ব্বতী একদিন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর পায়ে নমস্কার করিয়া, পাল্কীতে উঠিয়া স্বামিগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রায় তিন মাস পরে স্বামি-স্ত্রীর সাক্ষাৎ। সে সাক্ষাতে গোকুল একটুও ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না। তাহার মুখে যেমন উল্লাসের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, তেমনই ক্রোধেরও কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। এই তিন মাসে কত ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যেন কিছুই হয় নাই, বারো মাস যেমন চলে, তেমনই সাধারণভাবে চলিয়া আসিতেছে, গোকুলের এমনই ভাব দেখা গেল।

পার্ব্বতীর কিন্তু এ ভাবটা ভাল লাগিল না। সে স্বামীর সহিত বুঝাপড়া করিয়া লইতে আসিয়াছে। সাধারণভাব অপেক্ষা একটু অসাধারণভাব দেখিতে পাইলেই ভাল হয়। স্বামী তাহার উপর রাগ দেখাইল, সেও রাগিয়া স্বামীকে পাঁচ কথা শুনাইয়া দিল, তার পর রাগারাগি, কথা কাটাকাটি হইয়া একটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। মেঘ না কাটিয়া আরও বেশী জমে, ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রকৃতির এমন নীরব থমথমে ভাব, তাহা সম্পূর্ণ অসহ্য।

তিন চারি দিন কথাই হইল না। গোকুল যে কথা কহিল না, এমন নয়, কিন্তু সে নুণ-তেলের কথা, চাল-ডাউলের কথা, সাংসারিক কথা। আসল কথা যা, পার্ব্বতী যাহা চায়, সে কথার কোন উল্লেখ হইল না। পার্ব্বতী আর সহ্য করিতে পারিল না। স্বামী যখন কথা পাড়িল না, তখন সে নিজেই একদিন উপযাচক হইয়া কথা পাড়িল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি জেলে গিয়েছিলে?

গোকুল সহাস্যে উত্তর দিল, "হাঁ।"

পা। কেন?

গো। দেনার দায়ে।

পা। দেনা শোধের কি কোন উপায় ছিল না?

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "উপায় থাকতে কে জেলে যায় পারু?"

পার্ব্বতী কর্কশকণ্ঠে বলিল, "যার নেহাৎ পোড়া-কপাল, যার লজ্জা-ঘৃণা নাই, মান-মর্য্যাদার ভয় নাই, সেই যায়।"

গোকুল শঙ্কিত-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। পার্ব্বতী উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিল, "যার স্ত্রীর গায়ে পাঁচ ছ শো টাকার গয়না, সে যদি পাঁচ শো টাকার দায়ে জেলে যায়, তবে তার নেহাৎ পোড়া কপাল না কি?"

গোকুল সহজ প্রশান্ত স্বরে বলিল, "তোমার গয়নার কথা বল্‌ছো?"

পার্ব্বতী বলিল, "তা নয় তো কি রামীর মা'র গয়নার কথা বল্‌ছি?"

গোকুল বাঁ হাতটা মাথায় বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "গয়না—ও সব গয়না যে তোমার পারু?"

পা। তুমিই তো দিয়েছ?

গো। তোমাকে যখন দিয়েছি, তখন ও সব তোমার।

পা। আমার জিনিস কি তোমার নয়? আমি কি তোমার এতই পর?

মৃদু হাসিয়া গোকুল বলিল, "পর হ'তে যাবে কেন, তুমি আমার স্ত্রী।"

পার্ব্বতী রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিল, 'ঠিক তা মনে করলে আমার গয়না নিতে পারতে।"

গোকুল একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "কাছে থাক্‌লে কি হ'তো, বলা যায় না। তুমি কাছেও ছিলে না, তা ছাড়া—"

পা। তা ছাড়া আর কি?

গো। তা ছাড়া স্ত্রীর গয়না বেচে দেনা শোধ, সেটা কি ভাল হ'তো?

পা। তার চেয়ে জেলে যাওয়া খুব ভাল। তোমার মাথাটা খুব উঁচু হয়েছে, না?

গোকুল চুপ করিয়া রহিল। পার্ব্বতী বলিল, "কিন্তু লোকের কাছে আমার মাথা কাটা গেছে, তা জান?"

গোকুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ও সব কথা যেতে দাও পারু।"

পার্ব্বতী রুক্ষদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর জেল হ'তে খালাস পেলে কিসে?"

গো। দাবীর টাকা জমা দিতেই খালাস পেলাম।

পা। কে জমা দিলে?

গো। যোগী।

পা। যোগী কে?

গো। সে বাঁড়ুয্যেদের যোগী।

পা। টাকাটা খয়রাৎ করেছে, না ধার দিয়েছে?

গো। সে খয়রাৎ করেছে, আমি ধার ব'লেই নিয়েছি।

পা। তাকে খবর দিলে কে?

গো। আমিই চিঠি লিখেছিলাম।

পার্ব্বতীর গর্ব্বপ্রদীপ্ত মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য যেন কালি হইয়া গেল, বুকের ভিতর একটা জোর নিশ্বাস ঠেলিয়া উঠিল। কষ্টে তাহা চাপিয়া তীব্রকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "কোথাকার কে যোগী, তাকে চিঠি লিখতে পারলে, অথচ আমাকে কাকের মুখেও একটা খবর দিতে পারলে না।"

গোকুল বলিল, "তুমি মেয়েমানুষ, খবর দিলে শুধু ভাবতে।"

ভ্রূকুটি করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "মেয়েমানুষ শুধু ভাব্‌তেই জানে, আর কিছুই জানে না। তোমরা এমনই অকৃতজ্ঞ জাত বটে।"

স্ত্রীর রোষকঠিন মুখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে গোকুল বলিল, "তুমি কি এবার ঝগড়া করবার জন্যই কোমর বেঁধে এসেছ পারু?"

কঠোরস্বরে পার্ব্বতী উত্তর করিল, "না, শুধু জান্‌তে এসেছি, আমি তোমার কে?"

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গোকুল বলিল, "এইটুকু জান্‌বার জন্য এতটা কষ্ট ক'রে না এলেই পারতে।"

পার্ব্বতী বলিল, "না এলেই পারতাম? তা হ'লে আমার আসাটা কি অন্যায় হয়েছে?"

গো। ন্যায় কি অন্যায়, তা তুমিই জান।

পা। কিন্তু তুমি কি বল?

গো। আমি বলি, এ সময়ে না এলেই ভাল হতো।

পা। মন্দটাই কি হয়েছে?

গো। সময়টা বড় খারাপ, তোমার কষ্ট হ'তে পারে।

পা। কষ্টটা আমার, না তোমার?

গো। আমার আর কষ্ট কি?

পা। স্ত্রীর খাওয়া-পরা যোগান।

মুখ নীচু করিয়া গোকুল বলিল, "তা বটে।"

পার্ব্বতী চোখ কপালে তুলিয়া উদ্ধতস্বরে বলিল, "তা হ'লে এখন কি আমায় তাড়িয়ে দেবে ?"

গোকুল বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। পার্ব্বতী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "তুমি আন্‌তে যাও নাই, আস্‌বার কথাও বল নাই, তবু আমি সেধে এসেছি। এখন আমায় তাড়িয়ে দেবে কি না, তাই বল ?"

পার্ব্বতীর স্বরটা শুধু ক্রোধে ভরা ছিল না, তাহা অন্তনিরুদ্ধবাষ্পেও যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। গোকুল উঠিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া ধীর-কোমল-কণ্ঠে বলিল, "তুমি কি পাগল হ'লে নাকি ? তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী।"

হাতখানা ছিনাইয়া লইয়া পার্ব্বতী আবেগরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা। সত্য ক'রে বল, আমি তোমার কে, তুমি আমায় তাড়িয়ে দেবে কি না ?"

পার্ব্বতী আর থাকিতে পারিল না, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গোকুল প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অমূল্যচরণ আহার করিতে করিতে পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'নতুন গিন্নী নতুন সংসার কেমন চালাচ্ছে পিসীমা ?"

পিসীমা কাছে বসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে খাওয়াইতে-ছিলেন। তিনি সহাস্যে উত্তর করিলেন, "বেশ চালাচ্ছে। দিনরাত ঝগড়া, খিটিমিটি, বাড়ীতে কাক-চিল বস্‌বার যো নাই।"

ঈষৎ হাসিয়া অমূল্যচরণ বলিল, "ঝগড়া করে কে ? দাদা না কি ?"

পিসীমা বলিলেন, "হাঁ, দাদা ঝগড়া করবে ? কপাল আর কি। গিন্নী যা মুখে আসে, তাই বলে, আর হতভাগা মুখ বুজে সব সহ্য করে। যেন হাবা-বোবা। ধন্যি বেটাছেলে যা হোক্।"

অমূল্যচরণ একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "বল কি পিসীমা ?"

পিসীমা বলিলেন, "আমি কি মিথ্যে বলছি রে! হয় নয় ছোটবৌকে জিজ্ঞাসা কর। কেমন লা ছোট-বৌ ?"

ছোট-বৌ উনানের সম্মুখে বসিয়া ছেলের দুধ গরম করিতেছিল। সে ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদু-স্বরে উত্তর করিল, "কে জানে বাবু, আমি অত পরের ঝগড়ায় কান দিই না।"

মুখ ভার করিয়া পিসীমা বলিলেন, "কান আর কে দেয় বল বাছা, তবে কানে তো আর তুলো গুঁজে থাকা যায় না। এক ঘর, এক দোর, হাই তুললে শোনা যায়। তা নইলে আমার অমন পরের কথা শোনা, পরের চর্চ্চা করা স্বভাব নয়।"

অমূল্য বলিল, "কিন্তু আজ কৈ কিছু সাড়াশব্দ পাই না যে ?"

পিসী। গোকলো কি বাড়ী আছে যে, সাড়াশব্দ পাবি ?

অমূল্য। কোথায় গেছে ?

পিসী। বোধ হয়, কোথায় চাকরীর চেষ্টায় গিয়েছে।

ঈষৎ হাসিয়া অমূল্য বলিল, "চাকরী তো প'ড়ে আছে। যেমন বিদ্যের জাহাজ, তেমনি বুদ্ধির বৃহ-স্পতি। চাকরী হ'লেই হ'লো আর কি।"

পিসীমা বলিলেন, "তা বাছা, যেমন বিদ্যে, তেমনি চাকরী হবে। তাই ব'লে কি তোর মত সায়েবের আফিসে চাকরী পাবে ?"

অমূল্য একটু গর্ব্বের হাসি হাসিল। পিসীমা বলিতে লাগিলেন, "তা বাবু, আজ দু তিন মাস তো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর ভিতর কি আর একটা চাকরী জোটে না ? এ দিকে ঘরে তো আজ চাল নাই, কা'ল নুণ নাই, পরশু তেল নাই, দিন-রাত কেবল নাই নাই চলেছে।"

বাটির ঝোলটা পাতে ঢালিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে অমূল্য বলিল, "এখন নাই নাই কেন গো ? উনিই রোজগার করতেন, ওঁর রোজগারেই সংসার চল্‌তো, তবে দু'দিন না যেতে যেতেই আবার নাই নাই কেন ?"

পিসীমা মুখটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "কেন ? যে লক্ষ্মী ঘরে এসেছেন, তাতে আরো কি হয় দেখ। সংসার জুড়ে দেনা, গাঁয়ে হেন লোক নাই, যার কাছে ধার হয় নি। আমার তো গাঁয়ে মুখ দেখান ভার হয়েছে। এই সে দিন আবার আমাদের কাছে এক

সের চাল ধার নিয়ে গিয়েছিল। হাঁ ছোট-বৌ, সে চাল সেরটা দিয়ে গিয়েছে ?"

ছোট-বৌ বলিল, "কে জানে, মনে নাই।"

পিসী। মনে নাই কি লো ? মনে ক'রে চেয়ে নিবি।

ছোট। আমি চাইতে পারব না।

পিসীমা ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "শুন্‌লি রে অমূল্য, বড়মানুষের মেয়ের কথা। ধার দিয়ে উনি চেয়ে নিতে পারবেন না। তবু যদি বাপের কিছু থাক্‌তো।"

ছোট বৌ মৃদু অথচ তীব্রকণ্ঠে বলিল. "আমার বাপ বড়লোক নয় বটে, কিন্তু আপনার লোককে ঠকিয়ে বড়লোক হবার চেষ্টাও করে না।"

পিসীমা রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "শোন অমূল্য, এক রত্তি মেয়ের কথা শোন। আমি তোকে বলি না বাছা, কিন্তু না বল্‌লেও নয়। উনি একটু মৌটুস্‌কী, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে চাল-ডাল নুণ-তেল সব দিয়ে আসে।"

ছোট-বৌ উগ্রস্বরে বলিল, "মিথ্যে বলো না পিসীমা। আর যদিই দিই, তাতেই বা দোষ কি ? আপনার লোক তো ?"

অমূল্য ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে তুলিতে গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনার লোককে দিতে হয়, যে পারে, বাপের বাড়ী হ'তে এনে দান-খয়রাৎ করবে। আমার কষ্টের পয়সা কারো বাবার ধন নয়, এটা যেন মনে থাকে।"

ছোট-বৌ ঘোমটার পাশ দিয়া একটা তীব্র কটাক্ষ স্বামীর মুখের উপর নিক্ষেপ করিল, তার পর দুধের কড়াটা উনান হইতে তুলিয়া লইয়া ক্রোধকম্পিত-পদে ঘরে চলিয়া গেল। পিসীমা বলিলেন, "দেখছি, ওর কাছে দিনরাত থেকে থেকে সব শিখেছে।"

অমূল্য ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "যত পারে শিখুক. এক দিনের জুতোয় সব সোজা ক'রে দেব। আমি দাদা নই,—অমূল্যচরণ।"

পিসীমা তখন উচ্চকণ্ঠে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ওর দোষ নাই অমূল্য, পরের মন্ত্রণায় ওরকম হয়েছে। ছেলেমানুষ বই তো না। কিন্তু লোকেরই বা কি আক্কেল, ঐ একরত্তি মেয়েকে ফুস্‌লে সব ঠকিয়ে নেয়। খেতে না পাস্, ভিক্ষে করবি, পরকে ভুলিয়ে নিবি কেন ?"

অমূল্যচরণ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া বলিল, "যা হোক, তুমি একটু নজর রেখো পিসীমা।"

পিসীমা বলিলেন, "আমি আর কত দিকে নজর রাখব বল্। দুটো বই তো চোখ নাই। ঐ জন্যে নিজের ঘরে ভাঁড়ার করেছি, তা আমি কি দিন-রাত ঘর আগলে যকের মত ব'সে থাক্‌ব ?"

"ঘরে চাবি দিয়ে রেখো" বলিয়া অমূল্য আচমন করিতে গেল।

ঘরের ভিতর ছেলেটা তখন দুধ খাইতে গিয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছিল। ছোট-বৌ তাহার পিঠে কয়েক ঘা চড়-চাপড় বসাইয়া দিল। মেয়েমানুষ অপরের উপর রাগিলে আপনার ছেলে ঠেঙ্গাইয়া তাহার শোধ লইয়া থাকে, ইহাই সনাতন রীতি। ছোট বৌও এই সনাতন রীতির অবমাননা করিল না। মার খাইয়া ছেলে আরও কাঁদিতে লাগিল। পিসীমা চীৎকারে বাড়ী ফাটাইয়া ছোট-বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতীরও পিতৃকুলের দোষ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিষয়-আশয়, ঘর-দ্বার ভাগ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাড়ীটা একই ছিল, তখনও মাঝে পাঁচীল উঠে নাই। এক ঘরে একটু জোরে কথা কহিলে অন্য ঘর হইতে তাহা স্পষ্ট শুনা যাইত। সুতরাং অমূল্যচরণের রান্নাঘরের সকল কথাই পার্ব্বতীর কানে গেল, পার্ব্বতী শুনিয়া অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া আপনার রান্নাঘরে ঢুকিল।

রান্নাঘরে গিয়া পার্ব্বতী চালের হাঁড়ী বাহির করিল। দেখিল, তাহাতে সেরখানেক মাত্র চাউল আছে। পার্ব্বতী হাঁড়ী উপুড় করিয়া সেগুলা আপনার আঁচলে ঢালিল। আঁচলে চাউল ঢালিয়া সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এই চাউলগুলিই আজকার সম্বল। এগুলি দিয়া ধার শোধ করিলে কি খাওয়া হইবে ? পার্ব্বতী ভাবিল, 'দূর হউক খাওয়া, উপবাস দিব, তথাপি কথা সহ্য করিতে পারিব না।' কিন্তু উপবাস তাহাকে একা দিতে হইবে না, আর একজনকেও উপবাস দিতে হইবে। সে সকালে উঠিয়া বাসিমুখে বাহির হইয়া গিয়াছে। সারাদিন ঘুরিয়া ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত্ত দেহে যখন ফিরিয়া

আসিবে, তখন তাহাকে কি খাইতে দিবে? পার্ব্বতীর বুকটা বড় জোরে কাঁপিয়া উঠিল, চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্তব্ধভাবে ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন পিসীমার তীব্রকণ্ঠস্বর স্পষ্ট আসিয়া কানে বাজের মত ঠেকিতেছিল। পার্ব্বতী ভাবিল, "দূর হউক, যা কখন সহ্য করি নাই, আজ তা সহ্য করিতে পারিব না। সামান্য এক সের চাউল, তাহার জন্য এত শক্ত কথা শুনিব?" পার্ব্বতী ধার শোধ করিতে চলিল।

কিন্তু দরজার কাছে আসিতেই তাহার পা দুইটা যেন বড় জোরে কাঁপিতে লাগিল, ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত স্বামীর মলিন মুখখানা যেন ছবির মত তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। পার্ব্বতী আর অগ্রসর হইতে পারিল না, সে দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সে যে বড় নিরীহ ভালমানুষ, সে রাগ জানে না, তিরস্কার জানে না, জানে শুধু নীরবে সহ্য করিতে। সেই মানুষ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অধীর হইয়া যখন খাইতে চাহিবে, তখন পার্ব্বতী কি দিয়া তাহার ক্ষুধা দূর করিবে? তখন কি সে তাহাকে বলিবে, আজ ক্ষুন্নিবারণের কোন উপায় নাই, আমার গর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া আমি আজিকার শেষ সম্বল দিয়া আমার অহঙ্কার অভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি, তুমি উপবাস দাও। সে হয় তো তাহাই করিবে, একটুও বিরক্তি দেখাইবে না, একবিন্দু ক্রোধ প্রকাশ করিবে না, সহাস্য-মুখে উপবাস দিবে। কিন্তু পার্ব্বতী—পার্ব্বতী তাহা সহ্য করিবে কিরূপে? ওঃ ভগবান্! তুমি মেয়েমানুষকে যখন স্বাধীনতা দাও নাই, তখন অহঙ্কার দাও কেন?

পার্ব্বতী আঁচলের চাউল হাঁড়ীতে ঢালিয়া রাখিল এবং দ্রুতপদে ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কিন্তু আজ তাহাকে কি লাঞ্ছনাই সহ্য করিতে হইয়াছে! ইহা কি শুধু স্বামীর অক্ষমতার জন্যই নয়? স্বামীর যদি একটুও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সামান্য এক সের চাউলের জন্য সে কি এত লাঞ্ছনা, এমন অপমান সহ্য করে! ধিক্ এই স্বামীকে! আর পার্ব্বতী কি না এই অক্ষমের জন্য এত শক্ত কথা জীবনে এই প্রথম শুনিল, শুনিয়াও সে তাহার খাইবার সম্বল রাখিয়া দিয়া এমন ঘোরতর অপমান মাথা পাতিয়া লইল? চুলোয় যাক তার খাওয়া, ছাই থাক সে, আমি এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিব না।

পার্ব্বতী ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। দ্বারপ্রান্ত হইতে গোকুল ডাকিল, "পারু!"

পার্ব্বতী আবার শুইয়া পড়িয়া বালিসে মুখটা গুঁজিয়া দিল।

গোকুল জামা কাপড় ছাড়িয়া ঘরে ঢুকিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সময় শুয়ে কেন?"

পার্ব্বতী কোন উত্তর দিল না। গোকুল তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিতে গেল, পার্ব্বতী হাতটা ছুড়িয়া দিল। গোকুল ধীরে ধীরে গিয়া তামাক সাজিতে বসিল। তামাক সাজিতে সাজিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নৈরাশ্যক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিল, "কোথাও কিছু হ'লো না পারু।"

পার্ব্বতী মুখ না তুলিয়াই রুক্ষস্বরে বলিল, "হ'লো না, তার আমি কি করবো? আমি কি লোককে চাকরী দিতে বারণ ক'রে দিয়েছি?"

গোকুল ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি বারণ করবে কেন? আমার অদৃষ্টই বারণ ক'রে দিয়েছে।"

পার্ব্বতী উঠিয়া বসিল, তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তবে অদৃষ্টকে ধ'রে দু'ঘা বসিয়ে দাও। তাকে না পাও, আমি তো সাম্‌নে আছি, আমাকেই না হয়—"

বাধা দিয়া গোকুল বলিল, "ছি: পারু।"

পার্ব্বতী আর কিছু বলিল না, গোকুলও নীরবে তামাক সাজিয়া দরজায় আসিয়া বসিল। সে কলিকায় ফুঁ দিয়া ধরাইয়া তাহা হুঁকার মাথায় বসাইতে বসাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সময় শুয়ে কেন?"

পার্ব্বতী ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল, "কি করবো?"

গোকুল বলিল, "খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় হয়েছে?"

পার্ব্বতী তীব্রকণ্ঠে বলিল, "না।"

গোকুল নীরবে তামাক টানিতে লাগিল।

পার্ব্বতী বলিল, "যোগাড় হ'বে কোথা হ'তে? ঘরে কি আছে?"

গো। আজকার চাল ছিল না?

পা। ছিল।

গো। তবে ?

পা। সে দিন যে ওদের এক সের চাল ধার ক'রে খেয়েছিলে, তা কি মনে নাই ?

গো। সেটা আজ শোধ দিয়েছ ?

পা। হাঁ।

গোকুল একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় ধূমপানে মনোনিবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও ?"

গোকুল বলিল, "দেখি, কোথাও যদি কিছু যোগাড় করতে পারি।"

পা। আবার কার কাছে ধার করবে ?

গো। যার কাছে পাই।

পা। না, আর ধার করতে পাবে না।

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া গোকুল পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ধার ছাড়া আর উপায় কি ?"

পার্ব্বতী দৃঢ়স্বরে বলিল, "উপোস।"

গো। আমি তা পারি, কিন্তু তুমি ?

পা। তুমি যা পার, আমি কি তা পারি না ?

"পাগল।" বলিয়া মৃদু হাসিয়া গোকুল দরজার দিকে অগ্রসর হইল। পার্ব্বতী ছুটিয়া গিয়া দুই হাত দিয়া দরজা আটকাইল। ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না আর ধার করতে যেতে পাবে না।"

গোকুল ফিরিয়া হতাশভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। পার্ব্বতী তখন দরজা ছাড়িয়া বাক্সের নিকট গেল, এবং বাক্স খুলিয়া আপনার বালা দুই-গাছা বাহির করিয়া তাহা গোকুলের গায়ে ছুড়িয়া দিল। গোকুল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "গয়না !"

পার্ব্বতী ঘাড় উঁচু করিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, ঐ গয়না বেচে যা যোগাড় কর্ত্তে হয়, কর।"

গোকুল কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল, তার পর বালা দুইগাছা লইয়া বিছানার এক পাশে রাখিয়া দিয়া ধীর-সতেজ-কণ্ঠে বলিল, "তা আমি পারব না পারু।"

পার্ব্বতী পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর পায়ের কাছে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "ওগো, খুব পারবে গো খুব পারবে। তা যদি না পার, তবে আমি বিষ খাব, গলায় দড়ি দেব, জলে ডুবে মরব"

গোকুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বালা দুইগাছা তুলিয়া লইল, এবং তাহা চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পার্ব্বতী মেঝের উপর বসিয়া রহিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পল্লীগ্রামে বন্ধকী কারবারের মহাজন দুই এক জন মাত্র থাকে। হরিধন সাহার বন্ধকী কারবার ছিল। গোকুল গহনা লইয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু সাহা মহাশয় সে দিন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সুতরাং গোকুলকে সেখান হইতে ফিরিতে হইল। সরকার মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে বন্ধকী কারবার করিতেন। গোকুল অগত্যা তাঁহার নিকট গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনিও বাড়ীতে ছিলেন না। নৃত্য তখন আহারান্তে তাম্বুলরাগে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া, একখানি ধোপদস্ত কাপড় পরিয়া পাড়ায় বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল। সে গোকুলকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি গো, ঠাকুর মশায় যে ? আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম ?"

গোকুল দাবার উপর বসিয়া পড়িল, এবং কাঁধের চাদরখানা নাড়িয়া হাওয়া খাইতে খাইতে বলিল, "যার মুখ দেখেই উঠ, তার মুখটা যে মোটেই পয়মন্ত নয়, এটা নিশ্চয়।"

নৃত্য বলিল, "পয়মন্ত কি অপয়া, তা আমি বুঝব। এখন কি মনে ক'রে ?"

গো। মনে কিছু না করলে কি আসতে নাই ?

নৃত্য। অপরের থাকলেও তোমার নাই।

গো। যদি বলি, তোমায় দেখতে এসেছি ?

নৃত্য। আমি বলবো, গোকুল ঠাকুর মিথ্যুক।

গো। যদি বলি, বিশেষ দরকারে এসেছি ?

নৃত্য। সেইটাই সম্ভব। দরকারটা কি ?

গোকুল বলিল, "গোটাকতক টাকা দিতে পার ?"

সহাস্য দৃষ্টিতে গোকুলের মুখের দিকে চাহিয়া নৃত্য বলিল, "পারব না কেন, আমার টাকার অভাব কি ? তবে তোমাকে—"

গো। বিশ্বাস হয় না ?

নৃত্য। বামুন জাতটাই অবিশ্বাসী।

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "আমাকে অবিশ্বাস না হয়, এই জিনিস দুখানাকে বিশ্বাস ক'রে দিতে পার।"

গোকুল চাদরের খুঁট হইতে বালা দুগাছা বাহির করিয়া নৃত্যর সম্মুখে রাখিল। নৃত্য বলিল, "যে মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না, তার জিনিসের উপরও বিশ্বাস নাই।"

গোকুল বলিল, "জিনিসটা আমার নয়।"

নৃত্য। কার ?

গো। আমার স্ত্রীর। এই দুগাছা রেখে গোটা কুড়ি টাকা দাও।

নৃত্য। কুড়ি টাকা আমার হাতে নাই, গোটা দশেক দিতে পারি।

গো। তাই দাও।

নৃত্য দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল। ভাবিয়া বালা দুইগাছা তুলিয়া লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সোনা তো ?"

ক্রুদ্ধভাবে গোকুল বলিল, "না, পেতল। তোমার রাখতে হবে না, দাও।"

গোকুল হাত বাড়াইল। মৃদু হাসিয়া নৃত্য বলিল, "রাগ কর কেন ঠাকুর মশায়, মহাজনের কাছে এর চেয়েও কত কড়া কথা শুনতে হয়।"

গোকুল বলিল, "অপরের কাছে শুন্‌তে হয় শুন্‌বো, তাই ব'লে তোমার কাছে তা শুন্‌তে পারি না।"

নৃত্য সহাস্যে বলিল, "তাদের কথা গুড়-মাখান, আর আমার কথা বুঝি তেতো ?"

উগ্রকণ্ঠে গোকুল বলিল, "তোমার কথায় বিষ আছে।"

একটা হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নৃত্য বলিল, "তুমি তো বিষ খেয়ে বিষম্ভর হয়েছ, তোমার আবার বিষের ভয় কেন ?"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া বিরক্তভাবে গোকুল বলিল, "টাকা দেবে তো দাও, নয় তো জিনিস দাও।"

নৃত্য বলিল, "আজ মেজাজটা এত চড়া কেন ঠাকুর মশাই ? মুখখানাও শুকনো দেখছি। খাওয়া হয়েছে ?"

বিষাদগম্ভীর স্বরে গোকুল বলিল, "খাওয়া হ'লে তোমার কাছে গয়না বাঁধা দিতে আস্‌তাম না।"

"এতক্ষণ তা বল্‌তে হয়" বলিয়া নৃত্য তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিল, এবং দশটা টাকা আনিয়া গোকুলের হাতে দিল। গোকুল তাহা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "বড় উপকার কর্‌লে নিতু।"

নৃত্য বলিল, "আচ্ছা, পার তো এর শোধ দিও, এখন উঠে যাও।"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া গোকুল বলিল, "তাড়িয়ে দিচ্ছ ?"

বিরক্তির সহিত নৃত্য বলিল, "তা নয় তো কি আদর ক'রে বসিয়ে রাখব ? এখানে ব'সে থাক্‌লে পেট ভর্‌বে ? বেলা কি আর আছে ?"

"বেলা অনেকটা হয়েছে বটে" বলিয়া গোকুল উঠিয়া দাঁড়াইল। নৃত্য বলিল, "যদি দরকার হয়, কা'ল-পরশু এসো, আর গোটা কতক টাকা নিয়ে যেয়ো।"

"আচ্ছা" বলিয়া গোকুল চলিয়া গেল। নৃত্য খুঁটিটা ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে ফরসা কাপড়খানা ছাড়িয়া দাবায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। সে দিন আর তাহার বেড়াইতে যাওয়া হইল না।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় গোকুল কনিষ্ঠকে ডাকিয়া বলিল, "হাঁ রে অমূল্য, তোদের আপিসে একটা কাজ-কর্ম্ম ক'রে দিতে পারিস্ ?"

আপিসে কাজকর্ম্ম করিয়া দিবার ক্ষমতা অমূল্য-চরণের ছিল না। কিন্তু সে আপনার অক্ষমতাটুকু গোপন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "পার্‌ব না কেন, কিন্তু তুমি কর্‌বে কি ? তুমি কি জান ?"

গোকুল বলিল, "যা জানি। আর কিছু না হয়, ঘর ঝাঁট দেওয়া, তামাক সাজা, এগুলাও তো কর্‌তে পার্‌ব।"

রাগতস্বরে অমূল্য বলিল, "তা তুমি পার দাদা, তোমার ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান কিছুই নাই, কিন্তু আমার তা আছে। আমার মাথা কাটা যাবে।"

গোকুল ভাবিল, কথাটা মিথ্যা নয়। অগত্যা সে চুপ করিল। অমূল্য কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গম্ভীর-স্বরে বলিল, "দেখ দাদা, কথাটা বলাও দোষ, কিন্তু তোমাকে না বল্‌লেও নয়।"

শঙ্কিতভাবে গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "এমন কি কথা রে অমু ?"

অমূল্য মাথাটা নীচু করিয়া ঘাড়ে হাত বুলাইতে

বুঝাইতে বলিল, "তুমি জান কি না বলতে পারি না, তোমার জমী-জায়গার সঙ্গে ঘর-ভিটেও নীলাম হয়ে গিয়েছে।"

সহজকণ্ঠে গোকুল বলিয়া উঠিল, "জান্‌ব না কেন, বেশ জানি। তোর পিসতুতো সম্বন্ধী গোঁসাই আকুলি কিনেছে না ?"

অমূল্যচরণ উত্তর দিল, "হাঁ।"

গো। তা সে কি আমায় উঠে যেতে বল্‌ছে ?

অমূ। সে যখন টাকা দিয়ে নিয়েছে, তখন—

গো। তা তো বল্‌তেই পারে।

গোকুল নতমস্তকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। একটু ভাবিয়া বলিল, "তা সে দু' তিনটে মাস সময় দেয় না রে ?"

অমূল্য বলিল, "অনুরোধ উপরোধ কর্‌লে তা না হয় দিতে পারে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি দাদা, তোমার কি কোন তালুক-মুলুক আছে যে, দু'মাস পরে সেখান হ'তে টাকা এসে পড়বে ?"

গোকুল একটু হাসিল। সে হাসি যে কি দুঃখের হাসি, তাহা অমূল্য বুঝিতে পারিল না। গোকুল বলিল, "কথাটা মিথ্যা নয় রে অমূ, তবে কি জানিস, বাপের ভিটে, বড্ড মায়া হয় রে। ছেড়ে যাই বা কোথায় ?"

গোকুল একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের পাঁজরাগুলা বড় জোরে কাঁপিয়া উঠিল, চোখের পাতাগুলা ভারী হইয়া আসিল।

অমূল্য বলিল, "তা যা হয়, একটা ব্যবস্থা কর। সে কুটুম্ব মানুষ, নিজে কিছু বল্‌তে পারে না, আমাকে তাগাদা করে। আর এই নিয়ে যদি কুটুম্বের সঙ্গে একটা কেলেঙ্কারী হয়, সেটাও বড় নিন্দার কথা। আমি ব'লে ক'রে এক মাসের সময় নেব, এর মধ্যে যা হয় একটা ক'রে ফেল।"

গোকুল মাথা নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

চটী-জুতার ফট্‌-ফট্ শব্দ করিতে করিতে অমূল্য বাহির হইয়া গেল। গোকুল নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল।

পার্ব্বতী আসিয়া ডাকিল, "ভাত হয়েছে, উঠে এস।"

গোকুল নীরব, নিশ্চল। পার্ব্বতী তাহার গা ঠেলিয়া বলিল, "শুন্‌তে পাচ্ছ ?"

গোকুল মাথা তুলিয়া উদাসদৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। পার্ব্বতী বলিল, "ভাত বাড়া হয়েছে।"

গোকুল উঠিয়া ধীরে ধীরে গিয়া ভাতের কাছে বসিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আহার শেষ করিয়া পার্ব্বতী ঘরে আসিয়া দেখিল, স্বামী তখনও শয়ন করে নাই, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। পার্ব্বতী বাঁ-হাতের প্রদীপটাকে পিল-সুজের উপর রাখিয়া, ঘরের দরজা বন্ধ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাবচো ?"

গোকুল মাথা হেঁট করিয়াই ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "ভাবছি, এক মাস পরে বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে।"

পার্ব্বতী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "যাবে কোথায় ?"

গোকুল বলিল, "তাই ভাবছি।"

পা। বাড়ীখানা রাখবার কি কোন উপায় নাই ?

গো। টাকাটা ফেলে দিলে বোধ হয় রাখা যায়।

পা। তাই ফেলে দাও না।

বিষাদের হাসি হাসিয়া গোকুল বলিল, "দু'শো আড়াই শো টাকা, পাব কোথায় ? দেবে কে ?"

পা। লোকে দু'হাজার দশহাজার ধার পায়, আর তুমি দু'শো আড়াই শো টাকার যোগাড় কর্‌তে পার না ?

গো। পার্‌লে কি আর বাপের ভিটে ছেড়ে দিই, আমি এখন গরীব, "অস্তভক্ষ্য ধনুগুর্ণ" আমাকে এখন লোকে বিশ্বাস ক'রে দু'টো টাকা দেবে না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পার্ব্বতী গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে কোন উপায় নাই ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গোকুল বলিল, "কিছুই না।"

পার্ব্বতীর মনে হইয়াছিল, সে নিজের গহনার কথা বলে। কতক গহনা বিক্রয় করিলে তো অনায়াসে এই টাকার যোগাড় হইতে পারে। স্বামী যে তাহা জানে না, এমন নয়, কিন্তু জানিয়াও সে যখন এ কথায় কোন উল্লেখ করিল না, বাড়ী ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইবে, তথাপি তাহার গহনা লইবে না, ইহাই যখন স্বামীর

সংকল্প, তখন পার্ব্বতী আর সে কথা তুলিতে পারিল না, তুলিতে লজ্জা বোধ হইল। শুধু লজ্জা নয়, রাগও যথেষ্ট হইল। সে যে আজই মধ্যাহ্নে স্বামীকে উপবাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য গহনা বেচিতে দিয়া কি অন্যায় কাজ করিয়াছে, তাহা ভাবিতেও তাহার কষ্ট বোধ হইল, তাহার বুকের ভিতর যেন ছুঁচ বিঁধিতে লাগিল। সে গুম হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল। গোকুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে গোকুল ডাকিল, "ঘুমালে পারু?"

পার্ব্বতী উত্তর দিল না, শুধু হাত নাড়িয়া চুড়ির শব্দে জানাইল যে, সে এখনও ঘুমায় নাই। গোকুল বলিল, "ঘর-ভিটে যদি যায়, যায় কেন, গিয়েছে, তা হ'লে তুমি কোথায় থাকবে পারু?"

পার্ব্বতী পিছন ফিরিয়া শুইয়াছিল, মুখটা একটু ঘুরাইয়া রুক্ষ-স্বরে উত্তর করিল, "আমার থাক্‌বার অনেক জায়গা আছে, তোমার নিজের জন্য ভাব।"

মৃদু হাসিয়া গোকুল বলিল, "আমার জন্য ভাবনা নাই, পুরুষমানুষ, যেখানে হয় থাক্‌তে পারবো। ভাবনা শুধু তোমার জন্য।"

পার্ব্বতী ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিল, রাগে চোখ-মুখ লাল করিয়া উচ্চ-কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে যোড়-হাত ক'রে বল্‌ছি, আমার জন্য তোমার একটুও ভাবতে হবে না। তোমার এই কুঁড়েটুকু ছাড়াও আমার থাকবার জায়গা আছে।"

গো। কোথায়? বাপের বাড়ী?

পা। হাঁ।

গোকুল মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, পার্ব্বতী আবার শুইয়া পড়িল। তৈলহীন প্রদীপটা মিট মিট করিয়া শেষে নিবিয়া গেল। তথাপি গোকুল শুইল না, সে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আপনার গভীর চিন্তা-রাশি লইয়া বসিয়া রহিল। পার্ব্বতী যতক্ষণ জাগিয়া ছিল, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে শুধু এক একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইল না। তাহা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন পার্ব্বতী অন্নদাকে একখানা পত্র লিখিল,—

"ঠাকুরঝি! বাপের বাড়ীতে ছিলাম ব'লে তুমি আমায় গালাগাল দিয়ে চিঠি লিখেছিলে। আজ আমার তোমাকে পাল্টে গালাগাল দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু আমি তা দিলাম না।

এবার আমাকে দায়ে প'ড়ে বাপের বাড়ী যেতে হচ্ছে। কেন জান? তোমার বুদ্ধিমান্ ভাই ভিটে-টুকু পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে ব'সে আছেন। এক মাসের মধ্যে বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। তিনি নিজের জন্য একটুও ভাবেন না যেখানে হয় থাকতে পারবেন শুধু আমার জন্য ভেবেই পাগল। কাজেই বাপের বাড়ী গিয়ে তাঁকে এ ভাবনার হাত হ'তে অব্যাহতি দেব ভেবেছি।

তুমি হয় তো বল্‌বে, আমার গয়নাগুলো দিলে তো বাড়ীখানা থাকে। কিন্তু কাকে দেব? যে বাড়ী ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা বোধ করে না, কিন্তু আমার গয়না বেচে বাড়ী রাখতে লজ্জা পায়, তাকে? প্রাণ থাক্‌তে তা আমি পারব না। স্বামী পরম গুরু, তিনি মাথায় থাকুন, কিন্তু যে আমাকে পর ভাবে, তার কাছে এতটা হীনতা স্বীকার করতে পারব না। তাতে তুমি আমাকে নরকেই যেতে বল, আর যেখানেই পাঠাও, আমার দ্বারা কিন্তু এতটা বেহায়া-পণা হবে না।

তুমি কেমন আছ? তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। ইতি

তোমার বৌ।"

কয়েকদিন পরে পার্ব্বতী পত্রের উত্তর পাইল। অন্নদা তাহাকে লিখিয়াছে—

"পোড়ারমুখ,

অবস্থার ফেরে দাদার না হয় মাথা খারাপ হয়েছে, কিন্তু তোরও কি এই বয়সে ভীমরতি ধরেছে? বাপের বাড়ী গিয়ে ভাই-ভাজের কাছে মাথা নীচু ক'রে থাকবি, তবু স্বামীর কাছে মাথা হেঁট করতে পারবি না? ধন্যি মেয়ে তুই!

তুই দাদার কাছে মাথা নীচু করতে পারবি না, কিন্তু দাদা তোর কাছে মাথা নীচু ক'রে তোর কৃপা ভিক্ষা করবে, এইটাই তোর ইচ্ছা। কেমন, না? কিন্তু আমার সে দাদা নয়। তুই চুলোয় যা, কিন্তু দাদা যেন ঠিক আমার এই দাদাই থাকে। সে রাজসিংহাসনেই থাক্ বা গাছতলাতেই থাক, সে আমার দাদাই থাকবে। আমার গেলো, তাই তাকে

জ্বালার উপর জ্বালা দিতে তোর মত শিমুল-ফুলের মালা তার গলায় তুলে দিয়েছিলাম।

আমি কেমন আছি, জান্‌তে চেয়েছিস্? আমি খুব ভালই আছি, লোকে বলে, কষ্টে আছি, কিন্তু আমি বলি, খুব ভাল। শাশুড়ী দু বেলা মুখ না পুড়িয়ে জল খান না, ছোট জা কেনা বাঁদীর চেয়ে একটুও সদ্ব্যবহার দেখায় না। তবু আমি খুব সুখে আছি। কেন জানিস? এ যে স্বামীর ঘর। স্বামী নাই, কিন্তু তার অসংখ্য স্মৃতি আছে। সেই ঘর, সেই বিছানা, সেই জিনিসপত্র, সকলের সঙ্গেই যেন তার স্মৃতি মাখান। ঘরে ঢুকলেই যেন তার গায়ের গন্ধ পাই, বিছানাটা ছুঁলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে, চোখ বুজলেই যেন সে আমার চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়। তাই হাজার গাল-বকুনি খেলেও এখানে বেশ মনের সুখে আছি।

আমার মনে হয়, এটা আমার তীর্থস্থান। লোকে কি তীর্থে শুধু সুখ ভোগ করতে যায়? হাজার কষ্ট পেলেও এ তীর্থ ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না। পোড়ারমুখী আমি, এমন তীর্থ ছেড়ে এতদিন কেন যে বাপের বাড়ীতে প'ড়ে ছিলাম, এখন তাই ভাবি, আর কাঁদি।

আবার বলি, আমি খুব ভাল আছি। দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই, তোর সঙ্গে দেখা কর্‌বার ইচ্ছাও নাই। ইতি

তোর ঠাকুরঝি!"

পত্র পড়িয়া পার্ব্বতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তার পর একটু ভাবিয়া পত্রখানাকে কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

গোকুল আসিয়া বলিল, "পাল্‌কী-বেহারা ঠিক ক'রে এলাম পারু।"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া পার্ব্বতী গম্ভীর-স্বরে উত্তর করিল, "কা'ল না অমাবস্যা?"

গোকুল মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তাই তো, অমাবস্যা। তব—তবে কি কা'ল যাবে না?"

পার্ব্বতী বলিল, "কা'ল থাক্।"

গোকুল আর কিছু বলিল না, শুধু মনে মনে ঈষৎ হাসিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর পার্ব্বতী যখন ভাত চাপাইয়া উনানের কাছে বসিয়াছিল, তখন পিসীমা অমূল্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, "বড় গিন্নী যে আবার বাপের বাড়ী চল্‌লো রে।"

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

পিসীমা বলিলেন, "গোক্‌লো পাঠিয়ে দিচ্চে, আর কেন।"

ঈষৎ হাসিয়া অমূল্য বলিল, "তা দেবে বৈ কি, না হ'লে যে রাসলীলা চলে না।"

পিসীমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি রে অমূল্য?"

অমূল্য বলিল, "কিছু না। সে সব কথা তোমাদের শুনে কাজ নাই।"

পিসীমার কৌতূহল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "এমন কি কথা রে অমূ, তা বল্ না, আমায় বল্‌তে দোষ কি?"

অমূল্য একটু ভাবিয়া বলিল, "দোষ আর এমন কি, আর সে কথা কেই বা জানে না?"

পিসীমা আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে অমূল্যের মুখের দিকে চাহিলেন পার্ব্বতী ধীরে ধীরে গিয়া রান্নাঘরের জানালার কাছে দাঁড়াল। অমূল্য বলিল, "গুপী সরকারের মেয়ে নৃত্যকে জান?"

পিসীমা বলিলেন, "ও মা, তাকে আবার জানি না, সে যে গোকলোর ছেলেবেলার খেলুড়ী ছিল।"

অমূল্য বলিল, "হাঁ হাঁ, সেই এখন বুড়ো বয়সের খেলুড়ী হয়েছে।"

পিসীমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। অতি-মাত্র বিস্ময়ে তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, তিনি শুধু বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অমূল্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অমূল্য বলিল, "চারিদিকে হৈ হৈ প'ড়ে গিয়েছে, আমার তো গাঁয়ে বের হবার জো নাই। ভাগ্যে আলাদা হয়েছিলাম, তা নৈলে এত দিন আমার পর্য্যন্ত ধোপা-নাপিত বন্ধ হ'তো।

পিসীমা ডানহাতটা গালের উপর রাখিয়া বিস্মিত-কণ্ঠে বলিলেন "বলিস্ কি রে অমূল্য, তুই যে আমাকে অবাক্ করলি। গোকলোর পেটে পেটে এত বিদ্যে। ঘরে অমন সোমত্ত বৌ, বৌও তো নেহাৎ কালো কুচ্ছিত নয়।"

অমূল্য গম্ভীরভাবে বলিল, "হ'লে কি হয়, স্বভাব! দেখ্‌ছ না, বৌয়ের সঙ্গে বনিবনাও আছে?"

পিসীমা বলিলেন, "ঠিক কথা, তাই কথায় কথায়

বৌটাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। ছি ছি, গলায় দড়ি।"

পার্ব্বতী দুই হাতে জানালার গরাদে চাপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর উনানে জল ঢালিয়া দিয়া, ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

কতক রাত্রে গোকুল আসিয়া ডাকিলে পার্ব্বতী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াই আবার শুইয়া পড়িল। গোকুল ভাত চাহিল, পার্ব্বতী বলিল, 'ভাত আজ রান্না হয় নি।"

গোকুল একটু আশ্চর্য্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "রান্না হয় নি?"

পার্ব্বতী চড়া গলায় উত্তর দিল, "না:।"

গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কোন অসুখ হয়েছে?"

বিরক্তির সহিত পার্ব্বতী বলিল, "না, না:।"

গোকুল আর কিছু বলিল না, সে তামাক সাজিয়া ঘরের দাবায় বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

তামাক খাওয়া শেষ হইলে গোকুল ঘরে আসিয়া দেখিল, পার্ব্বতী তখনও ঘুমায় নাই। সে ধীরে ধীরে গিয়া পার্ব্বতীর কপালে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি কোন অসুখ হয়নি পারু?"

পার্ব্বতী তাহার হাতটাকে সরাইয়া দিয়া উগ্রস্বরে বলিল, "পাল্কী-বেহারা ঠিক আছে?"

গোকুল বলিল, "তাদের বারণ ক'রে এসেছি। তুমি তো কা'ল যাবে না বললে।"

পার্ব্বতী বলিল, "না, কা'লই আমায় যেতে হবে।"

গোকুল পাশে বসিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কা'ল কেন যাবে পারু?"

পার্ব্বতী মুখ ফিরাইয়া স্বামীর মুখের উপর ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি করিয়া বলিল, "আমার খুসী।"

গোকুল মৃদু হাসিয়া পার্ব্বতীর মাথার উপর হাত রাখিল। পার্ব্বতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং বেগে বিছানা ছাড়িয়া আসিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। কঠোর স্বরে বলিল, "দেখ, ফের যদি আমাকে জ্বালাতন করবে, তা হ'লে ভাল হবে না, তা ব'লে রাখছি।"

গোকুল বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

পার্ব্বতী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিয়া মুখ না তুলিয়াই বলিল, "দেখ, আমি এখানে থাকলে তোমারও নানাদিকে অসুবিধা, আমারও স্বস্তি নাই। তার চেয়ে আমাদের আলাদা থাকাই ভাল নয় কি?"

উত্তরের প্রত্যাশায় পার্ব্বতী বক্রদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। গোকুল কোন উত্তর দিল না, একটু নড়িলও না। পার্ব্বতী দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

একাবিংশ পরিচ্ছেদ

"নেত্য।"

"কেন গা অমূল্যবাবু।"

অমূল্যচরণ ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি—আমি—"

মৃদু হাসিয়া নৃত্যকালী বলিল, "তুমি, তুমি কি? মানুষ না জানোয়ার?"

একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া অমূল্যচরণ বলিল, "না, আমি—আমি তোমায় ভালবাসি।"

নৃত্যকালী যেন অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিবুকে অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া বলিল, "ও মা, বল কি গো? তা আমি এত দিন জানতাম না? আমার পোড়াকপাল!"

অমূল্যচরণ ঘাড় নীচু করিয়া পা নাচাইতে নাচাইতে জড়িতস্বরে বলিল, 'সত্যি নেত্য, আমি তোমায় খুব ভালবাসি।"

নৃত্যকালী বলিল, "তা আর বাসবে না? তোমার দাদা ভালবাসে, ওপাড়ার গণেশ ঘোষ ভালবাসে, হারু ডাক্তার—"

বাধা দিয়া অমূল্য বলিল, "তাদের কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।"

সহাস্যে নৃত্যকালী বলিল, "চুলোয় যাক্ তারা। আমার অনেক ভাগ্যি যে, তুমি আমায় ভালবাস। তাও আবার প্রাণ দিয়ে। হাঁগা অমূল্যবাবু, সত্যি কি তুমি আমায় প্রাণ দিয়েছ?"

গদগদকণ্ঠে অমূল্যচরণ বলিল, "সত্যই বলছি, আমি তোমাকে প্রাণ দিয়েছি নেত্য।"

একটু চিন্তিতভাবে নৃত্যকালী বলিল, "তা বটে, কিন্তু তোমার প্রাণ নিয়ে আমি কি করবো বল। শেষে কি ব্রহ্মহত্যা-পাপের ভাগী হব?"

আগ্রহপূর্ণ স্বরে অমূল্য বলিল, "তবে তুমি কি চাও নেত্য?"

একটু ভাবিয়া নৃত্যকালী বলিল, "শ'খানেক টাকা দিতে পার?"

বিস্মিতভাবে অমূল্য বলিল, "একশো টাকা?"

নৃত্যকালী বলিল, "হাঁ, একশো টাকা। বড় একটা দায়ে ঠেকেছি। তা তোমাকে শুধু হাতে দিতে বল্‌ছি না, একজোড়া সোনার বালা রেখে দিতে বল্‌ছি। এই দেখ না বালা।"

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া দুইগাছা বালা বাহির করিয়া আনিল। অমূল্য বালা দুইগাছা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, "আজই টাকা চাই?"

নৃত্যকালী বলিল, "আজ বিকালেই চাই। এই আমি ভাবছিলাম, হীরু ডাক্তারের কাছে যাব কি না।"

বালা দুইগাছা ফিরাইয়া দিয়া অমূল্য ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, আর কোথাও যেতে হবে না, আমিই দেখছি।"

নৃত্যকালী বলিল, "বেশ, আমি বিকাল পর্য্যন্ত তোমার অপেক্ষা কর্‌বো।"

অমূল্যচরণ আর দুই একটা মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া চলিয়া গেল। নৃত্যকালী আপন মনে খুব একচোট হাসিয়া লইল।

বিকাল না হইতেই অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দশ কেতা নোট নৃত্যকালীর হাতে দিল। নৃত্যকালী হাসিমুখে নোটগুলা গণিয়া ঘরে তুলিয়া রাখিল। অমূল্যচরণ একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "বালা দু'গাছা।"

কটাক্ষে বিদ্যুৎ হানিয়া, সহাস্যে নৃত্যকালী বলিল, "আমার কাছেই থাক্ না?"

অমূল্য বিস্মিত-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। নৃত্যকালী বলিল, "আমাকে বিশ্বাস ক'রে প্রাণ দিতে পার, আর বালা দু'গাছা আমার কাছে রেখে বিশ্বাস হয় না?"

অমূল্য নিরুত্তর হইল। নৃত্যকালী অপনার গৃহকার্য্যে মন দিল। অমূল্য বক্র কটাক্ষে তাহার রূপসুধা পান করিতে লাগিল।

গৃহকার্য্য-শেষে নৃত্যকালী ঘরে চাবী দিল, এবং অমূল্যর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তা হ'লে অমূল্যবাবু, এখন এস। আমি গা ধুতে যাব।"

অমূল্যচরণ মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। নৃত্যকালী গম্ভীর-মুখে বলিল, "ভাবছ কি? বিশ্বাস না হয় বল, বালাজোড়া দিই।"

আমতা-আমতা করিয়া অমূল্য বলিল, "না না, তোমাকে—তোমাকে অবিশ্বাস নাই নেত্য।"

অমূল্যচরণ উঠিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় চলিয়া গেল। নৃত্যকালীও মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহার পশ্চাৎ বাটীর বাহির হইল।

নৃত্যকালী কিন্তু গা ধুইতে গেল না। আঁচলে বালা জোড়া ও টাকা বাঁধিয়া সোজা চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। গোকুল একা বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল। নৃত্যকালী তাহার সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "পেন্নাম হই গো ঠাকুরমশায়।"

সহাস্যে গোকুল বলিল, "কৃষ্ণে মতি হোক্।"

মৃদু হাসিয়া নৃত্যকালী বলিল, "কৃষ্ণে আমার খুব মতি আছে, সে জন্য তোমার আশীর্ব্বাদের দরকার নাই। আমি একশো আটবার হরিনাম জপ না ক'রে জল খাই না।"

গো। এখন হ'তে হাজার আট হরিনাম কর্‌বে।

নৃত্য। মাপ করুন গুরুজি, অতটা সময়ে কুলাবে না।

গো। তা বটে, ছোঁড়াদের মাথা খেতে অনেকটা সময় যায়।

নৃত্য। সেগুলা নেহাৎ জানোয়ারের মাথা ঠাকুরমশায়। মানুষের মাথা একটাও খেতে পার্‌লাম না।

কথার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যকালী একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। গোকুল বলিল, "মানুষের মাথা এত সস্তা নয় যে, ইচ্ছা হ'লেই খাবে।"

নৃত্যকালী বলিল, "ঐ দুঃখটাই তো রয়ে গেল।"

গোকুল বলিল, "ও দুঃখটাকে মনেই চেপে রাখ। তার পর, হঠাৎ কি মনে ক'রে?"

নৃত্য। একবার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায়।

গো। তা হ'লে এ আশাটাকেও আপাততঃ চেপে রাখতে হবে।

সহাস্যে নৃত্যকালী বলিল, "ভয় নাই ঠাকুরমশায়, ব্রাহ্মণী বোধ হয় ছোঁড়া নয়।"

গোকুলও মৃদু হাসিল, বলিল, "তোমার কাছে সব সমান। কিন্তু আপাততঃ গৃহশূন্য।"

নৃত্যকালী বলিল, "আবার ব্রাহ্মণীর প লোকগমন না কি ?"

গো। পরলোক নয়, বাপের বাড়ী

নৃত্য। কবে গেলেন ?

গো। আজ সকালে।

"তাই তো" বলিয়া নৃত্যকালী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, 'হঠাৎ ব্রাহ্মণীর কাছে কি দরকার ?"

নৃত্য। তোমার গুণের কথা সব বল্‌তাম।

গো। আমার যা গুণ জেনেছেন, তাইতেই তিনি বাড়ীছাড়া, আর বেশী বল্‌বার দরকার নাই।

নৃত্য। দরকার ছিল কি না, থাক্‌লে বুঝ্‌তেম। যখন নাই, তখন টাকাগুলো তুমিই রাখ।

নৃত্যকালী অমূল্যচরণের নিকট প্রাপ্ত নোটগুলা আচল হইতে খুলিয়া গোকুলের সম্মুখে রাখিল। গোকুল সেগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের টাকা ?"

নৃত্য। সেই বালার।

গো। আমি তো তার টাকা এনেছি।

নৃত্য। ছ'গাছা সোনার বালা রেখে কেউ দশ টাকা নেয় না।

গো। তার দাম জোর একশো টাকা। তাই রেখে কেউ এত টাকা দেয়ও না।

নৃত্য। বালা ছ'গাছা আমার খুব পচ্ছন্দ হয়েছে, আমি কিনে নিচ্ছি।

গো। যখন বিক্রী করতে যাব, তখন কিনে নিও। এখন আমি দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি, সুদ আসল দিয়ে ছাড়িয়ে আনব। তোমার টাকা নিয়ে যাও।

নৃত্যকালী ম্লানমুখে বলিল, "তোমার কি টাকার দরকার নাই ?"

দৃপ্তকণ্ঠে গোকুল বলিল, "টাকায় আমার অনেক দরকার আছে। কিন্তু দরকার আছে ব'লে তোমার টাকা নিতে যাব কেন ?"

একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নৃত্যকালী বলিল, "টাকা আমার নয়।"

গো। তবে কার ?

নৃত্য। তোমার ভায়ের।

গোকুল বিস্মিতভাবে নৃত্যকালীর মুখের দিকে চাহিল। তখন নৃত্যকালী কিরূপ কৌশলে অমূল্যচরণের নিকট টাকাটা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা বলিল। শুনিয়া গোকুলের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। সে গম্ভীর দৃষ্টিতে নৃত্যকালীর মুখের দিকে চাহিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল "তুমি যে জুয়াচুরি পর্য্যন্ত করতে পার, তা আমি জান্‌তাম না। ছিঃ।"

নৃত্য লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল, ধীরে ধীরে বলিল, "জুয়াচোরের সঙ্গে জুয়াচুরি করতে দোষ নাই।"

গোকুল বলিল, "এ নীতিটা জুয়াচোরেরই। আমি জুয়াচোর নই নিতু।"

নৃত্যকালী নোটগুলা কুড়াইয়া আবার আচলে বাঁধিতে বাঁধিতে ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "আমি মেয়েমানুষ, বুঝ্‌তে পারি নাই।"

গোকুল বলিল, "এখন যদি বুঝে থাক, তবে যার টাকা, তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

নৃত্যকালী ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পিসীমা তখন বাড়ীতে ছিলেন না, ছোট-বৌ একা ছিল। নৃত্যকালী গিয়া তাহার কাছে বসিল। এ কথা সে কথার পর নৃত্যকালী আচল হইতে বালা জোড়া খুলিয়া ছোট-বোয়ের হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বালা ছ'গাছা চিন্‌তে পার বোঠাকরুণ ?"

ছোট-বৌ তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, "যেন দিদির বালা ব'লে বোধ হচ্চে।"

মৃদু হাসিয়া নৃত্যকালী বলিল, "বোধ হচ্চে নয়, তোমার দিদিরই বালা। আমার কাছে বাঁধা ছিল। আমি বিক্রী করেছি।"

"কে কিনেছে ?"

"অমূল্য বাবু।"

ছোট-বৌ বিস্মিত দৃষ্টিতে নৃত্যকালীর মুখের দিকে চাহিল। নৃত্যকালী বলিল, "একশো টাকায় কিনেছেন। কিনে আমার কাছে রেখে এসেছিলেন।"

ছোট-বৌ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "তোমার কাছে ?"

মৃদু হাসিয়া নৃত্যকালী বলিল, "হাঁ, আমার কাছে। বোধ হয়, কাউকে দেবার মতলব ছিল। কা'কে, তা ভগবান্ জানেন, সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারো।"

ছোট-বোয়ের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। নৃত্যকালী বলিল, "কিন্তু আপাতত বেচা হবে না। যার জিনিস, তাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে তো বেচ্‌তে পারি না। তিনি তো বাপের বাড়ী চ'লে গেছেন। ছোট কর্ত্তাকে টাকাগুলো দিও।"

নৃত্যকালী আঁচল হইতে নোটগুলা খুলিয়া ছোট-বোয়ের সম্মুখে রাখিল, এবং বালা দুইগাছা লইয়া চলিয়া গেল। ছোট বৌ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল।

অমূল্যচরণ ঘরে আসিলে ছোট-বৌ তাহাকে বলিল, "হাঁ গা, এক জোড়া বালা কিনেছ না?"

অমূল্য চমকিতভাবে বলিল, "কে বল্‌লে?"

মৃদু হাসিয়া ছোট-বৌ বলিল, যেই বলুক না, তুমি কিনেছ তো। তা কৈ, কোথায় রেখেছ?"

অমূল্য রাগতভাবে বলিল, "চুলোয় রেখেছি। বালা আবার কোথায়?"

ছোটবৌ বলিল, "কোথায়, তা আমি জান্‌ব কেমন ক'রে? তুমি বল না কোথায়?"

ভ্রূকুটি করিয়া অমূল্য বলিল, "বল না কোথায়? ও সব ন্যাকামী রেখে দাও। টাকা কোথায় যে বালা কিন্‌ব?"

ছোট-বৌ বলিল, তা তোমার টাকা না থাকে, আমি দিচ্ছি, তুমি বালা দু'গাছা নিয়ে এস।"

অমূল্য পত্নীর মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ছোট-বৌ বাক্স খুলিয়া একশত টাকা আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল। অমূল্য বলিল, "তুমি এ টাকা কোথায় পেলে?"

একটু তীব্র হাসি হাসিয়া ছোট-বৌ বলিল, "কোথায় আর পাব? তোমারই টাকা।"

ক্রুদ্ধস্বরে অমূল্য বলিল, "আমার টাকা তুমি নিয়েছ কেন?"

ছোট। নিতে দোষ আছে?

অমূ। একশো বার দোষ আছে। তুমি চুরি করেছ।

ছোট-বৌ স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "মাইরি বল্‌ছি, চুরি করি নাই। এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি।"

অমূল্য তীব্রস্বরে বলিল, "তবে কোথায় পেলে, আমি তো তোমাকে দিই নাই?"

ছোট-বৌ বলিল, "আমাকে দাও নাই বটে, কিন্তু তুমি যাকে দিয়েছিলে, সে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।"

পত্নীর হাত হইতে হাতটা ছিনাইয়া লইয়া অমূল্য গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি, আমি কাউকে টাকা দিয়েছি! যত বড় মুখ, তত বড় কথা!"

ছোট-বৌ বলিল, "কিন্তু সত্য কথা। দাওনি কি?"

রাগে চীৎকার করিয়া অমূল্য বলিল, "দিয়ে থাকি, দিয়েছি, বেশ করেছি। আমি তো কারো বাবার টাকা দিতে যাইনি।"

সহাস্যে ছোট-বৌ বলিল, "স্বচ্ছন্দে দিতে পার। তবে রাসলীলাটা দাদা একা করে কি না, তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।"

অমূল্য জোরে মাটীতে পা ঠুকিয়া ক্রোধরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "আমি রাসলীলাই করি আর দোললীলাই করি, কারো বাবার ঘরে গিয়ে করি না।"

পিসীমা আপনার ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে রে, রেতের বেলা এত চেঁচামেচি কেন?"

অমূল্য আরও জোরে চীৎকার করিয়া বলিল, "কেন? আমি সব খুন করবো, ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব, আমার যা মনে আসে, তাই করবো।"

পিসীমা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন, দরজার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কে হয়েছে?"

ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে অমূল্য বলিল, "কি হয়েছে? আমার নামে দুর্নাম রটায়। শোন না একবার ওর ন্যাকামো, বলে, আমি কাকে টাকা দিয়েছি, এক শো টাকা দিয়ে বালা কিনে দিয়েছি।"

পিসীমা গালে হাত দিয়া যেন অতিমাত্র বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ছি ছি, এ সব কি কথা বৌমা?"

ছোট-বৌ মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "সত্য কি মিথ্যা, জিজ্ঞাসা কর না।"

অমূল্য রাগে মাটীতে পা ঠুকিয়া বলিল, 'দু'শোবার সত্য। আমি বেশ করবো, আমি মদ খাব, গাঁজা খাব, মেয়েমানুষ রাখব, সর্ব্বস্ব উড়িয়ে পুড়িয়ে দেব, দেখি কে আমায় একটা কথা বলে। আমি তো কারো বাবার পয়সা নিতে যাই না।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে অমূল্য ঘরের বাইরে আসিয়া দাবার উপর বসিল। পিসীমা ছোট-বোয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা সত্যই তো বাছা, বেটাছেলে অমন কত রকমে পয়সা ওড়ায়। আমার ও তো সোনার চাঁদ, কোন বদ্‌খেয়াল নাই। তা যদিই খেয়ালের মাথায় কিছু ক'রে থাকে, তাই নিয়ে কি ঝগড়াঝাটী কত্তে হয়?"

ছোট-বৌ কোন উত্তর করিল না। পিসীমা তখন অমূল্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যা বাছা, ঘরে যা।"

অমূল্য মাথা নাড়িয়া জোর গলায় বলিল, "ঘরে আর আমি যাচ্ছি না, আমি বাড়ীছাড়া হব, দেশত্যাগ করবো।"

পিসীমা হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "পাগলা ছেলে! ওরে, ঘর করতে গেলে হাঁড়ী-কলসীতেও অমন ঠোকা-ঠুকি হয়। যা ঘরে যা, হিমে আর থাকিস্ না, ঠাণ্ডা লাগবে।"

পিসীমা গিয়া আপনার ঘরের দরজা বন্ধ করিলেন। অমূল্যচরণ বসিয়া বসিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "লাগুক ঠাণ্ডা, হোক্ না অসুখ, আমি মরবো। আমি আজ এই বাঁরেকই প'ড়ে থাকবো।"

ছোট-বৌ ঘর হইতে বাহিরে আসিল, স্বামীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "উঠে এস।"

হাতটা জোরে ছিনাইয়া লইয়া অমূল্য অভিমানের স্বরে বলিল, "কখনই যাব না।"

ছোট-বৌ বলিল, "আমি অবুঝ মেয়েমানুষ, আমার কথায় রাগ করে?"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া অমূল্য বলিল, "রাগ করে! তুমি আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলবে, আর আমি রাগ করবো না?"

ছোট-বৌ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অমূল্য বলিল, "দেখ, তুমি আমাকে দাদা পাওনি যে, স্ত্রীকে ইষ্টগুরু মনে করবো। তুমি যে আমার কথায় উপর কথা কইবে, সেটি হবে না।"

ছোট-বৌ বলিল, "আমার অন্যায় হয়েছে, আর কখন কথা কইবো না।"

অমূল্য বলিল, "আমাকে ছুঁয়ে দিব্য কর।"

ছোট বৌ স্বামীর পায়ে হাত দিয়া বলিল, "এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, তুমি যা ইচ্ছা—"

ছোট বৌ আর বলিতে পারিল না, অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল। অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সশব্দপদক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুই তিন মাস গোকুলদার কোন সংবাদ না পাইয়া যোগেনবাবু যখন পত্র লিখিয়া তাহার সংবাদ লইবে কি না ভাবিতেছিল, তখন সহসা এক দিন গোকুল স্বয়ং তাহার বাটীতে উপস্থিত হইল। যোগেনবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন না। ভৃত্যেরা তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে ভিক্ষাপ্রার্থী ব্যতীত অন্য কিছু স্থির করিতে পারিল না। তাহারা স্পষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিল যে, বাবু বাড়ীতে উপস্থিত নাই, থাকিলেও এখানে ভিক্ষা-শিক্ষা কিছু মিলিবে না।

গোকুল বলিল, "ওহে বাপু, আমি ভিখারী নই, তোমাদের বাবুর বন্ধু। বাবুর সঙ্গে আমার একবার দেখা করা দরকার। আমাকে বসবার একটু জায়গা দাও।"

ভৃত্যেরা কিন্তু গোকুলকে বাবুর বন্ধু বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সুতরাং তাহাকে বসিবার স্থান দেওয়াও যুক্তি-সঙ্গত বোধ করিল না। গোকুল বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িল। ছি ছি, এমন স্থানেও মানুষ আসে, যেখানে চাকরেরা পর্য্যন্ত বসিবার জায়গা দিতে চায় না? এমন কদর্য্য স্থানে এমন ইতরপ্রকৃতির লোকজন লইয়া যোগীর বাস। ঘোর বিরক্তির সহিত প্রস্থানের উপক্রম করিয়া গোকুল বলিল, "আচ্ছা বাপু, আমি এখন চল্লাম। তোমাদের বাবু এলে বলবে যে, আমি এসেছিলাম। আমার নাম গোকুল চক্রবর্ত্তী। বুঝলে—গোকুল চক্রবর্ত্তী।"

গোকুল প্রস্থানোদ্যত হইল, কিন্তু তাহার যাওয়া হইল না, সহসা সম্মুখে অনিলাকে দেখিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। অনিলা বেড়াইয়া আসিয়া সবে মাত্র বাড়ী ঢুকিতেছিল, এমন সময় ভৃত্যদের সহিত এক জন অপরিচিত আগন্তুককে জোরে জোরে কথা কহিতে দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। তার পর আগন্তুকের মুখে তাহার নাম শুনিয়া বুঝিতে পারিল, লোকটা কে। সে স্বামীর মুখে গোকুলের নাম অনেকবারই শুনিয়াছিল এবং তাহার সহিত স্বামীর সম্পর্ক কিরূপ, তাহাও জানিত। সুতরাং সে একটু ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইয়া গোকুলকে সহাস্যে নমস্কার করিয়া বলিল, "কিছু মনে করবেন না, ওরা তো আপনাকে চেনে না।"

তার পর ভৃত্যদের দিকে ফিরিয়া, বসিবার ঘরে বাবুকে বসাইতে আদেশ দিয়া অনিলা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ

করিল। গোকুল বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাহার পাদুকা-মণ্ডিত পদদ্বয়ের চঞ্চল গতির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার আদেশ-প্রদানের ভঙ্গী এবং ভৃত্যদের সন্ত্রস্ত ভাব দেখিয়া গোকুলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ইনিই বাটীর কর্ত্রী। ভৃত্যেরা সম্মানের সহিত গোকুলকে বসিবার ঘরে লইয়া গেল। সে ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া গোকুল যোগীর সহিত আপনার অবস্থার পার্থক্য বেশ বুঝিতে পারিল।

একটু পরে অনিলা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সেই ঘরে ঢুকিল, এবং গোকুলের সম্মুখে আসিয়া সহাস্য-মুখে বলিল, "আপনাকে বোধ হয়, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে?"

এরূপ স্বাধীনা শিক্ষিতা মহিলার সহিত সাক্ষাৎ কথোপকথনে গোকুল বড় একটা অভ্যস্ত ছিল না। সে মাথা নীচু করিয়া একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিল, "হাঁ, না, বড় বেশীক্ষণ নয়। তবে আপনি না এসে পড়লে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হ'তো আর কি। আপনাদের চাকর-বাকরেরা দেখছি খুব নেমকহালাল।"

অনিলা বলিল, "ওদের দোষ নাই। ওরা তো আপনাকে চিনে না।"

গোকুল বলিল, "তা হ'লে দেখছি, আপনাদের আগে ওদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে রাখা দরকার।"

গোকুল হাসিতে লাগিল। অনিলাও একটু লজ্জার হাসি হাসিল। গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "যোগী ফিরবে কখন্?"

দেওয়ালে ঝুলান ঘড়াটার দিকে চাহিয়া অনিলা বলিল, "আর ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরবেন।"

একটু অস্বস্তির ভাব দেখাইয়া গোকুল বলিল, "তাই তো, এক ঘণ্টা, সে তো প্রায় সন্ধ্যা। আমাকে আবার খিদিরপুর যেতে হবে।"

তাহার শুষ্ক মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া অনিলা বলিল, "আপনার বোধ হয় এখনো খাওয়া নি?"

গোকুল বলিল, "না, ট্রেণ থেকে নেমে বরাবর এইখানে আস্‌ছি।"

অনিলা আর কিছু না বলিয়াই বাহির হইয়া গেল, এবং একটু পরেই চাকরের হাতে এক থালা জলখাবার সাজাইয়া আনিয়া ঘরে ঢুকিল। জলখাবার দেখিয়াই অনিলা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গোকুল ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "ও সব কি? না না, জল খাওয়া, ও সব থাক্।"

সহাস্যে অনিলা বলিল, "তাও কি হয়, বেলা চারটে বাজে, এখনও আপনার কিছু খাওয়া হয় নি।"

জোরে মাথা নাড়িয়া গোকুল বলিল, "তা হোক, ও রকম আমাদের অভ্যাস আছে। না না, ও সব আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।"

একটু কুণ্ঠিতভাবে অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, "খেতে কিছু দোষ আছে কি?"

ব্যগ্রস্বরে গোকুল বলিল, "দোষ? দোষ আছে বৈ কি। আমি হলাম হিন্দু, আপনারা হলেন ব্রাহ্ম। দোষ একটু আছে বৈ কি। না না, এখানে আমি কিছু খেতে পার্‌বো না।"

অনিলার মুখখানা লজ্জায়—অপমানে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে চাকরকে ইঙ্গিত করিল। চাকর খাবার লইয়া চলিয়া গেল। অনিলা মুখ নীচু করিয়া অন্য-মনে চেয়ারখানা নাড়িতে লাগিল।

চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু আসিয়াছেন। অনিলা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গোকুলদা যে এ বাড়ীতে আসিবে, ইহা যোগেন্দ্র-নাথ কখনও ভাবেন নাই। কিন্তু সহসা তাহার আগমন-সংবাদ শ্রবণে তিনি শুধু বিস্মিত হইলেন না, গোকুলদার একটা অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে আশঙ্কা করিয়া ভয়ও পাইলেন। গোকুলদা যে সংস্কারের বশে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সম্পর্কটাও অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, অদৃষ্টচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে গোকুলদা সেই সুদৃঢ় সংস্কারটাকে মনের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া কিরূপে যে আপনার হীনতা প্রতিপন্ন করিতে আসিল, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল।

ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্রনাথ বসিবার ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গোকুল একটা হর্ষ-সূচক শব্দ করিয়া ব্যস্তভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে গেল। কিন্তু একটু উঠিয়াই সহসা যেন আত্মসংবরণ করিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িল। যোগেন্দ্রনাথ ধীর-গম্ভীরভাবে একখানা চৌকী টানিয়া লইয়া বসিলেন। টেবিলের উপর একখানা ইংরাজী খবরের কাগজ ছিল, গোকুল সেখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কত কাল পরে উভয় বন্ধুর মধ্যে সাক্ষাৎ, কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই, যেন পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় বসিয়া শুধু নীরবে স্মৃতির দংশন সহ্য করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে যোগেন্দ্রনাথ কথা কহিলেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ গোকুলদা ?"

কাগজখানার উপর দৃষ্টি রাখিয়া গোকুল উত্তর দিল, "মন্দ কি ?"

যো। আমি কিন্তু তোমার অবস্থাটা একটু মন্দ ব'লেই শুনেছিলাম।

গো। অবস্থার কথা ছেড়ে দাও। মানুষের অবস্থা কি চিরদিন সমান থাকে ?

গোকুল বক্রকটাক্ষে যোগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল।

যো। তা থাকে না, কারণ, মানুষ অনেক সময় বুদ্ধির দোষে দুরবস্থাকে ডেকে আনে।

হাসিতে হাসিতে গোকুল বলিল, "মুনীনাঞ্চ মতি-ভ্রমঃ।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ কি মনে ক'রে ? মতিভ্রমের বশে না কি ?"

গোকুল বলিল, "না, ভ্রমসংশোধনের জন্য। তোমার টাকাটার একটা বন্দোবস্ত করতে।"

গো। কি রকম বন্দোবস্ত করতে চাও ?

গো। সেইটাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

গো। আমাকে ?

গো। হাঁ। কিন্তু তার আগে আমার বর্তমান অবস্থাটা তোমার শোনা দরকার।

যো। না শুনলে কি চলে না ?

"না" বলিয়া গোকুল আপনার অবস্থা একে একে বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথ গম্ভীর-ভাবে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন। গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি উপায়ে তোমার ঋণটা শোধ যেতে পারে, তোমার কাছে তারই পরামর্শ চাই।"

যোগেন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া ঈষৎ রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আমার এই টাকা কয়টা শোধ করাই কি তোমার সব চেয়ে দরকারী হয়ে পড়েছে ?"

গোকুল বলিল, "ঋণমুক্ত হওয়ার চেয়ে আর কোন দরকারী কাজ জগতে আছে কি না, জানি না।"

কঠোরস্বরে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু তুমি যে সম্পূর্ণরূপে পথে ব'সেছ, সেটাও জানা উচিত।"

স্থির-গম্ভীরস্বরে গোকুল বলিল, "পথে বসলেও তোমার কাছ ছাড়া আমি কারো এক পয়সা ধারি না যোগী।"

যো। স্ত্রী কোথায় ?

গো। বাপের বাড়ীতে।

যো। কত দিন সেখানে থাকবেন ?

গো। যত দিন তাঁর ইচ্ছা।

যো। তিনি কি ইচ্ছা ক'রেই সেখানে গিয়েছেন ?

গো। কতকটা ইচ্ছায়, কতকটা দায়ে প'ড়ে।

যো। কতকটা নয় গোকুলদা, সম্পূর্ণ দায়ে পড়েই গিয়েছেন।

গোকুল নীরবে খবরের কাগজখানা লইয়া নাড়িতে লাগিল। যোগেন্দ্রনাথ ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তাঁর প্রতিও কি তোমার কোন কর্তব্য নাই ?"

গোকুল মুখ তুলিয়া চাহিল। স্থির-প্রশান্তস্বরে বলিল, "জগতে কর্তব্যের শেষ নাই যোগী। কিন্তু মানুষের শক্তি এত ক্ষুদ্র যে, সকল কর্তব্য সম্পন্ন কর্বার সুযোগ সে পায় না।"

যো। তা হ'লেও নিজের অক্ষমতার দোহাই দিয়ে তোমার মত কেউ বিবাহিতা স্ত্রীকে পথে বসায় না।

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "তুমি রাগ ক'রো না যোগী, আমি সত্যই অক্ষম।"

ক্রোধরুদ্ধ-কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এত অক্ষম যে, বন্ধুর উপর নির্ভর করার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছ।"

গোকুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভয় নাই গোকুলদা, আমার এই টাকা কয়টার জন্য তোমার আপাততঃ জেলে যাবার সুযোগ হবে না।"

গোকুল উঠিয়া দাঁড়াইল, শান্তস্বরে বলিল, "তুমি এখন রেগেছ যোগী, আমি আর এক সময় আসব।"

যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোথায় যাবে ?"

গো। খিদিরপুরে।

যো। সেখানে কে আছে ?

গো। সেখানে আমাদের গাঁয়ের জগন্নাথ পালের দোকান আছে। আজ সেখানে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করবো।

যো। তার পর ?

গো। তার পর একটা কাজকর্ম্ম যোগাড় ক'রে নিতে হবে।

"যাও" বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

গোকুল প্রস্থানোদ্যত হইল। দরজার কাছে গিয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল, ধীর-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "একটা কথা ব'লে যাই যোগী, তুমি আমাকে যতটা অকৃতজ্ঞ মনে করেছ, বাস্তবিক আমি ততটা অকৃতজ্ঞ নই। জগতে যদি আমি কারো উপর নির্ভর দিতে পারি, সে তুমি। কেন না, তুমি ছাড়া আমার ব'লে পরিচয় দেবার আর আমার কেউ নাই।"

গোকুলের স্বরটা রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

গোকুল চলিয়া গেলে যোগেন্দ্রনাথ কতক্ষণ যে সংজ্ঞাহীনভাবে বসিয়া ছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে চাকরে আলো দিয়া গিয়াছিল, অনিলা আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু কোন দিকেই তাঁহার হুঁস ছিল না। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে যেন অতীতের কোন এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সহসা অনিলার কণ্ঠস্বরে তাঁহার চৈতন্য হইল। অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বন্ধু চ'লে গেছেন?"

যোগেন্দ্রনাথ চমকিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অনিলা একটু তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এ রকম বন্ধু আর কতগুলি আছেন?"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দুর্ভাগ্যের বিষয় অনিলা, আর একটিও নাই।"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া অনিলা বলিল, "আমি কিন্তু এই 'নাই'টাকেই সব চেয়ে সৌভাগ্য বিবেচনা করি।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার বিবেচনায় আমার বোধ হয় কিছু আসে যায় না।"

অনিলা তীব্র ভ্রূকুটি করিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "গোকুলদা কেন এসেছিল জান?"

অনিলা বলিল, "সেটা জানা আমি তত প্রয়োজন বোধ করি নাই।"

যোগে। প্রয়োজন আছে। মাসকতক আগে ছ'শো টাকা দিয়ে আমি তাকে ঋণমুক্ত করেছিলাম।

অনি। বন্ধুর উপযুক্ত কাজ করেছিলে।

যোগে। গোকুলদা কিন্তু সেটাকে বন্ধুত্বের দান ব'লে স্বীকার করে নাই, ঋণস্বরূপেই গ্রহণ করেছিল।

অনি। আজ কি সেই ঋণ শোধ করতে এসেছিল?

যোগে। পরিশোধ কর্‌বার সামর্থ্য আপাততঃ নাই, কি উপায়ে পরিশোধ হ'তে পারে, তারই পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছিল।

অনি। তোমাকে?

গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি ছাড়া আর কেউ যে তার বন্ধু আছে, এ কথা সে স্বীকার করে না।"

ঈষৎ শ্লেষের হাসি হাসিয়া অনিলা বলিল, "অথচ বন্ধুর কৃতজ্ঞতার দানটুকুও গ্রহণ কর্‌তে পারে না?"

এই শ্লেষটুকু যোগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, বুঝিয়া একটু রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "আমাদের সাধারণ ধারণার অতীত এমনও লোক আছে অনিলা, যারা শুধু দান কর্‌তে চায়, প্রতিগ্রহ কর্‌তে কুণ্ঠা বোধ করে।"

অনিলাও স্বরে একটু জোর দিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার ঐ সঙ্কীর্ণচিত্ত হিন্দু বন্ধুটির ভিতর যে এতটা উদারতা আছে, এই কথাটাই কি আমাকে বুঝাতে চাও?"

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি বুঝাইতে চাইলেও তুমি বুঝ্‌বে না। কারণ, তোমার বিশ্বাস, জগতের উদারতা নামক পদার্থটি তোমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মেরই একচেটিয়া ব্যবসায়।"

ক্রুদ্ধভাবে অনিলা বলিল, "তুমি আমাকে নিন্দা কর্‌তে পার, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মকে নিন্দা কর্‌তে পার না। কারণ, স্বেচ্ছায় না হউক, অনিচ্ছাতেও তুমি এখন সেই ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাক্‌তে বাধ্য হয়েছ।"

উত্তেজিত-কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এটাকে আমি আমার দুর্ভাগ্য ব'লেই মনে করি অনিলা।"

শ্লেষপূর্ণস্বরে অনিলা বলিল, "কিন্তু দুর্ভাগ্যটুকু

স্বীকার না কর্‌লে আজ বোধ হয়, বন্ধুকে জেল হ'তে মুক্ত কর্‌বার সৌভাগ্য লাভ কর্‌তে পার্‌তে না।"

যোগেন্দ্রনাথ কঠোরদৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। অনিলা সমান তীব্রকণ্ঠে বলিল, "এজন্যও অন্ততঃ তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত।"

হতাশভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে জন্যে ধর্ম্মের কাছে না হউক, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ উচিত বটে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার জন্যই কি তুমি একটা ত্যাগ স্বীকার করেছিলে?"

যোগেন্দ্রনাথ দুই হাতে মাথা টিপিয়া ব্যথিত-কণ্ঠে বলিলেন, "এত দিন পরে সে কথাটা তোমাকে বুঝাতে চাই না অনিলা।"

অনিলা বলিল, "বুঝাবার চেষ্টা কর্‌তে, যদি সেটা একটা খুব বড় মিথ্যা না হ'তো।"

যোগেন্দ্রনাথ তীব্রদৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "হাঁ অনিলা, তার চেয়ে মিথ্যা, তার চেয়ে ভুল আমার জীবনে আর হয় নাই।"

মুহূর্ত্তে অনিলার মুখখানা যেন বরফের মত সাদা হইয়া গেল। সামান্য তর্কের মুখে যোগেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া এমন একটা কঠোর সত্য বাহির হইয়া পড়িবে, ইহা সে প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু আজি তাহারই নির্ব্বুদ্ধিতায় এই অপ্রত্যাশিত কঠোর সত্যটা যখন যোগেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া বেশ সহজ-ভাবেই বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার ক্ষুব্ধ অন্তর হইতে এমনই একটা তীব্র তিরস্কারের বেদনা উত্থিত হইল যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার মাথাটা নীচু না হইয়া থাকিতে পারিল না। অথচ তাহার সব চেয়ে লজ্জাজনক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, যোগেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ কঠোর-দৃষ্টিতে তাহার এই অপ-মানক্ষুব্ধ ব্যথিত ভাবটাকে লক্ষ্য করিতেছেন, তাহার অন্তরের সমস্ত লজ্জা, সকল ক্ষোভ যেন মুদ্রিত পুস্তকের উদ্‌ঘাটিত পৃষ্ঠার ন্যায় যোগেন্দ্রনাথের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অনিলা মুখ ফিরাইতে পারিল না, সে জোর করিয়া মুখে একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য আনিয়া স্বামীর গর্ব্বোজ্জ্বল দৃষ্টির সমক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময়ে গোকুল ব্যস্তভাবে "যোগী, যোগী" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। যোগেন্দ্রনাথ ও অনিলা উভয়েই চমকিতভাবে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

— —

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নদী যখন প্লাবনপুষ্ট হইয়া পূর্ণবেগে বহিয়া যায়, তখন সে আপনার পরিপূর্ণতার উচ্ছ্বাসে এতই অধীর হইয়া পড়ে যে, সে আপনাকেও স্থির রাখিতে সমর্থ হয় না, আপনার দুর্দ্দম বেগ আপনিই রোধ করিতে না পারিয়া উভয় কূল প্লাবিত করিতে থাকে। শেষে প্লাবনবেগ যখন হ্রাস পাইয়া আইসে, তখন সে আপনার কর্দ্দমাক্ত আবর্জ্জনাপূর্ণ সৈকত, বিদীর্ণদেহ তীরভূমি দেখিয়া আপনি শঙ্কিত হয় লজ্জায় আপনার সঙ্কীর্ণ খাতমধ্যে আত্মগোপন করিবার জন্য যেন ব্যস্ত হইয়া উঠে।

ভ্রাতৃগৃহে আসিবার পর পার্ব্বতীর অবস্থাও অনেকটা এইরূপ হইল। অভিমানে আত্মহারা হইয়া সে সকলকে ঠেলিয়া শুধু আপনি সংসারে মাথা উঁচু করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টার পরিণাম কি শোচনীয় হইয়াছে। আজি সে কত নিম্নে। অনুচরগণের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও সেটা তাহারই শোচনীয় পরাজয়ের বীভৎস কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নহে। সে আপনার যে সৌন্দর্য্যকে বিশ্ববিজয়ী জ্ঞান করিত, এবং গোকুলের মত স্বামীকে যাহার পাশে দাঁড়াইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মনে করিত, তাহার সেই অসামান্য রূপগর্ব্বের কি নিদারুণ পরা-ভব। গোকুলের মত লোক তাহার এই অসীম সৌন্দর্য্য-রাশিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যাইবে, ইহা অপেক্ষা তাহার রূপগর্ব্বের লজ্জাজনক ব্যর্থতা আর কি হইতে পারে? স্বামী তাহার সকল গর্ব্ব, সকল অভিমান চূর্ণ করিয়া দিয়া আর একজনের উপাসনায় রত হইল, আর সে সেই উপেক্ষিত ব্যর্থ সৌন্দর্য্য লইয়া, পরাজয়ের নিদারুণ কালিমা মুখে মাখিয়া পলাইয়া আসিল। ধিক্, আজ সে কত নিম্নে!

পার্ব্বতী দেখিল, তাহার এখানে পলাইয়া আসাই সব চেয়ে ভুল, সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যদি সেখানে দাঁড়াইয়াই এই পরা-জয়ের ক্ষোভটাকে সহিষ্ণুভাবে মাথা পাতিয়া লইতে

পারিত, তাহা হইলে হয় তো অপমানের এত তীব্র কশা তাহাকে সহ্য করিতে হইত না। পার্ব্বতীর সব চেয়ে ভয় হইল, এখানকার কেহ যদি এমন অস্বাভাবিক পরাজয়ের কথাটা শুনিতে পায়, তাহা হইলে গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর তাহার উপায়ান্তর থাকিবে না। পার্ব্বতী বড় ভয়ে, বড় সঙ্কোচে দিন কাটাইতে লাগিল।

সোনার মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁলা নাতনী, এই সে দিন গেলি, আবার এরি মধ্যে যে পাঠিয়ে দিলে ?"

পার্ব্বতী বলিল, "পাঠাবে আর কে ? আমার ইচ্ছা হ'লো, চ'লে এলাম।"

সোনার মা বলিল, "চ'লে তো এলি, কিন্তু নাতি ছেড়ে দিলে ?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, 'ছাড়বে না তো ধ'রে রাখবে ?"

সোনার মা সহাস্যে বলিল, "ধ'রে নয় লো, বেঁধে রাখবে। এমন সমস্ত বয়েস, তাতে ফাগুন মাসের দখিণ হাওয়া, আর নাতি তোকে বুক ধ'রে ছেড়ে দিলে ? কে জানে ভাই, মিন্‌ষের কি রকম আক্কেল।"

পার্ব্বতী বলিল, "আক্কেল তার খুব ভাল ঠান্‌দি, কিন্তু তাই ব'লে আমি তোমাদের দেখতে আস্‌ব না ?"

সোনার মা বলিল, "আস্‌বি না কেন ভাই, জন্ম জন্ম আস্‌বি, কিন্তু সে ছেড়ে দিলে তবে তো আস্‌বি।"

পা। বল্‌লাম তো, আমি নিজে এসেছি।

মুখ মচকাইয়া সোনার মা বলিল, "কে জানে ভাই, তোদের আজকালকার ভালবাসা কেমনতর। আমাদের বয়সে—হায় রে, অমন বয়সে চক্ষের আড় কর্‌তে চাইতো না।"

পার্ব্বতী বলিল, "গলায় কবচ ক'রে ঝুলিয়ে রাখত না কি ?"

সোনা মা। তার চেয়েও কিছু বেশী। চোখের কাজল ক'রে রাখতো। তবে শোন্ একদিনের কথা বলি, তখন সোনা কোলে। তিন বচ্ছর বাপের বাড়ী যাইনি, মনটা বড় খারাপ হ'লো, মিন্‌ষেকে বল্‌লাম। মিন্‌ষে বল্‌লে, তা এক কাজ কর ছোট বৌ, আমার তো বেশী দিন থাক্‌লে চল্‌বে না, চল, দিন তিনেকের মত তোমায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। আমি অবাক্ হ'য়ে বল্‌লাম, 'ও মা, তুমি যাবে কেন গো।' মিন্‌ষে বল্‌লে, "আমি না গেলে তোমায় হেঁপাজাত ক'রে নিয়ে যাবে নিয়ে আসবে কে ?' আমার তাই বড্ড রাগ হ'লো, কতকগুলো তিরস্কার কল্লুম, যা মুখে এলো, তাই বল্লুম। মিন্‌ষে গুম হ'য়ে রইল। আমিও জেদ ধর্‌লুম যাব। যাবার দিন ঠিক হ'লো, মিন্‌ষে কর্‌লে কি জান, আমাদের বাড়ীর কাছে একটা এঁদো ডোবা ছিল, মাছ ধরার অছিলে ক'রে মিন্‌ষে তাতে সাতগণ্ডা ডুব দিয়ে এল। সকালে যাবার জন্যে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে দেখি, মিন্‌ষে কাঁথা মুড়ি দিয়ে হুঁ হুঁ কচ্চে। আমাকে দেখে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বল্‌লে, 'আমার বিকার হয়েছে ছোট-বৌ, সন্নিপাতে ধিরেছে, আমি মর্‌বো।' আমার তো শুনেই চিত্তির। কবরেজ ডাক্‌তে পাঠালাম, মিন্‌ষের পায়ের উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে বল্‌লাম, 'ওগো, তুমি ম'রো না, আমি আর কখন কোথাও যাবার নাম কর্‌বো না।' মিন্‌ষে সে যাত্রা বেঁচে গেল বটে, কিন্তু যমে মানুষে টানাটানি কত্তে হ'লো।

পার্ব্বতী স্তব্ধভাবে বসিয়া সোনার মা'র এই ভালবাসার উপাখ্যান শুনিল, শুনিতে শুনিতে তাহার চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিল। সোনার মা উপাখ্যান শেষ করিয়া দুঃখের সহিত বলিল, "কে জানে ভাই, তোমাদের আজকাল কেমনতর ভাব। আমাদের সে এক কালই গেছে।"

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের পার্থক্য বিচার করিতে করিতে সোনার মা প্রস্থান করিল, পার্ব্বতী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সোনার মা'র কথাগুলা মনে মনে ভাবিতে লাগিল।

পার্ব্বতী ভাবিল, দূর হউক, সেখানে ফিরিয়া যাই। কিন্তু কোথায় যাইবে ? মাথা রাখিয়া দাঁড়াইবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত যে নাই। তা ছাড়া কাহার নিকট যাইবে ? যে তাহাকে চায় না, তাহার এমন রূপ-যৌবন সকল পদদলিত করিয়া অন্যের দ্বারস্থ হইতে লজ্জা বোধ করে না, তাহার নিকট গিয়া কোন্ মুখে বলিবে, "ওগো, আমাকে তোমার পায়ে একটু স্থান দাও।" হউক সে স্বামী, কিন্তু তাহার নিকট এতটা দৈন্য স্বীকার করিতে পার্ব্বতীর সমগ্র অন্তঃকরণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

সোনার মা'র বর্ণিত উপাখ্যানটা সত্য, না গল্প মাত্র ? স্বামী কি স্ত্রীর জন্য এতটা করিতে পারে ? কৈ, তাহার পিত্রালয়ে আসিবার প্রস্তাবে স্বামী তো একটুকুও আপত্তি প্রকাশ করিল না, বরং যেন খুব

সহজভাবেই তাহাতে সম্মতি দিয়াছিল। সে যে তাহার কোন প্রয়োজনের মধ্যেই নহে, তাহার দানটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে স্বামী নিতান্ত কুণ্ঠিত, স্বামীর প্রতি কথায়, প্রত্যেক আকার ইঙ্গিতে এমনই ভাবের প্রকাশ। পার্ব্বতী সেই স্বামীর নিকট কি রয়া যাইবে?

স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে দুর্ভাগ্য বলিয়া জানিলেও পার্ব্বতী কিন্তু জোর করিয়া সেটাকে স্বীকার করিয়া লইতে চাহিল না। অপরের ভালবাসার উপর নির্ভর করাকে সে হৃদয়ের একটা দুর্ব্বল বৃত্তি বলিয়াই স্থির করিয়া লইল। তথাপি সে লোকের নিকট ইহা প্রকাশ করা নিতান্ত দৈন্য স্বীকার করা বলিয়াই বুঝিয়াছিল। সুতরাং সে সযত্নে আপনার দৈন্যটুকু গোপন করিয়া চলিতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পার্ব্বতী শুধু একজনের কাছে ধরা পড়িয়াছিল। যতীন রায় আপনার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিপ্রভাবে পার্ব্বতীর এই আত্মদৈন্য গোপনের চেষ্টাটা সহজেই ধরিয়া ফেলিয়াছিল। ধরিতে পারিলেও সে কিন্তু কোন দিনই আপনার এই বুদ্ধির গৌরব প্রকাশ করে নাই, বরং সে যেন কিছুই বুঝে নাই, এমনই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিত। যতীন প্রায় প্রত্যহই বেড়াইতে আসিত, পার্ব্বতীর সহিত গল্প করিত, কিন্তু ভ্রমক্রমেও তাহার স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত না।

যতীনের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। বিবাহের পর দেনা-পাওনার তর্ক-বিতর্ক ক্রমে বিবাদে পরিণত হইলে, যতীন পিতার আজ্ঞায় স্ত্রীকে ত্যাগ করিল। স্ত্রী পিত্রালয়ে আশ্রয় লইল। যতীন স্বচ্ছন্দবিহারী প্রজাপতির ন্যায় আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিল। স্ত্রীকে ত্যাগ করার জন্য কেহ কিছু বলিলে যতীন গর্ব্ব-স্ফীত কণ্ঠে বলিত, "পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তকচ্ছেদন করেছিলেন, আর আমি স্ত্রী ত্যাগ করবো, এ কি বেশী কথা। আমরা আর্য্যসন্তান, আমাদের পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ ইত্যাদি।"

তাহার ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হইত। পিতাও তখন স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারূঢ়। যতীন পিতার পিণ্ডদানের সঙ্গেই চাকুরীরও পিণ্ডদান-কার্য্য শেষ করিয়াছিল। পিতা নাজিরী করিয়া যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইবার পক্ষে আপাততঃ কোন অন্তরায় ছিল না। সুতরাং যতীনের দিনগুলা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিতেছিল।

একদিন পার্ব্বতী যতীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ যতীনদা, বিয়ে করলে, কিন্তু বৌ নিয়ে ঘর করবে না?"

যতীন বিজ্ঞভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "বিবাহ একটা প্রধান সংস্কার, সেই সংস্কারের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন, স্ত্রী নিয়ে ঘর করার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।"

পার্ব্বতী বলিল, "কিন্তু সংসারের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে।"

উদাসস্বরে যতীন বলিল, "সংসার! যেখানে ভালবাসার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানে কিসের সংসার পারু?"

পা। ভালবাসাটাও আকাশকুসুম নয়, ভালবাসলেই ভালবাসা জন্মে।

য। তা হয় না পারু, মনের সঙ্গে জোর চলে না। তোমার হাতের ঐ বংখানা দেখ, ওর সাদা কাগজের উপর একবার যে ছাপ পড়েছে, তা আর কিছুতেই মুছবে না। এখন ওর উপর আর একটা ছাপ দিতে গেলে দুইটা' গোলমাল হয়ে যাবে।

বিস্মিতভাবে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মনের উপর কি আগেই ছাপ পড়েছে?"

করুণ দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া যতীন ব্যথিত-কণ্ঠে বলিল, আমাকে "কি পরীক্ষা কচ্চো পারু?"

পার্ব্বতী শিহরিয়া দৃষ্টি নত করিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ও সব ছেলে-মানুষীর কথা ভুলে যাও যতীনদা।"

বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া যতীন বলিল, "জগতে ভালবাসার চেয়ে আমি কোন বিজ্ঞতাকেই উচ্চ আসন দিতে পারি না।"

পা। কিন্তু যাকে বিয়ে করেছ, তার প্রতিও তো তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে?

য। সে কর্ত্তব্য আমি ভুলি নাই, তার খোরপোষের বন্দোবস্ত ক'রে দেব।

পার্ব্বতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সত্যই কি

যতীন এখনও তাহাকে ভালবাসে? তাহাকে ভালবাসিয়াই কি সে সংসারে সন্ন্যাসী সাজিয়া থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছে? পার্ব্বতীর বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু কথাটা ভাবিতে তাহার মনটা যতীনের উপর করুণায় আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে মুখ তুলিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমার কথা শুন্‌বে যতীনদা?"

যতীন বলিল, "বল।"

পা। বৌকে নিয়ে ঘর-ঘরকন্না কর।

য। তার পর?

পা। একসঙ্গে থাক্‌তে থাক্‌তেই ক্রমে ভালবাসা জন্মাবে। তুমি একটা স্বপ্ন নিয়ে মুগ্ধ হয়ে আছ। কিন্তু দেখ্‌বে, বাস্তবের কাছে এই স্বপ্নের ঘোর দু'দিনে কেটে যাবে।

মৃদু হাসিয়া যতীন বলিল, "তাই যায় না কি?"

পার্ব্বতী বলিল, "নিশ্চয়। পরীক্ষা ক'রেই দেখ না।"

যতীনের হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানা মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া আসিল। সে স্থির দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া করুণ অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি তা পারব না পারু, স্বপ্ন হয় হোক, এই স্বপ্ন নিয়ে আমি জীবন-যাত্রা আরম্ভ করেছি, স্বপ্ন নিয়েই যাত্রা শেষ কর্‌বো। তবু বাস্তবের আঘাতে আমি আমার এমন আকাঙ্ক্ষিত সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গতে পারব না। আমি তোমার অনুরোধ রাখ্‌তে পার্‌লাম না পারু।"

যতীন একটা ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আর একবার পার্ব্বতীর মুখের উপর করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পার্ব্বতী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় বসিয়া রহিল। এখনও যতীন তাহাকে ভালবাসে; তাহারই জন্য সে নিজের জীবনটাকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করিয়া ফেলিয়াছে। যতীনের এই গভীর ভালবাসার নিকট পার্ব্বতী শ্রদ্ধাভক্তিতে মস্তক নত করিল। অনুতপ্ত হৃদয়ে ভাবিল, হায়, এক দিন সে এই যতীনের সমক্ষে গর্ব্বোন্নত বক্ষে দাঁড়াইয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার স্বরে বলিয়াছিল তাহাকে বিবাহ করিতে হইলে পার্ব্বতী গলায় দড়ি দিবে, বিষ খাইবে। পার্ব্বতীর বিষ খাওয়াই উচিত। যতীন কত উচ্চে, আর সে কত নিম্নে!

ভাবিতে ভাবিতে পার্ব্বতীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

যতীন তখন রাস্তায় আসিয়া হাসিতে হাসিতে আঙ্গুলের তুড়ীতে তাল দিয়া গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,

"যারো প্রাণ তারো হাতে
লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হোলে জিজ্ঞাসিব
সে নিলে কি আমায় দিলে,
যারো প্রাণ—হাঃ হাঃ!"

এমন এক আধ দিন নয়, যতীন প্রায়ই আসিয়া পার্ব্বতীর কানে ভালবাসার মন্ত্র ঢালিয়া দিত, এবং পার্ব্বতীকে ভালবাসিয়া সে যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিত। সে পর্ব্বতীকে বুঝাইত, তাহার এ ভালবাসা আকাঙ্ক্ষাশূন্য, সুখদুঃখ-বোধবিহীন নিষ্কাম ভালবাসা, ইহা কঠোর আত্মদানব্রত, আত্মবিসর্জ্জনেই ইহার উদ্‌যাপন। যতীন মদ খায় শুনিয়া পার্ব্বতী তাহাকে তিরস্কার করিল। যতীন উত্তর দিল, "যাহার জীবনে সুখ নাই, স্পৃহা নাই, সে মদ কোন্ ছার, বিষ পাইলে খাইতে পারে।"

যতীনের কথা শুনিতে শুনিতে পার্ব্বতীর মনের ভিতর এমন একটা তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল, যাহাতে পার্ব্বতী একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সময়ে সময়ে পার্ব্বতী দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিত, সে যতীনকে বিষধর বোধে দূরে পরিহার করিবে। সংকল্প কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইত না। একজাতীয় সর্প নিশ্বাসে আপনার ভক্ষ্য জীবকে কাছে টানিয়া আনে। যতীনও যেন নিশ্বাসে পার্ব্বতীকে কাছে টানিয়া আনিত। পার্ব্বতীর কোন দৃঢ়তাই সেখানে স্থায়ী হইত না।

পার্ব্বতী প্রথম প্রথম আপনার হৃদয়বলের উপর নির্ভর করিয়া ছিল। কিন্তু শেষে যখন দেখিল, সে একান্ত দুর্ব্বল, নিতান্ত অসহায়, যতীন আপনার কুহকপূর্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন নির্ম্মূল করিয়া তাহার সকল প্রবৃত্তির উপর আসন পাতিয়া বসিয়াছে, তখন সে মাথা কুটিয়া, কপালে হাত চাপড়াইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল, হায়, কেন আসিলাম! যতীনের পায়ে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেওয়া অপেক্ষা স্বামীর চরণে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া তাহারই পা জড়াইয়া কেন না পড়িয়া রহিলাম! কাঁদিতে কাঁদিতে আকুলকণ্ঠে পার্ব্বতী ডাকিল, "হে ভগবান্! হে দর্পহারী মধুসূদন!

আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমাকে বাঁচাও, আমার সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা কর।"

কিন্তু দেবতা বুঝি তাহার সকাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। যতীন চারিদিক্ হইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে উপক্রম করিল। পার্ব্বতী হতাশ হইয়া পড়িল।

এমনই সময়ে পার্ব্বতীর নামে একখানা পত্র আসিল। গোকুল লিখিয়াছে,—

"পারু, আমি কলিকাতায় আসিয়াছি, কিন্তু কঠিন রোগে শয্যাগত হইয়া পলে পলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। মুখে জল দিবার লোক নাই। উপরে ঠিকানা দিলাম, যদি পার, একবার আসিও। অন্ততঃ মৃত্যুকালে তোমাকে দেখিয়া মরিতে পারিব, ইতি—

তোমার হতভাগ্য স্বামী
শ্রীগোকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

পত্র পড়িয়া পার্ব্বতী স্তম্ভিত হইল। সে তখনই কলিকাতায় যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু কাহার সঙ্গে যাইবে? ভাই কলিকাতায়, সে শনিবারে বাড়ী আসিবে, আজ সবে মাত্র বুধবার। চারি দিন তো পার্ব্বতী অপেক্ষা করিতে পারে না। যতীন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু পার্ব্বতী একা যতীনের সঙ্গে যাইতে রাজি হইল না। অবশেষে ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে যুক্তি করিয়া স্থির করিল, রঘু মাইতির মাতাকে লইয়া যতীনের সঙ্গে যাওয়া হউক।

সেই দিন বৈকালের ট্রেণে পার্ব্বতী কলিকাতা যাত্রা করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পার্ব্বতী সমস্ত পথটা বড়ই উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত করিল। প্রত্যেক ষ্টেশনে গাড়ীতে কত নূতন লোক উঠিল, কত লোক গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। কত স্ত্রীলোক আসিয়া পার্ব্বতীর সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিল; পার্ব্বতী কিন্তু তাহাদের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিল না, আপনার চিন্তারাশি লইয়া সে চুপ করিয়া এক পাশে বসিয়া রহিল।

গাড়ী হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইলে, যতীন একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া পার্ব্বতী ও রঘুর মাকে লইয়া পত্রনির্দ্দিষ্ট ঠিকানার উদ্দেশে চলিল।

একখানা ছোট একতলা বাড়ীর দরজায় আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। যতীন গাড়ী হইতে নামিয়া দরজার কড়া নাড়িলে বাড়ীর ঝি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। যতীন বাড়ী ঢুকিবার আগেই পার্ব্বতী নামিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। ঝি তাহাকে লইয়া গিয়া একটা ঘরে বসাইল।

ঘরে ঢুকিয়া পার্ব্বতী ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা পাইল না। ঝি তাহাকে বসাইয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। পার্ব্বতী উৎকণ্ঠাপূর্ণ চিত্তে বসিয়া যতীনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে যতীন আসিল। আসিয়া বলিল, "মুখ-হাত ধুয়েছ পারু? ঝি কোথায় গেল?"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কোথায় আনলে যতীনদা?"

যতীন বলিল, "এটা আমার মেসোর বাড়ী। তাঁরা দেশে গিয়েছেন, তাই বাড়ী খালি প'ড়ে আছে।"

বিরক্তভাবে পার্ব্বতী বলিল, "কিন্তু এখানে আমাকে আন্‌বার কি দরকার ছিল?"

যতীন বলিল, "আজ রাত্রে তো গোকুল বাবুর ঠিকানা খুঁজে বার কর্‌তে পার্‌ব না, কাজেই এখানে আস্‌তে হলো।"

অতঃপর যতীন ঝিকে ডাকিয়া তাহার হাতে টাকা দিয়া খাবার আনিবার জন্য আদেশ দিল। ঝি চলিয়া গেলে সে পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রেঁধে খাওয়ার তো কোন যোগাড় নাই, কাজেই খাবার খেয়েই রাতটা কাটাতে হবে।"

পার্ব্বতী কোন উত্তর করিল না। সে দেখিল, রাঁধিয়া খাওয়ার যোগাড় ছাড়া আর সকল যোগাড়ই ঠিক হইয়া আছে। বিছানাপত্র, থালা-বাটী, আলো, মায় নূতন মাটীর কলসীতে জল পর্য্যন্ত তোলা আছে। পার্ব্বতী ভাবিল, যখন এ বাড়ীতে কেহ বাস করে না, তখন এ সকল যোগাড় কে করিয়া রাখিল? কেন করিল? তবে কি আগে হইতেই যতীন এ সকল ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল? কিন্তু মাত্র আজ সকালে তো সে স্বামীর পত্র পাইয়াছে, ইহার আগে তাহার কলিকাতায় আসিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। পার্ব্বতীর মনে একটা ঘোর সন্দেহের উদ্রেক হইল।

ঝি খাবার লইয়া আসিল। যতীনের অনেক অনুরোধে পার্ব্বতী সামান্যমাত্র জল খাইয়া রঘুর মাকে কাছে লইয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে সে একবারও চক্ষু বুজিতে পারিল না।

যতীন সকালে রঘুর মাকে বলিল, "গঙ্গাস্নান করবি না রঘুর মা?"

রঘুর মা পরের পয়সায় পুণ্যলাভের লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, সে যতীনের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে বাহির হইল।

অনেক বেলা হইলে মুটের মাথায় বাজার লইয়া যতীন ফিরিয়া আসিল, কিন্তু রঘুর মা ফিরিল না। পার্ব্বতী তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, যতীন আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিল, "সে কি, রঘুর মা এখনো ফেরে নি? আমি যে মোড় থেকে তাকে গলি দেখিয়ে দিয়ে বাজারে গিয়েছিলাম।"

বাজার রাখিয়া যতীন তাড়াতাড়ি রঘুর মাকে খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, মাগী নিশ্চয় রাস্তা ভুল ক'রে কোথায় গিয়ে পড়েছে। আমি থানায় খবর দিয়ে এসেছি, কোথাও না কোথাও পুলিশের চোখে পড়লেই তারা এখানে দিয়ে যাবে।"

পার্ব্বতী রঘুর মা'র জন্য বড়ই চিন্তিত হইল। সে কোন রকমে ভাতে ভাত রাঁধিয়া দিলে যতীন খাইয়া গোকুলের বাসা খুঁজিতে বাহির হইল। পার্ব্বতী ভাতের কাছে বসিল মাত্র।

আহারাদির পর ঝি কাছে বসিয়া পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাছা, তোমার বাড়ী কোথায়?"

পার্ব্বতী বাসগ্রামের নাম বলিল। ঝি বলিল, "তোমার সোয়ামী আছে?"

পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, আছে।"

ঝি। তিনি বুঝি তোমায় ভালবাসেন না, যন্ত্রণা দেয়?

পার্ব্বতী ভ্রূকুটি করিল। ঝি কিন্তু ভ্রূকুটির দিকে লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "তা কত মেয়ে সোয়ামীর কাছে, শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে যন্ত্রণা পেয়েও আসে। তা মা, বাবুর কি দেশে তালুক-মুলুক আছে?"

পার্ব্বতী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ বাবুর?"

ঝি বলিল, "যে বাবু তোমাকে এনেছেন গো! তা তালুক মুলুক বিষয়-আশয় না থাক্‌লে কি কেউ পরের মেয়েকে ঘরের বাইরে আনে? একটা মেয়েমানুষ পোষা নয় তো, হাতী পোষা।"

পার্ব্বতী শিহরিয়া উঠিল, তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল, গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। ঝি বলিল, "তা বাছা, একটু সাবধান হয়ে চল্‌বে। এখন যেন রূপ আছে, যৌবন আছে, কিন্তু রূপ-যৌবন তো চিরস্থায়ী নয়। এর পর—"

বাধা দিয়া পার্ব্বতী সগর্জ্জনে বলিল, "তুমি কি বল্‌ছো? আমার সোয়ামীর অসুখ শুনে আমি তাকে দেখতে এসেছি।"

ঝি মুখ মচকাইয়া একটু হাসিল। পার্ব্বতীর কথাটা যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, ইহাই যেন তাহার হাসি-টুকুর ভাব। বিশ্বাস না করিলেও সে পার্ব্বতীর কথা-তেই সায় দিয়া যেন অপ্রতিভভাবে বলিল, "বটে, তা বেশ করেছ বাছা। আহা, সোয়ামী জিনিস, তার অসুখ করেছে, দেখতে আস্‌বে বৈ কি।"

ঝি পান-দোক্তা গালে দিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। পার্ব্বতী বজ্রাহতার ন্যায় স্তব্ধ-ভাবে বসিয়া রহিল।

এ বলে কি? যতীনদা কি এই উদ্দেশ্যেই তাহাকে আনিয়াছে? ঝি কি তাহার সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য কোন-রূপে জানিতে পারিয়াছে? যতীনদা এতই বিশ্বাস-ঘাতক? অসম্ভবই বা কি। যে মদ খাইয়া কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ লইয়া দিন কাটায়, তাহাকে বিশ্বাস কি? ঝি নিশ্চয় উহার অভিসন্ধি অবগত আছে। নতুবা সে এমন কথা বলিতে সাহস করিবে কেন, এমন মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিবে কেন? পার্ব্বতীর ইচ্ছা হইল, ঝিকে ডাকিয়া সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু ঝি তখন চলিয়া গিয়াছে। পার্ব্বতী একা বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু ক্ষণপরেই স্বামীর পত্রের কথা মনে পড়িল। সত্যই তো, স্বামীর পত্র পাইয়া সে আসিয়াছে, যতীন তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে মাত্র। সুতরাং ইহাতে তাহার কি দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে? না না, যতীনদা কখনও এতটা অবিশ্বাসী হইতে পারে না। শুনা যায়, কলিকাতার ঝি মাগীরা প্রায়ই নষ্টচরিত্রের স্ত্রীলোক। এ আপনার নষ্টচরিত্রের প্রভাবেই একটা কুৎসিত কল্পনা করিয়া লইয়াছে। কোন স্পষ্ট প্রমাণ

না পাইয়া শুধু ইহার কথায় যতীনদাকে অবিশ্বাসী স্থির করিলে তাহার উপর নিতান্ত অবিচার করা হইবে। কিন্তু রঘুর মা? যতীনদা তাহাকে গঙ্গাস্নান করাইতে লইয়া গেল, তার পর সে আর ফিরিল না কেন? সত্যই কি সে রাস্তা ভুলিয়াছে? পার্ব্বতী একা বসিয়া মনের ভিতর নানা কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

পাশেই একখানা দোতলা বাড়ী। সহসা তাহার উপরকার ঘরের জানালাটা খুলিয়া গেল, এবং তাহার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল হাস্যধ্বনির সহিত গানের আওয়াজ পার্ব্বতীর কানে আসিল। পার্ব্বতী রোয়াকে দাঁড়াইয়া খোলা জানালার দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, এক অসংযত-বেশা সুন্দরী যুবতী জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া বেশ গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছে। পার্ব্বতী অবাক্ হইল। দেখিতে দেখিতে এক পুরুষ আসিয়া যুবতীর পাশে দাঁড়াইল। পার্ব্বতী সরিয়া আসিল। তখন পুরুষ ও রমণী হো হো শব্দে অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল; পার্ব্বতী ছুটিয়া ঘরের ভিতর পলাইয়া আসিল। তাহার বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে যতীন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জীবন মল্লিকের গলি তো পেলাম না, জীবন চাটুয্যের গলি আছে, কিন্তু তার দশ নম্বর বাড়ীতে তো গোকুল বাবু নাই। জীবন মল্লিকের গলি একটা আছে, সে ভবানীপুরে।"

পার্ব্বতী বলিল, 'তা হ'লে ঐ ভবানীপুরেই হবে। হয় তো লিখতে ভুল হয়েছে। অসুখ অবস্থায় লেখা তো।"

যতীন বলিল, "হ'তেও পারে। ভাল, ভবানীপুরটাও একবার খুঁজে আসি। এক গ্লাস জল আর একটা পান দাও।"

পার্ব্বতী তাহাকে পান-জল দিয়া বলিল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

যতীন বলিল, "তাও কি হয়? তোমার তো হেঁটে যাওয়া হবে না, গাড়ী ক'রে তোমায় নিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াব?"

পার্ব্বতী বলিল, "যেখানেই ঘুরে বেড়াও, আমি কিন্তু যাব।"

তাহার জেদ দেখিয়া যতীন একটু ভীত হইল, এবং তাহাকে ইহার অন্যায্যতা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। পার্ব্বতী কিন্তু বুঝিল না, সে জোর করিয়া বলিল, "দেখ যতীনদা, মিছে ওজর ক'রে আমার কাছে নিজেকে অবিশ্বাসী দাঁড় করিও না।"

যতীন আর আপত্তি করিতে পারিল না। সে গাড়ী ডাকিয়া পার্ব্বতীকে লইয়া বাহির হইল।

গাড়ী সহর ছাড়াইয়া ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া পড়িল। যতীন কি উপায়ে পার্ব্বতীকে অন্যমনস্ক করাইয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল। এখন সে গাড়ীর জানালায় পাখী তুলিয়া দিয়া পার্ব্বতীকে সাহেবদের দোকান, পথচারিণী ইংরাজমহিলা, মোটরকার, গড়ের মাঠ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিল। পার্ব্বতীর কিন্তু কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "ভবানীপুর আর কত দূর?"

যতীন বলিল, "এই মাঠটা পার হ'লেই—"

তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই একখানা ট্রাম সবেগে আসিয়া গাড়ীর পশ্চাতে ধাক্কা লাগিল। ধাক্কা খাইয়া গাড়ীখানা উল্টাইয়া পড়িল। যতীন পশ্চাতের আসনে বসিয়াছিল, ট্রামের ধাক্কায় ছিট্‌কাইয়া গাড়ীর নীচে পড়িয়া গেল। পার্ব্বতী দরজাটা জড়াইয়া কাত হইয়া পড়িল।

চারিদিক্ হইতে বিস্তর লোক ছুটিয়া আসিল। তাহারা গাড়ীখানাকে সোজা করিয়া পার্ব্বতীকে বাহির করিল। পার্ব্বতী সামান্যমাত্র আঘাত পাইয়াছিল। সে একপাশে দাঁড়াইয়া ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গাড়ীখানা সরাইয়া যতীনকে উদ্ধার করা হইলে দেখা গেল, যতীন রীতিমত আঘাত পাইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, ক্ষতস্থান দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। সমবেত লোকেরা তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

পার্ব্বতী একটা গ্যাস-পোষ্টের পাশে দাঁড়াইয়া, কোথায় যাইবে, তাহার ঠিকানা কি, ইত্যাদি প্রশ্নে যখন সন্ত্রস্ত হইয়া ইতস্তত: ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তখন সহসা এক ব্যক্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "এ কি, তুমি?"

জিজ্ঞাসাকর্ত্তা গোকুল। যোগেন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া সে খিদিরপুর যাইতেছিল। শ্যামবাজারের ট্রাম হইতে নামিয়া জনতা দেখিয়া সে তথায় উপস্থিত হইল। ভয়ে বিস্ময়ে পার্ব্বতীর মুখের

ঘোমটা অনেকখানি সরিয়া গিয়াছিল। গ্যাসালোকের প্রখর রশ্মি আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছিল। সুতরাং তাহাকে চিনিতে গোকুলের বিলম্ব হইল না।

স্বামীকে দেখিয়া পার্ব্বতীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। গোকুল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে?"

মৃদুস্বরে পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, শীগগীর একখানা গাড়ী ডাক।"

গোকুল গাড়ী ডাকিয়া পার্ব্বতীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। পুলিশ এরখানা স্বতন্ত্র গাড়ী আনিয়া যতীনকে হাঁসপাতালে লইয়া গেল। গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িবার সময় গোকুলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে?"

গোকুল মুখ বাড়াইয়া বলিল, "শ্যামবাজার, যোগেন বাবুর বাড়ী।"

গাড়ী চলিল। পার্ব্বতী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার না কঠিন ব্যারাম?"

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "কে বল্লে?"

পার্ব্বতী আঁচল হইতে চিঠিখানা খুলিয়া গোকুলের হাতে দিল। গোকুল চিঠিখানা পকেটে রাখিল। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "প'ড়ে দেখলে না?"

গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া গোকুল উদাসস্বরে উত্তর করিল, "এখন থাক্।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয়?"

অন্যমনস্কভাবে গোকুল বলিল, "হাঁ।"

পার্ব্বতী বলিল, "চিঠিখানা তা হ'লে কে লিখলে?"

গোকুল বলিল, "কি জানি।"

পার্ব্বতী আর কিছু বলিল না। গাড়ী যোগেন বাবুর বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিলে গোকুল গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। পার্ব্বতী গাড়ীতে বসিয়া রহিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

যোগেন্দ্রনাথ ও অনিলার বিস্ময়-দৃষ্টির মধ্য দিয়া গোকুল একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, এবং ব্যস্তভাবে বলিল, "বড় বিভ্রাট যোগী, আমার স্ত্রী হঠাৎ এসে পড়েছে।"

বিস্মিতভাবে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার স্ত্রী!"

গোকুল বলিল, "হাঁ, আমার কঠিন ব্যারাম ব'লে কে চিঠি দিয়েছিল, সেই চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছে। দেখ ত চিঠিখানায় কি লিখেছে।"

গোকুল পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া যোগেন্দ্রনাথের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। যোগেন্দ্রনাথ চিঠি পড়িতে লাগিলেন। গোকুল তখন কোথায় কি অবস্থায় স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিল। শুনিয়া অনিলা শিহরিয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "১০নং জীবন চাটুয্যের লেন, সে আবার কোথায়? তুমি এখানে ছিলে না কি?"

গোকুল বলিল "আমার কোন পুরুষে ও রাস্তার নামও জানে না।"

যোগে। নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট লোকের অসদভিপ্রায়ে লেখা। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন।

অনিলার দিকে চাহিয়া গোকুল সহাস্যে বলিল, "ভাগ্যে আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা না ক'রে খিদিরপুর যাচ্ছিলাম।"

অনিলা মৃদু হাসিল, বলিল, "আপনার স্ত্রী কোথায়?"

গোকুল উত্তর করিল, "বাইরে গাড়ীতে ব'সে আছে।" তার পর যোগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন উপায়? কোথায় রাখা যায়?"

যোগেন্দ্রনাথ কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। অনিলা বলিল, "আমাদের বাড়ীতে থাক্‌লে আপনার জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট হবে কিন্তু আপনার স্ত্রীর জাতি-ধর্ম্মটা বোধ হয় এত ভঙ্গুর নয়?"

গোকুল জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে যোগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই অনিলা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্ত্রী একা এসেছিলেন?"

গোকুল বলিল, "না, সঙ্গে ওদের গাঁয়ের যতীন

ব'লে একটা ছোঁড়া ছিল। সে আহত হয়ে হাঁস-পাতালে গিয়েছে।"

যোগেন্দ্রনাথ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। গোকুল বলিল, "চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না, যা হয়, একটা উপায় কর।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার সেই জগন্নাথ পালের দোকানে রাখা চলে না?"

রাগতভাবে গোকুল বলিল, "তা হ'লে তোমার এখানে আস্‌তাম না।"

যোগে। হিন্দু হয়ে ব্রাহ্মের ঘরে আসা উচিত হয়েছে কি?

গোকুল তাহার মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু বাহিরে আসিয়া গোকুল গাড়ী বা পার্ব্বতী কাহাকেও দেখিতে পাইল না। হতবুদ্ধির ন্যায় সে রাস্তার এদিক্ সেদিক্ দেখিয়া ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিল। যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

গোকুল হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "গাড়ী নাই।"

যো। স্ত্রী?

গো। সে তো গাড়ীতেই ছিল।

যোগেন্দ্রনাথ যেন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ! তা হ'লে তো থানায় খবর দেওয়া দরকার।"

গোকুল অবসন্নভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। যোগেন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

অনিলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আমাদের বামুন ঠাকুরের হাতের রান্না খেতে আপনার স্ত্রীর আপত্তি নাই, গোকুল বাবু। কিন্তু আপনার জন্য কি হবিষ্যের যোগাড় করা যাবে? তা হ'লে গঙ্গাজল আনাতে হয়।"

গোকুল হতাশভাবে যোগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিল। যোগেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলিলেন, "গোকুলদা না হয় একটা রাত উপবাসেই কাটিয়ে দেবে। ও বেচারীর বহুমূল্য ধর্ম্মটিকে নষ্ট ক'রে কাজ নাই অনিলা।"

গোকুল বলিল, "তোমাদের যা মনে আসে, তাই কর যোগী, তবে আমি উপবাস দিয়ে তোমাদের গৃহস্থ-ধর্ম্মের উপর আঘাত করতে রাজী নই।"

অনিলা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিদ্বেষী হইলেও অনিলার ব্যবহারে তাহার উপর গোকুলের একটু শ্রদ্ধার ভাব আসিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে থাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সে যাহাকে যথেষ্ট অপমানিত করিয়া গিয়াছিল, সে যে আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার জন্য এতটা করিতে পারে, ইহাই গোকুলের বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল, তাহার এই উদারতা, এই আতিথিসৎকার-স্পৃহায় বাধা দিয়া গোকুল তাহাকে অধিকতর মনঃক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না। ধর্ম্মের ভাণে এতটা সহৃদয়তার বিনিময়ে অপমানের কশাঘাত করা সে নিতান্ত নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়াই স্থির করিল।

কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্ম জিনিসটাও তো এত উপেক্ষার সামগ্রী নহে যে এই সহৃদয়তা বা উপকারের বিনিময়ে তাহাকে এত সহজে বিসর্জ্জন দেওয়া যাইতে পারে। যে ধর্ম্মগত পার্থক্যের জন্য সে যোগীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছে, আজি সামান্য দুর্ব্বলতার বশে সেই পার্থক্যটুকু বিস্মৃত হইতে উদ্যত হইয়া সে যে একটা ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, ইহা ভাবিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে মুখ তুলিয়া ডাকিল, "যোগী।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না গোকুলদা, তোমার এত বড় অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় আমি দিতে পারি না।"

গোকুল বলিল, "আমি তা হ'লে খিদিরপুরেই চল্‌লাম।"

গোকুল উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বন্ধু কোথায়?"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তিনি খিদিরপুরে চ'লে গেছেন।"

অনিলা তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "খুব সম্ভব, তুমি তাঁকে থাক্‌বার জন্য অনুরোধ করেছিলে?"

বেশ সহজ কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, আমি বরং তাঁকে সেখানে যেতে বলেছি।"

ক্রোধে ঘৃণায় অনিলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে আর কিছু না বলিয়া স্বামীর সম্মুখ হইতে অপসৃত হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নৃত্যকালী পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "গোকুল ঠাকুর তা হ'লে দেশত্যাগী হ'লো বাবা ?"

ধীর-গম্ভীর-স্বরে সরকার মহাশয় বলিলেন, "তা হ'লো বই কি নিতু। সকলই শ্রীহরির ইচ্ছা।"

নৃত্যকালী বলিল, "সে নিরীহ বামুন শ্রীহরির কাছে এমন কি দোষ করেছিল বাবা ?"

সহাস্যে সরকার মহাশয় বলিলেন, "অবশ্যই কোন না কোন দোষ করেছিল, এ জন্মে না করুক, পূর্ব্বজন্মে করেছিল। দোষ না কর্‌লে এমন শাস্তি পাবে কেন ?"

নৃত্যকালী ঈষৎ রাগতস্বরে বলিল, "কিন্তু আমার মনে হয় বাবা, তুমিই এর মূল।"

সবিস্ময়ে সরকার মহাশয় বলিলেন, "আমি ?"

নৃত্যকালী বলিল, "তুমি যদি অমূল্যকে সাহায্য না কর্‌তে বাবা—"

সরকার মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। সে হাস্যধ্বনিতে নৃত্যকালী চমকিত হইল। খুব খানিকটা হাসিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "ছি নিতু, আমার মেয়ে তুই তোর এখনো এ ভ্রমটুকু গেল না। মানুষে কি কর্‌তে পারে, সকলই তিনি করান। এ সবই সেই চক্রধারীর চক্র। ঐ যে গানে শুনিস্ না, 'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।' সকলই তাঁর কাজ নিতু, মানুষ শুধু উপলক্ষ মাত্র। হরি হে, মধুসূদন।"

নৃত্যকালী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রোষগম্ভীর-স্বরে বলিল, "তোমার ও সব শাস্তর রেখে দাও বাবা, বামুনকে দেশত্যাগী করার পাপের ফল তোমার ভুগতে হবেই হবে।"

মস্তক-সঞ্চালন করিতে করিতে সহাস্যে সরকার মহাশয় বলিলেন, "তোর বাপকে কি তুই এত নির্ব্বোধ মনে করিস্ নিতু ? হরি-নামের কাছে আবার পাপ ? যেমন পর্ব্বতপ্রমাণ তুলায় একবিন্দু আগুন ছোঁয়ালে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনই ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা ক'রেও যদি একবার হরিনাম উচ্চারণ করা যায়, তবে পাপ তো পাপ, যমরাজ পর্য্যন্ত ভয়ে কেঁপে ওঠে। এই জন্যই বলেছে—হরের্নাম হরের্নাম নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। হরিনাম হচ্চে কলির অশ্বমেধ। সকালে সন্ধ্যায় হরিনাম কর্ নিতু, পাপ-তাপ সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে।"

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে নৃত্য বলিল, "আমি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছি।"

সরকার মহাশয় বদনবিবর বিস্তৃত করিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুখ ভা'র করিয়া নৃত্য বলিল, "মুখে হরি হরি বল্‌বো, আর মনে মনে পরের সর্ব্বনাশ চিন্তা কর্‌বো, তেমন ভণ্ডামী আমার দ্বারা হবে না।"

সরকার মহাশয় মাথা নাড়িয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আঃ পাগলী মেয়ে, করেছিস্ কি, হরিনাম ছেড়েছিস, হলোই বা ভণ্ডামী, হেলায় শ্রদ্ধায় যে রকমে হোক হরিনাম কর্‌লেই হ'লো। নামের ফল যাবে কোথায় ? অজামিলের গল্প শুনিস্ নাই ? বেশী না হয়, সকালে সন্ধ্যায় অন্ততঃ একবার মালাটা ফিরিয়ে নিবি।"

নৃত্য। আমি মালা ফেলে দিয়েছি।

সর। তা ফেলেছিস্ ফেলেছিস, আমি আর এক ছড়া মালা এনে দেব। এ সংসার-সমুদ্র বড় ভীষণ নিতু, বড় ভীষণ। এ সমুদ্রে তর্‌বার একমাত্র সহজ উপায় হরিনাম। হরের্নাম হরের্নাম নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। আর কোন গতি নাই মা, কোন গতি নাই।

নৃত্যকালী আর কোন উত্তর না দিয়া ক্রোধ-গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "তুই গোকুলকে ভালবাসিস্, না নিতু ?"

বিরক্তভাবে নৃত্যকালী উত্তর দিল, "যদি বেসেই থাকি।"

মৃদু হাসিতে হাসিতে সরকার মহাশয় বলিলেন, "তা বেসে থাকিস্, কিন্তু হরিনাম ছাড়িস্ না। ভাল কথা, অমূল্য ছোঁড়া নাকি মদ ধরেছে ?"

নৃত্যকালী বলিল, "পুরো মাতাল হয়েছে। চাকরী-বাকরী ছেড়ে গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝিদের উপর নজর দিয়ে বেড়াচ্চে।"

সহাস্যে সরকার মহাশয় বলিলেন, "এ সকলই সেই শ্রীহরির খেলা নিতু।"

নৃত্যকালী বলিল, "শুধু কি তাই, সে দিন বাড়ী ঢুকে আমাকে পর্য্যন্ত অপমান ক'রে গেল ?"

চমকিতভাবে সরকার মহাশয় বলিলেন, "তোকে অপমান ?"

অনুযোগের স্বরে নৃত্যকালী বলিল, "তুমিই তো তার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছ বাবা।"

সরকার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম অপমান?"

মুখ নীচু করিয়া যেন অতিমাত্র ব্যথিতকণ্ঠে নৃত্যকালী বলিল, "সে সব কথা তোমার কাছে বল্‌বার নয় বাবা। আমার সে দিন এমনি ইচ্ছা হ'লো যে, গলায় দড়ি দিই, কি জলে ডুবে মরি।"

সরকার মহাশয়ের মুখখানা আষাঢের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি নীরবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার মালাছড়াটা দে।"

নৃত্য জানিত, কোন গভীর বিষয়ের চিন্তা করিতে হইলে পিতার মালাছড়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়। সে উঠিয়া মালা আনিয়া দিল। মালা হাতে লইয়া সরকার মহাশয় গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "বামুনটাকে দেশত্যাগী করা বড় অন্যায় হয়েছে, না নিতু?"

নৃত্যকালী বলিল, "সে কথা দু'বার বল্‌তে।"

"হুঁ" বলিয়া সরকার মহাশয় জপে গভীর মনঃসংযোগ করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সরকার মহাশয় অমূল্যচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "হাঁগো অমূল্যবাবু, দাদার জমী দু'বিঘে হাত করেই বুঝি নিশ্চিন্ত হ'লে?"

অমূল্য বলিল, "দাদার আর আছে কি?"

বিজ্ঞভাবে মস্তক-সঞ্চালন করিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "নেহাৎ ছেলেমানুষ কি না, দাদার যা আছে, তার এক পাই যদি তোমার থাক্‌তো, তা হ'লে তুমি পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খেতে পার্‌তে।"

অমূল্য বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সরকার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "গোকুল যে এখন যোগীন মুখুয্যের করবারের ম্যানেজার হয়েছে, তা শুনেছ কি?"

বিস্মিতভাবে অমূল্য বলিল, "কোন্ যোগীন? শ্রীনাথ বাঁড়ুয্যের ভাগনে?"

সর। হাঁ; যে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে খশুরের পয়সায় লাখপতি হয়েছে।

অমূল্যচরণ বিমর্ষমুখে বলিল, "সকলই বরাত।"

সরকার মহাশয় সহাস্তে বলিলেন, "বরাত কি গাছ থেকে এসে গা অমূল্য বাবু, হাত-পা আছে, জ্ঞানবুদ্ধি আছে, চেষ্টা ক'রে নিতে হয়।"

অম্। আর কি নেব?

সর। কিছু নগদ টাকা।

অম্। দাদা দেবে কেন?

সর। দিতে মত্তে কি সহজে কেউ চায়? কৌশল—কৌশল ক'রে মাথা খেলিয়ে নিতে হবে।

একটু ভাবিয়া অমূল্য বলিল, "আমার মাথায় তো তেমন কোন কৌশল আস্‌ছে না।"

সরকার মহাশয় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হাস্তের সহিত বলিলেন, "তোমাদের মাথায় যদি সে সকল কৌশল আসে বাবাজী, তা হ'লে আমাদের মাথার গৌরব আর কি থাকে?"

অমূল্যচরণ বিস্মিত বিস্ময়ে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "বুদ্ধি আমার, সাহস তোমার। যদি এক কথায় পাঁচশো টাকা আদায় ক'রে দিতে পারি, তবে আমার তাতে কত বখরা থাক্‌বে?"

অমূল্যচরণ বলিল, "আগে কি রকমে আদায় হবে, তাই শুনি।"

সরকার মহাশয় তখন টাকা আদায়ের একটা সহজ পন্থা বলিয়া দিলেন। যে সময়ে দেনার দায়ে গোকুল জেলে গিয়াছিল, সেই সময়ে সে একখানা হাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া অমূল্যচরণের নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল, এবং সেই টাকা জমা দিয়া জেল হইতে খালাস পাইয়াছিল। এক্ষণে সেই হাণ্ডনোট বাবদে নালিশ করিয়া গোকুলকে ধরিতে পারিলেই যোগেন্দ্রনাথ টাকাটা ফেলিয়া দিয়া বন্ধুকে যে রক্ষা করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অমূল্য বলিল, "কিন্তু দাদা তো আমাকে হাণ্ডনোট লিখে দেন নাই? হাণ্ডনোট আস্‌বে কোথা হ'তে?"

সরকার মহাশয় গর্ব্বস্ফীত-কণ্ঠে বলিলেন, "গোপীনাথ সরকারের মাথা হ'তে। এখন বখরাটার কথা আগে বল দেখি। আমার অর্দ্ধেক চাই। খরচ খরচা তোমার, তারও কতক আদায় হবে।"

অমূল্য কিন্তু অর্দ্ধেক দিতে রাজি হইল না। অনেক দূর কষাকষির পর সরকার মহাশয়ের ভাগে দুই শত টাকা পড়িল। সরকার মহাশয় তখন এক সপ্তাহের মধ্যে হাণ্ডনোট প্রস্তুত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

ঘরে গিয়া সরকার মহাশয় কন্যাকে বলিলেন, "তাই তো নিভু, তোর জন্য শেষে আমাকে জুয়াচুরীও কর্ত্তে হ'লো।"

অমূল্যচরণ তখন অভাবের তাড়নায় অস্থির। কারণ, রীতিমত মদ্যপায়ী হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীকে মদ খাইতে দেখিয়া ছোট-বৌ প্রথম প্রথম বাধা দিতে গিয়া সে শুধু স্বামীর নিকট নয়, পিসীমার নিকট হইতেও তিরস্কার গালাগালি খাইতে লাগিল। অমূল্য পিসীমাকে বুঝাইয়া দিল যে, মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হিতকর, সাহেবেরা মদ খায় বলিয়াই এত বলবান্। ভ্রাতুষ্পুত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতির আশায় পিসীমা নিজের তহবিল হইতে মদের খরচ যোগাইতে লাগিলেন।

এ দিকে অনুপস্থিতি, কাজে ভুল, মাতলামি ইত্যাদি নানা কারণে চাকরীটি গেল। অমূল্যচরণ একটুখানি ভয় পাইল। কিন্তু পিসীমা অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কি, এত দিন খেটে এসেছিস্ দিনকতক ব'সে শরীরটা তাজা ক'রে আবার তখন চাকরীর চেষ্টা দেখ্‌বি।"

কিন্তু সেই দিন পিসীমার ভুল ভাঙ্গিল, যে দিন ছোট-বোয়ের গহনাগুলি একে একে পোদ্দারের বাক্সে তুলিয়া দিয়া অমূল্যচরণ পিসীমার বাক্সে হাত দিল, এবং সহজে না পাইলে বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইবার ভয় দেখাইল। পিসীমা তাহার মতি গতি পরিবর্ত্তনের জন্য শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিলেন, ঠাকুর-দেবতারা পিসীমার মানতে লুব্ধ হইয়া অমূল্যচরণের মতি পরিবর্ত্তনের কোনই ব্যবস্থা করিলেন না।

অমূল্যচরণের অভাব ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, দেনাও অনেক হইল। পিসীমা কায়ক্লেশে সংসার চালাইতে লাগিলেন। আর অমূল্যচরণ বাজারের পয়সায় মদ খাইয়া, ছোট-বৌকে প্রহার করিয়া, পিসীমাকে গালাগালি দিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

এমন সময় দাদার নিকট পাঁচ শত টাকা পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া অমূল্যচরণ ভাবিল, এবার টাকাগুলা হাতে এলে দেনা শোধ ক'রে মদ ছেড়ে দেব। সে আপনার সাধু সঙ্কল্পের কথা পিসীমাকে জানাইল। পিসীমাও তাহাতে সাগ্রহে সম্মতি দিলেন, এবং অমূল্যর মতি কতকটা ফিরিয়াছে দেখিয়া এক পয়সার বাতাসা কিনিয়া তুলসীতলায় হরির লুট প্রদান করিলেন।

যথাসময়ে হ্যাণ্ডনোট প্রস্তুত হইলে অমূল্যচরণ মোকদ্দমা রুজু করিবার জন্য পিসীমার নিকট পঁচিশ টাকা লইল। পিসীমা ধার করিয়া টাকাটা আনিয়া দিলেন। অমূল্য কুড়ি টাকা সরকার মহাশয়কে দিল ও পাঁচ টাকার মদ খাইল। সরকার মহাশয় মোকদ্দমা রুজু করিয়া আসিলেন।

গোকুলের নামে শমন বাহির হইল। অমূল্যচরণ সরকার মহাশয়কে বলিল, "আপনিই কলকাতায় গিয়ে শমনটা জারি ক'রে আসুন।"

সরকার মহাশয় আটগণ্ডা পয়সা দিয়া পেয়াদার নিকট হইতে শমনের কাগজটা লইলেন, এবং তাহা ছিঁড়িয়া কাণা নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। তার পর তিন দিন কুটুম্ব-বাড়ীতে বসবাস করিয়া ঘরে ফিরিয়া কলিকাতা যাতায়াত ও খাওয়া খরচ ইত্যাদি বাবদে অমূল্যর নিকট হইতে চারি টাকা আদায় করিয়া লইলেন।

যে দিন মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব-দিবস রাত্রে অমূল্য সরকার মহাশয়কে মোকদ্দমার খরচ দিতে গেল। সরকার মহাশয় কিন্তু মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "না অমূল্য বাবু, এ মোকদ্দমার তদ্বির আমার দ্বারা হবে না, তুমি অন্য তদ্বিরকারের চেষ্টা দেখ।"

অমূল্যচরণ কারণ জানিতে চাহিলে সরকার মহাশয় বলিলেন, "কি জান বাবাজি, মোকদ্দমায় গোল উঠেছে। শুনতে পাচ্ছি, হাকিমের ধারণা হয়েছে, হ্যাণ্ডনোট জাল।"

অমূল্যচরণের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বলেন কি ?"

সরকার মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আর বলি কি। যোগীন বাবুই নাকি যত গোল বাধিয়েছে। সে আপনার খাতা দাখিল ক'রে প্রমাণ করবে যে, সে-ই গোকুলকে টাকাটা দিয়েছিল, এ হ্যাণ্ডনোট জাল। তার মস্ত কারবার, সে কারবারের খাতাই হাকিম বিশ্বাস করবে।"

অমূল্যচরণ হতবুদ্ধির ন্যায় কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ভীতিকম্পিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে উপায় ?"

সরকার মহাশয় মস্তক-সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "উপায় তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যে

রকম কড়া হাকিম, তাতে সে দায়রা-সোপরদ্দ না ক'রে যে ছাড়বে, এমন তো বোধ হয় না। আর দায়রায় গেলেই —জালের মোকদ্দমা—সাতটি বচ্ছর জেল।"

অমূল্য কাঁপিয়া উঠিল। তাহার কপাল দিয়া দরদর ঘাম ঝরিতে লাগিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "কিছু মনে ক'রো না। বাবাজি. দু'শো টাকার লোভে বুড়ো বয়সে কি জেলে যাব? হরি হে দীনবন্ধু পার কর দয়াময়।"

অমূল্যচরণ একটু রাগিয়া বলিল, "কিন্তু আমাকে বিপদে ফেলে আপনি স'রে দাঁড়ালেন, এই কি আপনার ধর্ম্ম হ'লো সরকার মশায়? আপনিই তো যুক্তি দিয়ে আমাকে নামালেন।"

মৃদু-গম্ভীর হাস্যের সহিত সরকার মহাশয় বলিলেন, "আমি যুক্তি দিয়েছি বটে, কিন্তু তুমি কি শুধু আমার যুক্তিতেই নেমেছ? টাকার লোভেই এ কাজে হাত দিয়েছ।"

অমূল্য বলিল, 'কিন্তু জেলে আমি একা যাব না, আপনাকেও যেতে হবে। আপনি জাল করেছেন।"

সরকার মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ বাবাজি, 'এই কর্ম্ম ক'রে আমি পাকাইলাম দাড়ি।' আমি কি নিজের পথ খোলসা না ক'রে কাজ করেছি? আমি দেখিয়ে দেব, হ্যাণ্ডনোটের একটি অক্ষরও আমার লেখা নয়।"

'আচ্ছা দেখা যাবে" বলিয়া অমূল্য ক্রুদ্ধভাবে উঠিয়া গেল। নৃত্যকালী বাপের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার রকম কি বাবা?"

সরকার মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "কিছু নয় মা, শুধু একটু মজা।"

অমূল্য বাড়ী আসিয়া পিসীমাকে সকল কথা বলিল। পিসীমা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে বাবা রে, গোকলোর কি এই কর্ম্ম হ'লো ওরে, আমার দুধের বাছাকে শেষে জেলে দেবে রে! ওরে, অতি বড় শত্রুও যে এত শত্রুতা সাধে না রে!"

অতঃপর তিনি ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবান্, হে দিন-রাত্রির কর্ত্তা, এর বিচার তুমি ক'রো। যে আমার বাছাকে জেলে দিতে চায়, তার যেন তেরাত্তির না পেরোয় ঠাকুর! দেখবো তোমার কেমন বিচার!"

পিসীমা আঙ্গুল মট্‌কাইয়া ঠাকুরের উদ্দেশে মাথা কুটিতে লাগিলেন।

অমূল্যচরণ কিন্তু ভগবানের বিচারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিল না, হাকিমের বিচারটাই তাহার মনের ভিতর জাগিতে লাগিল। তাহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ছোট-বৌ স্বামীকে বুঝাইয়া বলিল, "দেখ, অত ভেবো না, ভাবলে কিছু হবে না। তার চেয়ে বড়ঠাকুরের কাছে গিয়ে পড়, তিনি নিশ্চয় তোমাকে মাপ করবেন।"

অনেক দিন আগেকার—যে দিন দাদার সহিত পৃথক্ হইতে চাহিয়াছিল, সেই রাত্রির স্বপ্নবৃত্তান্তটা অমূল্যচরণের মনে পড়িল। সুতরাং ছোট-বৌয়ের উপদেশ যুক্তিযুক্ত হইলেও সে বড় বৌয়ের কাছে আপনার দৈন্য প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইল না। সে উপায়ের জন্য পুনরায় সরকার মহাশয়ের কাছে চলিল। সরকার মহাশয় তাহাকে দেখিয়াই ভীতিপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "করেছ কি বাবাজি, তোমার নামে যে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। এ সময়ে ঘরের বার হয়? ঘরে যাও, ঘরে যাও।"

অমূল্যচরণ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে সরকার মহাশয়ের হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ভীতি-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমাকে রক্ষা করুন সরকার মশায় আমি আপনার সামনে ব্রহ্মহত্যা হব।"

সরকার মহাশয় তাহাকে বসাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "আমার হাত থাকলে কি এতটা হয় বাবাজি, এখন রাখাই বল আর মারাই বল, সব গোকুলের হাত। সে যদি মিটিয়ে ফেলে, তা হ'লেই গোল চুকে যায়। তুমি না হয় একবার দাদার কাছে যাও না।"

অমূল্য বলিল, "তা আমি পারব না, আমার যাবার মুখ নাই। আপনাকেই মাঝে প'ড়ে যা হয় করতে হবে।"

একটু ভাবিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা দেখি, শ্রীহরি কি করেন। তা হ'লে আমার কলকাতা যাওয়ার খরচটা দিয়ে যেও। আর তুমি খুব সাবধানে থাকবে, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ঘরের বা'র হবে না।"

কলিকাতা যাতায়াতের খরচ লইয়া সরকার মহাশয় দুই তিন দিন গা-ঢাকা হইয়া রহিলেন। তার পর ফিরিয়া অমূল্যর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হতাশভাবে বলিলেন, "কিছু হ'লো না অমূল্য বাবু।"

অমূল্য নৈরাশ্যক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "কিছু হ'লো না।

সর। না হওয়ার মধ্যেই। কারণ, মিটমাট করতে হ'লে সে যা চায়, তা দেওয়া সম্ভব নয়।

অমূ। কি চায়?

সর। তার যে সব জমী-জায়গা ঘর ভিটে তুমি নিয়েছ, সমস্ত ফিরিয়ে দিতে হবে।

একটু ভাবিয়া অমূল্য বলিল, "তাই দেব।"

যেন একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "তাই দেবে?"

অমূল্য দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, সমস্ত ফিরিয়ে দেব, শুধু তার কেন, যদি আমারও জমী-জায়গা চায়, তা পর্য্যন্ত দিতে পারি। আমি সব দিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাব, তবু জেলে গেলে আমি বাঁচবো না।"

মৃদু হাসিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে বেনামীতে স্বনামীতে যা নিয়েছ, খোস কোবালায় সব লিখে রেজেষ্টারী ক'রে দাও। আমি পাঁচ দিনের সময় নিয়ে এসেছি।"

অমূল্য ভীতভাবে বলিল, "কিন্তু রেজেষ্টারী করতে গেলে যদি ওয়ারেন্ট ধরে?"

সহাস্যে সরকার মহাশয় বলিলেন, "সে ভয় নাই, তার ব্যবস্থা আমি ক'রে এসেছি।"

অতঃপর পিসীমা ও অমূল্য উভয়ের বেনামীতে লওয়া সম্পত্তি সাফ কোবালায় রেজেষ্টারী করিয়া দিল, এবং অমূল্য সে কোবালা সরকার মহাশয়কে দিয়া আসিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "আর কোন ভয় নাই, তবে আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত একটু সাবধানে থাকবে।"

সরকার মহাশয় কোবালা লইয়া নৃত্যকালীর হাতে দিলেন, এবং দুঃখের সহিত বলিলেন, "তোর জন্যে নিতু এই বয়সে বিশ্বাসঘাতক পর্য্যন্ত হ'তে হ'লো।"

নৃত্যকালী বলিল, "বিশ্বাসঘাতকতা নয় বাবা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত।"

নৃত্যকালী কৌশলে পিতার নিকট যোগেন্দ্রনাথের ঠিকানা জানিয়া লইল, এবং কয়েক দিন পরে পাড়ার সঙ্গী ও সঙ্গিনীদিগের সহিত দশহরাযোগে গঙ্গাস্নানে গমন করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নৃত্যকালী কলিকাতায় পৌছিয়া গঙ্গাস্নান করিল, তার পর খুঁজিয়া খুঁজিয়া যোগেন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিল, গোকুল সে বাড়ীতে নাই, স্ত্রীকে লইয়া অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিয়াছে। এক জন চাকর সে বাড়ীর ঠিকানা জানিত। নৃত্যকালী বহুকষ্টে তাহার নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া লইল।

পার্ব্বতীকে দিনকয়েক যোগেন বাবুর বাড়ীতে রাখিয়া গোকুল চাকরীর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। সে ইচ্ছা করিলে যোগেন বাবুর কারবারেই মোটা মাহিনার চাকরী পাইতে পারিত, কিন্তু গোকুল তাহার অধীনে চাকরী স্বীকার করিল না, তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া যোগেন্দ্রনাথও সে প্রস্তাব করিলেন না। গোকুলের হাতের লেখা খুব ভাল, এবং বাঙ্গালা হিসাব-নিকাশেও যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। সুতরাং কয়েক দিন চেষ্টার পর বড়বাজারে এক কাপড়ের দোকানে কুড়ি টাকা বেতনে খাতা রাখিবার কাজ পাইল। গোকুল তখন তিন টাকায় একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া পার্ব্বতীকে সেখানে আনিল।

সরু গলির ভিতর ছোট বাড়ীখানি। বাড়ীতে দুইটি মাত্র ঘর, একটি রন্ধনশালা, অপরটি শয়নগৃহ। মাঝে দুই তিন হাত প্রশস্ত উঠান। এই নূতন বাড়ীর নূতন ঘরে আসিয়া পার্ব্বতী দিনকতক বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে সহ্য হইয়া গেল। কুড়ি টাকা মাহিনায় ঝি চাকর রাখা চলে না, সুতরাং পার্ব্বতীকেই গৃহস্থালীর সকল কাজ করিতে হইত। পার্ব্বতীর যে ইহাতে কষ্ট হইত, তাহা নহে, বরং সে বেশ একটা স্বচ্ছন্দতাই অনুভব করিত। গোকুল সময়ে সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিত, "তোমার বড় কষ্ট হচ্চে পারু।"

পার্ব্বতী জোর করিয়া উত্তর দিত, "না, আমার কোন কষ্টই হয় নি।"

গোকুল বলিত, "আমি জানি, তুমি সেটা স্বীকার করবে না, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি—"

পার্ব্বতী রাগিয়া ধমক দিয়া বলিত, "দেখ, এ রকম যদি কর, তা হ'লে ভাল হবে না বলছি।"

গোকুল আর কিছু বলিত না, শুধু মনে মনে হাসিত। পার্ব্বতী রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াইত, নিজে

খাইত, বাসন মাজিত, ঘর ধোয়া, জল তোলা, বিছানা পরিষ্কার করা, সকল কাজই তাহাকে করিতে হইত, অথচ সে প্রত্যেক কাজটি এমন নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিত যে, গোকুল তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত। তাহার সেবাযত্ন, ভক্তিভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে ভাবিত, এই কি সেই পার্ব্বতী। গোকুল বুঝিতে পারিল,এত কাল বিদ্রোহের পর পার্ব্বতী এবার সন্ধিস্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছে। তাহার এ প্রয়াসে বাধা দেওয়া গোকুল অসঙ্গত জ্ঞান করিত।

একদিন গোকুল দুইখানা পত্র আনিয়া পার্ব্বতীর হাতে দিল। একখানা পূর্ব্বেকার গোকুলের বেনামীতে লিখিত পত্র, অপরখানা যতীন হাঁসপাতাল হইতে বাড়ীতে আরোগ্য-সংবাদ দিতেছে। গোকুল বলিল, "শেষের পত্রখানা যোগী সংগ্রহ করেছে।"

হস্তাক্ষর দেখিয়া দুইখানা পত্রেরই লেখক যে একই ব্যক্তি, ইহা বুঝিতে পার্ব্বতীর বিলম্ব হইল না। সে পত্র দুইখানা কুটি-কুটি করিয়া ছিড়িয়া ফেলিল। গোকুল চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। পার্ব্বতী তাহার সম্মুখে আসিয়া ম্লানমুখে বলিল, "যতীনদার চরিত্র খুব ভাল না হ'লেও সে যে এত বড় পাপিষ্ঠ, এ আমি বিশ্বাস করি নাই।"

গোকুল বলিল, "মানুষের মনের কথা দেবতারও অগোচর।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আমার উপর কি তোমার কিছু অবিশ্বাস হয়েছে?"

গোকুল উদাসস্বরে উত্তর করিল, "না।"

পার্ব্বতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সহসা সে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং গোকুলের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি অবিশ্বাসিনী নই। তোমার অসুখের সংবাদে আমি জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলাম।"

গোকুল তাহাকে তুলিয়া প্রশান্তস্বরে বলিল, "ছি পারু, এ সব তোমার কি পাগ্‌লামী!"

পার্ব্বতী চোখে আঁচল চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এত দিন পরে পার্ব্বতী বুঝিতে পারিল, রমণী শুধু রমণী, তাহার গর্ব্ব অভিমান সকলই রমণীর উপযুক্ত হওয়াই উচিত। মাত্রা অতিক্রম করিলেই সে স্বীয় আসন হইতে সহজেই বিচ্যুত হইয়া পড়িতে পারে। এত কাল পরে তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল, এই সর্ব্বংসহ মানুষটি তাহার স্বামী নামের নিতান্ত অযোগ্য নহে। এই মানুষটিও যদি তাহারই মত ক্রোধ ও অভিমানের আধার হইত, তাহা হইলে সংসারে কি মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত! পার্ব্বতী বুঝিল, ক্রোধ ও ক্ষমা উভয়ের মধ্যে কাহার মূল্য অধিক।

আর একদিন গোকুল বাড়ী আসিয়া পার্ব্বতীকে বলিল, "তোমার যতীনদাকে একবার দেখ্‌তে যাবে?"

পার্ব্বতী ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল। গোকুল বলিল, "সে এখনো সেরে উঠতে পারে নি, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য ছটফট কচ্চে।"

পার্ব্বতী বলিল, "সেখানে হাঁসপাতালে কোথায় যাব?"

গোকুল বলিল, "যেতে দোষ কি? যোগী তাকে স্বতন্ত্র ঘরে রেখেছে। যোগীর স্ত্রীও তোমার সঙ্গে যাবে।"

পার্ব্বতী অনিচ্ছা সত্বেও স্বীকৃত হইল এবং পরদিন অনিলার সহিত হাঁসপাতালে উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া যতীন কাঁদিতে লাগিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। পার্ব্বতী বলিল, "তুমি ক্ষমার অযোগ্য হ'লেও আমি তোমাকে ক্ষমা করতে বাধ্য। কেন না, মেয়েমানুষের ক্ষমা করতে না পারাই সব চেয়ে বড় পাপ। আমি তোমায় অন্তরের সঙ্গে ক্ষমা করলাম। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি ঐ সব বদ খেয়াল ছেড়ে সংসারী হও।"

যতীন বলিল, "তোমার সামনে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি পারু, এবার হ'তে আমি মানুষ হবার চেষ্টা করবো।"

পা। স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে এসো।

যতী। আনবো, যদি তার ক্ষমা পাই।

পার্ব্বতী সহাস্যে বলিল, "তার ক্ষমা তোমার তেমন দুষ্প্রাপ্য হবে না যতীনদা। সে মেয়েমানুষ, তুমি সব চেয়ে পাপী, সব চেয়ে বিশ্বাসঘাতক হ'লেও সে হাস্‌তে হাস্‌তে তোমায় ক্ষমা করতে পারবে।"

অনিলা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

বিদায়গ্রহণকালে পার্ব্বতী রঘুর মা'র কথা জিজ্ঞাসা করিলে যতীন বলিল, তাহাকে কৌশলে সেই দিনই দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"হরি বল মন। বাড়ীতে কে আছে গো?"

মধ্যাহ্ন আহারশেষে পার্ব্বতী একখানা বই লইয়া সবেমাত্র তাহার প্রথম পাতাটা উল্‌টাইয়াছে, এমন সময় নৃত্যকালী বাহিরের দরজা ঠেলিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "হরি বল মন। বাড়ীতে কে আছ গো?"

পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল, এবং তাঙ্গা দরজায় ফাঁক দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। নৃত্যকালী সহাস্যে বলিল, "ওগো, চোর নই, ডাকাত নই, মেয়েমানুষ। দরজাটা খোল, ভয় নাই।"

পার্ব্বতী দরজা খুলিলে নৃত্যকালী বাড়ীতে ঢুকিল। পার্ব্বতী দরজা ভেজাইয়া দিয়া তাহাকে লইয়া ঘরের দাবায় আসিল। নৃত্যকালী জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কোথায়?"

পার্ব্বতী বলিল, "বাবু কাজে গিয়েছেন।"

নৃত্যকালী তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "বাবু আবার কে গো? গোকুলঠাকুর তিন মাস কলকাতায় না আস্‌তেই বাবু হয়ে গেল না কি? মা গো মা, অবাক্ কর্‌লে যে!"

নৃত্যকালী হাসিতে লাগিল। পার্ব্বতী বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিল। নৃত্যকালী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিই বুঝি ঠাকুর মশায়ের ব্রাহ্মণী, দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী?"

পার্ব্বতী মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নৃত্যকালী ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া বলিল, "মা গো মা, এ কি বাড়ী? এই দেড় হাত ঘর, আধ হাত উঠান, জল ছপ-ছপ কচ্ছে। তোমরা এখানে থাক কি ক'রে?"

গম্ভীর বিরক্তিসূচক স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "কি করি বল, ভাল বাড়ী কোথায় পাব?"

নৃত্য বলিল, "কলকাতা সহরে বাড়ীর অভাব কি, পয়সা ফেল্‌লে ইন্দির-ভবন পাওয়া যায়।"

পার্ব্বতী কোন উত্তর দিল না। নৃত্য বলিল, "দেশে তোমাদের তেমন বাড়ী-ঘর; সে সব ফেলে এমন এঁদো বাড়ীতে বাস কত্তে এসেছ?"

পার্ব্বতী বলিল, "তা বাছা, কপালের ভোগ থাক্‌লে—"

নৃত্য বলিল, "বাছা নয়, বোন বল। তা হাঁগা, এতক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছি, একটা বস্‌বার আসনও তো দিতে হয়।"

পার্ব্বতী লজ্জিতভাবে একখানা মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিল।

একটু সঙ্কোচের ভাব দেখাইয়া নৃত্য বলিল, "তাই তো, বামুনের বিছানায় বস্‌বো? আচ্ছা, পা দু'টো মাদুরের বাইরে রাখি। তা হ'লে বোধ হয় দোষ হবে না, কেমন?"

নৃত্য পার্ব্বতীর মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পার্ব্বতী ফিক্ করিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

নৃত্য মাদুরের উপর বসিয়া নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "উঁঃ, যেন একটা বিশ্রী গন্ধ আস্‌ছে। রাগ ক'রো না ভাই, আমার তো এমন এঁদো বাড়ীতে থাকা অভ্যাস নাই।"

পার্ব্বতী সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হুঁ।"

নৃত্য বলিল, "তোমাদের ঘরে পান নাই? একটা পান দাও না।"

পার্ব্বতী পান সাজিয়া আনিয়া দিল। নৃত্যকালী পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "ঠাকুর মশায় ফির্‌বেন কখন্?"

পার্ব্বতী বলিল, "রাত আটটায়।"

নৃত্য। আটটা? সে কত রাত?

পা। চার ছ'দণ্ড হবে।

নৃত্য একটু চিন্তান্বিতভাবে বলিল, "তাই তো, এত রাত পর্য্যন্ত তো আমি থাক্‌তে পার্‌ব না। একা মেয়েমানুষ, রাত্রে কি রাস্তা চিনে যেতে পার্‌বো?"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

নৃত্য বলিল, "বাড়ী? বাড়ী অনেক দূর। বাঁকড়োর কাছে ঠিক বাঁকড়ো নয়, বর্দ্ধমান জেলায়। ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। আমি আবার তাঁকে গুরুজীও বলি। গুরুজী বেশ লোক, না?"

পার্ব্বতী মৃদু হাসিল। নৃত্য বলিল, "চমৎকার লোক। এক গালে চড় মার্‌লে অপর গাল ফিরিয়ে দেয়। এমন না হ'লে মানুষ!"

পার্ব্বতী নীরবে দাঁড়াইয়া এই প্রগল্‌ভা রমণীর বাক্-বৈদগ্ধ্য শুনিতে লাগিল, নৃত্যকালী একটু ভাবিয়া বলিল, "তাই তো, দেখাটা হ'লো না।"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "দেখা করা কি বিশেষ দরকার?"

নৃত্য। দরকার—না, দরকার এমন কিছু নাই। তবে দেখা হ'লে ভালই হ'তো, দু'টো কথা ব'লে যেতাম। তা নাই হোক, তুমি এই কাগজ দু'খানা—

কাপড়ের ভিতর হইতে দুইখানা দলীল বাহির করিয়া নৃত্যকালী পার্ব্বতীর হাতে দিল, বলিল, "এই কাগজ দু'খানা তাঁকে দিও। ভুলো না, ভারী দরকারী কাগজ। হারিও না যেন।"

"না" বলিয়া পার্ব্বতী মৃদু হাসিল। নৃত্য বলিল, "আমি তা হ'লে এখন উঠি। বেলাটাও যায়।"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

নৃত্যকালী বলিল, "নাম? নামে দরকার কি?"

পার্ব্বতী বলিল, "যদি জিজ্ঞাসা করেন?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া নৃত্যকালী বলিল, "তা হ'লে ব'লো, নেত্য এসেছিল।"

পার্ব্বতী শিহরিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "নেত্য!"

সহাস্যে নৃত্যকালী বলিল "হাঁ, নেত্য। নৃত্যকালী আমার নাম, নেত্য ব'লেই সকলে ডাকে। ঠাকুর মশায় আবার নিতু বলেন।"

পার্ব্বতী ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নৃত্য বলিল, "তুমিও তা হ'লে আমার নাম শুনেছ? ঠাকুর মশায়ের মুখে শুনেছ বুঝি?"

পার্ব্বতী বলিল, "না।"

হাসিতে হাসিতে নৃত্যকালী বলিল, "তা যার মুখেই শুনে থাক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কাগজ দু'খানা দিতে ভুলো না।"

নৃত্যকালী উঠিয়া ধীরে ধীরে দরজার দিকে চলিল। দরজার কাছে গিয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "ভাল কথা, ঠাকুর মশায়কে বল্‌বে, তিনি আমায় জুয়াচুরি কর্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু পোড়া মেয়েমানুষ কি না, 'স্বভাব যায় না ম'লে,' থাক্‌তে পার্‌লাম না। তা জুয়াচুরি কর্‌লে যদি নরকে যেতে হয়, তাই না হয় যাব. এখন ঠাকুর মশায়কে দেশে ফিরে যেতে ব'লো। দেশের ঘরবাড়ী বোধ হয় এ রকম নরক নয়। বুঝ্‌লে?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই নৃত্যকালী দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। পার্ব্বতী স্তব্ধ-নিস্পন্দ-ভাবে দরজার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রে গোকুল ফিরিয়া আসিলে পার্ব্বতী তাহাকে দলীল দুইখানা দিল। গোকুল তাহা পড়িয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে দিয়ে গেল?"

পার্ব্বতী বলিল, "নেত্য।"

গোকুল বর্দ্ধিত বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "নেত্য!"

"হাঁ গো হাঁ, নেত্য, তোমার নিতু।"

পার্ব্বতী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। গোকুল আশ্চর্য্যান্বিতভাবে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পার্ব্বতী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "চিন্‌তে পার্‌লে না?"

গম্ভীরস্বরে গোকুল বলিল, "চিনেছি। কি ব'লে গেল?"

পার্ব্বতী বলিল, "ব'লে গেল, তুমি তাকে জুয়াচুরি কর্‌তে বারণ করেছিলে। কিন্তু মেয়েমানুষের স্বভাব কি না, থাক্‌তে পার্‌লে না, আবার একটু জুয়াচুরি করেছে। তোমার জন্য জুয়াচুরি ক'রে সে নরকে যেতেও রাজী আছে।"

"হুঁ" বলিয়া গোকুল মাথা নীচু করিল। পার্ব্বতী বলিল, "সে তোমাকে বাড়ী ফিরে যেতে অনুরোধ করেছে।"

গোকুল কোন উত্তর দিল না। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "যাবে?"

মুখ না তুলিয়াই গোকুল বলিল, "যাব।"

পা। কাগজ দু'খানা কিসের?

গো। দলীল।

পা। কিসের দলীল?

গো। আমি পিসীমার নামে যে সম্পত্তি বেনামী ক'রে দিয়েছিলাম, পিসীমা সে সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছেন। আর অমূল্য বেনামীতে আমার যে ঘর-ভিটে কিনে নিয়েছিল, তা ফিরিয়ে দিয়েছে।

পা। হঠাৎ এ রকম ফিরিয়ে দেবার কারণ কি?

গো। সেই কারণটাই বুঝতে পাচ্ছি না। এইখানেই নিতুর কৌশল।

পা। কিন্তু সে তোমার জন্য এত কৌশল কর্‌তে গেল কেন?

একটু গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া গোকুল বলিল, "তুমি বিশ্বাস কর্‌বে কি না জানি না, কিন্তু সে আমার জন্য মর্‌তে পারে।"

পার্ব্বতীর মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া আসিল। গোকুল তাহা লক্ষ্য করিয়া বলি-

"কিন্তু দুঃখের বিষয় পারু, তার এই দানের একবিন্দু প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই।"

পার্ব্বতী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। গোকুল বলিল, "আমার মুখের কথায় তোমার বিশ্বাস হবে?"

পার্ব্বতী বলিল, "হবে।"

গোকুল তখন বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মৃত্যুর ভালবাসার ইতিহাস একে একে বর্ণনা করিল। তাহা শুনিতে শুনিতে পার্ব্বতীর বিদ্বেষ-কঠোর মুখখানা সহানুভূতির বেদনায় কোমল হইয়া আসিল। বর্ণনা শেষ করিয়া গোকুল স্থির-দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তোমার কি মনে হয়?"

পার্ব্বতী আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "হতভাগিনীর জন্য একটু দুঃখ হয়।"

"সত্য পারু, সেত্য বড় হতভাগিনী।"

গোকুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। পার্ব্বতী শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গোকুল দলীল দুইখানা পার্ব্বতীকে তুলিয়া রাখিতে বলিল। পার্ব্বতী স্বামীর হাত হইতে দলীল লইয়া নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে যাবে?"

গোকুল তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "তুমি কি বল?"

নতমস্তকে পার্ব্বতী বলিল, "আমি বলি, যাওয়াই ভাল।"

গোকুল বসিয়া বসিয়া একটু ভাবিল, তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাতর-স্বরে বলিল, "ভাল যে, তা আমিও জানি পারু, কিন্তু শেষে—"

পার্ব্বতী বলিল, "জুয়াচুরী করবো? কেমন, এই কথা না?"

মাথা হেঁট করিয়া গোকুল উত্তর করিল, "ঠিক।"

পা। কিন্তু এর ভিতর জুয়াচুরীটা কোথায়? তুমি কবর বেনামী ক'রে রেখেছিলে, বিক্রী তো কর নি।

গো। অমূল্য দু'শো টাকায় ঘর ভিটে কিনে ।

পা। ঐ টাকা তাকে ফেলে দিলেই হ'লো।

গোকুল সহাস্য দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ এই যে, ঐখানেও যত গোল, দ ক্ষমতা থাকিলে দেশত্যাগী হইব কেন? পার্ব্বতীও এই অর্থটুকু বুঝিল, বুঝিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমি যদি কোন রকমে টাকাটা দিতে পারি?"

গোকুল কোন উত্তর করিল না। পার্ব্বতী ব্যস্তভাবে বলিল, "মনে কর, আমি এখন তোমাকে ধার দিচ্ছি।"

গোকুল এবার হাসিল। বলিল, "তোমার কাছে টাকা লওয়াকে আমার ধার লওয়া বলে না পারু।"

পা। তবে কি বলে?

গো। আমার জিনিস আমি নিলে তাকে কি বলে, তা জানি না।

পার্ব্বতীর চোখে মুখে আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে স্বামীর মুখের উপর গর্ব্বপ্রফুল্ল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমি জানি, শুনবে?"

গো। কি?

পা। ভালবাসা।

গোকুলের মুখের উপর দিয়া বিস্ময় ও আনন্দের বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া গেল। পার্ব্বতী বিদ্যুদ্বেগে স্বামীর সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

পার্ব্বতী অন্নদাকে পত্র লিখিল, "ঠাকুরঝি, তোমার অভিশাপই ফলেছে, শুনে বোধ হয় তোমার আশ্চর্য্য হবে, আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে। এখন বুঝেছি, মেয়েমানুষের গর্ব্বই বল, অভিমানই বল, তার একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করতে গেলে মেয়েমানুষ নিজের গণ্ডীর বাহিরে গিয়ে পড়ে। আমিও পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। স্বামী ও স্ত্রী এই দু'জনের কার কোথায় স্থান, তা চিনে নিয়েছি। তবে তোমার দাদাটি আমার কাছে দুর্ব্বোধ রয়েই গেলেন।

একবার আসবে না? যুদ্ধ দেখে গিয়েছিলে, সন্ধি দেখতে আসা তোমার উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে আমারই জয় হয়েছে, এ কথা তুমি স্বীকার না করলেও তোমার দাদা একশোবার স্বীকার করেন। সত্য মিথ্যা তাঁর মুখ থেকেই শুনে যাও।

আমরা এখন কলকাতায় আছি। শীগগীর দেশে ফিরে যাব, গিয়ে যেন দেখা পাই। আমার দিব্যি।"

উত্তরে অন্নদা লিখিল, "ও বৌ, আমি আবার যাব না? আমি না গেলে তোর গালে ঠোনা মারবে কে? তোর সেই উঁচু মাথাটা কেমন ক'রে দাদার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে, তা আমি যদি না দেখলাম, তবে দেখবে কে? তোরা কবে দেশে যাবি, লিখে জানাস, তোরা পৌঁছুলেই আমিও গিয়ে হাজির হচ্ছি।

তোর চিঠি পেয়ে আমার একটুও আশ্চার্য্য বোধ হয় নাই। কেন না, আমি জান্‌তাম, ঠিক এই রকমটাই হবে। ব'লেও ছিলাম তাই। দাদাকে তুই চিন্‌তে না পারিস্‌, আমাকে চিনে রাখিস্‌, অনি বামনী যা বলে, তাই ঠিক ফলে কি না।"

———

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক সময়ে মনে হয়, সংসারে যেটুকু সত্য, যাহা স্বাভাবিক, সেইটুকু জানিতে পারার উপরেই বুঝি জীবনের সকল সার্থকতা নির্ভর করে। এই জন্যই মানুষ সন্দেহের আবরণে ঢাকা সত্যটুকুকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সত্যটুকু যখন ভ্রমের আবরণ ভেদ করিয়া রুদ্রমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখন মনে হয়, হায়, এ সত্য চিরদিন কেন মিথ্যা হইয়াই রহিল না, কেন আজীবন সন্দেহের তিমিরাবরণেই ডুবিয়া রহিলাম না। জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ, শান্তি, সব হারাইয়া এ সত্যটুকু লইয়া আমি কি করিব? মানুষ তখন সত্যের সেই প্রকটোজ্জ্বল রশ্মিরেখাকে বিস্মৃতির ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া মিথ্যার তমোময় গর্ভে আপনাকে ডুবাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হয়।

অনিলা কিন্তু শত চেষ্টাতেও তাহা করিতে পারিল না। যে আলোক একবার জ্বলিয়াছে, তাহা নিভিল না। সে তখন সকল আঘাতকে উপেক্ষা করিয়া জোর করিয়া আপনাকে অনাহতের ন্যায় খাড়া রাখিতে চাহিল, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইল না। তাহার প্রত্যেক ব্যর্থ চেষ্টার মধ্যেই অন্তরের আর্ত্তচীৎকার ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে আরও আকুল, আরও বিড়ম্বিত প্রতিপন্ন করিয়া দিতে লাগিল। হায়, অভিমানে অধীর হইয়া সে প্রাণ লইয়া কেন খেলা করিতে গিয়াছিল!

যোগেন্দ্রনাথও স্ত্রীর অন্তরের বেদনা বুঝিতে পারিলেন না, এমন নহে। অপমানের ব্যথাটা চাপিয়া গোকুল ও তাহার স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক আদর-যত্ন প্রদর্শনের চেষ্টাটাই অনিলাকে সব চেয়ে ভাল রকমেই স্বামীর কাছে ধরাইয়া দিল। লোকে আছাড় খাইয়া আঘাত পাইলেও শুষ্ক হাসির দ্বারা যেমন সে আঘাতের বেদনাটা লুকাইবার চেষ্টা করে, অনিলার চেষ্টাও যে তাহা হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে, যোগেন্দ্রনাথ ইহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া একটু ব্যথা অনুভব করিলেন। কিন্তু যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাকে প্রতিসংহার করিবার উপায় নাই।

পার্ব্বতী যে কয়দিন রহিল, সে কয়দিন অনিলা তাহার প্রতি এত আদর-যত্ন দেখাইল যে, পার্ব্বতী তাহাতে মুগ্ধ হইয়া প'ড়ল। এত বড় লোকের মেয়ে, এমন শিক্ষিতা মহিলা যে তাহার ন্যায় দরিদ্রের স্ত্রীকে এত যত্ন, এত সহানুভূতি দেখাইতে পারে, ইহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার অভিমানদৃপ্ত প্রকৃতিটা এইখান হইতেই মস্তক নত করিতে যেন অভ্যস্ত হইল।

গোকুলের একটা চাকরী করিয়া দিবার জন্য অনিলা স্বামীকে অনুরোধ করিল। যোগেন্দ্রনাথ কিন্তু সে চেষ্টা করিলেন না। গোকুল নিজে চাকরীর যোগাড় করিয়া লইল। কিন্তু তাহার মধ্যে পরোক্ষে যে যোগেন্দ্রনাথের গুপ্ত চেষ্টা ছিল, তাহা কেহ জানিল না।

গোকুল চাকরী পাইয়া পার্ব্বতীকে লইয়া চলিয়া গেল। অনিলা ও যোগেন্দ্রনাথ উভয়েই অন্তরের বেদনা অন্তরে চাপিয়া সন্ধিস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। উভয়ের হৃদয়েই অনুতাপের আগুন জ্বলিয়াছিল, কিন্তু কেহই সে আগুনে জল ঢালিতে পারিতেছিল না, শুধু নীরবে দাহযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল।

এমন সময়ে গোকুল একদিন আসিয়া আপনার সকল কথা যোগেন্দ্রনাথকে জানাইল। শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি জান্‌তাম গোকুলদা, তুমি বিশুদ্ধ অর্থোডক্স অর্থাৎ গোঁড়া ব্রাহ্মণ, দানগ্রহণ করা তোমার স্বভাবের বিরুদ্ধ। কিন্তু দেখছি, অভাবে প'ড়ে তোমারও স্বভাব নষ্ট হয়ে গেল।"

গোকুল বলিল, "স্বভাব নষ্ট হয়নি যোগী, স্বভাবের একটা ভুল সংশোধন হয়ে গেল। সংসারকে শুধু দিলেই চলে না, তার কাছ হ'তে কিছু কিছু নিতেও হয়, এইটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। সে নিয়মের অন্যথাচরণ করতে গেলে প্রকৃতি তার এমন ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করে, যাতে সমগ্র সংসারটাই পর হয়ে যায়।"

ঈষৎ হাসিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "স্ত্রী পর্য্যন্ত।"

গোকুল হাসিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছিঃ গোকুলদা, এই বয়সে শেষে স্ত্রৈণ হয়ে পড়লে?"

গোকুল হাসিয়া বলিল, "সেটা খুব দোষের কথা নয় যোগী, যার সঙ্গে যতটা নিকট সম্বন্ধ, তাকে ততটা কাছে রাখাই ভাল, দূরে রাখতে গেলেই বিপদের সম্ভাবনা।"

যোগেন্দ্রনাথ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। গোকুল বলিল, "মানুষের মনের ভিতর অহঙ্কার ব'লে যে জিনিসটা আছে যোগী, সেটা বড়ই ভয়ানক। আমি সকলকে অনুগ্রহ কর্‌বো, কিন্তু অপরের একটু দয়া বা অনুগ্রহ নেব না, এই অহঙ্কারটুকুই মানুষের সঙ্গে মানুষকে পৃথক্ ক'রে রাখে। এ অহঙ্কারটুকু ত্যাগ কর্‌তে না পার্‌লে মিলনের সুখ অনুভব করা যায় না।"

যোগেন্দ্রনাথ দেরাজ খুলিয়া গোকুলের প্রদত্ত হ্যাণ্ডনোটখানা বাহির করিল, এবং তাহা গোকুলের হাতে দিয়া বলিল, "এটাও বোধ হয় আমাদের মিলনের পথে একটা অন্তরায় হয়ে আছে গোকুলদা?"

গোকুল হ্যাণ্ডনোটখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। বলিল, "ভুল যখন হয়, তখন একসঙ্গে অনেকগুলা ভুলই হয়ে যায় যোগী, নতুবা তোমার কাছেও ঋণ স্বীকার কর্‌তে লজ্জা বোধ কর্‌বো কেন?"

যোগেন্দ্রনাথ কোন উত্তর করিলেন না। গোকুল বলিতে লাগিল, "এখন তোমার কাছে আর তোমার স্ত্রীর কাছে আমার ঋণের মাত্রাটা এত বেড়ে গেছে যে, তা শোধ করা আমার ক্ষমতার অতীত। তার উপর যদি এই টাকা কয়টা দিয়েই আমি অঋণী হ'তে যাই, তা হ'লে সেটা শুধু আমার মূর্খতা নয়, ভয়ানক অকৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয়। কেমন, ঠিক কি না?"

যোগেন্দ্রনাথের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যের রেখা দেখা দিল।

দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অনিলা বলিল, "কিন্তু গোকুল বাবু, আপনার বন্ধু যত সহজে আপনাকে ঋণ হ'তে মুক্তি দিলেন, আমি তত সহজে দিতে পার্‌ব না।"

গোকুল চমকিতভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া বলিল, "এই দেখুন, আপনিও একটা মস্ত ভুল ক'রে ব'সে আছেন। আমি ঋণ হ'তে মুক্তি চাই না, ঋণী হয়ে থাকতে চাই। কেন না, জগতে ঋণগ্রহণটাই হচ্চে মিলনের পথ, আর তা হ'তে আপনাকে মুক্ত ক'রে রাখ্‌বার চেষ্টাই মিলনের অন্তরায়।"

মৃদু হাসিয়া অনিলা বলিল, "তা হ'লে প্রতিগ্রহে আপনার আপত্তি নাই?"

গোকুল বলিল, "আপত্তি যে নাই, তা তো প্রত্যক্ষই দেখলেন। তবে—"

গোকুলের মুখে স্বরে যেন একটু সঙ্কোচের ভাব জাগিয়া উঠিল। অনিলা বলিল, "ভয় নাই গোকুল বাবু, ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা পুণ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে আপনার ধর্ম্মে আঘাত কর্‌বো, এতটা স্বার্থপর আমি নই।"

কথাটার ভিতর যে শ্লেষ ছিল, তাহাতে গোকুল আপনা আপনিই যথেষ্ট লজ্জা অনুভব করিল। আর বেশী কথা না কহিয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল।

গোকুল চলিয়া গেলে যোগেন্দ্রনাথ একখানা পুরাতন খবরের কাগজ লইয়া তাহাতে চোখ বুলাইতে লাগিল, অনিলা গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল, উভয়েই নীরব। উভয়েরই প্রাণের ভিতর হইতে একরাশ কথা কণ্ঠার কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুখ দিয়া তাহা বাহির হইতেছিল না। বারান্দার টব হইতে বেলফুলের টাটকা গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, সম্মুখের রাস্তা দিয়া চীনের বাদাম, তেল ক্রাশীন হাঁকিয়া গেল, অনিলা অন্তরে একটা তীব্র আকুলতা লইয়া, জানালার গরাদে ধরিয়া স্থির-নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা যোগেন্দ্রনাথ ডাকিলেন, "অনিলা!"

অনিলা ত্রস্তভাবে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, যোগেন্দ্রনাথ আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছেন। অনিলা দৃষ্টি নত করিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমরা মনে কর অনিলা, পুরুষজাতিটা ভয়ানক নিষ্ঠুর—"

বাধা দিয়া অনিলা বলিয়া উঠিল, "আর তোমরা মনে কর, ক্ষমা তোমাদেরই সম্পূর্ণ নিজস্ব বৃত্তি। কিন্তু তোমরা বল্‌বার আগেই আমরা তোমাদের ক্ষমা কর্‌তে পারি।"

অনিলা স্বামীর মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। স্ত্রীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সহাস্যমুখে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ওটা ভুল বল্‌লে অনিলা, আমরা জানি, ক্ষমাটা তোমাদেরই ধর্ম্ম।"

অনিলার চোখ দিয়া ঝর ঝর জল গড়াইয়া পড়িল। একটা দমকা বাতাসে একরাশ ফুলের গন্ধ আসিয়া ঘরখানাকে মাতাইয়া তুলিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি হবে রে অমূল্য ?"

বিরক্তভাবে অমূল্য উত্তর দিল, "তোমার শ্রাদ্ধ।"

পিসীমা আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, "আমার কি আর শ্রাদ্ধ হবে ? যম যে আমায় ভুলে আছে, তা নৈলে কি তোদের এই লাথি-ঝাঁটা খেয়ে প'ড়ে থাকি ?"

অমূল্য বলিল, "সেটা তোমার কপালের জোর।"

দুঃখগম্ভীরস্বরে পিসীমা বলিলেন,"তা বল্‌বি বৈ কি রে অমূল্য, বলে 'যার তরে করি চুরি সেই বলে চোরা হরি।' আমি যে তোর তরে মরি রে।"

অমূল্য বলিল, "তুমি আর ম'লে কোথায় পিসীমা ? তুমি ম'লে কি আমার এই সর্ব্বনাশ হ'তো ?"

পিসীমা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "বলিস্ কি রে নেমকহারাম, আমি তোর সর্ব্বনাশ করেছি ?"

দৃঢ়স্বরে অমূল্য বলিল, "আলবৎ করেছ। তুমি আমার যা করেছ, অতি বড় শত্রুতেও তা পারে না। দাদার সঙ্গে ঝগড়ার মূল তো তুমি।"

পিসীমা রাগে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি ? আমি তোকে ঝগড়া কর্‌তে বলেছিলাম ? আমি আলাদা হ'তে যুক্তি দিয়েছিলাম ? ওরে হতভাগা, আমি যে তোর তরেই গোকলোকে পর করেছি।"

অমূল্য বলিল, "সেই জন্যই তো বল্‌ছি পিসীমা, তুমিই সকলের মূল। ভাইকে কি রকমে পর কর্‌তে হয়, তা তুমিই হাতে ধ'রে শিখিয়েছ।"

পিসীমা হাত-মুখ নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আহা, কচি খোকা কি না তুই। তা যা না, ভায়ের পায়ে গড়িয়ে পড়, বড় গিন্নীর লাথি-ঝাঁটা খেয়ে জন্ম সার্থক কর্।"

অমূল্য বলিল, "সে পথও আর নাই বুঝি পিসীমা। যাক্ সে পরের কথা পরে, এখন তোমার গলার ঐ সোনার কবচটা দাও দেখি।"

পিসী। বটে, কবচটা কি হবে ?

অমূ। আর সকল জিনিসের যে গতি হয়েছে, এরও তাই হবে।

পিসী। হবে বৈ কি, আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়েও আশ মিটে নি, শেষে এই ইষ্টিকবচটুকু বেচে মদ খাবে। বল্‌তে তোর লজ্জা করে না রে হতভাগা ?

অমূল্য হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "সে সব অনেক দিন চ'লে গেছে পিসীমা। লজ্জা থাক্‌লে কি আর দাদাকে বাড়ী হ'তে তাড়াই ? লজ্জা থাক্‌লে কি ছোট-বোয়ের গায়ের গয়না বেচে, মেয়েটার পায়ের মল চারগাছা পর্য্যন্ত শুঁড়ীর দোকানে দিয়ে মদ খাই ? লজ্জা থাক্‌লে কি তোমার বাক্স ভাঙ্গি ? সে সব আর কিছুই নাই, এখন ভাল মানুষের মেয়েটির মত কবচটা খুলে দাও দেখি।"

পিসীমা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি দেব না।"

অমূ। তোমার বাবা যে, সে দেবে। আমার বোতল খালি, তা জান ?

পিসী। আর এ দিকে চালের হাঁড়িও খালি, তা মনে রাখিস্।

অমূ। অত কথা মনে রাখবার দরকার আমার নাই। আমি যা চাইছি, তা দাও।

"আচ্ছা, দেব এখন" বলিয়া পিসীমা প্রস্থানোদ্যত হইলেন। অমূল্য তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পিসীমা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জোর ক'রে নিবি না কি ?"

অমূল্য বলিল, "তা নয় তো কি মনে করেছ, আমি জল খেয়ে খোঁয়ারী ভাঙবো ?"

পিসীমা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ইস্, মগের মুল্লুক আর কি। এত কাল কিছু বলি নাই, কিন্তু এবার ঝাঁটায় মুখ ভেঙ্গে দেব, তা জানিস্ ?"

"খুব জানি" বলিয়া অমূল্য পিসীমার গলা ধরিতে উদ্যত হইল। পিসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ছোট-বৌ ছুটিয়া আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ছি:, কর কি, পিসীমার গায়ে হাত দেবে ?"

অমূল্য দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধাক্কা দিয়া ছোট-বৌকে ফেলিয়া দিল, এবং লাফাইয়া পিসীমার উপর পড়িয়া এক হাতে তাঁহার গলা, অপর হাতে কবচটা টানিয়া ধরিল। পিসীমা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে বাবা রে, মেরে ফেল্লে রে, এ যে আমার অনেক যত্নের ইষ্টিকবচ রে, ওতে আমার ইষ্ট-মন্তর লেখা আছে রে।"

অমূল্য সে চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া কবচ ধরিয়া টান দিল। পিসীমা কাঁদিয়া উঠিলেন।

"পিসীমা কোথায় গো ? কৈ রে অমূল্য ?"

চমকিত হইয়া অমূল্য পিসীমার গলা ছাড়িয়া

দিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, গোকুল ও বড়-বৌ দণ্ডায়মান। অমূল্য লজ্জায় মাথা হেঁট করিল, পিসীমার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল। পিসীমা ক্রন্দনরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "গোকুল রে।"

সান্ত্বনার স্বরে গোকুল বলিল, "ও কি পিসীমা, ছেলেমানুষ, ওর কি জ্ঞানবুদ্ধি আছে?"

আকুলকণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, "ও অধঃপাতে গেছে গোকুল, ওকে বাঁচা।"

সহাস্যে গোকুল বলিল, "হাঁ হাঁ, বাঁচাব। এখন রান্না চাপিয়ে আমার পাপটা বাঁচাও দেখি।"

তার পর অমূল্যর দিকে ফিরিয়া বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলি যে? গাড়ীতে মোট-ঘাটগুলো প'ড়ে আছে, সেগুলো কি আমি নামিয়ে আনব?"

অমূল্য জ্যেষ্ঠের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল। গোকুল তাহাকে তুলিয়া দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। পার্ব্বতী পাশে দাঁড়াইয়া স্তব্ধনেত্রে গোকুলের দিকে চাহিয়া রহিল। গোকুল তাহার দিকে ফিরিয়া আনন্দোচ্ছলিতকণ্ঠে বলিল, "অতীতের সব কথা ভুলে যাও পারু! অনেক দিনের পরে আজ আমাদের দুই ভায়ের সুখের মিলন।"

পার্ব্বতী ছুটিয়া গিয়া ছোট-বৌকে জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমাদেরও আজ সুখের মিলন, কি বলিস্ ভাই।"

মৃদু হাসিয়া ছোট-বৌ পার্ব্বতীর গলা জড়াইয়া ধরিল।

এমন সময় নৃত্যকালী বাড়ী ঢুকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি এসেছি গো ঠাকুর মশায়, এখন আমার জুয়াচুরীর শাস্তির হুকুম হোক।"

পার্ব্বতী আসিয়া তাহার হাত ধরিল, উৎফুল্ল-কণ্ঠে বলিল, "তোমার শাস্তি দেব আমি। তোমার ভালবাসার মন্ত্রটা আমায় শিখিয়ে দিতে হবে, এই তোমার দণ্ড।"

নৃত্যকালী বলিল "বেশ, তোমার অভিমানটা আমাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিও।"

সমাপ্ত

উত্তরাধিকারী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মথুরাবাটীর জমীদার তারিণী চৌধুরী রথ দেখিতে যাইতেছিলেন। সঙ্গে দেওয়ান রাজীব দত্ত ছিল, কারকুন রামধন বাগুলী ছিল, দুই চারি জন পারিষদ ছিল, এক জন দরোয়ান ছিল। জমীদারের উপযোগী যাহা, তাহা সকলই ছিল, শুধু রাস্তাটাই ভাল ছিল না। একে পল্লীগ্রামের কাঁচা রাস্তা, তাহাতে বর্ষাকাল, মধ্যাহ্নে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাস্তার মাঝে মাঝে জল জমিয়া ছিল। যেথানে জল জমে নাই, সে স্থানও কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল। সুতরাং সকলকেই নগ্নপদে ধীরে ধীরে যাইতে হইতেছিল। রাস্তার লোকেরা জমীদারকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া এক পাশে দাঁড়াইতেছিল।

রাস্তার এক জায়গায় অনেকটা জল জমিয়াছিল, পাশে একটু সরু জায়গা অপরাহ্নের রৌদ্রে কতকটা শুক্‌না হইয়াছিল, পথিকেরা সেই সঙ্কীর্ণ পথটুকু দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। জমীদার মহাশয় দলবল সহ সেই অপ্রশস্ত পথ দিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু তাঁহার গমনে বাধা পড়িল। বিপরীত দিক্ হইতে একটি তের চোদ্দ বছরের মেয়ে, এক বুড়ার হাত ধরিয়া পথের অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং জমীদারের দলবলকে সেই সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মুখ তুলিয়া গম্ভীর সতেজ কণ্ঠে অনুজ্ঞার স্বরে বলিল, "তোমরা একটু স'রে যাও, আমার দাদামশায় বুড়ো মানুষ, প'ড়ে যাবে।"

প্রবলপ্রতাপ জমীদারের সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র বালিকার এইরূপ ধৃষ্টতা দর্শনে জমীদারের পারিষদবর্গ মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অপর কেহ এইরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলে তাহার কাঁধে মাথা থাকিত কি না সন্দেহ, কিন্তু সেই তের চোদ্দ বছরের মেয়েটির সুন্দর মুখখানায় এবং তাহার সেই গর্ব্বোদ্দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে এমন একটা মাদকতা ছিল, যাহাতে দুর্দ্দান্ত জমীদার তারিণী বাবুও অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং ক্রোধের পরিবর্ত্তে মৃদু হাসিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। অগত্যা দলের আর সকলকে, মেয়েটাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। মেয়েটি বুড়ার হাত ধরিয়া সদর্প পদক্ষেপে তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তারিণী বাবু তাহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখ এবং সদম্ভ পদবিক্ষেপের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মেয়েটি চলিয়া গেলে তারিণী বাবু জনৈক পারিষদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি কে হে অবিনাশ?"

অবিনাশের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শ্রীপতি গাঙ্গুলী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ও পাড়ার দেবু ঘোষালের মেয়ে, ভুবন ঘোষালের নাতনী। বড় ভয়ানক মেয়ে বাবু, ওর দৌরাত্ম্যে পাড়াশুদ্ধ অস্থির।"

মুখ মুচকাইয়া হাসিয়া তারিণী বাবু অগ্রসর হইলেন, সকলে তাঁহার অনুসরণ করিল। চলিতে চলিতে তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির বোধ হয় বিয়ে হয়নি?"

গাঙ্গুলী বলিলেন, "হয় নি, বোধ হয় হবেও না। হবে কিসে? থাক্‌বার মধ্যে আছে ভাঙ্গা বাড়ীখানা, আর ঐ বুড় দাদামশায় ভুবন ঘোষাল, তার উপর ঐ দস্যি মেয়ে, ওকে আবার বিয়ে কর্‌বে কে?"

তারিণী বাবু আর কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইলেন। অবিনাশ ঘোষ দেওয়ান রাজীব দত্তের গা টিপিয়া একটু হাসিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর তারিণী বাবু বৈঠকখানার পাশের ঘরে আলবোলার নলটি হাতে করিয়া একা বসিয়াছিলেন। বাহিরে মৃদুগম্ভীরে মেঘ ডাকিতেছিল, ঝিম্‌-ঝিম্ বৃষ্টি পড়িতেছিল, অন্ধকারটা খুব জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। তারিণী বাবু খোলা জানালায় বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন।

এমন সময় দীর্ঘশব্দে "জয়োস্তু" বলিয়া শিরোমণি মহাশয় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তারিণী বাবু আলবোলার নলটা রাখিয়া হাত তুলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। শিরোমণি মহাশয় জয়কামনা-পূর্ব্বক আসনগ্রহণ করিলেন, এবং তারিণী বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "আপনাকে যেন কিছু চিন্তান্বিত দেখ্‌ছি।"

ম্লান হাসি হাসিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "না, এমন কিছু নয়।"

সহাস্যে শিরোমণি বলিলেন, "একটু কিছু আছে বৈ কি। আর ধর গে, তা থাকাই সম্ভব। কবি বলেছেন—"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা-বৃত্তিচেতঃ.—কণ্ঠাশ্লেষে প্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূর-সংস্থে।" অর্থাৎ মেঘোদয় দর্শন কি না মেঘ দেখিলে, সুখিনঃ অপি কি না সুখী যে লোক, তাহারও, প্রণয়িনী জনে কণ্ঠাশ্লেষে কি না প্রণয়পাত্রী, অনুরক্তা, নায়িকা ইতি যাবৎ, বুঝলেন কি না ?"

কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "কিন্তু শিরোমণি মশায়, আমাদের এখন আর গলায় প্রণয়িনী ঝোলাবার বয়স আছে কি ? এখন যে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিয়ে বনে যাবার বয়স হয়েছে।"

ব্যগ্রভাবে শিরোমণি বলিয়া উঠিলেন, "আপনার শত্রু যে, সে বনে যাক্। ধরুন, আপনার মত ধনী জ্ঞানী দানী লোক যদি বনে যায়, তবে সংসারে থাক্‌বে কি ? সংসারই যে ধরুন ঘোর অরণ্য হয়ে উঠ্‌বে।"

তারিণী। কিন্তু শাস্ত্র তো তাই বল্‌ছে।

শিরো। সে ধরুন গে বল্‌ছে, যারা হতভাগা, যাদের আজ আন্‌তে কাল নাই, তাদের। আপনার মত লোকদের ধরুন বনে যেতে বলে না।

তারি। তবে আমাদের কি বলে ?

শিরো। আপনাদের ধরুন পুনরায় দারপরিগ্রহ ক'রে সংসারী হ'তে বলে।

মৃদু হাসিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "এই বয়সে আবার দারপরিগ্রহ ? সে যে গলগ্রহ!"

মস্তক-সঞ্চালনে দীর্ঘশিখা কম্পিত করিয়া শিরোমণি বলিলেন, "কতই বা বয়স আপনার ? ধরুন, জোর চল্লিশের কাছাকাছি।"

সহাস্যে তারিণী বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, চল্লিশের নয়, পঞ্চাশের কাছাকাছি।"

জোরে মাথা নাড়িয়া শিরোমণি বলিলেন, "তাই বা এমন কি বেশী ? শীতল চাটুয্যে ধরুন সত্তর বৎসর বয়সে বিবাহ ক'রে তিন পুত্র রেখে স্বর্গে গেলেন। মহেশ বাষট্টি বৎসর বয়সে, ধরুন চতুর্থ পক্ষের পাণি-গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের চেয়ে ধরুন গে আপনার বয়স কি বেশী ?"

তারিণী বাবু ঈষৎ গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "কিন্তু লোকে বল্‌বে কি ? ঘরে বিধবা মেয়ে।"

শিরোমণি উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন, "মেয়ে আছে, তা হয়েছে কি ? মেয়ে বিধবা হয়েছে, ধরুন, শাস্ত্রের বিধানমতে সে ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে। তাই ব'লে ধরুন, আপনাকেও যে ব্রহ্মচর্য্য করতে হবে, এমন কোন কথা নাই। আর ধরুন, মেয়েই বলুন, ছেলেই বলুন, কে কার ? অসময়ে কেউ ফিরেও চেয়ে দেখবে না। এই যে ধরুন আমার কন্যা আছে, পুত্র আছে, পুত্রবধূ আছে। তথাপি আমি ধরুন পুনরায় বিবাহ করলাম কেন ? ঐ ধরুন, অসময়ে এক গণ্ডূষ জলের প্রত্যাশায়। আপনি বুঝ্‌ছেন না, ঐ যে ধরুন একটা পরের মেয়ে, সে যত্নটা করবে, নিজের ছেলে মেয়ে ধরুন তার শতাংশের একাংশও করতে পারবে না। আপনি বিবাহ করুন, বিবাহ করুন।"

তারিণী বাবু আলবোলার নলটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে টান দিতে লাগিলেন। শিরোমণি মহাশয় নস্যের কৌটা বাহির করিয়া এক টিপ নস্য নাকে দিয়া বলিতে লাগিলেন, "অন্য কারণে না হোক, অন্ততঃ ধরুন, পুত্রের জন্যও আপনার বিবাহ করা উচিত। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনম্।' আরও আছে, 'অপুত্রস্য গৃহং শূন্যম্।' আপনার ধরুন পিণ্ডাধিকারীর অভাব, এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরা-ধিকারীর অভাব, সুতরাং ধরুন, আপনার দারপরিগ্রহ করা যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ, এ বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই।"

তারিণী বাবু গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে আলবোলায় ঘন ঘন টান দিতে লাগিলেন. শিরোমণি মহাশয় উত্তরের প্রত্যাশায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তারিণীচরণ চৌধুরী মহাশয় প্রৌঢ়-বয়সে বিপত্নীক হইয়া পত্নীর বিয়োগবেদনায় যতটা কাতর না হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক কাতর হইয়াছিলেন আপনার বিপুল সম্পত্তির উপযুক্ত উত্তরাধিকারী অভাবে। দায়ভাগের ব্যবস্থামতে তাঁহার দুই জন উত্তরাধিকারী ছিল,—এক কন্যা অপর্ণা, দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণ। কিন্তু তারিণী বাবুর বিবেচনায় এই দুই জনের এক জনও ঠিক উত্তরাধিকারের যোগ্য ছিল না। কন্যা অপর্ণা পিতার স্নেহের পাত্রী ছিল, কিন্তু অদৃষ্টদোষে সে বিধবা, নিঃসন্তানা। সুতরাং তাহার উত্তরাধিকারিত্বে কোন ফল নাই।

ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণ শাস্ত্রমতে পিণ্ডাধিকারী হইলেও জ্যেষ্ঠতাতের বিষয়বুদ্ধির মতে এত বড় জমীদারীর উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। না হইবার কারণও ছিল। সত্যচরণের পিতা কালীচরণ অনেক আগেই জ্যেষ্ঠের সহিত পৃথক হইয়া বিষয়সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সম্পত্তি রাখিতে পারিল না। কতক অপরিমিত দান-ধ্যানে, ক্রিয়াকর্ম্মে খরচ করিল, কতক বিলাসে, মদে, বাবুগিরিতে উড়াইয়া দিল। তার পর সামান্য সম্পত্তি এবং প্রচুর ঋণ রাখিয়া,এবং নাবালক পুত্র সত্যচরণ ও পত্নী কল্যাণীকে অকূলে ভাসাইয়া ইহলোকের পরপারে চলিয়া গেল।

মহাজন আসিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি দখল করিবার উদ্যোগ করিল। বংশমর্য্যাদাভিমানী তারিণী বাবু এতটা সহিতে পারিলেন না, তিনি মহাজনদের পাওনা মিটাইয়া দিয়া সম্পত্তিটুকু নিজের হাতেই রাখিলেন, এবং ভ্রাতৃবধূ কল্যাণী ও ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণকে আপনার গৃহেই আশ্রয় দিলেন।

জ্যেষ্ঠতাতের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সত্যচরণ গ্রামের স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। অতঃপর সে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তারিণী বাবু তাহাতে মত দিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, ইংরাজী শিক্ষাতেই দেশটা উচ্ছন্নে যাইতে বসিয়াছে, ছেলাগুলা আচার-ব্যবহারের শৃঙ্খল কাটিয়া অনাচারী হইয়া পড়িতেছে। কালীচরণ বি এ পাশ করিয়া কি অনাচারটাই না করিল! তবে ইংরাজের রাজত্ব, বিষয়-কর্ম্মের জন্য এক আধটু ইংরাজী জানা দরকার। সত্যচরণের সে দরকার মিটিয়া গিয়াছে, আর তাহার বেশী ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুত্বের সীমার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই।

সুতরাং তারিণী বাবু সত্যচরণের উচ্চশিক্ষার সম্বন্ধে অনুমোদন করিলেন না। বলিলেন, "আর ও ম্লেচ্ছ ভাষা বেশী পড়বার দরকার নাই। তার চেয়ে আমলাদের কাছে ব'সে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করুক, একটা মহলে নায়েবী করলে যে পয়সা রোজগার করবে, সাতটা বি এ পাশে তা চোখেও দেখে নাই।"

সত্যচরণের কিন্তু নায়েবী পদ-গ্রহণে একটুও আগ্রহ ছিল না সুতরাং ইংরাজীশিক্ষায় হতাশ হইয়া সে সংস্কৃত শিক্ষায় মনোযোগী হইল এবং সীতানাথ বাচস্পতির টোলে গিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আরম্ভ করিল। তারিণী বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রের অবাধ্যতায় একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। বরং মৌখিক হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা। ওর যখন ঝোঁক হয়েছে, তখন তাই শিখুক, বাপের মত নাস্তিক হবে না।"

অপর্ণা পিতাকে অনুরোধ করিয়া বলিল, "বাবা, সতুর যখন কলেজে পড়বার ইচ্ছা, তখন পড়ালে হয় না?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "প'ড়ে হবে কি? ঘরের পয়সা খরচ ক'রে মদ-মুরগী খেতে শিখবে, এই তো?"

অপর্ণা বলিল, "সকলেই কি তাই খায়?"

উত্তেজিতভাবে তারিণী বাবু বলিলেন, "সকলে না খায়, ও খাবে, ওর বাবা খেয়েছে। তার চেয়ে সংস্কৃত শিখে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করবে, এটা মন্দ হ'ল কি?"

নিম্নস্বরে অপর্ণা বলিল, "মন্দ নয়, তবে খুড়ীমা দুঃখ কচ্ছিলেন।"

উগ্রকণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, 'তাঁর দুঃখটা কিসের?"

অপর্ণা বলিল, "তিনি বলছিলেন, আজ যদি কাকা বেঁচে থাকতেন।"

সক্রোধে তারিণী বাবু বলিলেন, "তা হ'লে এত দিন ঘটী বাটি পর্য্যন্ত বেচে মদ খেতেন।"

পিতার ক্রোধ দেখিয়া অপর্ণা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, সে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

নীচে কল্যাণী তখন রাত্রিকালীন রন্ধনের জন্য তরকারী কুটিতেছিলেন। অপর্ণা গিয়া তাঁহার পাশে

বসিল। খুড়ীমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার চোখ দু'টা জলে ভরা। পিতার কথাগুলা যে তাঁহার কানে আসিয়াছে, ইহা বুঝিতে অপর্ণার বিলম্ব হইল না। সে একটা আলু তুলিয়া লইয়া নখ দিয়া খুঁটিতে খুঁটিতে ধীরে ধীরে বলিল, "সব শুনেছ খুড়ীমা?"

কল্যাণী মৃদু হাসিয়া ধরা গলায় বলিলেন, "শুনেছি। ঠাকুর ঠিকই বলেছেন অপু, ও সব ইংরিজী-মিংরিজী পড়ার চেয়ে আমাদের শাস্তর পড়াই ভাল।"

অপ। কিন্তু তাতে হবে কি?

কল্যা। মানুষ হবে।

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আর তুমি চিরকাল আমাদের ভাত রেঁধে দেবে।"

অপর্ণার মুখের উপর স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কল্যাণী স্নেহসজল-কণ্ঠে বলিলেন, "তোদের রেঁধে দেব অপু, এটা কি আমার কষ্ট ব'লে মনে করিস্?"

অপর্ণা আর কিছু বলিতে পারিল না। সে নত-মুখে কতকগুলা আলু কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া ছাড়াইতে বসিল।

তা ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণ থাকিতেও তারিণী বাবু যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অকারণে নহে। সত্যচরণ শান্ত শিষ্ট সুবোধ হইলেও তাহার প্রকৃতিতে জমীদারের কোন গুণই বর্ত্তমান ছিল না। সে ইতর ভদ্র সকলের সঙ্গেই মিশিত, ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ঘর হইতে বাগ্দী চাঁড়ালের কুটীর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে ইতস্ততঃ করিত না। কেবল তাহাই নহে, লোকের বেগার খাটিত। কাহারও ঘরে চাল নাই, কে রোগে ঔষধ-পথ্য পায় না, লোকাভাবে কাহারও ডাক্তার ডাকা হইতেছে না, এই সব সন্ধান লইয়া বেড়াইত, আর পয়সা দিয়া, নিজে খাটিয়া লোকের সাহায্য করিতে ছুটিত, জমীদারের ঘরের ছেলে বলিয়া একটুও দ্বিধা বোধ করিত না। একটা ভিখারী আসিয়া হাত পাতিলে কাছে দুই চার পয়সা যাহা থাকিত, সব তাহার হাতে তুলিয়া দিত। দানের জন্য তারিণী বাবুরও নাম ছিল, কিন্তু ছেলেমানুষের এতটা দানশীলতা তিনি পছন্দ করিতেন না। এই বয়সেই যাহার হাত এত দরাজ, সে যে বড় হইয়া সম্পত্তি হাতে পাইলে তাহা ধূলিমুষ্টির ন্যায় তিন দিনেই উড়াইয়া দিবে, সে বিষয়ে তারিণী বাবুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এই সকল কারণেই তারিণী বাবু সত্যচরণকে পিণ্ডাধিকারী বলিয়া মানিয়া লইলেও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি দ্বিতীয় উত্তরাধিকারীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু মানুষ যাহা চায়, সব সময়ে তাহা পায় না। গৃহিণী দুই বৎসর আগে একমাত্র কন্যা অপর্ণাকে রাখিয়া স্বর্গবাসে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর অনেকেই তারিণী বাবুকে দ্বিতীয়-বার দারপরিগ্রহের জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তারিণী বাবু তাহাদের অনুরোধ-রক্ষায় অসম্মত হইলেন। তার পর বিধাতার নিষ্ঠুর বিধানে উনিশ বৎসর বয়সে অপর্ণা বিধবা হইল। তারিণী বাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দৌহিত্রের মুখদর্শনের আশায় বিধাতা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করিলেন।

এ দিকে বয়সও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এত বয়সে আবার বর সাজিয়া বিবাহ করা যায় না। লোকে কি বলিবে? বিধবা কন্যা কি ভাবিবে? সুতরাং পোষ্য-পুত্র লওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু পোষ্য-পুত্রের দলের উপর তারিণী বাবুর আন্তরিক বিরক্তি ছিল। তাহাদের স্বভাবচরিত্র প্রায় ভাল হয় না, ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলেরা রাজপদ পাইয়া প্রায়ই আপনাকে ঠিক রাখিতে পারে না। "কালা বামুন কটা শূদ্র"—ইত্যাদি যে প্রবাদ আছে, তারিণী বাবু তাহার সত্যতার অনেকগুলা প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া পোষ্য-পুত্রগ্রহণের ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ দিকে দায়ভাগের মতে উত্তরাধিকার-স্বত্বে স্বত্ববান্ সত্যচরণের নিকটেও কোন আশা নাই। কোন উপায় না দেখিয়া তারিণী বাবু বিষম চিন্তায় উৎপীড়িত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এখন একমাত্র উপায় পুনরায় বিবাহ। কিন্তু ছিঃ, এই বাহান্ন বৎসর বয়সে একটা দশ-বারো বছরের মেয়ের পাণিগ্রহণ! কথাটা মনে উঠিলেই তারিণী বাবুর হাসি আসিত।

কিন্তু যে দিন তারিণী বাবু রথ দেখিতে গিয়া সেই তের চৌদ্দ বছরের মেয়েটিকে দেখিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার হাসির বেগটা যেন অনেক

করিয়া আসিল, তৎপরিবর্ত্তে সেই অস্ফুটযৌবনা বালিকার গর্ব্বোজ্জ্বল মুখখান তাঁহার মনের ভিতর উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া বড়ই উৎপাত করিতে লাগিল। মেয়েটিকে দেখিয়া সুলক্ষণা বলিয়াও বোধ হয়। এমন সুন্দরী সুলক্ষণা, বিশেষতঃ আত্মগরিমাসম্পন্না মেয়ে জমীদারের ঘরেই শোভা পায়। কিন্তু ছিঃ, এই বয়সে!

তারিণী বাবু বিষম ভাবনায় পড়িলেন। ভাবিতে ভাবিতে সেই মেয়েটার দিকে তাঁহার চিত্তটা বড় বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। তারিণী বাবু অস্থির হইয়া পড়িলেন।

সহসা তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, "এই সুরূপা সুলক্ষণা মেয়েটিকে ঘরে আনিতেই হইবে, কিন্তু আপনার বধূরূপে নয়, পুত্রবধূরূপে।"

চিত্তে অসম্ভব দৃঢ়তা আনিয়া তারিণী বাবু চিন্তামণি ঘটককে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"তরু! ওগো শ্রীমতী তরঙ্গিণি!"

"কেন গা শ্রীযুক্ত দাদামশায়?"

"একটু তামাক দিতে পার?"

ঘাড় নাড়িয়া তরঙ্গিণী বলিল, "খুব পারি দাদা মশায়, এক ছিলিম কেন, দশ ছিলিম দিতে পারি।"

দন্তহীন মুখে হাসির লহর তুলিয়া দাদামহাশয় বলিলেন, "লঙ্কার বীচ পর্য্যন্ত দিয়ে সাজ্‌তে পার।"

একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "সে একদিন তামাসা ক'রে দিয়েছিলাম, তা ব'লে রোজই কি তামাসা কর্‌বো?"

দাদামহাশয় বলিলেন, "তা আমাকে রোজ কেন, দিনে সাতবার তামাসা ক'রে দিতে পার, কিন্তু দাদা, এর পর যাকে সেজে দিতে হবে, তার সঙ্গে যেন তামাসা ক'রো না।"

তরঙ্গিণী হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইল।

বাড়ীখানা বড়, কিন্তু ভাঙ্গা। বাড়ীর অধিকাংশ ঘরই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কেবল দুই তিনখানা ঘর বাসের উপযোগী ছিল। তাহাদেরও বালিচুণ খসিয়াছিল, দেওয়ালে ফাট ধরিয়াছিল, ছাদের আলিসায় বটগাছ জন্মিয়াছিল। সে গাছ তুলিয়া ফেলিয়া কেহ বাড়ী মেরামত করায় নাই। যাহারা এই ভাঙ্গা বাড়ীতে বাস করিতেছিল, তাহারাও ইহার মেরামত করান আবশ্যক বোধ করে নাই। তাহাদের মধ্যে একজন এই বাড়ীখানারই মত ভগ্ন হৃদয় আর জীর্ণ দেহ লইয়া পরপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। আর একজন—সে তো দুই দিন পরে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে। তখন এই বাড়ীখানা অরণ্যে পরিণত হইলেও, এখানে শৃগাল-কুক্কুর বাস করিলেও তাহাতে কাহারও কিছুই ক্ষতি হইবে না।

আগে এই বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব, ক্রিয়াকাণ্ড, বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। ঐ যে ভাঙ্গা দালানটা —যাহার শুধু একদিকের দেওয়ালটা দাঁড়াইয়া আছে, ঐ দালানে দুই শত ব্রাহ্মণ একসঙ্গে বসিয়া খাইত। ঐ যে পাঁচীলের পাশে ইটের ঢিবি, ঐখানে পূজার সময় ভিয়ান বসিত। ঐ যে বড় সদর দরজা—যাহার কপাট নাই, শুধু মোটা মোটা শালের বাজু দুইটা দুই পাশে দাঁড়াইয়া আছে, ঐ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূর্ণ-মনোরথ ভিখারীরা বৎসরে দুই তিনবার মুক্তকণ্ঠে দাতার জয়-কামনা করিত। যাহার জয়-কামনা করিত, সেই ভুবন গাঙ্গুলী এখনও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু এখন একটা ভিখারী সেই ভাঙ্গা দরজায় পাশে 'রাধেকৃষ্ণ' বলিয়া দাঁড়াইলে সে ঘরের ভিতর গিয়া লুকাইয়া থাকে।

ভুবন গাঙ্গুলী আছে, কিন্তু তাহার আর সে অর্থ-সামর্থ্য কিছুই নাই, অর্থসঞ্চয়ের শক্তি নাই, উৎসাহ-অধ্যবসায়ও নাই। যেমন ঝড়ে ডালগুলা ভাঙ্গিয়া পড়িলে গাছের গুঁড়িটা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, শুকাইয়া গেলেও যত দিন কাঠুরিয়া আসিয়া কুঠারের আঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী না করে, তত দিন পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, ভুবন গাঙ্গুলীও তেমনই কালের ঝড়ে স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র সব হারাইয়া, অর্থ, শক্তি-সামর্থ্য সকল হইতে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডেরই মত দাঁড়াইয়াছিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কালের প্রচণ্ড কুঠারাঘাতের প্রতীক্ষা করিতেছিল। শুধু একটা ছোট ফেঁকড়ী ডাল সেই শুক্‌না গুঁড়ির গাত্রে উদ্গত হইয়া শ্যামদলরাজির শোভা বিকীর্ণ করিয়া, বসন্তের বাতাসে মৃদু হেলিত দুলিত। তাহাতে বৃদ্ধের অনন্ত পথপ্রান্তে

নিবদ্ধ দৃষ্টিটা এক একবার সংসারের দিকে না ফিরিয়া থাকিতে পারিত না। সে ক্ষুদ্র সরস শাখাটি—পৌত্রী তরঙ্গিণী।

তরঙ্গিণী মেয়েটি দেখিতে শুনিতে বেশ, কিন্তু পাড়ায় সে অসম্ভব রকমের দুরন্ত মেয়ে বলিয়া প্রসিদ্ধ। তরঙ্গিণীর প্রকৃতিটা স্বভাবতই একটু চঞ্চল ছিল, ইহার উপর পিতামহের অজস্র স্নেহ ও আদরের আতিশয্যে তাহার প্রকৃতিটা অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দৌরাত্ম্যে পাড়ার লোকেরা অনেক সময় অস্থির হইয়া পড়িত। মেয়ে-ছেলেদের তো কথাই নাই, বয়সে বড় বেটাছেলেরাও তাহার নিকট প্রহৃত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী যাইত। সে যখন পুরুষের মত মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া, জামগাছের সর্ব্বোচ্চ ডালে উঠিয়া জাম পাড়িত, তখন অনেক সাহসী বেটাছেলেও তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে পারিত না। স্নান করিতে গিয়া সে যখন সন্তরণ-কৌশলে বড় বড় পুকুরের এপার হইতে ওপারে চলিয়া যাইত, তখন ঘাটের মেয়েরা গালে হাত দিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত।

কেবল ইহাই তাহার দুষ্টামীর চূড়ান্ত নহে, সে ঘাটে স্নানপূজায় নিরত মেয়েদের কলসী ভাঙ্গিয়া দিত, পিতলের কলসী গভীর জলে ভাসাইয়া দিয়া তামাসা দেখিত। কাহারও গাছে ফল দেখিলে সে লোভ সংবরণ করিতে পারিত না, সুযোগমতে তাহা পাড়িয়া খাইত। এজন্য কেহ তিরস্কার বা গালাগালি দিলে তাহার গাছের গোড়া কাটিয়া দিয়া আসিত। তাহার ভয়ে প্রতিবাসীরা শশব্যস্ত হইয়া থাকিত। কেহ তাহাকে গালাগালি দিত, কেহ বা ভুবন গাঙ্গুলীর মুখ চাহিয়া মা-বাপ-মরা মেয়েটাকে বেশী কিছু বলিত না। কেহ কিছু বলুক বা না বলুক, তরঙ্গিণী কিন্তু কাহাকেও ভয় করিত না। সে 'দস্যি মেয়ে' আখ্যা লইয়া অবাধে পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।

অপর কাহাকেও ভয় না করিলেও তরঙ্গিণী শুধু একজনকে ভয় করিয়া চলিত। ভয় ততটা না করুক, তাহার কথা না মানিয়া চলিতে পারিত না। সে সত্যচরণ।

একদিন একটা মেয়ে তাহাদের নিজের গাছে পেয়ারা পাড়িয়া তাহা খাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় তরঙ্গিণী তথায় উপস্থিত হইল। এমন সুপক্ক পেয়ারাটি এই ছোট মেয়েটা যে উদরস্থ করিবে, ইহা তরঙ্গিণী সঙ্গত বিবেচনা করিল না, সে তাহা আপনার ভোগে লাগাইবার জন্য কাড়িয়া লইতে গেল। মেয়েটি ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি পেয়ারায় একটা কামড় দিয়া তাহার আধখানা মুখে পুরিল। তরঙ্গিণীর আর সহ্য হইল না, নিকটেই একটা শুক্‌না পেয়ারা-ডাল পড়িয়া ছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া সজোরে মেয়েটার পিঠে বসাইয়া দিল। মেয়েটা হাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তরঙ্গিণী বাঁ হাতে তাহার ঘাড়টা চাপিয়া ধরল, এবং ডানহাতের আঙ্গুল দিয়া তাহার ব্যাদিত মুখগহ্বর হইতে পেয়ারাটা বাহির করিয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল। তার পর আবার শুক্‌না ডালটা তুলিয়া লইয়া মেয়েটার এই দুর্ব্ব্যবহারের সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহার আর শাস্তি দেওয়া হইল না। ঠিক সেই সময় সত্যচরণ এই পথে স্কুল হইতে ফিরিতেছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া তরঙ্গিণীর উদ্যত হাতখানা চাপিয়া ধরিল এবং বিরক্তি ও তাচ্ছীল্যের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন উহাকে মাচ্ছ ?"

অসম্ভাবিতরূপে বাধা পাইয়া তরঙ্গিণী রোষ-কষায়িত-দৃষ্টিতে সত্যচরণের দিকে ফিরিয়া চাহিল। মৃদু হাসিয়া সত্যচরণ বলিল, "ছিঃ, এই ছোট মেয়েটাকে মারতে আছে ?"

গর্জ্জন করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "হাঁ, আছে।"

সত্যচরণ বলিল, "বেশ, আমি যদি এখন তোমাকে মারি ?"

তরঙ্গিণী হাতটা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিল যে, পাড়ার অযোগ্য ছেলেদের চেয়ে এ ছেলেটার হাতের জোর অনেক বেশী। সত্যচরণ তখন নিজেই তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "ঘরে যাও।"

তরঙ্গিণী কিন্তু গেল না, মুখ নীচু করিয়া রাগে ফুলিতে লাগিল। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাদের মেয়ে ?"

তরঙ্গিণী কোন উত্তর দিল না। প্রহৃতা মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ও ওই বামুনদের মেয়ে। বড় দুষ্ট গো বড় দুষ্ট। আমাকে পেয়ারাটা খেতে দিলে না ফেলে দিলে।"

পেয়ারার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিতে করিতে এবং তরিঙ্গিণীকে দুই একটা গালি দিতে দিতে মেয়েটি দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সত্যচরণ তরঙ্গিণীর দিকে

চাহিয়া বলিল, "ছিঃ, এমন দুষ্টামী করে ? ঘরে যাও।"

তরঙ্গিণী তাহার মুখের উপর একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ-পাত করিয়া ধীরে মন্থর-পদে চলিয়া গেল।

ক্রুদ্ধ হইলেও তরঙ্গিণী কিন্তু এই বালকটিকে আপনার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া লইল। ইহার পর আরও কয়েকবার সত্যচরণের সহিত তরঙ্গিণীর পথে দেখা হইল। দেখা-সাক্ষাতে আলাপ হইল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে একটু সখ্যভাব জন্মিল। অল্প-দিনের মধ্যেই সত্যচরণ তাহার একজন সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল।

তার পর সত্যচরণ যখন স্কুল ছাড়িয়া গাঙ্গুলীদের বাড়ীর কাছেই বাচস্পতির টোলে পড়িতে আরম্ভ করিল, তখন সে প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া তরঙ্গিণীর সহিত দেখা করিত, এবং স্তব্ধ মধ্যাহ্নে উভয়ে মিলিয়া ঘোষেদের বাগানে আম, জাম, লিচু, পেয়ারা পাড়িয়া খাইত। তবে তরঙ্গিণী এখন আর গাছে উঠিত না, উঠিবার ইচ্ছা থাকিলেও সত্যচরণের ভয়ে উঠিতে পারিত না। সত্যচরণ গাছে উঠিয়া ফল সংগ্রহ করিত, তার পর দুই জনে ভাগ করিয়া খাইত।

এ দিকে তরঙ্গিণী অনেক দিন আগেই কন্যাকাল অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু বিবাহ হইল না। গাঙ্গুলী মহাশয়ের তেমন চেষ্টাও দেখা গেল না। লোকে কিছু বলিলে বলিতেন, "সময় হ'লেই হবে, বিধাতার নির্ব্বন্ধ।"

আসল কথা, তরঙ্গিণীর জন্মের পর বৃদ্ধ নরহরি আচার্য্য কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া বলিয়াছিল, "মেয়েটির জন্মকালীন রাশিতে রবি ও চন্দ্র অবস্থিত, এবং বৃহস্পতি দশমস্থ; সুতরাং মেয়েটি রাজরাণী হইবে। রাজরাণী হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও অন্ততঃ জমীদারগৃহিণী হওয়া সম্ভব।" গাঙ্গুলী মহাশয় এই সম্ভাব্য ফলের আশায় কতকটা নির্ভর করিয়াছিলেন। সুতরাং যে দুই চারিটা সম্বন্ধ আসিতেছিল, তাহাতে ততটা মনোযোগ দিলেন না। তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, নরহরি আচার্য্যের প্রস্তুত কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা হইবার নহে, থাক না দিনকতক।

এইরূপে দিনকতক যাইতে যাইতে তরঙ্গিণী যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিল, তখন গাঙ্গুলী মহাশয় যেন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, "হায়, কলি বলিয়া জ্যোতিষের ফলও কি ফলিবে না ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তরঙ্গিণী তামাক সাজিয়া আনিয়া দাদামহাশয়ের হাতে হুঁকা দিলে দাদামহাশয় নীরবে গম্ভীরভাবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। তরঙ্গিণী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদামহাশয়, আজ লক্কাবাঁচি দিই নাই ব'লে তামাকের সঙ্গে যে ভাবটা জমিয়ে তুল্‌লে।"

মৃদু হাসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "ভাব জমে নাই দিদি, শুধুই ভাবছি।"

তরঙ্গিণী দাদামহাশয়ের পাশে বসিয়া পড়িল, এবং তাঁহার উরুদেশের উপর হাত দুইটি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচো দাদামশায় ?"

গা। ভাবছি, এত আদরের তামাকটাকে ছাড়ব কেমন ক'রে ?

তর। ছাড়বে কেন ? কি দুঃখে ?

গা। দুঃখ অনেক, সেজে দেবে কে ?

তর। এখন কে দিচ্চে ?

গা। এখন দিচ্চে শ্রীমতী তরঙ্গিণী ওরফে তরুদিদি। কিন্তু তখন ?

তর। কখন্ ?

গা। যখন শ্রীমতী তরুদিদি এই বুড়োকে ফেলে আর এক যুবোর ঘর আলো করতে যাবে।

ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "বালাই! তোমাকে ফেলে যাব কেন দাদামশায় ?"

মুখ হইতে হুঁকা সরাইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ফেলে যাবি না তো কি দু'জনেরই ঘর করবি ?"

তর। তুমি যদি বল, তবে তাই করবো।

গা। আমি তো তাই বলি। কিন্তু সে রাজি হবে কেন ?

তর। আবার কে ?

গা। আর একজন যে আমার সতীন—না, সতীন নয়, সতা হবে ?

তর। তুমি সতা জোটাচ্চ কেন ?

গা। না জোটালে চলে কই ? তুই কি চিরকাল এই বুড়োর ঘরই করবি ?

তর। এত দিন তো তাই ক'রে আসছি।

গা। অগত্যা।

তরঙ্গিণী হাসিয়া বলিল, "আর এখন কি গত্যা ?"

গা। ঠিক তাই। রুক্মিণীকে রথে তুল্‌বার জন্য কৃষ্ণ এসে যে উঁকিঝুঁকি মার্‌ছে, এখন কি আর বুড়ো শিশুপালকে মনে ধর্‌বে ?

তর। খুব ধর্‌বে। আমার কেষ্টঠাকুরের দরকার নাই, বুড়ো শিশুপালই ভাল।

গাঙ্গুলী মহাশয় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এ প্রার্থনায় আর কাজ নাই দিদি, এখন আশীর্ব্বাদ করি, কৃষ্ণের মত স্বামী লাভ ক'রে রুক্মিণীর মতই সৌভাগ্যবতী হও।"

তরঙ্গিণী বলিল, "কিন্তু তোমার কি হবে দাদামশায় ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া গাঙ্গুলীমহাশয় বলিলেন, "আমার আর কি দিদি, হিসাব-নিকাশ চুকে গেছে, চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে ব'সে আছে, একদিন ডাক আসে আর কি। সে দিন দু'জনে এসে মুখে এক গণ্ডূষ জল দিয়ে যাস্‌, সেই আমার যথেষ্ট সুখ।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের গলাটা ভারী হইয়া আসিল। তরঙ্গিণী ছল-ছল-চোখে দাদামহাশয়ের বিষাদগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাঙ্গুলীমহাশয়ের বিষণ্ণতার একটু কারণ ছিল। সংসারে তরঙ্গিণী ছাড়া তাঁহার আর অবলম্বন ছিল না। একমাত্র তরঙ্গিণীকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীর্ণ হৃদয়ের সকল ভালবাসা মরুপ্রায় সংসারভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু এই স্নেহমমতার কেন্দ্রটুকু সে একদিন তাঁহার আকুল প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে, নিশ্চিত হইলেও এ চিন্তাটাকে তিনি মনোমধ্যে স্থান দিতে পারিতেন না। কথাটা মনে আসিলেই তাঁহার হৃদয়টা যেন আরও ভাঙ্গিয়া পড়িত।

কিন্তু হৃদয়টা শতখণ্ডে চূর্ণ হইলেও তরঙ্গিণীকে পর করিতেই হইবে, এবং শীঘ্রই যে তাহা করা আবশ্যক, ইহা যে দিন বুঝিতে পারিলেন, সেই দিন হইতে বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তবে এই নূতন বিচ্ছেদটা নিশ্চিত হইলেও আশু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া সুস্থচিত্তে দিন কাটাইতে থাকিলেন।

তার পর যে দিন তারিণীবাবুর প্রেরিত ঘটক আসিয়া বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণের সহিত তরঙ্গিণীর বিবাহের প্রস্তাব করিল, সে দিন কৃষ্ণ যেমন একদিকে আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন, অন্যদিকে তেমনই আশু বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তবে তরঙ্গিণীর কোষ্ঠীর ফল মিলিল, সে সুখী হইবে, এই আশ্বাসেই তিনি গভীর বেদনার মধ্যেও যথেষ্ট সুখের আস্বাদ অনুভব করিলেন।

এই প্রার্থনীয় বিবাহে গাঙ্গুলী মহাশয় প্রফুল্লচিত্তে সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তারিণী বাবুর মেয়ে দেখাই ছিল। সুতরাং ঘটক মারফতে কথা ঠিক হইয়া গেল। আষাঢ় মাস অকাল, শ্রাবণের প্রথমেই বিবাহ হইবে।

এ বিবাহের কথা সত্যচরণ শুনিল, তরঙ্গিণীও শুনিল। তরঙ্গিণীর মনে কি হইল, বলা যায় না, তবে সত্যচরণ বেশ প্রফুল্ল হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আহারান্তে তারিণী বাবু যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন অপর্ণা ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার পাশে বসিল এবং পাখাটা তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর খাওয়া হয়েছে, অপি ?"

অপর্ণা বলিল, "আজ যে একাদশী বাবা।"

তারিণী বাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অপর্ণা নীরবে বসিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "সতুর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল বাবা ?"

তারিণী বাবু বলিলেন,"হাঁ, শ্রাবণের সাতুই বিয়ে।"

অপর্ণা পাখাটা খাটের গায়ে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "কিন্তু বাবা—"

গম্ভীরভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "কিন্তু কি অপি ?"

অপর্ণা মুখ নীচু করিয়া বলিল, "কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন বাবা ?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "বিয়ের বয়স হয়েছে, ভাল মেয়ে পাওয়া গেছে, বিয়ে হবে, এর আর তাড়াতাড়ি কি ?"

অপর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন অপি, এতে কি কারো আপত্তি আছে ? ছোটবৌমা—"

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বলিল, "না বাবা, খুড়ীমা এমন কিছু বলেন নি।"

তারি। তবে?

অপ। তবে সত্য বলছিল—

তারিণী বাবু বালিস হইতে মাথাটা তুলিয়া একটু চড়াগলায় বলিলেন, "সত্য? সত্য কি বলছিল—"

অপর্ণা মৃদুস্বরে বলিল, "এমন কিছু বলে নি, তবে এখন পড়াশোনা কচ্চে—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "ভারী তো পড়া। ঐ গঙং গচ্ছৌ গজা প'ড়ে অনুস্বার বিসর্গের শ্রাদ্ধ ক'রে হবে কি? একটা কাজকর্ম্ম করতে পাবে, না, দু'পয়সা আনতে পারবে? একালে ও গজা-খাজায়, টিকি নামাবলীতে কিছুই হবে না অপি, কিছুই হবে না।"

বিরক্তির সহিত অপর্ণা বলিল, "কিছুই যদি হবে না তো প'ড়ে ফল কি?"

তারি। ফল আর কি, খেয়াল হয়েছে পড়ছে। যদি ভাল শিখতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্রে একটু জ্ঞান জন্মাবে।

অপর্ণা রাগিয়া বলিল, "ছাই জন্মাবে। আমি ও পড়া ছাড়িয়ে দেব।"

সহাস্যে তারিণী বাবু বলিলেন, "ছাড়িয়ে দিয়েই হবে কি? ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, মদ, ভাঙ্গ, গাঁজা ধরবে। তার চেয়ে পড়ছে পড়ুক।"

পড়ার সপক্ষে ও বিপক্ষে উভয় দিকেই পিতার পোষকতা দেখিয়া অপর্ণা কষ্টে হাস্য সংবরণ করিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "তা পড়ার সঙ্গে বিয়ের এমন কোন অহি-নকুল সম্বন্ধ নাই যে, বিয়ে করলেই পড়া ছাড়তে হবে।"

অপর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারিণী বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, 'দেখ্ অপি, আমি পোষ্যপুত্র নেব না, বিয়ের বয়সও আর নাই। এখন ভরসার মধ্যে ঐ ছোঁড়াটা। তা ও যে বিষয়-আশয় রেখে চলতে পারবে, এমন তো বোধ হয় না। না পারে—যাক্, সে তারার যা ইচ্ছা, তাই হবে। এখন দেখে শুনে যদি ওর বিয়েটাও না দিয়ে যাই—"

অপর্ণা বলিল, "তা বাবা, তুমি যদি ভাল বোঝ—"

রুক্ষকণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "আমি ভাল বুঝলে হবে কি? জোর ক'রে বিয়ে দেব? তার পর একটা কিছু হ'লে উনি ঘরের কোণে ব'সে চোখের জল ঢালুন, আর সে পাড়ায় পাড়ায় আমার নিন্দা ক'রে বেড়াক। তা হবে না অপি, তুই ভাল ক'রে ওদের মা বটার মত জিজ্ঞাসা করিস্।"

অপর্ণা বলিল, "আচ্ছা।"

উত্তেজিত-কণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "শুধু আচ্ছা নয়, বেশ খোলাখুলি মত নিবি। যদি নেহাৎ অমত করে, তা হ'লে—তা হ'লে জন্ম বিষয়ের একটি পয়সা পাবে না, নয় আমি জোর ক'রে বিয়ে দেব। কেন, আমি কেউ নই? আমার কি সাধ-আহ্লাদ কিছুই নাই? সে চ'লে গেছে ব'লে—"

তারিণী বাবুর গলার স্বরটা ভারী হইয়া আসিল, তিনি গাঢ় অথচ উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "সে চ'লে গেছে ব'লে আমারও সাধ-আহ্লাদ সব ফুরিয়ে গেছে না কি? দু' বছর পরে যদি আমি মরেই যাই, তখন আমার মনের সাধ কে মেটাবে? ওরা মায়ে বেটায় আমাকে স্বর্গে দেবেন আর কি। ঝাঁটা মারি অমন স্বর্গের মুখে।"

তারিণী বাবু ব্যস্তভাবে উঠিয়া, খড়মটা পায়ে দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। অপর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রিতে তারিণী বাবু বাড়ীর ভিতর আসিয়া অপর্ণাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওদের জিজ্ঞাসা করেছিলে অপি?"

অপর্ণা মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ।"

তারি। কি মত হ'লো?

অপর্ণা নীরব। তারিণী বাবু ক্রোধ-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "বুঝেছি, সত্য বিয়ে করবে না।"

অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল, "সত্য ছেলেমানুষ বাবা।"

বিকৃত-কণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "হাঁ, সত্য ছেলেমানুষ, তুই ছেলেমানুষ। শুধু আমি বুড়ো।"

তারিণী বাবু দ্রুতপদে আপনার ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"সুশীল বালক পিতা-মাতাকে অতিশয় ভালবাসে। তাঁহারা যে উপদেশ দেন, সে তাহা মনে করিয়া রাখে, কখনও ভুলিয়া যায় না।

বাচস্পতি মহাশয়ের টোল-ঘরের এক পাশে বসিয়া একটি বছর দশেকের মেয়ে হেলিয়া দুলিয়া, মাথার কোঁকড়ান খাটো খাটো চুলগুলি দোলাইয়া বর্ণ-পরিচয় দ্বিতীয় ভাগের সুশীল বালকের সুশীলতার উপাখ্যান পড়িতেছিল, আর মাঝে-মাঝে অদূরে দুর্ব্বোধ সংস্কৃত পাঠে নিরত সত্যচরণের দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। সত্যচরণ তখন ভট্টি কাব্যের দুরূহ শ্লোকের ধাতুরূপ-সাধনে ব্যস্ত, সুতরাং বালিকার এই মনোযোগশূন্য পড়ার দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। যখন লক্ষ্য হইল, তখন বালিকার দিকে চাহিয়া রুক্ষকণ্ঠে ডাকিল, "গৌরি।"

গৌরী বহির্নিক্ষিপ্ত দৃষ্টিটাকে তাড়াতাড়ি পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া দ্রুত উচ্চারণে পড়িতে লাগিল,—"সে তা—তা উপদেশ দেন, ভুলিয়া—ভুলিয়া যায় না।"

ক্রুদ্ধস্বরে সত্যচরণ বলিল, "তোমার মাথা খায় না। বই নিয়ে আয়।"

গৌরী বইখানি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে সত্য-চরণের কাছে আসিল, সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "পড়া হয়েছে?"

গৌরী মাথা নাড়িয়া সায় দিল। সত্যচরণ বলিল, "পড়।"

গৌরী অক্ষরগুলার উপর আঙ্গুল দিয়া পড়িতে লাগিল, "সুশীল বালক—বালক মাতা-পিতাকে—"

ধমক দিয়া সত্যচরণ বলিল, "কি?"

গৌরী একটু থতমত খাইয়া পড়িতে লাগিল, "পয়ে হ্রস্ব ই পি, তয়ে আকার তা, পিতা—পিতা মাতাকে—অ তয়ে হ্রস্ব ই তি, অতিশয়—পিতা-মাতাকে, অতিশয়—অতিশয় ভালবাসে সে।"

দাঁত খিঁচাইয়া সত্যচরণ বলিল, "তোমার মাথা-মুণ্ডু করে। এই বুঝি তোমার পড়া হয়েছে?"

তার পর বইখানা লইয়া টানিয়া বলিল, "আচ্ছা, বানান কর—সুশীল।"

সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভীতি-জড়িত-কণ্ঠে গৌরী বলিল, "সুশীল—সুশীল—দন্ত্য স, লয়ে—লয়ে দীর্ঘ ই—সুশীল—"

সত্যচরণ ঠাস্ করিয়া তাহার গালে চড় বসাইয়া দিল; তর্জ্জন করিয়া বলিল, "দন্ত্য স—দন্ত্য স। সুশীল—সু—শী—ল।"

ক্রন্দনজড়িত স্বরে গৌরী বলিল, "সুশীল—সু সয়ে হ্রস্ব উ সু—"

তাহার মাথায় চুলে টান দিতে দিতে সত্যচরণ বলিল, "সয়ে হ্রস্ব উ, কোন্ স?"

গৌরী দুই হাতে চোখ ঢাকিল। তখন সত্যচরণ তাহাকে আরও দুই চারিটা ধমক দিয়া পড়া বলিয়া দিল, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর-স্বরে বলিল, "এই ব'লে দিয়ে গেলাম। ও বেলা যদি পড়া না হয়, তা হ'লে তোমার মুণ্ডু ভেঙ্গে দেব। বুঝ্‌লে গা গৌরীমণি?"

সত্যচরণ চলিয়া গেল। গৌরী চোখ মুছিতে মুছিতে পড়িতে লাগিল, সুশীল বালক—সুশীল বালক পিতা-মাতাকে অতিশয়—"

মুখুয্যেদের সুরেন এক পাশে বসিয়া অনডুহ্ শব্দের সাত বিভক্তির রূপ ঠিক করিতেছিল। সত্য-চরণ চলিয়া গেলে, সে গৌরীর দিকে চাহিয়া বলিল, "সতেটা নেহাৎ গোঁয়ার। শুধু শুধু মেরে গেল। তুই আমার কাছে আয় গৌরি, পড়া ব'লে দিচ্ছি।"

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। সুরেন বলিল, "তার কাছে মার খাবি, সে ভাল?"

জোরে মাথা নাড়িয়া গৌরী উত্তর দিল, "হাঁ।"

"তবে মর" বলিয়া সুরেন পুনরায় শব্দরূপে মনো-নিবেশ করিল। গৌরী বানান করিয়া পড়িতে লাগিল।

সত্যচরণ দুইটা পেয়ারা হাতে ফিরিয়া আসিল, এবং পেয়ারা দুইটা গৌরীর কোলের কাছে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "এই নে।"

গৌরী ব্যগ্রহস্তে পেয়ারা দুইটা তুলিয়া লইল, এবং লোলুপ-দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "বেশ পাকা, কোথায় পেলে সতুদা?"

সত্যচরণ বলিল, "যেথানেই পাই না, তুই পেয়েছিস্, খা। পরাণ মালা পাড়ছিল, চারটে আমাকে দিলে। দু'টো দুখে বাগ্দীর ছেলেকে দিয়ে এলাম, দু'টো তোর জন্যে এনেছি।"

দুই হাতে দুইটি পেয়ারা লইয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যচরণ বলিল, "উঠ্‌লি যে?"

গৌরী একটু বিনয়ের সহিত বলিল, "ও বেলা পড়া ক'রে দেব সতুদা, তোমার পায়ে পড়ি।"

কথাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গৌরী ডান-হাতের পেয়ারায় একটা কামড় দিল। সত্যচরণ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "বটে!"

গৌরী তাহার মুখের উপর হাস্যপ্রফুল্ল দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া পেয়ারায় কামড় দিতে দিতে পলাইল। বাতাসে তাহার কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে ঢেউ খেলিতে লাগিল।

সুরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আবার ফিরে এলে যে হে সত্যচরণ ?"

সত্য বলিল, "গৌরীকে পেয়ারা দু'টো দিতে এলাম। ও পেয়ারা বড্ড ভালবাসে।"

"হুঁ" বলিয়া সুরেন মৃদু হাসিল। সত্যচরণ চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে তারিণী বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া গম্ভীরভাবে আলবোলায় টান দিতেছিলেন। পারিষদ দুই চারি জন জুটিয়াছিল, কিন্তু আজ বাবুর অসাধারণ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাহারা সকাল সকাল সরিয়া পড়িয়াছিল। তারিণী বাবু একা বসিয়াছিলেন।

নায়েব স্বরূপগঞ্জের প্রজা হলধর ঘোষকে লইয়া বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং বাবুকে অভিবাদন করিয়া সবিনয়ে জানাইল যে, হলধর ঘোষ একজন সাতোয়ান প্রজা, কিন্তু উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অজন্মা-নিবন্ধন সে ভয়ানক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। তাহার কাছে এক শত তিন টাকা সাত আনা আড়াই পাই খাজানা বাকী পড়িয়াছে। তাহার এই বাকী শোধ করিবার কোনই উপায় নাই। এখন হুজুর যদি দয়া করিয়া তাহাকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলেই গরীব রক্ষা পায়।"

তারিণী বাবু ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে হলধরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যে টাকাটা নায়েবকে দিয়েছ, সেটা সরকারে জমা দিলে কতক ওয়াশীল যেত।"

হলধর হাতযোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই হুজুর, খেতে পাই না, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে উপোস দিয়ে দিন কাটাচ্চি।"

তারিণী বাবু নায়েবের দিকে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ দিলেন, "টাকা দিতে না পারে, ঘর-দোর, ঘটী-বাটি, গরুবাছুর বেচে টাকা আদায় কর।"

নায়েব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হলধরকে লইয়া পলাইয়া গেল। তারিণী বাবু চাকরকে কলিকা পাল্টাইয়া দিতে বলিলেন।

একটু পরে দেওয়ান রাজীব দত্ত লোচনপুরের বৃদ্ধ গোমস্তা রামকুমার সরকারকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তারিণী বাবু তীব্রদৃষ্টিতে দেওয়ানের মুখের দিকে চাহিলেন। দেওয়ান অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিল, "ইনি লোচনপুরের গোমস্তা। আখিরী হিসাব দিতে এসেছেন, কিন্তু দেড় শত টাকা তহবিল মেলাতে পাচ্ছেন না।"

তারিণীবাবু গোমস্তার মুখের উপর ভ্রূকুটীভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বৃদ্ধ গোমস্তা কৃতাঞ্জলিপুটে ভীত-কম্পিত-স্বরে বলিল, 'মিথ্যা বল্‌ব না হুজুর, আজ পনর বৎসর হুজুর-সরকারে চাকরী কর্‌ছি, কখনো এক পয়সার তঞ্চক হয়নি। এবারে গেল বোশেখে শুধু কন্যাদায়ে প'ড়ে—"

গর্জ্জন করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "টাকা এনেছ ?" গোমস্তা সকাতরে বলিল, "মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেনদার হয়ে পড়েছি হুজুর —"

দেওয়ানের দিকে ফিরিয়া তারিণী বাবু বজ্রগম্ভীর নাদে আদেশ দিলেন, যতক্ষণ টাকা আদায় না হয়, বুড়াকে রোদে বসিয়ে রাখ।"

নূতন ধরণের আদেশ শুনিয়া দেওয়ান ভীত স্তম্ভিত হইল। গোমস্তা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই হুজুর—"

তারিণী বাবু দেওয়ানের দিকে চাহিয়া ভীষণ ভ্রূকুটি করিলেন। দেওয়ান ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। তারিণী বাবুর আলবোলার নলে জোরে জোরে দুইটা টান দিয়া নলটা ফেলিয়া দিলেন, এবং খড়মের খটাখট শব্দে বাড়ী কাঁপাইতে কাঁপাইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

পূজার ঘরে ঢুকিয়া তারিণী বাবু চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "অপি! অপি!"

অপর্ণা ছুটিয়া আসিল, এবং দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা ?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "কেন ? এ সব হয়েছে কি ?'

অপর্ণা দেখিল, পূজার উদ্যোগ যেমন প্রত্যহ হয়, তেমনই হইয়াছে, তাহাতে কোন ত্রুটী নাই; কেবল পুষ্পপাত্র হইতে একটু জল গড়াইয়া আসনে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তারিণী বাবু চড়া গলায় বলিলেন, "এ সব করেছে কে ?"

মৃদুস্বরে অপর্ণা বলিল, "খুড়ীমা।"

চীৎকার করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "তা তো

কর্‌বেনই, আমি ম'লেই সব আপদ্ চুকে যায়, ওঁরা মায়ে পোয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বিষয় ভোগ করেন। তা আমি এখন মর্‌ছি না অপি, আর ম'লেও বিষয়ের রীতিমত ব্যবস্থা না ক'রে মর্‌ব না।"

তারিণী বাবু রাগে ফুলচন্দন ছড়াইয়া ফেলিলেন, আসনটা টানিয়া বাহিরে ছুড়িয়া দিলেন। তার পর একখানা কুশাসন পাতিয়া শুধু গঙ্গাজল আর কয়েক পাত তুলসী লইয়া পূজায় বসিলেন। অপর্ণা দরজার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পূজা করিতে করিতে তারিণী বাবু সিংহাসনাসীন ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "রাধাবল্লভ! আর কেন প্রভু!"

সেই একটু সম্বোধনেই তাঁহার হৃদয়নিহিত দুঃখরাশি যেন পুঞ্জীকৃতভাবে বাহির হইয়া ঠাকুরের চরণে আছাড় খাইয়া পড়িল। তাঁহার দুই চোখ দিয়া ঝর-ঝর অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অপর্ণা চোখ মুছিতে মুছিতে নীচে নামিয়া গেল।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর কেন অমন কচ্ছিলেন, অপু?"

অপর্ণা বলিল, "ওঁর কথা ছেড়ে দাও খুড়ীমা, একটুতে আগুন, আবার একটুতে গঙ্গার জল। সত্যের উপর রাগটা বোধ হয় এখনো যায় নি।"

কল্যাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সত্য—এমন কুসন্তানও পেটে ধরেছিলাম?"

অপর্ণা বলিল, "ও কি কথা খুড়ীমা!"

গদ্‌গদকণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "ঈশ্বর জানেন, সত্য আমার অবাধ্য সন্তান। কিন্তু ঠাকুর তো তা বোঝেন না।"

কল্যাণীর গলার স্বরটা জড়াইয়া আসিল। অপর্ণা বলিল, "ছিঃ খুড়ীমা, তুমিও পাগল হ'লে?"

মধ্যাহ্নে টোল হইতে ফিরিবার সময় সত্যচরণ দেখিল, কাছারী বাড়ীর উঠানে এক বৃদ্ধ প্রখর রৌদ্রে বসিয়া রহিয়াছে, বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য্য তাহার মাথার উপর অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। সে উত্তাপে বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দেহনিঃসৃত ঘর্ম্মধারায় মৃত্তিকা সিক্ত হইতেছে। সত্যচরণ বিস্মিতভাবে বৃদ্ধের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি?"

বৃদ্ধ গোমস্তার তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না, সে শুধু সকাতর দৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল। কাছারীতে তখন আর কেহ ছিল না, শুধু একজন সরকার বৃদ্ধের প্রহরিরূপে বসিয়াছিল। সত্যচরণ তাহাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, সে কর্ত্তার হুকুম জানাইল। শুনিয়া সত্যচরণ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর গোমস্তার হাত ধরিয়া বলিল, "এস।"

গোমস্তা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যচরণ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কাছারীতে বসাইল। বৃদ্ধ হাঁপাইতে লাগিল, সত্যচরণ একখানা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। সরকার তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাত হইতে পাখা লইতে গেলে সত্যচরণ তাহার দিকে এমনই তীব্র দৃষ্টিপাত করিল যে, সরকার ভয়ে পিছাইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে গোমস্তা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে জল প্রার্থনা করিল। গম্ভীর কণ্ঠে সত্যচরণ বলিল, "এখানে নয়।"

তার পর সরকারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এঁকে বাচস্পতি মশায়ের বাড়ীতে নিয়ে যাও।"

সরকার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "কর্ত্তার হুকুম—"

সত্যচরণ ক্রুদ্ধ কটাক্ষে সরকারের মুখের দিকে চাহিল। সরকার মাথা নীচু করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "এখানেই খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় ক'রে দিলে হয় না?"

সত্যচরণ বজ্রকঠোর স্বরে আদেশ দিল, "না, এ বাড়ীতে নয়।"

সরকার আর প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না, সে গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া বাচস্পতি মহাশয়ের বাড়ীতে চলিল। সত্যচরণ বাড়ীতে না ঢুকিয়া দেওয়ানের বাসায় গেল।

নিকটেই দেওয়ানের বাসা। সত্যচরণের ডাক শুনিয়া দেওয়ান বাহিরে আসিলেন। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোচনপুরের গোমস্তা কত টাকা ভেঙেছে?"

দেওয়ান উত্তর করিল, "দেড়শো।"

সত্য। এই সামান্য টাকার জন্য বুড়া মানুষের এত শাস্তি? আর কখনো এমন কাজ করেছে?

দেও। না। লোকটা পুরাতন, বিশ্বাসী। শুধু কন্যাদায়ে প'ড়ে টাকাটা ভেঙেছে।

সত্য। কর্ত্তা তো কত লোকের কন্যাদায়ে পাঁচ সাতশো টাকা দান করেন।

দেও। তা জানি ব'লেই বুড়োকে কর্ত্তার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কন্যাদায় শুন্‌লেই ছেড়ে দেবেন। কিন্তু আজ যে ওঁর মেজাজটা কেন এমন হ'লো, তা তো বুঝ্‌তে পারলাম না, বাবাজি।"

সত্যচরণের মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বুঝেছি খুড়ো-মশায়, আমার অপরাধের শাস্তিটা এই বুড়া বেচারীর উপর দিয়ে হয়ে গেল।"

দেওয়ান সবিস্ময়ে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিল।

সত্যচরণ বলিল, "আমি তাকে তুলে সরকারকে সঙ্গে দিয়ে বাচস্পতি মশায়ের বাড়ীতে খাওয়াদাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি।"

দেওয়ান ঈষৎ শঙ্কিত স্বরে বলিলেন, "তোমার উপযুক্ত কাজ করেছ। কিন্তু কর্ত্তার হুকুমটা নিলেই ভাল হ'তো।"

রুষ্টস্বরে সত্যচরণ বলিল, "আপনারা কর্ত্তার হুকুম না পেলে মরণাপন্ন লোকের মুখে এক গণ্ডূষ জল দিতেও পারবেন না, কিন্তু আমি তা পারি, আমি চাকর নই।"

দেওয়ানের ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু এতে ঐ বেচারীর উপর আরও বেশী উৎপীড়ন হবে কি না, তাই ভাব্‌ছি।"

সত্যচরণ বলিল, "তার সম্ভাবনা যদি দেখেন, তা হ'লে আমার নামে দেড়শো টাকা খরচ লিখে বুড়োকে মুক্ত ক'রে দেবেন।"

সত্যচরণ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। দেওয়ান আপন মনে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সাধে কি কর্ত্তা বলেন, এ ছোকরা দ্বারা বিষয় রক্ষা হবে না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আহারান্তে তারিণী বাবু অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় শয্যার উপর বসিয়াছিলেন। সম্মুখের দেওয়ালে একখানা তৈলচিত্র ঝুলিতেছিল। চিত্রখানা পরলোকগতা গৃহিণীর; তাঁহার পরলোকগমনের অল্পদিন পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়াছিল। ছবির নীচে গৃহিণী স্বহস্তে মোটা মোটা অক্ষরে লিখিয়াছিলেন,"দাসী।" তারিণী বাবু স্থির-দৃষ্টিতে চিত্রখানার দিকে চাহিয়াছিলেন, আর অতীত স্মৃতির এক একটা উচ্ছ্বাস আসিয়া তাঁহার শূন্য হৃদয় আলোড়িত করিতেছিল।

সে কয়দিনের কথা! এই তো সে দিন—সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন এখনো যেন চোখের উপর ভাস্‌ছে, সানায়ের সে মিলনের মধুর তান, এখনো যেন কানের ভিতর বাজ্‌ছে, হৃদয়ের সেই নূতন আশাভরা আনন্দ-মাখা স্পন্দন এখনো যেন শোনা যাচ্ছে। তখন জীবনের প্রথম উন্মেষ, সংসারের প্রথম স্নিগ্ধ মধুর আহ্বান। সেই প্রথম জীবনে, নূতন সংসারপথে একদিন স্বপ্নের মত এসে দাঁড়িয়েছিলে, আর আজ জীবনের ম্লান অপরাহ্ণে—যখন আশার আলোক ধীরে ধীরে নিবে আস্‌ছে, পুরাতন জীবনটা ক্রমেই তিক্ত বিস্বাদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন একদিন আবার ঠিক স্বপ্নের মতই চলে গেলে। রেখে গেলে শুধু কৈশোরের, যৌবনের, প্রৌঢ়ের অনন্ত স্মৃতি। সে মধুময়ী স্মৃতি যে এখন কি নিদারুণ, তা তো তুমি বুঝ্‌তে পারবে না। আমিও তখন বুঝি নাই যে, সংসারটা এত কঠোর, সাধের নন্দনকাননের মধ্যে এত প্রচণ্ড উত্তাপ। স্নেহমমতার কোমল আবরণে তুমি তার সব কঠোরতা ঢেকে রেখেছিলে, প্রীতির সুশীতল ধারায় এত বড় মরুভূমিকে স্নিগ্ধতা, সরসতা দান করেছিলে। আর আজ সে ভীষণ মরুভূমির মাঝে আমায় ফেলে রেখে তুমি বেশ হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেলে, কিন্তু আমার কেঁদে কেঁদেও যাবার দিন এখনও আসে নি?

তারিণী বাবুর দীর্ঘ বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা তপ্ত নিশ্বাস বাহির হইল।

সত্যচরণ ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "জ্যেঠা মশায়!"

তারিণী বাবু সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। সত্যচরণ নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে ডেকেছেন?"

"হাঁ" বলিয়া তারিণী বাবু উঠিয়া বসিলেন। সত্য-চরণ আদেশের প্রতীক্ষায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারিণী বাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "শুনিলাম, আমার হুকুমের অপেক্ষা না ক'রেই তুমি লোচনপুরের গোমস্তাকে ছেড়ে দিয়েছ।"

সত্যচরণ নতমুখে মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "বুড়-মানুষ —"

বাধা দিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "বুড়া কি যুবা, তা জান্‌তে আমার বাকী নাই। কিন্তু সে তবিল ভেঙেছে, এ কথাটা কি শুনেছ?"

সত্য। শুনেছি। বেচারী কন্যাদায়ে প'ড়ে এমন কাজ করেছে।

তারি। পুরানো চাকর, এসে কন্যাদায় জানালে এই টাকাটা আমার কাছ থেকে পেতো না ব'লে কি তোমার বিশ্বাস হয়?

সত্য। না।

তারি। অথচ আমি যে একটা ঘোর পাষণ্ড, এটা তোমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সত্যচরণ নিরুত্তর। তারিণী বাবু বলিলেন, "তুমি এখন সাবালক হয়ে উঠেছ, আমি তোমার বিষয়-আশয় তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চাই।"

সত্যচরণ হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "আমি বিষয়কর্ম্মের কিছুই জানি না।"

তীব্রস্বরে তারিণী বাবু বলিলেন, "কিন্তু গুরুজনকে অপমান করতে বেশ জান।"

সত্যচরণের মুখে কথা নাই। তারিণী বাবু একটু থামিয়া, সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "যাক্, আর একটা কথা। আমি তোমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেছি, বোধ হয় শুনেছ?"

সত্যচরণ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "এ সম্বন্ধে তোমার মতামত জিজ্ঞাসা করতে যাওয়াই আমার অনুচিত। তবে শুনতে পাই, তোমার নাকি এ বিবাহে মত নাই। কথাটা সত্য, না মিথ্যা?"

সত্যচরণ মস্তকে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে একটা ঢোক গিলিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "সত্য।"

তারিণী বাবুর ললাটের মাংস কুঞ্চিত হইল। তিনি অপেক্ষাকৃত চড়া গলায় বলিলেন, "তা হ'লে তুমি রাজি নও?"

সত্য। না।

তারি। আমি কিন্তু কথা দিয়েছি।

জড়িতকণ্ঠে সত্যচরণ বলিল, "আমায় মাপ করুন।"

রাগে চীৎকার করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "দেখ, ফি হাত তোমাদের ঐ মাপ করুন কথাটা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে।"

সত্যচরণ অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। তারিণী বাবু ক্রোধরক্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন, "যাও।"

সত্যচরণ ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। তারিণী বাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অপর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "বাবা, খুড়ীমা এসেছেন।"

বিরক্তির স্বরে তারিণী বাবু বলিলেন, "কেন, কি দরকার?"

অপর্ণা বলিল, 'খুড়ীমা বলছেন, সত্য ছেলেমানুষ।"

মুখ বিকৃত করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "ভাগ্যে উনি ব'লে দিলেন। আমি মনে করেছিলাম, সে আমার পিতামহের বয়সী।"

অপ। সে বিষয় হাতে পেলে রাখতে পারবে না।

তারি। না পারে, যাবে।

অপ। খুড়ীমা বলছেন, তুমি রাগ করলে বাবা—

চীৎকার করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "রাগ? আমি রাগ করলেই কি জগতের যত ক্ষতি? আমার কি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবারও যো নাই? কেন অপি, আমি তোদের করেছি কি?"

অভিমানের আবেগে তারিণী বাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অপর্ণা শঙ্কিত দৃষ্টি তুলিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিতে সাহস করিল না।

বাহির হইতে দরজার শিকল নড়িয়া উঠিল। অপর্ণা ধীরে ধীরে দরজার কাছে গেলে কল্যাণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "জিজ্ঞাসা কর অপু, সত্য যায় যাক্, থাকে থাক্, কিন্তু আমি—ঠাকুরের সেবা ছেড়ে, আমি কোথায় যাব?"

মৃদুস্বরে বলিলেও কথাগুলি তারিণী বাবুর কানে গেল, অপর্ণাকে তাহার আর পুনরুক্তি করিতে হইল না। তারিণী বাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "না ছোট-বৌমা, আমার কাছে আর কেউ যত্নের প্রত্যাশা ক'রে না, আমিও কারো কাছে আর বিন্দুমাত্র স্নেহ-যত্নের দাবী রাখবো না। আমার বয়স হয়েছে, মাথার ঠিক নাই। আমি এখন দেনা-পাওনা শোধ ক'রে তোমাদের কাছে ছুটী নিতে চাই।"

কল্যাণী বলিলেন, "জিজ্ঞাসা কর অপু, আমি ঠাকুরের কাছে এমন কি অপরাধ করেছি?"

ক্রোধরুদ্ধ-কণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "অপরাধ তোমাদের নাই ছোট-বৌমা, সব অপরাধ আমার, আমি গলায় কাপড় দিয়ে মিনতি ক'রে বলছি, তোমরা আমাকে রেহাই দাও। স্নেহ-ভালবাসার ভিতর দিয়ে আমার বুকে অপমানের ছুরী মেরো না।"

তারিণী বাবু অবসন্নভাবে শয্যার উপর শুইয়া

পড়িলেন। কল্যাণী চুপ করিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটু পরে তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌমা চ'লে গেলেন, অপি?"

অপর্ণা উত্তর দিল, "দাঁড়িয়ে আছেন।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "ওঁকে বল, সত্য বিয়ে করবে না, সে আমার মুখের উপর জবাব দি' গেল।"

কল্যাণী অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "সে অবাধ্য সন্তান।"

তারিণী। কিন্তু তারিণী চৌধুরী এই প্রথম কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলে না।

কল্যাণী নিরুত্তর। অপর্ণা বলিল, "খুড়ীমার কোন দোষ নাই বাবা, উনি তাকে অনেক বুঝিয়েছেন।"

তারিণীবাবু উঠিয়া বসিলেন, এবং খাট হইতে পা ঝুলাইয়া খড়ম পায়ে দিতে দিতে বলিলেন, "দোষ কারো নাই অপি, যত দোষ-ঘাট সব আমার। কিন্তু যখন কথা দিয়েছি, তখন যে উপায়েই হোক, আমাকে কথা রাখতেই হবে। সত্য রাজি না হয়, শেষে আমাকেই এ বয়সে আবার নূতন সংসার পাততে হবে। সেটা কিন্তু কারো পক্ষে ভাল হবে না।"

স্থিরস্বরে কল্যাণী বলিলেন, "যে ছেলে গুরুজনের অবাধ্য, তার কোন কালেই মঙ্গল নাই।"

তারিণী বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আমি কাউকে শাপ-সম্পাত দিতে চাই না, কিন্তু এর পর যেন কেউ রাগ বা দুঃখ না করেন।"

তারিণী বাবু ক্ষিপ্রপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার বাহির হইবার পূর্ব্বেই কল্যাণী দরজার কাছ হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন। শুধু অপর্ণা একা দরজা ধরিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া তারিণী বাবু একেবারে কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। গল্প-কৌতুকে নিরত কর্ম্মচারীরা সন্ত্রস্তভাবে স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। তারিণী বাবু স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেওয়ানকে ডাকিলেন। দেওয়ান আসিয়া অভিবাদন করিল। তখন তারিণী বাবু পুরোহিত শিরোমণি মহাশয়কে ডাকিবার আদেশ দিয়া, লোচনপুরের গোমস্তা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেওয়ান বলিল, "সে বাইরে নজরবন্দী হয়ে আছে।"

তারিণী বাবু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "নজরবন্দী—কেন? সে এমন কি খুন-খারাপী করেছে যে, তাকে নজরবন্দী ক'রে রাখা হয়েছে?"

দেওয়ান কোন উত্তর দিতে পারিল না। তারিণীবাবু বলিলেন, "দেখ দত্তজা, দেখছি, এ সব লোকজন নিয়ে আমার আর কাজ চলবে না, এদের বুদ্ধিবিবেচনা একটুও নাই। আগে নিজে সব দেখা-শুনা করতাম, একরকমে চ'লে যেত। কিন্তু এখন আমার বয়েস হয়েছে, সকল দিক দেখবার শক্তি আর নাই।"

দেওয়ান সবিস্ময়ে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল, তারিণী বাবু তাহার দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সরোষে বলিলেন, "একটা বুড়ো মানুষকে এই বোশেখের রোদে বসিয়ে রেখে সকলে কোন্ আক্কেলে চ'লে গেল? বুড়া যদি ম'রে যেত, তখন হাতে দড়ি পড়তো কার? ছি ছি, কাণ্ডের লোক একটাও নাই।"

তারিণীবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইলেন। দেওয়ান অবনত-মস্তকে সঙ্কুচিতস্বরে বলিল, "হুজুরের হুকুম ছিল—"

সক্রোধে তারিণী বাবু বলিলেন, "আমি হুকুম দিলাম, দীনু ঘোষের বুকে ছুরী বসিয়ে দাও, শিরোমণি মশায়ের ঘরে আগুন লাগাও। তোমরা কি তাই করবে? তোমাদেরও তো বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। আমি না হয় রাগের মাথায় একটা হুকুম দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের তো একটু ভেবে চিন্তে কাজ করা উচিত।"

দেওয়ান বুঝিতে পারিল, এটা বাবুর কাটা কান চুল দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা। সে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "যাক্, অনেক দিনের পুরানো চাকর, দায়ে প'ড়ে এক কাজ ক'রে ফেলেছে, তার আর কি করা যায়। কন্যাদায় বিষম দায়। দাতব্য খাতে খরচ লিখে নিয়ে বুড়াকে ছেড়ে দাও।"

দেওয়ান প্রভুর আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। চাকর তামাক দিয়া গেল, তারিণী বাবু গম্ভীরভাবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শিরোমণি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারিণীবাবু তাঁহাকে বিবাহের দিন দেখিতে বলিলেন। শিরোমণি মহাশয় কর্ম্মচারীদের নিকট পাঁজী চাহিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যচরণের ধর গে বিয়েতে মত হয়েছে?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "তার মতামতে কিছু আসে যায় না, তবে এটা তার বিয়ের দিন নয়।"

শিরোমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর গে তা হ'লে বিয়েটা কার?"

তারিণী বাবু উত্তর দিলেন, 'আমার।"

শিরোমণি মহাশয় সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কর্ম্মচারীরাও ঘাড় তুলিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। শিরোমণি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর গে কথাটা কি সত্য?"

তারিণী বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে পরিহাস কর্‌ছি না।"

শিরোমণি পাঁজীর পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। তারিণী বাবু বলিলেন, "কি জানেন শিরোমণি মশায়, মেয়েটির বয়স প্রায় পনরো, আর সত্যর বয়স মাত্র আঠার। আঠার বছরের ছেলের সঙ্গে পনরো বছরের মেয়ের বিয়ে, এটি বেশ যুক্তিসঙ্গত হয় কি?"

শিরোমণি মস্তক-সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "রাধা কৃষ্ণ, ধর গে, তাও কি সম্ভব হয়?"

তারি। এ দিকে ওদেরও অন্য উপায় নাই। অগত্যা নিজেকেই—বুঝলেন কি না।

শিরো। বেশ করেছেন, ধর গে উত্তম করেছেন। আমি তো কত দিন বলেছি, ধর গে আপনি তাতে কান দেন না। কি জানেন, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। গৃহিণী বিনা গৃহ অন্ধকার, তা ধর গে আত্মীয়-স্বজন যতই থাক্। এই যে আমার কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ সব বর্ত্তমান, তথাপি ধর গে—

শিরোমণির বক্তৃতায় বাধা দিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "এখন দিনটা ঠিক ক'রে ফেলুন।"

শিরোমণি অনেক দেখিয়া শুনিয়া ২২শে তারিখে দিন ঠিক করিলেন। তারিণী বাবু দেওয়ানকে ডাকিয়া বিবাহের আয়োজনের আদেশ দিলেন। তবে ইহাও বলিয়া দিলেন, আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, কোনরূপে কাজটা সারিয়া দিতে হইবে।

গাঙ্গুলী মহাশয় যখন শুনিলেন যে, সত্যচরণ বিবাহে রাজী নয় তৎপরিবর্ত্তে তারিণী বাবু নিজেই তরঙ্গিণীর পাণিপ্রার্থী হইয়াছেন, তখন তিনি ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এত আদরের পৌত্রীকে বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিবেন? গাঙ্গুলী মহাশয় সহজে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারিলেন না।

কিন্তু এ প্রস্তাবে মত না দিয়াও উপায় নাই। তারিণী বাবু জমীদার, মহাশক্তিসম্পন্ন, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে, গ্রামে এমন সাহসী কে আছে? একজন ছিল, সে গাঙ্গুলী মহাশয় নিজে। একদিন তিনি এই জমীদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দশ বৎসর মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন, তাঁহার লাঠিয়ালের ভয়ে তারিণী বাবুকে ঘোষপুকুরের দাবী ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল এখন স্বপ্নমাত্র। এখন তিনি শক্তিহীন, বৃদ্ধ, সহায়সম্পত্তিশূন্য, দীন, ভিক্ষুক। এখন শুধু ভগবান্‌কে ডাকা ছাড়া তাঁহার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। গাঙ্গুলী মহাশয় ভগবান্‌কে ডাকিয়া এবং তরঙ্গিণীর অদৃষ্টের দোষ দিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তরঙ্গিণী তাঁহার চোখে জল দেখিয়া বলিল, "কাঁদ কেন দাদামশায়?"

দাদামহাশয় বলিলেন, "তোর কপাল দেখে কাঁদি তরু। এমন কপাল নিয়েও জন্মেছিলি?"

তরঙ্গিণী হাসিয়া বলিল, "জমীদার বর জুটেছে, কপালটা মন্দই বা কি?"

দাদামহাশয় মাথায় হাত চাপড়াইয়া বলিলেন, "জমীদার হ'লে কি হয়, বুড়ো যে।"

তরঙ্গিণী বলিল, "যার পয়সা আছে, সে আবার বুড়ো কি? আমিই বা কোন্ কচি খুকীটি?"

গাঙ্গুলী মহাশয় বিস্ময়বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে তরঙ্গিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তরঙ্গিণী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখছো কি দাদামশায়?"

"তুই কি রকম মেয়ে তরু?"

"খুব দুরন্ত মেয়ে দাদামশায়।"

হাসিতে হাসিতে তরঙ্গিণী দাদামহাশয়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। গাঙ্গুলী মহাশয় তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "তোর মত আছে?"

স্বরে জোর দিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "খু—ব।"

গা। বুড়োকে এত পছন্দ হ'ল কিসে?

তর। বুড়োর কাছে থেকে থেকে।

গাঙ্গুলী মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসল কথাটা কি বল্ দেখি তরু?"

ঈষৎ লজ্জিতভাবে তরঙ্গিণী বলিল, "আসল কথা, জমীদারের গিন্নী হ'তে সাধ যায়।"

তরঙ্গিণীর সাধ অপূর্ণ রহিল না। গাঙ্গুলী মহাশয় পরদিন ঘটককে ডাকাইয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন।

জমীদার-গৃহিণী হইবার জন্য যে তরঙ্গিণী উদ্‌গ্রীব ছিল, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু যে দিন সে শুনিল, সত্যচরণ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে, সেই দিন সে যেন অন্তরে একটা নিদারুণ আঘাত পাইল, তাহার চারিদিকে যেন লজ্জা ও অপমানের একটা বিকট হাসির রোল উঠিতে লাগিল। ক্রোধে অভিমানে তরঙ্গিণী আত্মহারা হইয়া পড়িল। ছি ছি, সে কি এত হেয়, এত ঘৃণার পাত্র যে, সত্যচরণের মত একটা ছোঁড়া তাহাকে উপেক্ষা করিল! সত্যচরণ মূর্খ, সত্যচরণ নির্ব্বোধ। কিন্তু এই নির্ব্বোধ যুবককে কি শিক্ষা দেওয়া যায় না? এই অপমানের, এই উপেক্ষার প্রতিশোধ দিয়া তাহাকে কি বুঝান যায় না, সে সত্যচরণ অপেক্ষা অনেক বড়, তাহার সহিত সত্যচরণের তুলনাই হয় না?

ইহার পর তারিণী বাবুর নিকট হইতে যখন দ্বিতীয় প্রস্তাব আসিল, তখন তরঙ্গিণী দেখিল, সত্যচরণকে শিক্ষা দিবার এই উত্তম সুযোগ। তরঙ্গিণী এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না। ক্রোধে অন্ধ—অভিমানে জর্জ্জরিত হইয়া সে আপনার কথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল না।

তার পর আলোকসমুজ্জ্বল বিবাহ-সভায় সে যে কেমন করিয়া তারিণী বাবুর গলায় মালা তুলিয়া দিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। সত্যচরণ তখন অদূরে দাঁড়াইয়া টিপি টিপি হাসিতেছিল, দেখিয়া তরঙ্গিণী চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বিবাহান্তে তারিণী বাবু নববধূ লইয়া বাড়ীতে আসিলেন। অপর্ণা ঘরের বাহির হইল না, কল্যাণী নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর তরঙ্গিণী সেই যে স্বামিগৃহে আসিল, আর তাহার বাপের বাড়ী যাওয়া হইল না। সেখানে আছেই বা কে? আছে শুধু বুড়া দাদামশায়, আর বাড়ীখানা। তেমন বাড়ীতে কখন জমীদারগৃহিণীর থাকা হইতে পারে না। তরুর কিন্তু সেই ভাঙ্গা বাড়ীখানা, আর বুড়া দাদামশায়ের জন্য বড় মন কেমন করিত। এখানে এমন চকমিলান বাড়ী, দাসদাসী, লোকজন সকলেই নূতন বোয়ের আদেশ-পালন জন্য সর্ব্বদা উৎসুক। তরু হাত নাড়িলে পাঁচ সাত জন দাসী ছুটিয়া আসে, হাঁ করিলে তাহার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহে মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, চলিতে গেলে তাহারা হাত পাতিয়া দিতে চায়। তারিণী বাবুও নূতন বৌকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন। তাহাকে গা-ভরা গহনা পরাইয়াছেন আঁচলে বাড়ীর চাবি বাঁধিয়া দিয়াছেন, সেবার জন্য তিন চার জন দাসী নিযুক্ত করিয়াছেন। সুখের এত উপকরণ সত্ত্বেও তরু কিন্তু একটুও সুখ পাইল না। এই অনভ্যস্ত সেবা-শুশ্রূষা, লোকজনের মুখে তাহার অজস্র সুখ্যাতি, সকলই যেন তাহার মনে একটা অস্বস্তি আনিয়া দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে এই সব অতিরিক্ত আদর যত্নের জাল কাটিয়া ছুটিয়া পলায়, সেই ভাঙ্গাবাড়ীতে গিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে, ঘোষেদের পুকুরে সাঁতার দিয়া, সিংহীদের বাগানে ছুটাছুটি করিয়া বন্য বিহঙ্গিনীর ন্যায় অবাধ আকাশে বিচরণ করিবার সুখভোগ করে। কিন্তু সে সুখ আর ফিরিবার নয়, সে ইচ্ছা করিয়াই এই সোনার পিঞ্জরে ঢুকিয়াছে।

সব চেয়ে তরুর কষ্ট হইল, কথা কহিবার লোকের অভাব। দাসদাসীরা শুধু কর্ত্রীর আদেশপালনে প্রস্তুত থাকিত, তাঁহার কি চাই না চাই, তাহাই জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। তাহাদের সহিত আর কি কথা কহিবে? কথা কহিবার লোক আছে অপর্ণা। কিন্তু সে যেন তরঙ্গিণীর সহিত আদৌ মিশিতে চায় না, মুখামুখী হইলেও একটা কথা কয় না, সাধিয়া কথা কহিতে গেলে কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় মাত্র। আর তরঙ্গিণী সাধিয়া আলাপ করিবার মেয়েই নয়। কেন সে সাধিতে যাইবে? সেই তো এখন এ বাড়ীর গৃহিণী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তাহার ইচ্ছার উপর এখন এ বাড়ীর অনেকের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে। সে অপরকে সাধিতে যাইবে? বোবা হইয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি সে সাধিয়া কাহারও সহিত আলাপ করিতে যাইবে না। তরঙ্গিণী আপনার গর্ব্বে আপনি গর্ব্বোন্নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পদিনের মধ্যেই তরঙ্গিণী বুঝিতে পারিল, তাহার আগমনে এ বাড়ীর কেহই সন্তুষ্ট নহে, সকলেই তাহাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে,

সকলেই যেন তাহার নীরব শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তরঙ্গিণীও সকলকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। হৃদয়ে ঈর্ষার আগুন জ্বালাইয়া সে নিদারুণ অস্বস্তি অনুভব করিত তথাপি আপনার গর্ব্ব ত্যাগ করিল না। সে প্রতিজ্ঞা করিল, দেখি, এ সংগ্রামে কে জয়লাভ করিতে পারে।

জয়লাভের অস্ত্র তাহার হাতেই ছিল। বৃদ্ধ স্বামীকে বশ করিতে যুবতী স্ত্রীর অধিক প্রয়াসের আবশ্যক হয় না। তবে তারিণী বাবু একটু স্বতন্ত্র ধরণের বুড়া। তাঁহার যে কিসে সন্তোষ, কিসে অসন্তোষ, তাহা বুঝা দায়। এক এক সময়ে মনে হয়, নবীনা স্ত্রীকেই তিনি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন। আবার এক সময়ে বোধ হয়, এ সকলই মৌখিক, তরঙ্গিণী তাঁহার হৃদয়ের উপর কিছুমাত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। তরঙ্গিণী স্থির করিল, আগে এই হৃদয়টাকে হাত করিতে হইবে, তাহা যদি না পারি, তবে আমার এত রূপ, এত বুদ্ধিমত্তা, এই নবোদ্গত যৌবন সকলই বৃথা।

একদিন তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোন কষ্ট হচ্চে নতুন বৌ?"

তরঙ্গিণী উত্তর করিল, "কষ্ট কিসের?"

তারি। কষ্ট অনেক রকমেই হ'তে পারে।

তর। আমি গরীবের মেয়ে, রাজসংসারে এসে পড়েছি। এর চেয়ে আমার আর কি সুখ থাকতে পারে?

ঈষৎ হাসিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "বেশ, তুমি সুখী হয়েছ শুনে সুখী হলাম। ভাল কথা, বাড়ীর সকলে তোমাকে যত্ন আত্তি করে?"

নতমুখে তরঙ্গিণী বলিল, "তা একরকম করে বৈ কি।"

তরঙ্গিণীর মুখের দিকে চাহিয়া তারিণী বাবু গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "এক রকম? তা হ'লে ভাল শ্রদ্ধা-যত্ন করে না?"

ঠোঁটে একটু হাসি আনিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "নাই বা করলে? তাদের আদর-যত্নে আমার কি আসে যায়? আমার শুধু—"

ব্যগ্রভাবে তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শুধু কি?"

লজ্জাজড়িত-কণ্ঠে তরঙ্গিণী বলিল, "আমার শুধু এক জনের কাছে আদর-যত্ন পেলেই যথেষ্ট।"

"বটে" বলিয়া তারিণী বাবু হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা সে একজনের কাছে কি আদরযত্ন পাও না?"

তরঙ্গিণীও একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "যথেষ্ট পাই।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারিণী বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু নতুন বৌ, শুধু একজনের ভালবাসা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চল্‌বে না। সংসারে থাক্‌তে হ'লে সকলকে মানিয়ে নিয়ে চলা উচিত।"

স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তরঙ্গিণী মুখখানাকে একটু ভারী করিয়া উত্তর দিল, "চল্‌বো।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "হাঁ, বেশ বুঝে চলবে। দেখ, মিষ্ট কথায় বনের পশুও বশ হয়।"

অভিমানরুদ্ধ-কণ্ঠে তরঙ্গিণী বলিল, "তুমি যদি সকলের পায়ে ধর্‌তে বল, আমি তাও ধর্‌তে পারি।"

মৃদু হাসিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "রাগ ক'রো না নতুন বৌ, তারিণী চৌধুরী তার স্ত্রীকে কারও পায়ে ধর্‌তে হুকুম দেয় না। তবে এইটুকু মনে রেখো, তুমি এখন আমার স্ত্রী, জমীদারের গৃহিণী। আমার গৌরব বজায় রেখে তোমায় চল্‌তে হবে।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে তরঙ্গিণী বলিল, "তা যদি না পারি?'

হাসিতে হাসিতে তারিণী বাবু বলিলেন, "না পার, তোমারই তাতে ক্ষতি।"

তর। তোমার?

তারি। আমার আবার কি? আমি তোমাকে পেয়েই হাতে স্বর্গ পেয়েছি।

তর। সত্যি?

তারি। সত্য মিথ্যা তুমি কি বুঝ্‌বে বৌ। তবে এইটুকু বুঝে রাখ, তোমার উপরেই আমার সকল সুখ-দুঃখ নির্ভর কর্‌ছে।

তরঙ্গিণী বুঝিল, চতুর বুড়া ধরা দিয়াও ধরা দিতে চায় না। ভাবিল, দেখি ধরিতে পারি কি না।

তারিণী বাবু বাহিরে চলিয়া গেলে তরঙ্গিণী ঘরের বাহির হইল উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "যশি!"

যশি ওরফে যশোদা ছুটিয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকছো মা?"

তরঙ্গিণী বলিল, "হাঁ, ডাক্‌ছি। চুলগুলা কি বাঁধতে হবে না?"

যশোদা তাড়াতাড়ি মাথা বাঁধিবার উপকরণ বাহির

করিতে ছুটিল। তরঙ্গিণী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মালী যে রোজ এক রাশ ক'রে ফুল নিয়ে আসে, তা কি হয়?"

যশোদা বলিল, "সে সব ফুলে ঠাকুরপুজো হয় মা।"

ক্রুদ্ধস্বরে তরঙ্গিণী বলিল, "পুজো করতে ঠাকুরকে ফুলে চাপা দিতে হয় না কি? দুটো ভাল ফুল বেছে আনতে পারিস্ না?"

যশোদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "পারব না কেন মা, তবে দিদিমণি যদি—"

রাগে চীৎকার করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "দূর হ পোড়ারমুখী, তোর দিদিমণির কাছে যা, আমার কাজ তোকে করতে হবে না।"

যশোদা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠাকুরঘর সেখান হইতে বেশী দূর নয়। অপর্ণা ঠাকুরঘর হইতে ডাকিয়া বলিল, "ওলো যশি, এই ফুলগুলো মাটীতে প'ড়ে গেছে, নিয়ে যা।"

যশোদা যেন অকূল সাগরে কূল পাইল। সে ছুটিয়া গিয়া গোটাকতক চাঁপা আর গোলাপ লইয়া আসিল। তরঙ্গিণী তাহার হাত হইতে ফুলগুলি কাড়িয়া লইয়া উঠানে ফেলিয়া দিল, এবং পায়ের গুম্-গুম্ শব্দে যশোদাকে সন্ত্রস্ত করিয়া ঘরে ঢুকিল। যশোদা গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"অপি!

"কেন বাবা?"

"টাকাটা বড়, না বাবাটা বড়?'

অপর্ণা বিস্মিতভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "শান্ত-শিষ্ট মেয়েটির মত মুখের দিকে চেয়ে রইলি যে, বল্ না কোনটা বড়?"

অপর্ণা বলিল, "তোমার কাছে কিছুই বড় নয় বাবা।"

ভ্রূকুটি করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "বটে, সেটা শুধু কথায়, না কাজে?"

অপর্ণা চুপ করিয়া রহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "বাবাটাই যদি সব চেয়ে বড় হ'লো, তা হ'লে আজ ক'দিন যে বাবার খাওয়া হ'ল না, কোন খোঁজ রেখেছিলে?"

অপর্ণা [illegible] হইল। এতক্ষণে সে পিতার অনুযোগের কারণ বুঝিতে পারিল। সে জানিত, বাড়ীতে পাচক-পাচিকা থাকিলেও তাহাদের রন্ধন পিতার তৃপ্তিকর হইত না। যত দিন মা ছিলেন, তত দিন তিনি স্বহস্তে স্বতন্ত্রভাবে রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াই-তেন। তাঁহার মৃত্যুর পর খুড়ীমা এই কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে অপর্ণাকেও দেখিতে হইত। কিন্তু আজ কয়দিন খুড়ীমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। অপর্ণারও মনটা ভাল ছিল না। অগত্যা তারিণী বাবুকে পাচকের পক্ব অন্ন খাইতে হইতে-ছিল। যদিও কন্যা নিকটে বসিয়া দেখাইয়া শুনাইয়া দিতেন, পাচকও যথাসম্ভব সাবধানে [illegible] করিত, তথাপি সে অন্নব্যঞ্জন তেমন তৃপ্তিকর হয় নাই, অপর্ণা তাহা বুঝিতে পারিল, দুঃখে ও লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। তারিণী বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ধ্যেৎ, বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে নাই যে বলে, তার কান ম'লে দিতে ইচ্ছা হয়।"

লজ্জাজড়িত স্বরে অপর্ণা বলিল, "ভুল হয়েছে বাবা, মাপ কর।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে তারিণী বাবু বলিলেন, "কথার শ্রী দেখ। আমি কি ঢাল-খাঁড়া হাতে ক'রে এসেছি যে, তাড়াতাড়ি মাপ চাইতে এসেছ? ভাল, তোমা-রই না হয় ভুল হয়েছে, কিন্তু ঐ যে একটি ভদ্রলোকের মেয়ে আছেন, শুনতে পাই, তিনি না কি ব'লে বেড়ান, ভাসুর দেবতাতুল্য। তা সে অভাগ্য দেবতা ঘুটের পাশ নৈবেদ্য পেলে কি না, এটা দেখতে তাঁরও কি ভুল হয়ে গেল?"

সঙ্কুচিতস্বরে অপর্ণা বলিল, "খুড়ীমার বড় অসুখ।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "ব্যস্, তোমার ভুল হয়েছে, তাঁর হয়েছে অসুখ, কাজেই তুই বুড়ো বেটা বনে যা।"

অপর্ণা পিতার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, "আমার ঘাট হয়েছে বাবা, কা'ল আমি নিজের হাতে রেঁধে দেব।"

অপর্ণার চোখের কোণে জল দেখা দিল। তারিণী বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া ত্রস্তভাবে বলিলেন, "রক্ষা কর্ আপ, এইজন্যই তোদের কিছু বলতে নাই না। ভগবান্ মেয়েমানুষের চোখে এত জল দিয়ে আবার যে কেন মেঘের সৃষ্টি করেছেন, তা তো বলা যায় না। বাপ।"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে অপর্ণা হাসিয়া

ফেলিল। তারিণী বাবু সহাস্যে বলিলেন, "সাধে কি বলি, এই বয়সে উপোস দিলে ক'দিন বাঁচবো বল্।"

বাপের পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে অপর্ণা বলিল, "না বাবা, কা'ল হ'তে আর তোমায় উপোস দিতে হবে না।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "উপোস যে দিতে হবে না, তা বেশ বুঝেছি। এখন পেটের ব্যারাম না হ'লে হয়। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার হাতে হাঁড়ি।"

তারিণী বাবু হাসিয়া উঠিলেন, অপর্ণাও হাসিল।

একটু চুপ করিয়া তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে অপি, ওটাকে কেমন দেখছিস্?"

অপ। কোন্‌টাকে বাবা?

তারি। কোন্‌টা আবার? ক'টা নূতন লোক বাড়ীতে এসেছে?

অপর্ণা একটু হাসিয়া বলিল, "কে, নতুন মা?"

তারিণী বাবু গম্ভীর-স্বরে বলিলেন "হাঁ হাঁ, ও আবার তোর মা হ'লো কবে? ছিঃ, খুঁটেকুড়ুনী, হ'লো তারিণী চৌধুরীর মেয়ের মা। কালে কালে আরও কত কি হবে।"

অপর্ণা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ত, কেমন দেখছিস্?"

ঘাড় নীচু করিয়া অপর্ণা বলিল, "মন্দ কি বাবা?"

তারি। মন্দ তো নয়, বলি, ভাল কিছু দেখতে পাচ্ছিস্?

অপ। ক্রমে ভাল হবে বাবা, এই নতুন এসেছে, তার উপর ছেলেমানুষ। একটু জ্ঞানবুদ্ধি হ'লেই ভাল হবে।

ঈষৎ রুক্ষস্বরে তারিণী বাবু বলিলেন, "ছাই হবে। তা হ'লে তোদের ভক্তিশ্রদ্ধা যত্ন-আত্তি করে না।"

লজ্জিতভাবে অপর্ণা বলিল, "তা করবে না কেন? আর আমরাই বা কোন্—"

বাধা দিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "তোমরা গিয়ে ওর পায়ে গড়িয়ে পড়বে না কি? তুই হ'লি কি অপি?"

অপর্ণা মুখ নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তারিণী বাবু বলিতে লাগিলেন, "ঝাঁটা মার। আমারও কর্ম্মভোগ, এই বয়সে আবার বিয়ে করতে গেলাম। ছি ছি, যত গোল বাধালে ঐ ছোঁড়াটা।"

অপর্ণা মৃদু শান্তস্বরে বলিল, "গোল কি বাবা, হয়েছে, ভালই হয়েছে।"

তারিণী বাবু ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "ছাই হয়েছে। ভাল একটুও হয় নি অপি, এর চেয়ে একটা পুষ্যিপুত্তুর নেওয়াও ভাল ছিল। যাক্, যা হয়ে গিয়েছে, তা তো আর ফিরবে না। এখন যে ক'টা দিন বাঁচি, এই কর্ম্মভোগের ফল ভুগতে হবে।"

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কিছুই ভুগতে হবে না বাবা, আমি বলছি, কিছুই ভুগতে হবে না। নতুন মা মেয়ে তো মন্দ নয়।"

তারিণী বাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অপর্ণা বলিল, "দুটো মাস যেতে দাও বাবা, তার পর দেখে নিও, আমার কথা ঠিক কি না।"

তারিণী বাবু মৃদু হাস্য করিলেন।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "বাবা!"

তারিণী বাবু উত্তর দিলেন, "কেন অপি?"

অপ। একটা কথা বলব?

তারি। এত ভয় কেন অপি? আমি বাঘ-ভাল্লুক নয়—বাবা।

অপ। তা নয় বাবা, তবে পাছে তুমি রাগ কর।

ব্যথিতকণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "রাগ? কেন অপি, রাগ ছাড়া আমার আর কিছু নাই কি? আমি কি মানুষ নই?"

লজ্জিতভাবে অপর্ণা বলিল, "না বাবা, বলছিলাম কি, বাচস্পতি মশায়ের একটি মেয়ে আছে না?"

তারি। তা থাকতে পারে।

অপি। মেয়েটি না কি খুব সুন্দরী।

ঈষৎ হাসিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "কেন বল্ দেখি, আবার কি তোর বাবার—"

হাসিতে হাসিতে অপর্ণা বলিল, "না বাবা, আমি বলছিলাম যে, সত্যর তো একটা বিয়ে দিতেই হবে।"

তারিণী বাবু শুইয়াছিলেন, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, ক্রোধগম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "কেন, সত্যর বিয়ে না দিলে কি আমার দিন চলবে না?"

অপর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "তার বুঝি মেয়েটি দেখে পছন্দ হয়েছে? এই বুঝি তার পড়তে যাওয়া?"

অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল, "সে কিছুই বলে নাই, বাবা।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "না বললেও কথাটা ঠিক

তাই দাঁড়িয়েছে না অপি? কিন্তু তা হবে না, একবার তার জন্ম যা নয়, তাই করেছি, আর আমি কিছু করতে পারব না।"

অপর্ণা বলিল, "তুমি না পারলে আর কে পারবে বাবা? তার আর কে আছে?"

পরুষকণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "কে আছে না আছে, তা আমি কি জানি? কেন, আমি কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি? না না, আমি ও সব কথায় আর নাই।"

অপর্ণা আর কিছু বলিল না। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। তারিণী বাবু আবার শুইয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তারিণী বাবু বৈঠকখানায় গিয়াই বাচস্পতি মহাশয়কে ডাকাইবার জন্য দেওয়ানকে আদেশ দিলেন। দেওয়ান তাঁহার বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া দিয়া কতকগুলা হিসাবপত্র লইয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কিসের কাগজ?"

দেওয়ান উত্তর দিলেন, "খোকাবাবুর বিষয়ের।"

ক্রুদ্ধভাবে তারিণী বাবু বলিলেন, "খোকাবাবুর বিষয় আবার কোথা হ'তে এল?"

দেওয়ান কি বলিবে, কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। তারিণী বাবু নিজেই কয়েকদিন পূর্ব্বে আদেশ দিয়াছিলেন, "সত্যচরণের বিষয় যা আছে, তার হিসাব তৈরি ক'রে দাও। তার বিষয় তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।" আজ আবার তাহার বিপরীত কথা শুনিয়া দেওয়ান হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তারিণী বাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ দত্তজা, তোমার বয়স হয়েছে, তোমার অবসর লওয়া উচিত।"

দত্তজা কেশশূন্য ব্রহ্মরন্ধ্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে সবিনয়ে বলিলেন, "আজ্ঞে, তা হ'লে খোকাবাবুর বিষয়টা—"

তর্জ্জন করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "দেখছি, তোমার একেবারে ভীমরথী হয়েছে। খোকাবাবুর আবার কোন্ বিষয়? যা ছিল, সে তো তার হতভাগা বাপ উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। আমি টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি। ঘরের টাকা দিয়ে বিষয় কিনে তা ফেরত দিতে যাব কেন বল দেখি? আমি এতই দায়ে প'ড়ে গিয়েছি না কি। টাকাটা কি তোমরা এতই সস্তা দেখেছ?"

দেওয়ান আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। তিনি ধীরে ধীরে কাগজপত্র লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তারিণী বাবু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন, যদি ফেরত দিতে হয়, যে টাকা দিয়ে কিনেছি, তা কেটে নিতে হবে। শুধু খরিদা টাকা নয়, টাকা পিছু এক পয়সা সুদ নেব। টাকা তো আর খোলামকুচী নয়। বুঝলে?"

মস্তকসঞ্চালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া দেওয়ান চলিয়া গেলেন। তারিণী বাবু আলবোলার নলটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে টান দিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি মহাশয় আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। তারিণী বাবু প্রতিনমস্কার করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। বাচস্পতি মহাশয় বসিলে তারিণী বাবু আপন মনে আলবোলায় টান দিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি মহাশয় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমায় আহ্বান করেছেন?"

আলবোলার নলটা হইতে মুখ না সরাইয়া তারিণী বাবু উত্তর করিলেন, "হাঁ, ছোঁড়াটা পড়াশোনায় কেমন?"

বাচস্পতি বলিলেন, "কে? সত্যচরণ?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "তা নয় তো কি আমি দুলে-বাগ্দীর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি?"

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বাচস্পতি বলিলেন, "সত্যচরণ পড়াশোনা ভালই কর্‌ছে। এরি মধ্যে কুমারসম্ভব —

ভ্রূকুটি করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "চুলোয় থাক কুমারসম্ভব। বলি, কিছু হবে বলতে পারেন?"

বাচস্পতি সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "দেখুন, এটা অর্থকরী বিদ্যা নয়, জ্ঞানকরী বিদ্যা। এতে অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই, তবে জ্ঞানের বিকাশ হ'তে পারবে।"

তারিণী বাবু একটু শ্লেষব হাসি হাসিয়া বলিলেন, "জ্ঞান যা হবে, তা উঠন্তি বৃক্ষের পত্রেই চেনা যাচ্ছে। ওর চেয়ে আমার সাত টাকা মাইনের চাকর ভোলার অনেক বেশী জ্ঞান আছে।"

বাচস্পতি নতমস্তকে নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারিণী আলবোলায় গোটাকতক টান দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার না একটি বয়স্থা কন্যা আছে?"

বাচস্পতি বলিলেন, "কন্যা নয়, ভ্রাতুষ্পুত্রী।"

তারি। শ্যামের মেয়ে বুঝি?

বাচ। আজ্ঞা হাঁ।

তারি। শ্যাম তো মারা গেছে?

বাচ। তার স্ত্রীও নাই।

তারি। বটে, তা হ'লে মা-বাপ-মরা মেয়ে। বয়স হয়েছে কত?

বাচ। এগারো বারো হবে।

তারি। মেয়েটি না কি টোলের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে?

বাচ। সে বালিকা।

তারি। এগারো বছরের মেয়ে বালিকা নয়।

বাচ। যুবতীও নয়।

তারিণী বাবু ভ্রূকুটি করিলেন। বাচস্পতি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

একটু পরে তারিণী বাবু বলিলেন, "এত বড় মেয়ে এখনো বিবাহ দেন না কেন? আপনারাই না বলেন, '...ক্তা ত ত উর্দ্ধং রজস্বলা?' এটা কি 'দশমে কন্যক' বলায়?"

বাচ। শাস্ত্রের বিধানে আপন পর প্রভেদ নাই।

তারি। তবে এত বড় মেয়ে ক'রে রেখেছেন?

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "বিধির নির্ব্বন্ধ।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "কেবল বিধাতার ঘাড়ে ভার চাপিয়ে থাকলে চলে না, আপনাদেরও একটু চেষ্টা দেখতে হয়।"

বাচস্পতি নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি দেখতে শুনতে না কি ভাল?"

বাচস্পতি উত্তর দিলেন, "পরমা সুন্দরী।"

ঈষৎ হাসিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "তাই বুঝি মেয়ে বড় ক'রে রেখেছেন? যদি কোন জমীদারের ছেলের নজরে পড়ে?"

ভ্রূকুটি করিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "এরূপ অনুচিত আশা আমার হৃদয়ে স্থান পায় না।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "যা আশা করেন না, তা যদি ঘটে যায়?"

বাচস্পতি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তারিণী বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। তারিণী বাবু আলবোলার নলে একটা জোর টান দিয়া বলিলেন, "সত্যচরণকে কি আপনি অপাত্র মনে করেন?"

বাচস্পতি উৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "তার মত সুপাত্র বিরল।"

তারি। কেন, জমীদারের ভাইপো ব'লে?

বাচ। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমি লোকের বিষয় লক্ষ্য করি না, চরিত্রই দেখি।

তারিণী বাবু হাতের নলটা ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "উত্তম, সত্যচরণও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। আপনি দু'জনের কোষ্ঠী দুটা মিলিয়ে, দিনস্থির ক'রে আমায় সংবাদ দেবেন। কিন্তু এটা মনে রাখবেন, জমীদারের ভাইপো হ'লেও জমীদারীতে তার কোন অধিকার নাই।"

তারিণী বাবু ব্যস্তভাবে উঠিয়া খড়মটা পায়ে দিলেন। বাচস্পতি যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তারিণী বাবু বুঝিলেন, সেটা তাঁহার এই উদারতার জন্য কতকগুলা প্রশংসাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তিনি সত্বরপদে বৈঠকখানা ত্যাগ করিলেন। বাচস্পতি কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন, তার পর উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

তারিণী বাবু বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "অপি, অপি!"

অপর্ণা ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "বাচস্পতির ভাইঝির সঙ্গে সত্যর বিয়ের ঠিক ক'রে এলাম। বুঝলি?"

হাসিতে হাসিতে অপর্ণা বলিল, "বেশ করেছ বাবা।"

রুক্ষস্বরে তারিণী বাবু বলিলেন, "বেশ করেছি? একটুও বেশ করি নাই অপি। আমি জানতাম না যে, তারিণী চৌধুরী নিজে উপযাচক হয়ে কারো কাছে কিছু চাইবে। আমি দিনে দিনে কি হলাম অপি?"

সহাস্যে অপর্ণা বলিল, "কিছুই হওনি বাবা, তুমি আমার যে বাবা, সেই বাবাই আছ।"

"ছাই আছি।" বলিয়া তারিণী বাবু সশব্দে চৌকীখানার উপর বসিয়া পড়িলেন।

সত্যচরণের মনোভাব বুঝিয়াই অপর্ণা এমন বিবাহের জন্য পিতাকে ধরিয়া বসিয়াছিল। সুতরাং এ শুভ সংবাদটা সত্যচরণকে জানাইবার জন্য তাহার একটু আগ্রহ হইল এবং সে বার বার খোঁজ লইতে লাগিল, সত্য ফিরিয়াছে কি না। কিন্তু সত্যচরণ সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিল না। অপর্ণা উৎকণ্ঠিত চিত্তে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি বাহিরে কাটাইয়া সত্যচরণ বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় বাড়ীতে ফিরিল। তাহার শ্রান্ত-ক্লান্ত মূর্ত্তি, শুষ্ক মলিন মুখ দেখিয়া অপর্ণা বিস্মিত হইল।

সত্যচরণের রাত্রিটা বাহিরে কাটাইবার কারণ ছিল। সে দিন বৈকালে টোলে যাইতে যাইতে ফকির বাগের মায়ের মুখে সংবাদ পাইল, বুড়া রামজীবন চক্রবর্ত্তীর আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বা তাহার বিধবা মেয়েকে দেখিবার কেহই নাই। সত্যচরণের আর টোলে যাওয়া হইল না, সে বই বগলে করিয়াই রামজীবন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া দেখিল, বৃদ্ধের মৃত্যুকাল আসন্ন, জল দিবার কেহই নাই, শুধু একমাত্র বিধবা মেয়ে বিমলা মুমূর্ষু পিতার পায়ের কাছে মুহ্যমানভাবে বসিয়া আছে। সংসারে বৃদ্ধের আর যাহারা ছিল, সকলেই চলিয়া গিয়াছে, আছে শুধু এই মেয়েটি। কিন্তু অদৃষ্টদোষে সেও বিধবা।—শুধু বিধবা নয়, কলঙ্কিতা, সমাজচ্যুতা।

এই ফুলের মত সুন্দর মেয়েটি নয় বৎসরে না পড়িতেই রামজীবন তাহাকে পাত্রস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে এগার বৎসর বয়সে স্বামীর সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বেই বিধবা হইল। এইখানেই তাহার সকল দুঃখের নিবৃত্তি হইল না। বিধবা বলিয়া প্রাকৃতিক শক্তি তাহার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়িল না, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার রূপরাশি যৌবনের শোভায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সে নবযৌবনোদ্ভাসিত সৌন্দর্য্যালোকিত ব্রহ্মচারিণী-মূর্ত্তি যে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইল, বৃদ্ধ পিতা মনে মনে শঙ্কিত হইলেন। লম্পটের লোলুপ দৃষ্টি বিমলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিল।

বিমলার বয়স তখন পনরো বৎসর। সে দিন সে সন্ধ্যার সময় বোসপুকুরে গা ধুইয়া যখন নির্জ্জন পথে বাড়ী ফিরিতেছিল তখন সহসা উমেশ ঘোষের ছেলে রমেশ ঘোষ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দুর্বৃত্তের অসদভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, বিমলার চীৎকারে কৃষকপল্লী হইতে চাষার দল ছুটিয়া আসিল, এবং রমেশকে উত্তম-মধ্যম দিয়া বিমলাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। জমীদার তারিণী বাবুর কানে কথাটা উঠিলে তিনি রমেশকে ধরিয়া আনিলেন। রমেশ অর্থদণ্ড দিয়া অব্যাহতি লাভ করিল।

পাপী অব্যাহতি পাইল, কিন্তু বিমলা অব্যাহতি পাইল না। সে সমাজের নিকট গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইল। পরপুরুষস্পৃষ্টা বলিয়া সমাজ তাহাকে ত্যাগ করিল। সমাজ ত্যাগ করিলেও বাপ মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুতরাং পিতা-পুত্রীতেই সমাজচ্যুত হইয়া রহিল।

সে এক বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই এক বৎসর সমাজের নিকট অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত বৃদ্ধ যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল, ধর্ম্মপ্রাণ সমাজ তখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিল না। সুতরাং বৃদ্ধ মৃত্যুর জন্য না হউক, অনাথা কন্যার চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। মৃত্যুশয্যা তাঁহার নিকট কণ্টকশয্যা হইল। তাঁহার মৃত্যু-কবলিত আত্মা মৃত্যুর হাত ছাড়াইবার জন্য যেন ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিল।

আর বিমলা—সংসারের একমাত্র অবলম্বন পিতাকে অনন্তপথযাত্রী দেখিয়া সে মুহ্যমান হইয়া পড়িল; পিতার পায়ের কাছে বসিয়া সে শুধু ব্যগ্র-কাতর-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুমূর্ষু পিতার মুখে যে এক গণ্ডূষ জল দিতে হইবে, সে সংজ্ঞাটুকু পর্য্যন্ত তাহার রহিল না।

এমনই সময়ে সত্যচরণ তথায় উপস্থিত হইল।

সত্যচরণ মুমূর্ষু বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "চক্রবর্ত্তী মশায়।"

বৃদ্ধ বহুকষ্টে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। সত্যচরণ দেখিল, বৃদ্ধের উন্মীলিত দুই চোখ দিয়া দর-দরধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সত্যচরণ তাঁহার মুখে একটু জল দিয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছেন কেন? আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?"

বৃদ্ধের তখন নাভিশ্বাস উপস্থিত, বাক্‌শক্তি রুদ্ধ। তিনি নীরবে শুধু কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া প্রবল বেগে অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। সত্যচরণ তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, "আপনি বিমলার জন্য ভাববেন না।"

বৃদ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া আশান্বিতভাবে সত্যচরণের দিকে চাহিলেন। সত্যচরণ পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বিমলার জন্য আপনার চিন্তা নাই, ওর ভার আমি নিলাম।"

মুমূর্ষুর মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন মুখে সান্ত্বনার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, এবং সে জ্যোতিটুকু অন্তর্হিত না হইতেই তাঁহার শোকদুঃখ-পীড়িত আত্মা শোকদুঃখের অতীত দেশে চলিয়া গেল। বিমলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সত্যচরণ বিমলাকে সান্ত্বনা দিয়া বৃদ্ধের সৎকারের জন্য লোকসংগ্রহে বাহির হইল। লোক কিন্তু পাওয়া গেল না, সমাজচ্যুত বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সাহায্য করিয়া গ্রামের কোন ব্রাহ্মণই আপনাকে পতিত করিতে এবং সমাজের নিকট দায়ী হইতে স্বীকৃত হইল না। কেবল নীচ সমাজের কয়েক জন বাগ্দী চাঁড়াল সত্যচরণের আহ্বানে ছুটিয়া আসিল। তাহারা কাঠ কাটিয়া চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। সত্যচরণ একাই ক্ষীণকায় বৃদ্ধের শবদেহ কাঁধে ফেলিয়া শ্মশানে লইয়া গেল।

বিমলা মুখাগ্নি করিল। সত্যচরণ সারা রাত ধরিয়া মড়া পোড়াইল। যখন দাহ শেষ হইল, তখন পূর্ব্বাকাশে উষার ছটা দেখা দিয়াছে। বিমলা শ্মশানের এক পাশে সংজ্ঞাহীনার ন্যায় পড়িয়া ছিল। সত্যচরণ তাহাকে টানিয়া তুলিল, এবং তাহাকে স্নান করাইয়া, নিজে স্নান করিয়া ঘরে লইয়া আসিল। তার পর হীরু বাগ্দীর মাকে তাহার কাছে রাখিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পিতার মৃত্যুতে বিমলা খুব কাঁদিল, খুব ভাবিল। তার পর চারি দিনের দিন পিতার পারলৌকিক কার্য্য করিয়া শুদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইতে গ্রামের কোন ব্রাহ্মণই আসিল না। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "এক শত টাকা দণ্ড দিলে মন্ত্র পড়াতে পারি, কিন্তু ওর বাড়ীতে খাব না।"

সত্যচরণ রাগিয়া বলিল, "টাকা দিলেই কি পতিতা শুদ্ধ হয়ে যাবে?"

শিরোমণি মস্তক-সঞ্চালন করিয়া উত্তর করিলেন, "বাপু, ছেলেমানুষ তুমি, এ সব সামাজিক ব্যাপারে কি বুঝবে?"

সত্যচরণ যাহা বুঝিতে পারিল না, সে কাজে হাত দিল না। সে নিজে পুঁথি ধরিয়া শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইল। তাহার ব্যবহারে গ্রামের লোক অবাক্ হইল। তবে জমীদারের ভাইপো বলিয়া সহসা কিছু বলিতে পারিল না, পরস্পর কানাঘুষা করিতে লাগিল।

সত্যচরণের কৃপায় বিমলা পিতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইল বটে, কিন্তু তার পর কি করিবে, কোথায় দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। ষোড়শী সুন্দরী বিধবা, সংসারের চারিদিকে প্রলোভন, পদে পদে বিপদ্, ইহার উপর সে গ্রামের লোকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত। তাহার দুঃখে কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করিবে না, বরং আনন্দ উপভোগ করিবে, বিপদে বুক দিয়া দাঁড়াইবে না, দূরে দাঁড়াইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবে, কৌতুক দেখিবে। সে শুধু অনাথা বিধবা নয়, পতিতা, সমাজচ্যুতা, মানুষের স্নেহ-করুণা হইতে বঞ্চিতা। উপায়ের মধ্যে ভগবান্। কিন্তু শুধু ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার শক্তি বিমলার ছিল না। শুধু বিমলার কেন, সত্যচরণেরও ততটা দৃঢ়বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং সে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তুমি কি করবে?"

বিমলা কোন উত্তর দিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল। সত্যচরণ বলিল, "তোমাদের আর কেউ আপনার লোক আছে?"

মৃদুস্বরে বিমলা উত্তর করিল, "না।"

সত্য। এখানে একা থাকতে পারবে?

বিম। না।

সত্য। তা হ'লে কোথায় থাকবে?

বিম। জানি না।

সত্য। তোমার তো খাওয়া-পরার কোন সংস্থান নাই।

বিমলা নীরবে নতমুখে মাটীতে আঙুল ঘষিতে লাগিল। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শ্বশুর-বাড়ীতে কেউ নাই?"

বিম। আছে।

সত্য। সেখানে গেলে হয় না?

বিম। তারা আমায় ঠাঁই দেবে না।

বিমলা একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সত্যচরণ বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একটু পরে বিমলা ধীরে ধীরে বলিল, "কোথাও একটা দাসীবৃত্তি ক'রে দিতে পারেন?"

বিষাদগম্ভীর-স্বরে সত্যচরণ বলিল, "তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমাকে কে দাসী রাখবে?"

বিম। রাঁধুনী রাখতে পারে।

ম্লান হাসি হাসিয়া সত্যচরণ বলিল, "তুমি আপনার অবস্থা ভুলে যাচ্ছ। তোমার হাতে খাবে কে?"

বিমলা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সত্যচরণ কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিল, বিমলাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভেব না, ভগবান্ ব'লে একজন আছেন। তাঁর মনে যা আছে, তাই হবে। আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তোমার ভয় নাই।"

বিমলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু—"

সত্যচরণ চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি?"

বিমলা বলিল, "আপনার এ রকমে আসা-যাওয়া—"

বিমলা থামিয়া গেল। সত্যচরণ তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, "আমার আসা-যাওয়াটা ভাল দেখায় না, লোকে নিন্দা কর্‌বে, না?"

বিমলা ঘাড় নাড়িল। সত্যচরণ সহাস্যে বলিল, "যারা বিপদে উঁকি দিয়ে একটু উপকার কর্‌তে পারে না, তাদের নিন্দায় কিছু আসে যায় কি?"

বিমলা মুখ তুলিয়া সতেজ-কণ্ঠে বলিল, "আসে যায় বৈ কি। আমরা মেয়েমানুষ, মর্‌তে পারি, তবু লোকনিন্দা সইতে পারি না।"

সত্যচরণ হাত দুইটা বুকের কাছে জড় করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। একটু ভাবিয়া বলিল, "দেখছি, মরণ ছাড়া তোমার আর উপায় নাই। তবে আমাকে দুই এক দিন ভাবতে দাও, তার পর যা হয় ক'রো।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সত্যচরণ চলিয়া গেল। বিমলা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হীরুর মা আসিয়া বলিল, "ও মা, এখনো ঠায় ব'সে আছ? রাঁধবে কখন? খাবে কখন্? বেলা বাড়ছে না কম্‌ছে?"

বিমলা মুখ তুলিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার বেলা ফুরিয়ে এসেছে। আর নাই বা খেলাম হীরুর মা।"

হীরুর মা তর্জ্জন করিয়া বলিল, "বামুনের মেয়ের কথা শোন। না খেলে বাঁচবে কিসে?"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিমলা বলিল, "আর বেঁচে কি হবে?"

হীরুর মা বিরক্তভাবে বলিল, "কথা দেখ, বলে বেঁচে কি হবে। বেঁচে আবার হবে কি? এই যে আমার নাতি-নাতিনী, একটা চাট বল্‌লে হয়, সব গেছে, তাই ব'লে কি আমি বেঁচে নাই,—না খাই না? সংসারে থাকতে হ'লে—বাঁচতেও হবে, খেতেও হবে।"

বিমলা অশ্রুসজল দৃষ্টিতে হীরুর মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হীরুর মা বলিতে লাগিল, "সে যা হোগ বাছা তোমাদের জাতের কেমনতর ধারা। এমন সোমত্ত বয়েস, আমাদের ঘরে হ'লে এদ্দিন তিনটে নিকে কর্‌তো, সোয়ামি নিয়ে সুখে ঘর-ঘরকন্না কর্‌তো।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিমলা বলিল, "দূর মাগী, আমরা যে বামুন।"

হীরুর মা রাগে গর-গর করিতে করিতে বলিল, "রেখে দাও তোমার বামুন। বামুন ব'লে জলে প'ড়ে গেছ না কি? এমন সোমত্ত বয়েস, মা দুগ্‌গার মত চেহারা নিয়ে এক মুঠো ভাতের তরে হা হা ক'রে বেড়াবে, আর বল্‌বে আমরা বামুন। ধ্যেৎ তোর বামুনদের কেঁথায় আগুন।"

বিমলা বলিল, "আমাদের ও কথা বল্‌তে নাই হীরুর মা, ওতে পাপ হয়।"

হীরুর মা, গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তা পাপ হয় হ'লো, এখন তুমি এক মুঠো আলোচাল ফুটুবে, না বল্‌বে আমরা বামুন।"

হীরুর মার রাগ দেখিয়া বিমলা হাসিতে হাসিতে রন্ধনের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"কি ভাবছ সত্যচরণ ?"

"ভাবছি, হিন্দু-সমাজটা কবে উচ্ছন্নে যাবে।"

"তুমিও হিন্দু, আমিও হিন্দু, সুতরাং হিন্দুসমাজ উচ্ছন্নে গেলে তোমার আমার কোন লাভ নাই।

ভ্রূকুটী করিয়া সত্যচরণ বলিল, "আমাদের লাভ না থাক, অপরের আছে। অন্ততঃ কতকগুলা দুর্ব্বল, সমাজের অন্যায় উৎপীড়নের হাত হ'তে রক্ষা পাবে।"

গম্ভীরভাবে বাচস্পতি বলিলেন, "সমাজের কাছে সবল দুর্ব্বল ভেদ নাই সত্যচরণ।"

সত্যচরণ বলিল, "কিন্তু স্ত্রীপুরুষ ভেদ আছে।"

বাচ। সেটা ঐশ্বরিক বিধান।

সত্য। ঈশ্বর এমন কোন বিধান করেন নাই, যাতে একজন পুরুষ যে অপরাধ ক'রে অনায়াসে অব্যাহতি পাবে, আর একটা স্ত্রীলোক সেই অপরাধে সমাজ হ'তে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হবে।"

বাচ। মানুষ বিচারক, মানবোচিত দুর্ব্বলতা সব সময়ে ত্যাগ কর্‌তে পারে না সত্যচরণ।

সত্য। এমন দুর্ব্বল মানুষের বিচার কর্‌তে যাওয়াই ভুল।

বাচ। তুমি কি সমাজ-বন্ধন তুলে দিতে চাও ?

সত্য। যে সমাজ শুধু দুর্ব্বলকেই আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধে, সবলের কাছে অগ্রসর হ'তে পারে না, সে সমাজ-বন্ধন শুধু প্রহসন মাত্র।

বাচ। কিন্তু সমাজ-বন্ধনই লোকস্থিতির মূল। ভগবান্ বলেছেন—

বাধা দিয়া উগ্রকণ্ঠে সত্যচরণ বলিল, "রেখে দিন আপনাদের ভগবান্, যদি ভগবান্ ব'লে কেউ থাকে এবং তার যদি এরূপ বিধান হয়, তবে হিন্দু বিধবা দের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে সে ভগবান্ একদিনে ভস্মসাৎ হয়ে গিয়েছে।"

মৃদু হাসিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "দেখছি, তুমি বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী।"

সত্যচরণ বলিল, "যা সঙ্গত, যা ন্যায্য, আমি তারই পক্ষপাতী। শিরোমণি মহাশয় যদি ষাট বৎসরে পঞ্চমপক্ষে দারপরিগ্রহ কর্‌তে পারেন, তবে একটা বার বছরের মেয়ে বিধবা হ'লে তার কি আর বিবাহ হ'তে পারে না ?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "একজন যদি প্রবৃত্তির দাস হয়, তবে সকলকেই তুমি সেই পথ অবলম্বন কর্‌তে বল ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সত্যচরণ বলিল, "কাজেই, আপনারা নিবৃত্তি-মার্গটা শুধু ঐ বিধবাদের জন্য নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন।"

গম্ভীরস্বরে বাচস্পতি বলিলেন, "ভুল বুঝেছ সত্যচরণ, দুইটা পথই দুই জনের নির্দ্দিষ্ট আছে। যে যেটা পারে বেছে নেয়। সকল পুরুষে ষাট বৎসরে বিবাহ করে না, আবার সকল বিধবা নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করে না।"

সত্যচরণ বলিল, "অনেকে আবার শুধু নিবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করে না, জাতি-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু জান্‌বেন, সে জন্য দায়ী আপনারা।"

বাচস্পতি বিস্মিতভাবে শিষ্যের মুখের দিকে চাহিলেন। সত্যচরণ দৃঢ়-সতেজকণ্ঠে বলিল, "আপনারা সমাজের বিধাতা, ব্যবস্থাদাতা, সুতরাং সমাজের অত্যাচার উৎপীড়নের জন্য আপনারাই দায়ী।"

বাচস্পতি বলিলেন, "আমাদের ব্যবস্থায় কেহ অসৎপথ অবলম্বনে বাধ্য হয়, তোমার এ কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না সত্যচরণ।"

সত্যচরণ তখন রামজীবন চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিমলার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই অনাথা বিধবার জন্য আপনারা এখন কোন্ পথ নির্দ্দেশ করেন ?"

একটু চিন্তা করিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "আমরা যে পথই নির্দ্দেশ করি, তুমি এখন এই অনাথার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা কর্‌তে চাও, তাই বল।"

সত্য। আমার মতে এই অনাথা বিধবার পুনরায় বিবাহ দেওয়া উচিত।

বাচ। কিন্তু বিধবা-বিবাহ সমাজে অপ্রচলিত।

সত্য। আপনারা চেষ্টা কর্‌লেই তা প্রচলিত হ'তে পারে।

বাচ। তা পারে। কিন্তু তাতে সমাজে একটা ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হবে।

সত্য। কিরূপ বিপ্লব ?

বাচ। এরূপ বালবিধবাগণের বিবাহ যে উচিত, এ কথা কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তিই অস্বীকার কর্‌তে পারে না। কিন্তু সত্যচরণ, সমাজে একবার বিধবা-বিবাহের স্রোত প্রবাহিত হ'লে তখন আর তা শুধু বালবিধবার বিবাহেই সংযত হয়ে থাকবে না। তখন ধার্ম্মিকা,

যুবতী, প্রৌঢ়া, সকল শ্রেণীর বিধবার মধ্যেই এই স্রোত প্রবাহিত হ'তে থাক্‌বে। হিন্দুসমাজের স্বাতন্ত্র্যটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সত্যচরণ বলিল, "সে অবাধ স্রোত আপনারাই রোধ করতে পারেন।"

বাচস্পতি বলিলেন, "স্রোত একবার প্রবাহিত হ'লে আর তার রোধ করা যায় না, সত্যচরণ। তার সাক্ষী যে সকল সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সেই সকল সমাজের অবস্থা দেখ। আমাদের নীচ শ্রেণীর মধ্যেও বিধবাবিবাহের প্রচলন আছে, সে দিকেও লক্ষ্য কর। কেবল বালবিধবা নয়, অসহায়া বিধবা নয়, অনেক সন্তানের জননীও তৃতীয়বার চতুর্থবার স্বামি-গ্রহণে বিরত নয়। তুমি কি আমাদের হিন্দুসমাজকে এই সকল সমাজের পর্য্যায়ভুক্ত কর্‌তে ইচ্ছা কর?"

সত্যচরণ নতমস্তকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বাচস্পতি বলিলেন, "এখন আমরা কোন পথ নির্দ্দেশ করি শোন. কোন লোকের গৃহে দাসীবৃত্তি ক'রেও যদি এই বিধবা আপনার ব্রহ্মচর্য্য বজায় রাখতে পারে, তবে তার চেয়ে আর প্রকৃষ্ট পথ নাই।"

সত্যচরণ বলিল, "কিন্তু এ পথ অতি দুর্গম। তার চারিদিকে প্রলোভন।"

বাচ। প্রলোভন কোথায় নাই সত্যচরণ? বিবাহিতার নিকটেও কি প্রলোভন থাকে না?

সত্য। থাক্‌লেও তার সে প্রলোভনের হাত হ'তে আত্মরক্ষা কর্‌বার অনেকটা সুযোগ থাকে। সুতরাং আমি এই বিধবার পুনরায় বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি।

বাচ। ইচ্ছা হ'লেও সহজে তা পার্‌বে না। কে বিবাহ কর্‌বে?

সত্য। দেশে কি এমন মহাপ্রাণ লোক নাই যে, বিধবা-বিবাহ কর্‌তে পারে?

বাচ। বিধবাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ কর্‌বার লোক অনেক পাবে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ ক'রে সমাজের উৎপীড়ন সহ্য কর্‌বার সাহস সকলের নাই।

সত্য। বিধবা-বিবাহ তো মাঝে মাঝে হয়?

বাচ। সে কোথাও অর্থলোভে হয়, কোথাও রূপজ মোহে প'ড়ে হয়। কিন্তু এই দরিদ্র কন্যাকে বিবাহ কর্‌তে কেউ সম্মত হবে ব'লে বোধ হয় না।

সত্য। অপরে না হয়, আমি নিজে হব।

বিস্ময়বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিয়া বাচস্পতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি? পারবে?"

সহাস্যে সত্যচরণ বলিল, "না পারবার কোন কারণ নাই।"

বাচ। কারণ অনেক আছে। প্রথমতঃ তারিণী বাবু তোমাকে বিষয় হ'তে বঞ্চিত কর্‌বেন।

সত্য। আপনি কি আমাকে এতটা অপদার্থ জ্ঞান করেন?

বাচ। দ্বিতীয়তঃ তুমি সমাজ-বহিভূর্ত হবে।

সত্য। আমি যে সমাজের ধ্বংস কামনা করি, তা হ'তে বহিষ্কৃত হ'লে আমার কিছুমাত্র দুঃখ হবে না।

বাচ। তৃতীয়তঃ গৌরীর সহিত তোমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়েছে।

সত্য। এখনও বাগ্‌দান হয় নাই। তাকে অন্য পাত্রস্থা কর্‌তে পার্‌বেন।

বাচস্পতির মুখখানা বড় গম্ভীর হইয়া আসিল। একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি জান্‌তাম, গৌরীকে বিবাহ কর্‌বার জন্য তোমার একটু আগ্রহ আছে।"

সত্যচরণ মাথাটা নীচু করিয়া বলিল, "আপনি গুরু, আপনার কাছে গোপন কর্‌ব না, আগ্রহ আমার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কর্ত্তব্যের জন্য আমি আগ্রহ দমন কর্‌তে জানি।"

বাচস্পতির গম্ভীর মুখে প্রফুল্লতার ছায়া পড়িল। তিনি হর্ষোৎফুল্ল-কণ্ঠে বলিলেন, "যদি তাই হয়, তবে আশীর্ব্বাদ করি সত্যচরণ, তুমি সুখী হও। কিন্তু সাবধান, কর্ত্তব্যভ্রমে রূপজ মোহ তোমার আকর্ষণ না করে।"

সত্যচরণ গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিল।

সত্যচরণ যখন টোল হইতে বাহির হইল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। সে টোল হইতে বাহির হইয়া চিন্তিত মনে যাইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে কাপড়ে টান পড়িল। সত্যচরণ চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিতেই পশ্চাতে গৌরী মুখে হাত চাপা দিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি গৌরি!"

গৌরী উত্তর দিল না, শুধু ঠোঁট টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আকাশের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে গোধূলির স্বর্ণচ্ছটা আসিয়া তাহার গণ্ডে ললাটে রক্তিম রাগ মাখাইয়া দিল।

সত্যচরণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, এত হাসি কেন?"

গৌরী পূর্ব্ববৎ নীরব, শুধু তাহার ঠোঁটে সেই মৃদু হাসি।

বিরক্তভাবে সত্যচরণ বলিল, "ক'দিন পড়তে আসিস্ নাই যে?"

গৌরী ঘাড় দোলাইয়া চোখ নাচাইয়া সহাস্যমুখে উত্তর করিল "আমি তো আর পড়বো না।"

সত্য। কেন?

গৌরী। জ্যেঠাইমা বারণ করেছে।

সত্য। তোর মাথা করেছে, পড়তে বারণ করেছে।

মাথা নাড়িতে নাড়িতে গৌরী বলিল, "হাঁ, বারণ করে না বৈ কি,—তুমি তো সব জান।"

রুষ্টস্বরে সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বারণ করেছে?"

পশ্চাতে পার্শ্বে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, "আমার যে বিয়ে।"

সত্যচরণের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তে সে ভাব সংবরণ করিয়া চড়া গলায় সত্যচরণ বলিল, "তোর মাথা।"

গৌরী বলিল, "আমার মাথা বৈ কি, জ্যেঠাইমা বল্‌ছিলেন। মাইরি, মাইরি।"

সত্যচরণ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের চাহিয়া গম্ভীর-স্বরে বলিল, "হ'লেই বা বিয়ে। বিয়ে হ'লে বুঝি পড়তে নাই?"

গৌরী বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তা থাকবে না কেন, কিন্তু তোমার কাছে কি পড়তে আছে? তুমি যে,—"

বক্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়াই গৌরী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সত্যচরণ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "দেখ গৌরি, তুই বড় জেঠা হয়ে পড়েছিস্।"

গৌরী হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছি?"

ক্রুদ্ধস্বরে সত্যচরণ বলিল, "তোর মুণ্ডু! একরত্তি মেয়ে, বিয়ের কথায় যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়েছে! কে বল্‌লে বিয়ে হবে? বিয়ে হবে না।"

সত্যচরণের রাগ দেখিয়া গৌরী ভীত হইল, তাহার হাসিভরা মুখখানা ম্লান হইয়া আসিল। সত্যচরণ মুখ ফিরাইয়া লইয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ঘরে যা।"

গৌরী একবার শঙ্কিত দৃষ্টিখানি তুলিয়া সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিল। তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে ফিরিল। কিছু দূর গিয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, সত্যচরণ তখনও তাহার দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গৌরী ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল। সত্যচরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"ওগো সত্যবাবু, তোমার নাকি বিয়ে?"

সত্যচরণ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ।"

তরঙ্গিণীর শ্লেষের মৃদু হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটি কেমন?"

সত্যচরণ বলিল, "তোমার চেয়ে ভাল।"

তরঙ্গিণীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, সে গম্ভীর-মুখে বলিল, "আমার সঙ্গে আর কারো তুলনা চলে না। আমি এখন—"

মৃদু হাসিয়া সত্যচরণ বলিল, "তুমি কি? রাজ-রাণী না কি?"———

তরঙ্গিণী বলিল, "রাজরাণী না হ'লেও জমীদার গৃহিণী।"

সত্যচরণ দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তরঙ্গিণী গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই না তুমি বিয়ে করবে না?"

সত্য। এমন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা আমি কখনো করি নাই।

তর। আমি যেন এই রকম কথাই শুনেছিলাম।

সত্য। ভুল শুনেছিলে। আমি বলেছিলাম—

তর। কি বলেছিলে?

সত্য। বলেছিলাম, এখন বিয়ে করবো না।

তর। কেন বলেছিলে?

সত্য। তখন ইচ্ছা ছিল না।

তর। এই ছ' মাসের ভিতরেই ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হয়ে গেল?

সত্য। মানুষের মন ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়।

তর। বিশেষ, তোমার মত মানুষের মন।

সত্যচরণ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এত শীগ্‌গীর মনের বদল হ'লো কেন?"

সত্যচরণ বলিল, "এ কেনর উত্তর নাই।"

রুক্ষস্বরে তরঙ্গিণী বলিল, "আমি কিন্তু এর উত্তর দিতে পারি।"

সত্যচরণ একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি উত্তর দিতে পার?"

তীব্রদৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "খুব সহজ উত্তর। তখন তোমার ক'নে পছন্দ—"

বলিতে বলিতে তরঙ্গিণী থামিয়া গেল। মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "সে কথা যাক্, এখন কি জন্ম আমার কাছে এসেছ, তাই বল।"

সত্য। তোমার দ্বারা একটা কাজ উদ্ধার কর্‌তে।

তর। কি কাজ?

সত্য। কাজটা একটু শক্ত। তুমি জ্যেঠামশায়কে একটি অনুরোধ কর্‌তে পার্‌বে?

মুখখানাকে অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "দেখ, এখন আর তোমার আমাকে 'তুমি' 'তোমার' এ সব বলা উচিত নয়।"

ঈষৎ হাসিয়া সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলা উচিত?"

তর। গুরুজনের সঙ্গে কি ভাবে কথা বল্‌তে হয়, তাও কি শিখিয়ে দিতে হবে?

সত্য। শেখাতে হবে না। ভাল, আপনি জ্যেঠামশায়কে একটা অনুরোধ কর্‌তে পার্‌বে?

তর। পার্‌বে নয়—পার্‌বেন বল।

সত্য। আচ্ছা তাই, পারবেন?

সত্যচরণ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তরঙ্গিণী কিন্তু হাসিল না। সে স্থির-গম্ভীরভাবে বলিল, "খুব পার্‌বো। তোমার জ্যেঠামশায় তো এখন আমার আঁচলে বাঁধা।"

সহাস্যে সত্যচরণ বলিল, "সত্যি না কি?"

তরঙ্গিণী বলিল, "খুব সত্যি। তোমার জ্যেঠামশায় তোমার মত নির্ব্বোধ নয়, গুণের আদর জানে।"

ঈষৎ শ্লেষের স্বরে সত্যচরণ বলিল, "আমিও আমার জ্যেঠামশায়কে ভালরকমই জানি।"

ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, এটাও জান তো?"

সত্যচরণ গম্ভীর-স্বরে বলিল, "তোমার সঙ্গে এখন অন্যরূপ সম্পর্ক, সুতরাং এ সব কথার আলোচনা ভাল নয়।"

তরঙ্গিণী বলিল, "আমিও তা ভালবাসি না। এখন তোমার অনুরোধটা কি বল।"

সত্য। অনুরোধ এই বিয়ের সম্বন্ধেই।

তর। কি, যাতে বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়?

সত্য। না, যাতে বিয়েটা বন্ধ হয়।

তরঙ্গিণী চমকিত হইয়া বিস্ময়পূর্ণ-দৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিল। সত্যচরণ মস্তক অবনত করিল। তরঙ্গিণী বলিল, "তুমি তা হ'লে বিয়ে করবে না?"

সত্য। কর্‌বো, তবে এটা নয়।

তর। তবে আবার কোন্‌টা কর্‌বে? কেন, এটার দোষ কি?

সত্য। সব কৈফিয়ৎ না দিলে চল্‌বে না?

তর। যদি বল্‌তে বাধা থাকে, তবে দরকার নাই।

সত্য। বাধা আছে।

তর। তবে শুন্‌তে চাই না। কিন্তু আর কারো দ্বারা অনুরোধ করালে না কেন?

সত্য। আর কে আছে? এক দিদি, সে তো শুনে রেগেই আগুন। রাগ থাম্‌লো তো কান্না।

তর। কিন্তু আমিই যে অনুরোধ করবো, এ কথা তোমায় কে বল্‌লে?

সত্য। আমার মন।

তর। তোমার মন মিথ্যা বলেছে। আমি এমন অন্যায় অনুরোধ কর্‌তে পার্‌বো না।

"আচ্ছা" বলিয়া সত্যচরণ প্রস্থানোদ্যত হইল। তরঙ্গিণী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "শোন, তা হ'লে এখন কি কর্‌বে?"

সত্যচরণ স্থিরকণ্ঠে বলিল, "নিজেই জ্যেঠামশায়কে বল্‌বো।"

তর। বল্‌তে পার্‌বে?

সত্য। তুমি কি মনে কর, আমার সে সাহস নাই?

তরঙ্গিণী একটু কঠোর হাসি হাসিয়া বলিল, "সে সাহস থাক্‌লে আমায় খোসামোদ কর্‌তে আস্‌তে না।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সত্যচরণ উগ্রকণ্ঠে বলিল, "তোমাকে একটা অনুরোধ করা আমি খোসামোদ ব'লে মনে করি না।"

তরঙ্গিণী একটু ম্লান হাসি হাসিল। বলিল, "তা হ'লে এখন নিজেই সাহস প্রকাশ কর্‌বে?"

সত্যচরণ দৃঢ়স্বরে বলিল, "নিশ্চয়।"

তর। কিন্তু সেটা দুঃসাহস, আর সে দুঃসাহসের পরিণাম কি, তা জান তো?

সত্য। জানি, হয় তো আমায় বাড়ী ছাড়তে হবে।

তর। তাও ছাড়তে পারবে?

সত্য। না পারবার কোন কারণ নাই।

তরঙ্গিণী একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার আর একসঙ্গে এতগুলা সাহস দেখাতে হবে না। আমিই চেষ্টা দেখব।"

সত্য। দেখবে?

তর। কাজেই। পরোপকার পরম ধর্ম্ম।

"তোমার কল্যাণ হোক" বলিয়া সত্যচরণ প্রস্থানোদ্যত হইল। তরঙ্গিণী বলিল, "গুরুজনকে আশীর্ব্বাদ করতে নাই, গুরুজনের কাছে আশীর্ব্বাদ নিতে হয়।"

সত্যচরণ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যে বলিল, "অভ্যাসের দোষ। প্রণাম করবো?"

মৃদু হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, 'আজ থাক্, আগে তোমার কাজ উদ্ধার করি।"

সত্যচরণ চলিয়া গেল। তরঙ্গিণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"নতুন বৌ। ওগো নতুন গিন্নি!"

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া তরঙ্গিণী বলিল, যাও, আমি বুঝি গিন্নী?"

সহাস্যে তারিণী বাবু বলিলেন, "তবে তুমি কি?"

তরঙ্গিণী মুখ ভার করিয়া বলিল, "কি, তা তুমিই জান। কিন্তু আমি গিন্নী হ'তে গেলাম কেন? আমার নাকে কি ফাঁদি নথ আছে? আমার চুল পেকেছে? আমি কি বুড়ী হয়েছি?"

তারিণী বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গিন্নী হ'লে বুঝি বুড়ী হ'তে হয়?"

ঘাড় দোলাইয়া, চোখ নাচাইয়া তরঙ্গিণী বলিল, "তা হয় না বৈ কি। বুড়ী হ'লেই তো তাকে গিন্নী বলে।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "তা বলে বটে। কিন্তু নতুন বৌ. তুমি বুড়ী না হ'লেও বুড়োর স্ত্রী তো বটে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "বোয়ে গে আমার বুড়োর স্ত্রী হ'তে।"

তারি। আমার বয়স যে পঞ্চাশের কাছাকা নতুন বৌ।

তর। পঞ্চাশ হ'লেই বুঝি লোকে বুড়ো হয়

তারি। যুবাও থাকে না।

তর। তোমায় ব'লেছে থাকে না। খুব থাকে

তারি। যুবার চুল পাকে না।

তর। আমাদের পাড়ার হীরু দাদার তিরিশ বছর বয়সে মাথার চুল শণের নুড়ি হয়ে গেছে।

তারি। সে হয়েছে গরমে। আমার পেকেছে বয়সে।

তর। তা পাকুক, আমি তুলে দেব।

তারি। পারবে?

তর। খুব পারবো। আমি দাদামশায়ের ক[illegible] পাকা চুল তুলে দিতাম।

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তারিণী বা[illegible] বলিলেন, "কিন্তু পাকা চুল তুলে দিলেই কি যুব[illegible] হব?"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া তরঙ্গিণী বলিল, "হবে গো হবে, আমি বল্‌ছি, খুব হবে।"

একটা হাত তরঙ্গিণীর কাঁধে রাখিয়া, অপর হাতে তাহার চিবুকখানি ধরিয়া মুগ্ধকণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "সত্যি নতুন বৌ, তোমাকে পেয়ে আমি আবার বুঝি যৌবন ফিরে পেয়েছি।"

তরঙ্গিণীর চোখের পাতা স্বভাবতই কেমন যেন ভারী হইয়া আসিল। সে কোন উত্তর না দিয়া নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। তারিণী বাবু ডাকিলেন, "নতুন বৌ।"

তরঙ্গিণী মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "সত্যি বল দেখি নতুন বৌ, আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হয়েছ কি না?"

মৃদু হাসিয়া তরঙ্গিণী উত্তর দিল, "তোমার কি মনে হয়?"

তারি। আমার মনে হয়, তুমি সম্পূর্ণ সুখী হ'তে পার নাই।

তর। কেন?

তারি। আমার বয়সে তোমার বয়সে অনেক

কাৎ। তোমার এই যৌবন, আর আমি বুড়ো না লও বার্দ্ধক্যের দরজায় এসে পৌঁছেছি।

তারিণী বাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঙ্গিণী সহাস্যে বলিল, "স্বামী বুড়ো হ'লেই যদি অসুখী হয়, তবে থুবথুরে বুড়ো শিবকে পাবার ভগবতী এত তপস্যা করেছিলেন কেন?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "সে কথা আলাদা। মহাদেব দেবতা।"

স্থিরগম্ভীরস্বরে তরঙ্গিণী বলিল, "স্ত্রীলোকের কাছে স্বামীই দেবতা, স্বামীই স্বয়ং মহাদেব। আমি মহাভারতে পড়েছি, মেয়েমানুষের স্বামীর চেয়ে বড় দেবতা আর নাই।"

তারিণী বাবু দেখিলেন, ভক্তি ও বিশ্বাসের মহিমায় তরঙ্গিণীর মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মুগ্ধ-বিহ্বল-দৃষ্টিতে পত্নীর সেই স্বামিপ্রেমে সমুজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যর বিয়ের কি হ'লো?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "সে ঠিক হয়ে গিয়েছে। আসছে বিশে তারিখে বিয়ে।"

তরঙ্গিণী বলিল "এই বিশে? এত তাড়াতাড়ি কেন?"

তারি। তাড়াতাড়ি আর কি, যখন কথা উঠেছে, তখন কাজ শেষ ক'রে ফেলাই ভাল।

তর। দু'দিন পরে হ'লে ক্ষতি কি?

তারি। দু'দিন আগে হ'লেও কোন ক্ষতি নাই।

তর। যখন আগেও ক্ষতি নাই পরেও ক্ষতি নাই, তখন দু'দিন থাক না কেন?

তারি। থাকবার কোন দরকার আছে কি?

তর। দরকার না থাকলে বলবো কেন?

তারি। কি বলছো?

তর। বলছি, বিয়েটা এখন থাক।

তারি। কেন থাকবে, তাই বল।

তরঙ্গিণী কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না, সে স্বামীর হাতের আঙ্গুলগুলা লইয়া নাড়িতে লাগিল। তারিণী বাবু গম্ভীর-স্বরে ডাকিলেন, "নতুন বৌ।"

তর। কি?

তারি। এটা তোমার নিজের কথা, না আর কারো অনুরোধ?

তর। যদি আমারই হয়?

তারি। তোমার এমন অন্যায় অনুরোধ করবার কোন কারণ নাই।

তরঙ্গিণী চুপ করিয়া রহিল। তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক বল, সত্য তোমায় এ অনুরোধ করতে বলেছে কি না।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "তোমার কাছে মিথ্যা কইতে পারবো না, বলেছে।"

তারিণী বাবুর মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল। তরঙ্গিণী মৃদু শঙ্কিত-কণ্ঠে বলিল, "রাগ ক'রো না, ছেলেমানুষ—"

গর্জ্জন করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "ছেলেমানুষ? ছেলেমানুষ কখনো বুড়োমানুষের কথার উপর কথা কয় না। তুমি ওকে চেন না নতুন বৌ, ও হতভাগা আমায় জ্বালাতন করেছে। ঐ ছোঁড়ার জন্যই তো আমাকে এই বয়সে আবার—"

বলিতে বলিতে তারিণী বাবু থামিয়া গেলেন। তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল, "এই বয়সে আবার কি হয়েছে?"

ক্রোধগম্ভীর-কণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "যা হবার নয়, তাই হয়েছে। এটা কি আমার বিয়ে করবার বয়স, না যুবতী স্ত্রী নিয়ে আমোদ করবার সময়? শুধু হতভাগার জন্যই তো—"

তরঙ্গিণীর লজ্জানত মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তারিণী বাবু চুপ করিলেন। তরঙ্গিণী ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারিণী বাবু ডাকিলেন, "যশি, যশি।"

যশোদা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। তারিণী বাবু বলিলেন, অপিকে ডেকে দে।"

অপর্ণা আসিতে তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিল।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকছো বাবা?"

তারিণী বাবু চড়া গলায় বলিলেন, "সত্য কোথায়?"

অপ। কোথায় গিয়েছে।

তারি। চুলোয় যাক! ফিরে এলে তাকে ব'লে দিও, তারিণী চৌধুরী তার হুকুমের চাকর নয়। বিষয় সব আমার, যা কিছু দিতাম, তা দয়া ক'রে দিতাম। কিন্তু আমি একটি পয়সাও দেব না। এখন তার যা ইচ্ছা, তাই করতে পারে, আমার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।

অপর্ণা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

তারিণী বাবু শুইয়া ছিলেন, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আর বাবা নয় অপি, একখানা ছুরী এনে এই বুড়োর বুকে বসিয়ে দে। একা না পারিস্, তোর খুড়ীমাকে ডাক্, সত্যকে ডাক্, আর—আর যে কেউ থাকে, সকলকে ডাক্। যদি না ডাকিস্, তবে তোর বাবারই—"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই তারিণী বাবু আবার শুইয়া পড়িলেন। অপর্ণা নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর অদূরে দণ্ডায়মানা তরঙ্গিণীর উপর একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তারিণী বাবু সত্যচরণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি রামজীবন চক্রবর্ত্তীকে দাহ করেছ ?"

সত্যচরণ বিনীতভাবে উত্তর করিল, "করেছি।"

তারি। সে পতিত ব'লে বোধ হয় জান্‌তে না ?

সত্য। জান্‌তাম।

তারিণী বাবু ভ্রূকুটী করিলেন, বলিলেন, "জেনে শুনে এই অসামাজিক কাজ করেছ ?"

সত্যচরণ নতমস্তকে মৃদুস্বরে বলিল, "নতুবা ব্রাহ্মণের সৎকার হ'তো না।"

রুক্ষস্বরে তারিণী বাবু বলিলেন, "তারিণী চৌধুরী বেঁচে থাক্‌তে একজন ব্রাহ্মণের সৎকার হ'তো না, এ কথা তুমি ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস কর্‌তে পারে কি ?"

সত্যচরণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "দেখ্‌ছি, তুমি জগতের সকলকেই তোমার চেয়ে হৃদয়হীন মনে কর।"

সত্যচরণ ঘাড় হেঁট করিয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুলটি মাটীতে ঘষিতে লাগিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "শুন্‌তে পাই, এখনো তোমার সে বাড়ীতে যাতায়াত আছে

সত্যচরণ বলিল, "ব্রাহ্মণের একটি বিধবা কন্যা আছে।"

তারি। সে পতিতা।

সত্য। বিনাদোষে।

তর্জ্জন করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "দেখ্‌ছি, দোষ গুণ, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সব তুমি আয়ত্ত ক'রে নিয়েছ কিন্তু এক যুবতী বিধবার কাছে একজন যুবকের যাতায়াতটা ভাল কি মন্দ, সে বিবেচনাটুকু কর্‌বার শক্তি তোমার নাই।"

সত্যচরণ শঙ্কাজড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল, "ত সহায়-সম্পদ্ কেউ নাই।"

তীব্রস্বরে তারিণী বাবু বলিলেন, "তোমার সহায়তায় তার বোধ হয় সকল অভাবের মোচন হয়েছে ?"

সত্যচরণ নিরুত্তর। তারিণী বাবু বলিলেন, "তুমি শুধু নির্ব্বোধ নও, কুলাঙ্গার। তোমার ব্যবহারে চৌধুরীবংশ কলঙ্কিত।"

সত্যচরণের মুখে কথা নাই। তারিণী বাবু কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে।'

মুখ তুলিয়া সত্যচরণ ধীরে ধীরে উত্তর করিল "আমি কোন অন্যায় কাজ করি নাই।"

রোষগম্ভীরস্বরে তারিণী বাবু বলিলেন, "ন্যায় অন্যায় বিচারের ভার তোমার হাতে নয়।"

সত্যচরণ বলিল, "আমার বিবেকের একটা স্বাধীনতা আছে।"

তারি। উচ্ছৃঙ্খল যুবকমাত্রেরই তা থাকে।

সত্যচরণ নীরব। তারিণী বাবু বলিলেন, "তোমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়েছে বোধ হয় জান।"

সত্য। জানি।

তারি। প্রায়শ্চিত্ত না কর্‌লে তোমার বিবাহ হ'তে পারে না।

সত্য। বিবাহে আমার প্রবৃত্তি নাই।

তারি। প্রবৃত্তি আছে শুধু আমার অপমানে ?

সত্য। আপনি গুরুজন, আপনাকে অপমানিত কর্‌বার ইচ্ছা বা সাহস আমার নাই।

তারি। আমি বাচস্পতিকে কথা দিয়েছি।

সত্য। আমায় ক্ষমা করুন।

রোষদীপ্ত-কণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল যুবককে ক্ষমা কর্‌বার শক্তি আমার নাই সত্যচরণ। আজ হ'তে আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে চাই না।"

নতমুখে সত্যচরণ বলিল, "আমার দুর্ভাগ্য।"

তারিণী বাবু ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার মত দুর্ভাগ্য জগতে আর নাই।"

সত্যচরণ নতমস্তকে প্রস্থানোদ্যত হইল। তারিণী বাবু

তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন, সেই মেয়েটার সম্বন্ধে কি করবে?"

সত্যচরণ বলিল, "এখনো কিছু স্থির করি নাই।"

তারি। পরে কি করবে?

সত্য। যেমন প্রয়োজন বুঝ্‌বো।

তারি। তোমার সেখানে যাতায়াত অনুচিত।

সত্য। অনুচিত হ'লেও আমায় যেতে হবে। কারণ, আমি ছাড়া তাকে দেখবার কেউ নাই। তার পিতার মৃত্যুশয্যায় ব'সে আমি তার ভার গ্রহণ করেছি।

তারি। ক্ষমতার অতিরিক্ত ভার গ্রহণ করেছ।

সত্য। যা গ্রহণ করেছি, তা ত্যাগ করতে পারি না।

তীব্র ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "তুমি তাকে রক্ষা করতে পারবে?"

স্থিরস্বরে সত্যচরণ বলিল, "সাধ্যমত চেষ্টা করবো।"

তারি। তোমার সাধ্য কতটুকু? আমি তাকে গ্রাম হ'তে দূর ক'রে দেব।

সত্য। আপনার সে ক্ষমতা থাকলেও অকারণ একজন দুর্ব্বলের উপর এতটা অত্যাচার করতে পারবেন না।

তারি। এ অত্যাচার অকারণ নয়, সকারণ। আমার শাসনসীমার মধ্যে একটা বিধবার সহিত একজন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের এরূপ অবৈধ সংসর্গ ক্ষমা করতে পারবো না।

সত্যচরণ ঘাড় উঁচু করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র এতটা নীচ নয়। আমি তার সঙ্গে বৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করবো।"

গর্জ্জন করিয়া তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করবে?"

অবিচলিত-কণ্ঠে সত্যচরণ বলিল, "প্রয়োজন হয়, আমি তাকে বিবাহ করবো।"

চীৎকার করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "কুলাঙ্গার!"

সত্যচরণ ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল। তারিণী বাবু ক্রুদ্ধ অজগরের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

সেই দিন তারিণী বাবু বাচস্পতিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "নানা কারণে সত্যচরণের সহিত আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হওয়া উচিত নয়। আপনি গৌরীকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করুন। বিবাহের যা ব্যয়, তা আমার তহবিল হ'তে পাবেন।"

বাচস্পতি বলিলেন, "আপনার আদেশ মত কার্য্য হবে। তবে বিবাহে এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন দেখি না।"

ক্রুদ্ধভাবে তারিণী বাবু বলিলেন, "আপনার প্রয়োজন না থাকে, আমার প্রয়োজন আছে। আপনি নির্দ্দিষ্ট দিনে কন্যাকে অন্য পাত্রস্থা করবেন কি না, জানতে চাই।"

বাচস্পতি ভয়ে ভয়ে স্বীকার করিলেন। তখন তারিণী বাবু দেওয়ানকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "সত্যচরণের নামে যে একটা পৃথক্ হিসাব চ'লে আসছে, তা আর রাখবার প্রয়োজন নাই।"

দেওয়ান বলিলেন, "সব হিসাব কি আপনার নামেই হবে?"

বিরক্তির সহিত তারিণী বাবু বলিলেন, "তা নয় তো কি শঙ্কর ঘোষের নামে হবে?"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

তরঙ্গিণী বড় গর্ব্ব করিয়াই সত্যচরণের হইয়া স্বামীকে অনুরোধ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু স্বামী যে তাহার সে গর্ব্বটাকে এমন একটা নিদারুণ লজ্জার আঘাতে চূর্ণ করিয়া দিবেন ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সত্যচরণ যথার্থ বলিয়াছিল, তুমি আমার জ্যেঠা মহাশয়কে চেন না। কে জানিত যে, বুড়ার মিষ্টি কথার ভিতরে এতখানি ক্রোধ লুক্কায়িত আছে। তরঙ্গিণী যে কিরূপে সত্যচরণকে মুখ দেখাইবে, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িল।

শুধু সত্যচরণ কেন, অপর্ণার নিকটেও মুখ দেখাইতে তরঙ্গিণীর লজ্জা বোধ হইল। ছি ছি, সে যে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপমানটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা লইয়া গিয়াছে, যাহাতে স্বামীর ক্রোধের সমস্ত দায়িত্বটা তাহার ঘাড়েই চাপিয়া বসিয়াছে। সে-ই যেন সত্যচরণকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য স্বামীর চিত্তটাকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। অপর্ণা যদি আপনার এই ভ্রান্ত ধারণা অভ্রান্ত সত্যরূপে সত্যচরণের নিকট প্রতিপন্ন করিয়া দেয়? ছি ছি,

সে কি লজ্জার কথা। সত্য তাহাকে কতটা হীন, কতটা নীচ প্রকৃতি ভাবিয়া লইবে। হা ভগবান্! সে সত্যচরণকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য হীন ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিবে? সত্য কি তাহার এতই শত্রু? সম্পত্তির লালসাটা কি তাহার এতই প্রবল? ধিক্ সে লালসায়। কিন্তু কে এ কথাটা সত্যচরণকে বুঝাইয়া দিবে? নিজে তো পারিবেই না, সত্যচরণের নিকট এতটা হীনতা স্বীকার করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য, অসাধ্য বলিলেই হয়। অপর্ণাকে বুঝাইয়া দিতে পারিলেও হয়। কিন্তু অপর্ণা বুঝিবে কি।

সে দিন একাদশী। অপর্ণা আহ্নিক সারিয়া মহাভারতখানি পাড়িয়া সবেমাত্র পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে তরঙ্গিণী ঘরে ঢুকিয়া এক পাশে কিছু দূরে বসিল। নতুন মাকে ঘরে আসিতে দেখিয়া অপর্ণা যেন একটু চমকিত হইল। তদপেক্ষা বিস্মিত হইল, নতুন মা'র মুখ দেখিয়া। সে তরঙ্গিণীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখ হয়েছে নতুন মা?"

মুখ নীচু করিয়া তরঙ্গিণী উত্তর দিল, "না।"

অপর্ণা নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তরঙ্গিণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার হবিষ্যি হয়ে গিয়েছে?"

অপর্ণা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া উত্তর দিল, "আজ একাদশী।"

"ওঃ" বলিয়া তরঙ্গিণী চুপ করিয়া রহিল। অপর্ণা মহাভারতের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যে ঘুমাও নি?"

তরঙ্গিণী হাতের নখ দিয়া মেঝেয় আঁক কাটিতে কাটিতে বলিল, "ঘুম ধর্লো না।"

অপর্ণা নীরবে পুঁথির পাতা উল্টাইতে লাগিল, তরঙ্গিণীও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল।

একটু পরে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু বল্‌বার আছে নতুন মা?"

তরঙ্গিণী বলিল, "না। তুমি কি পড়্‌ছো? মহাভারত?"

অপ। হাঁ।

তর। একটু পড় না।

অপ। তুমি পড়তে পার?

লজ্জায় মৃদুহাসি হাসিয়া তরঙ্গিণী উত্তর দিল, একটু আধটু পারি আমি রোজ দাদামশায়কে প'ড়ে শুনাতাম।"

"তবে আমাকেও একটু শুনাও" বলিয়া অপর্ণা বইখানা তরঙ্গিণীর দিকে ঠেলিয়া দিল। তরঙ্গিণী মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। অপর্ণা বলিল, "পড় না, আমার কাছে লজ্জা কি?"

নত মুখেই তরঙ্গিণী মহাভারতখানা টানিয়া লইয়া অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্‌খানটা পড়বো?"

অপর্ণা বলিল, "যেখানটা হয়। আমি স্ত্রীপর্ব্ব পড়ছিলাম, ঐখানটাই পড় না।"

তরঙ্গিণী তখন পাতা উল্টাইয়া স্ত্রীপর্ব্ব বাহির করিয়া গান্ধারীর বিলাপ পড়িতে লাগিল। একে কবির অপূর্ব্ব ভাষায় করুণ রসের সকরুণ বর্ণনা, তাহার উপর তরঙ্গিণীর সুমিষ্ট সুর। এই উভয়কে সম্মিলিত করিয়া তরঙ্গিণী মধুর-কণ্ঠে পড়িতে থাকিল,—

"গান্ধারী পুত্রের শোকে করেন রোদন,
আহা মরি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন।
সকল সংসার শূন্য পুত্রের বিহনে,
শুন কৃষ্ণ কত দুঃখ উঠে মম মনে।
শত পুত্র যেন মম পূর্ণ শশধর,
কি হোলো কোথায় গেল কহ যদুবর।
সে হেন সুন্দর মুখ অনলে পুড়িল,
নানা আভরণ অঙ্গে কেবা কাড়ি নিল।
নানা ভোগে নানা রঙ্গে থাকিত সকলে,
হেন তনু ছারখার করিল অনলে।
স্বপ্নবৎ দেখি আমি সকল সংসার,
কহ কোথা গেল মম শতেক কুমার।
স্মরণ করিতে মোর বিদরে পরাণ,
হস্তিনা হইল শূন্য শুন ভগবান্।
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে,
দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্য-চান্দে।
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে,
চরণ পূজিত যার নৃপতিমণ্ডলে।
ময়ূরের পাখা যারে করিত ব্যজন,
কুক্কুর-শৃগালে তারে করয়ে ভক্ষণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী ভাসে অশ্রুজলে,
হাহাকার করিয়া লোটায় ভূমিতলে।"

শুনিতে শুনিতে অপর্ণার দুই চক্ষু দিয়া করুণার অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল; পাঠিকার কণ্ঠস্বরও

জড়াইয়া আসিল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তরঙ্গিণী পুঁথি হইতে মুখ তুলিল, ধরা গলায় বলিল, "আহা! এমনি মায়ের প্রাণ।"

অপর্ণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এমন জিনিস স্বর্গেও নাই।"

বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "আমার কিন্তু এ জিনিসটার সঙ্গে আদৌ পরিচয় নাই। মিষ্টি কি তেতো, তাও জানি না।"

অপর্ণা ব্যথিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কত বয়সে মা মারা গেছেন?"

তরঙ্গিণী বলিল, "তিন বছরের সময়।"

অপ। মাকে একটুও মনে পড়ে না?

তর। একখানা ভারি ভারি মুখ আবছায়ার মত মনে পড়ে।"

অপ। তোমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ।

তরঙ্গিণী মৃদু হাসিয়া বলিল, "মন্দই বা কিসে বলি, তোমাদের মত মেয়ের মা হওয়া, সেটাও কি কম ভাগ্যের কথা।"

কথাটা বলিয়াই তরঙ্গিণী লজ্জায় মুখ নীচু করিল। অপর্ণা বিস্মিত-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কল্যাণী আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "বেলা যায় যে অপু, ঠাকুরঘরে যাবি না?"

অপর্ণা বলিল, "এই যাই খুড়ীমা, এখনো ঢের বেলা।"

কল্যাণী তরঙ্গিণীর দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আজ যে নতুন বৌ এ ঘরে? কি ভাগ্যি?"

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বলিল, "নতুন মা বেশ মহাভারত পড়ে খুড়ীমা, একটু শুনবে?"

কল্যাণী বলিলেন, "আজ আর থাক্, বেলা গেছে, আবার রান্নাবান্নার যোগাড় ক'রে দিতে হবে।"

অপর্ণা বলিল, "তুমি রান্নাবান্না আর সংসার নিয়েই গেলে খুড়ীমা, একটু হাঁফ ক'রে বসাও কি তোমার কোষ্ঠীতে লেখেনি?"

মৃদু হাসিয়া কল্যাণী বলিলেন, "লিখবে না কেন, আগে তুই গিন্নীবান্নী হ', নতুন বৌ নিজের সংসার বুঝে নিতে শিখুক, তখন আমি দিনরাত ব'সে ব'সে তোদের সেবা নেব।"

অপর্ণা সহাস্যে বলিল, "আবার সত্যর বৌ আসবে।"

কল্যাণী মুখখানাকে ভার করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সে কপাল আমার নয় মা, রাধাবল্লভের কাছে প্রার্থনা করি, সত্যর বোয়ের সেবা যেন আমায় নিতে না হয়।"

অপর্ণা একটু বিরক্তির সহিত বলিল, "তোমার ও কি কথা খুড়ীমা?"

কল্যাণী নীরবে একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অপর্ণা বলিল, "সত্য খেতে এসেছিল?"

কল্যাণী বলিলেন, 'আসবে না তো খাবে কোথায়?"

অপ। কিছু বললে?

কল্যা। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তো কিছু বলবে। এলো, মাথা হেঁট ক'রে খেয়ে চ'লে গেল।"

অপর্ণা রাগতভাবে বলিল, "আর তুমিও মুখ ভার ক'রে রইলে। ধন্য খুড়ীমা, ভগবান্ যে কি দিয়ে তোমায় মেয়েমানুষ তৈরী করেছিলেন, তা জানি না।"

কল্যাণী সহাস্যে বলিলেন, "ইট, পাথর, লোহা এই সব দিয়ে আর কি। তা যা দিয়েই করুক, এখন উঠে ঠাকুরঘরে যা, বেলা যায়।"

কল্যাণী চলিয়া গেলেন। অপর্ণা আপন মনে বলিল, "এমন মাও কখনও দেখি নাই।"

তরঙ্গিণী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সে মুখ তুলিয়া অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যচরণ সত্যই কি বিধবা-বিয়ে করবে?"

অপর্ণা বলিল, "কে জানে বাছা, কি করবে। তবে শুনছি তো তাই।"

তর। তুমি বুঝিয়ে বারণ কর্ত্তে পার না?

অপ। বুঝলে তো বোঝাব। বুঝবার ছেলেই সে নয়। যা ধরে, তা সহজে ছাড়ে না।

তরঙ্গিণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "উনি নাকি খুব রেগে গেছেন।"

অপর্ণা বলিল, "রাগবারই কথা। এখনো যে বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্ছেন, এই আশ্চর্য্য।"

তর। তা হঠাৎ ওর এমন মতি হ'লো কেন?

অপ। ওর মতিগতি বোঝা দায়। মেয়েটা নাকি অনাথা, খেতে পরতে পায় না, এই আর কি, তাকে বিয়ে করতে হবে।

তর। তা খেতে পরতে পায় না, খেতে পরতে দিলেই তো চলে।

অপ। খেতে পরতে যেন দিলে, কিন্তু তার দেখা-শোনা করে কে? একে বিধবা, যুবতী।

তরঙ্গিণী মৃদু হাসিল, বলিল. "ঐখানেই যত গোল। তা মেয়েটাকে দেখবার কেউ না থাকে, বাড়ীতে এনে রাখলে চলে না?"

অপর্ণা বলিল, 'তারও উপায় নাই, সে সমাজে পতিত।"

তর। তা এই পতিত মেয়েটার উপরেই ওর এত দরদ হ'লো কেন?

অপ। ঐটাই ওর রোগ। যাকে সবাই ত্যাগ করবে, তার জন্তই ওর যত মাথাব্যথা।

তর। এখন এই মাথাব্যথার জন্য বিষয় আশয় যে সব যায়?

অপর্ণা দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল, "ওর তো তাতে বড়ই ক্ষতি। বিষয়ের ওপর কি ওর দরদ আছে?"

তরঙ্গিণী বলিল, "দায়ে পড়লেই দরদ বুঝতে পারবে।"

অপর্ণা অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিল। তরঙ্গিণী নীরবে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিধবাবিবাহের কথা যখন উঠিল, তখন তাহা গ্রামে রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। একে জমীদার-ঘরের কথা, তাহার উপর বিধবা-বিবাহ, স্থতরাং চারিদিকে আন্দোলনের ধুম পড়িয়া গেল। আন্দোলনের বেগটা বেশী হইল শিরোমণি মহাশয়ের টোলে। সেখানে যুক্তিতর্করূপ মন্দর দ্বারা শাস্ত্রসমুদ্র অবিরাম মথিত হইতে লাগিল। সে মন্থনে ধর্ম্মরূপ অমৃত উঠিল, আচাররূপ উচ্চৈঃশ্রবা উঠিল, শেষে অধর্ম্মরূপ হলাহলও উত্থিত হইল। সে হলাহল গলাধঃ করিতে মহেশ্বর ছিলেন না, স্থতরাং উহা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া শীঘ্রই সমাজ ও ধর্ম্মকে ধ্বংসের পথে প্রেরণ করিবে, সকলেই এইরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয় নূতন পঞ্জিকা হইতে ভবিষ্যপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া কলির ভাবী ভীষণ অবস্থা বর্ণনে শ্রোতৃবর্গকে চমকিত করিয়া দিলেন।

মেয়ে-মহলেও আন্দোলন বড় কম হইল না। সেখানে বিচার-বিতর্কের পরিবর্ত্তে বিস্ময়-প্রকাশ ও গালাগালিরই বেশী ছড়াছড়ি হইল। কেহ রামজীবন চক্রবর্ত্তীর মেয়েটার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিল, কেহ তাহাকে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিল, কেহ বা সম্মার্জ্জনী-প্রহারেও গায়ের ঝাল মিটিবে না বলিয়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া মেয়েটাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করিল। বিমলার সৌভাগ্য যে, তাহাদের একটা প্রস্তাবও কার্য্যে পরিণত হইল না, শুধু চারিদিকে একটা ছি ছি রব উঠিল।

কেবল একজন এই কথাটার ভিতর ছি ছি করিবার মত কিছু দেখিতে পাইল না, বরং কথাটা শুনিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিল। সে হীরুর মা। একে বাগ্দীর মেয়ে, তাহার উপর বুড়ী, স্থতরাং হীরুর মা যে ধর্ম্মের কিছুই জানিত না, যাহাও জানিত, বুড়া হইয়া তাহাও যে ভুলিয়া গিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই সংশয় থাকিতে পারে না। স্থতরাং বুড়ীর কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু ধর্ত্তব্যের মধ্যে না হইলেও গ্রামের অনেক নবীনা-প্রবীণার সহিত বুড়ীর ঝগড়া বাধিয়া গেল। তাহার সাক্ষাতে কেহ বিধবা-বিবাহের নিন্দাবাদ করিলে সে রাগে জ্বলিয়া উঠিত, এবং যাহা মুখে আসিত, তাহাই বলিয়া নিন্দাকারিণী-দিগকে তিরস্কার করিতে ছাড়িত না।

সে দিন জমীদারবাবুদিগেরই শ্যাম-সায়রের বাঁধা ঘাটে অনেকগুলি নবীনা ও প্রবীণার সমাগম হইয়াছিল। প্রবীণারা শিবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিতে দিতে এবং নবীনারা গাত্রমার্জ্জন দ্বারা অঙ্গরাগ বর্দ্ধন করিতে করিতে বিধবাবিবাহের সমালোচনায় একান্ত মনোনিবেশ করিয়াছিল। বিধবাবিবাহটা যে হাড়ী-বাগ্দীদের সাঙ্গারই নামান্তর, বিমলি হতভাগী যে কেবল রূপের কুহকে জমীদারের ভাইপোকে ভুলাইয়া তাহার সর্ব্বনাশের উদ্যোগ করিয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া সকলে বিমলার ছাই রূপযৌবনে অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা করিতেছিল। শুধু দুই এক জন বালবিধবা কোন সিদ্ধান্তে মত না দিয়া শিবের উদ্দেশে ঘন ঘন অঞ্জলিভরা জল ঢালিতেছিল। এমন সময় ঘুঁটের ছাই দিয়া দাঁত ঘষিতে ঘষিতে হীরুর মা আসিয়া ঘাটের চাতালের একপাশে দাঁড়াইল।

সমালোচনা স্রোত মুহূর্ত্তের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণকাল মাত্র। ক্ষণকাল পরেই ঘোষগিন্নী হীরুর মা'র দিকে চাহিয়া শ্লেষপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও হীরুর মা, বিয়েটা হচ্চে কবে?"

হালদারদের মেজো বৌ মৃদু হাসিয়া বলিল, "বিয়েতে বাজনা হবে তো হীরুর মা ?"

হীরুর মা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "আর মা, কত লোকের মিনি বিয়েতেই বাজনা বেজে গেল, তা এ বিয়েতে বাজনা বাজতে দোষ কি ?"

ঘোষগিন্নী নাসা কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন, এবং মুখে জলের ছিটা দিয়া জপে মনোনিবেশ করিলেন। যাহারা ঘোষগিন্নীর বিধবা কন্যার চরিত্রের কথা জানিত, তাহারা মুখ মুচকাইয়া একটু হাসিল। হালদার বৌ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "শুধু বাজনা হ'লে তো চল্‌বে না হীরুর মা, কলসীও তো চাই ?"

হীরুর মা বলিল, "শুধু কলসী নয় মা, দড়িও চাই। দু'য়েরি বায়না দেওয়া হয়েছে, অনেক চাই কি না।"

গোবরার পিসী জিজ্ঞাসা করিল, "এত কি হবে ?"

হীরুর মা শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "গাঁয়ে অনেক ঘরে বিলি কত্তে হবে। অনেকেরই যে এতে দরকার পিস্‌ঠাকরুণ।"

ঘোষগিন্নী জপ হইতে বিরত হইয়া উষ্মাপূর্ণ-স্বরে বলিলেন, "আর কারো দরকার নাই লো বুড়ী, তোর একটা, আর সেই পোড়াকপালীর একটা হ'লেই চল্‌বে।"

হীরুর মা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বালাই, তার কপালের মত সোনার কপাল কোন্ বেটা-বেটীর আছে ? সে আমার সোনার সংসার পেতে বস্‌বে, আর যে পোড়াকপালীরা ঘরের কোণে রাসলীলে করে, তারা হিংসের গলায় কলসী বেঁধে এই পুকুরের জলে ডুবে মর্‌বে।"

হীরুর মার উত্তর শুনিয়া রমণীমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কেহ মাথা হেঁট করিল, কেহ বা মৃদু হাসিল। ঘোষগিন্নী ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "বটে রে হারামজাদা মাগী, যত বড় মুখ, তত বড় কথা, খেংরায় মুখ ভেঙ্গে দেব, তা জানিস্ ?"

হীরুর মা হাত নাড়িয়া, মাথা দোলাইয়া বলিল, "খেংরা নিয়ে সবাই ঘর করে গো ঠাকরুণ, চেপে যাও না। হীরুর মা আস্তিকালের বস্তি বুড়ী, সকলেরই কুলের কথা জানে।"

ঘোষগিন্নী রাগে আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, গোবরার পিসী তাঁহাকে থামাইয়া বলিল, "চুপ কর দিদি, ও মাগীর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করে।"

ঘোষগিন্নী হীরুর মার উপর একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সগর্জ্জনে বলিলেন, "বেটী ছোট লোক।"

হীরুর মা বলিল, "আমরা বাগদীর মেয়ে, ছোট লোকই তো আছি, কিন্তু তোমাদের কায়েত-বামুনের ঘরের কথা বল্‌তে গেলে আমাদেরও পেরাচিত্তির কত্তে হয়, তা জান ?"

ক্ষান্ত ঠাকরুণ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "ও কি হীরুর মা, বুড়ো হয়ে কি তোর ভীমরতি হয়েছে ?"

হীরুর মা বলিল, "আমাকে ঘাঁটাও কেন মা ঠাকরুণ, আমি তো কারুর গায়ে প'ড়ে বল্‌তে যাই না। তোমরাই বল না মা, তোমরা তো ভদ্দর লোকের মেয়ে, শাস্তর জান, জপতপ কর। একটা মেয়ে, দাঁড়াবার স্থলকূল নেই, সে না খেয়ে মর্‌বে, না পাপ কাজ ক'রে দিন চালাবে ? সেটা ভাল, না তার বিয়ে ক'রে সোয়ামী নিয়ে ঘর করা ভাল ? তাই নিয়ে তোমরা আবার এত কথা কইচো! আঃ রে, তোমাদের কেবল নালা ঠক্‌ঠকিই সার।"

গজগজ করিতে করিতে হীরুর মা ঘাটের এক পাশে নামিল, এবং স্নান করিয়া উঠিয়া সদর্প-পদক্ষেপে চলিয়া গেল। রমণীমণ্ডলী বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

হীরুর মা চলিয়া গেলে আবার সকলের মুখ ফুটিল। ঘোষগিন্নী গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার ভাশুরপোকে বলিয়া হীরু বাগদীর যে ভিটা-মাটী চাটী করিবেন, এতদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে করিতে ঘাট হইতে উত্থিত হইলেন।

এ দিকে হীরুর মা ভিজা কাপড়ে ভিজা মাথায় একেবারে বিমলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দেখ বাছা, যদি ভাল চাও তো বিয়ে কর, কোন হারামজাদীর কথা শুনো না। বিয়ে ক'রে সোনার চাঁদ সোয়ামী নিয়ে ঘর আলো কর, হিংসুটে মাগীদের মুখে চুণকালি পড়ুক। তা যদি না কর, তবে তোমার দরজায় মাথা কুটে রক্তগঙ্গা হব, তোমার ছাঁচতলায় যদি পা দিই, তবে আমি নফরা মাঝির মেয়েই নই।"

বিমলা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হীরুর মা, হয়েছে কি ?"

হীরুর মা জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না দিয়া দ্রুত-পদে চলিয়া গেল।

খানিক পরে হীরুর মা ভিজা কাপড় ছাড়িয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বিমলা ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে হীরুর মা হাসিতে হাসিতে বলিল, "হবে আবার কি? তুমিও যেমন, একটা কথা ভাবতে ভাবতে মেজাজটা রুক্ষি হয়ে উঠেছিল। বুড়ো মানুষ কি না।"

আসল কথা, বিমলার বিবাহের কথা লইয়া পাড়ায় পাড়ায় যে একটা নিন্দাবাদের সূত্রপাত হইয়াছে, সে কথাটা বিমলার কাছে প্রকাশ করিতে হীরুর মা অনিচ্ছুক। পাড়াপ্রতিবাসীদের সহিত বিমলার সংস্রব ছিল না, সুতরাং আন্দোলনটা যে বিমলার অজ্ঞাত রহিয়াছে, ইহাই সে জানিত। তাই রাগের মাথায় যাহা বলিয়া গিয়াছিল.তাহা চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

হীরুর মা বিমলার নিকট যে কথাটা লুকাইল, সে কথাটা যে অনেক আগেই বিমলার কানে আসিয়াছিল হীরুর মা তাহা জানিত না। কথা বাতাসের আগে যায়। সুতরাং পাড়া বেড়াইবার অভ্যাস না থাকিলেও বিমলা ঘরে বসিয়াই শুনিতে পাইয়াছিল যে, সত্যচরণ তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, এবং তাহাই লইয়া গ্রামের মেয়ে-পুরুষে একটা কুৎসিত আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। কথাটা শুনিয়া বিমলার যেমন বিস্ময় হইল, তেমনই কষ্টও হইল। তাহার যে আবার বিবাহের প্রস্তাব উঠিতে পারে, এ কথাটা সে কখনও কল্পনাও করে নাই। তাহার ইচ্ছা হইল, সে সত্যচরণকে কতকগুলা তিরস্কার করে। কিন্তু সে যে দিন হইতে ইঙ্গিতে সত্যচরণকে আসিতে নিষেধ করিয়াছে সেই দিন হইতে সত্যচরণ আর তাহার কাছে আসে না। তাহার যাহা কিছু দরকার, হীরুর মাই তাহা আনিয়া দেয়। তবে সে সকল যে সত্যচরণেরই প্রদত্ত, সে বিষয়ে বিমলার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সত্যচরণের সহিত দেখা করিয়া কথাটা বোঝাপড়া করিবার জন্য বিমলার বড়ই আগ্রহ হইল। সে একদিন হীরুর মাকে বলিল, "হাঁ হীরুর মা, ওঁর সঙ্গে তোর দেখা হয়?"

হীরুর মা উত্তর করিল, "কার সঙ্গে?"

বিমলা বলিল, "কার সঙ্গে আবার? ওঁর সঙ্গে?"

উনি লোকটা কে, তাহা বুঝিতে পারিলেও হীরুর মা একটু দুষ্টামী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার? রাম ঠাকুরের সঙ্গে?"

বিমলা রাগিয়া বলিল,"হাঁ, রাম ঠাকুরের সঙ্গে।"

ঈষৎ হাসিয়া হীরুর মা বলিল, "তা কেন দেখা হবে না? রোজ দু'বেলা বন্‌তে গেলে দেখা হয়। আহা, রাম ঠাকুর লোকটি বড় ভাল, আমায় কত দরদ করে। বলে হীরুর মা, তোর এই বয়েস, এ বয়সে কি আর তোর খেটে খাওয়া চলে?"

ভ্রূকুটী করিয়া বিমলা বলিল, "তবে একটা সাঙ্গা ক'রে ফেল্।"

হীরুর মা হাত দুইটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আর দিদি, সে বয়েস কি আর আছে! থাক্‌তো যদি তোমাদের মত সোমত্ত বয়েস, তবে এদ্দিন সাতটা সাঙ্গ ক'রে ফেল্‌তাম।"

বিমলা রাগিলেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল,"বলিস্ কি হীরুর মা, সাতটা? একসঙ্গে না কি?"

মাথা দোলাইয়া হীরুর মা বলিল, "তা সাতটাই হোক্, আর পাঁচটাই হোক্, তোমার মত এক সন্ধ্যে এক বেলা আলোচাল ফুটিয়ে খেয়ে প'ড়ে থাক্‌তাম না। না গো মা, একরত্তি মেয়ে, তার কি শাসন! একাদশীর দিন এক আঁজলা জল মুখে দেবার যো নাই।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিমলা বলিল, "চুপ কর্ মাগী, তুই তো একাদশীতে খুব জল খাস্?"

হীরুর মা বলিল, "কেনে খাব না গা, আমরা কি তোমাদের মত বামুনের মেয়ে।"

বিমলা নীরবে একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। হীরুর মা বলিল, "তা রাম ঠাকুরকে কি দরকার গা?"

বিমলা বলিল, "তোর ছাদ্দ করতে।"

হীরুর মা বলিল, "আমার ছাদ্দ! তা রাম ঠাকুর কেন আমার ছাদ্দ করবে দিদি, ওনারা হ'লো কুলীন বামুন।"

বিমলা বলিল, "তা না ক'রে করবে, তুই মাগী আপনার কাজে যা।"

হীরুর মা বলিল, "তা যাচ্ছি।"

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা হ'লে ডেকে দেব?"

বিমলা বলিল, "তাই দিস্।"

পরদিন মধ্যাহ্নে বিমলা যখন হবিষ্যান্নের উদ্যোগ করিতেছিল, তখন সত্যচরণ আসিয়া ডাকিল, "বিমলা!"

বিমলা তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় কাপড় দিয়া রন্ধনশালার বাহিরে আসিল। সত্যচরণ উঠানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ডেকেছ বিমলা?"

বিমলা ঘাড় নাড়িল। সত্যচরণ বলিল, "কেন ডেকেছ?"

বিমলা কোন উত্তর না দিয়া দাবার উপর আসন পাতিয়া দিল। মৃদু হাসিয়া সত্যচরণ বলিল, "বসবো আবার?"

বিমলা মাথা নীচু করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যচরণ আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন বিশেষ কথা আছে কি?"

বিমলা চুপ করিয়া রহিল। সত্যচরণ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার কোন কষ্ট হচ্চে কি?"

বিমলা মৃদুস্বরে বলিল, "আমার মত বিধবার আবার কষ্টই কি আর সুখই কি?"

সহাস্যে সত্যচরণ বলিল, "জীবমাত্রেরই সুখ-দুখ আছে। তবে তুমি জোর ক'রে সে কথাটা অস্বীকার করতে পার।"

বিমলা একবার সত্যচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

সত্যচরণ বলিল, "তোমার কোন কথা থাকে, বলতে পার।"

বিমলা একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "আপনি আর এ দিকে আসেন না।"

সত্যচরণ বলিল, "এলে পাছে দোষ হয়, তাই আসি না।"

বি। আপনি যখন আমার রোজ মাপছেন, তখন আসতেই আর দোষ কি?

স। তুমি দোষ মনে না করলেও পাঁচজনে দোষ ধরতে পারে।

বি। আপনি কি পাঁচজনকে ভয় করেন?

স। নিজের জন্য না করলেও তোমার জন্য ভয় করি।

ঈষৎ রুক্ষস্বরে বিমলা বলিল, "সেই জন্যই বুঝি আপনি—"

শেষ কথাটা বিমলার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সত্যচরণ একটু অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি করেছি বিমলা?"

বিমলা কোন উত্তর দিল না, শুধু সত্যচরণের মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিল। সত্যচরণও নীরবে বসিয়া রহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া সত্যচরণ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথাটা কি আমাকেই বল্‌তে হবে?"

বিমলা মাথাটা আরও নীচু করিল। সত্যচরণ দৃষ্টি ফিরাইয়া মাথাটা একবার চুলকাইয়া লইয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই, না?"

সত্যচরণ দেখিল, বিমলার সর্ব্বশরীর থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সত্যচরণ তাহার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "এটা কি নিন্দা বা দোষের কাজ বিমলা?"

বিমলা রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল, "ছি:!"

সত্যচরণ বলিল, "ছি নয় বিমলা, মনে ক'রো না, আমি তোমাকে পাপ কাজে প্রবৃত্তি দিচ্ছি। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত, শুধু শাস্ত্র-সম্মত নয়, ধর্ম্ম-সঙ্গত, তোমার অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী।"

বিমলার মুখে কোন কথা নাই, সে নীরব নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান। সত্যচরণ উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিল, "লোকে নিন্দা করবে, করে করুক, লোকের কথায় কান দিও না। ধর্ম্মের কাছে—ঈশ্বরের কাছে, আপনার মনের কাছে খাঁটী থাক্‌বে।"

বিমলা দুই হাতে খুঁটিটা জড়াইয়া ধরিয়া নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ আমি চল্‌লাম। তুমি তোমার মনের সঙ্গে, অবস্থার সঙ্গে বোঝাপাড়া ক'রে দেখ, তার পরে আমার কথার উত্তর দিও। শুধু লোকনিন্দার ভয় ক'রে আপনাকে লোকের কাছে আরো হীন—আরো ঘৃণ্য ক'রে রেখো না, এইটুকু আমার অনুরোধ।"

সত্যচরণ চলিয়া গেল। বিমলা সেইখানে বসিয়া পড়িল।

বিমলা কতক্ষণ যে বসিয়াছিল, তাহা সে জানে না, হীরুর মা'র ডাকে তাহার চৈতন্য হইল। হীরুর মা তিরস্কার করিয়া বলিতেছিল, "মা গো মা, এমন মেয়েও দেখি নি, ভাতগুলোর ধরা-গন্ধে ভূত-পেরেত যে বাড়ী ছেড়ে পালায়।"

বিমলা উঠিয়া ধীরে ধীরে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় সকল স্থানেই দুইটা দল থাকে, একটা প্রাচীনের দল, অপরটা নবীনের দল। প্রাচীনের দল প্রায়ই রক্ষণশীল, আর নব্যের দল পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী। প্রাচীনেরা ভাঙ্গা ঘরে গোঁজা দিয়া কোন রকমে দিন কয়টা কাটাইয়া যাইতে ইচ্ছুক, কিন্তু উৎসাহশীল নব্য-দল ভাঙ্গা ঘরকে নূতন করিয়া গড়িয়া আপনাদের বাসোপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করে। প্রাচীনেরা বলেন, যাহা চিরাচরিত, তাহাই ধর্ম্ম, নব্যেরা বলেন, যাহা বিবেকবুদ্ধির অননুমোদিত, তাহা ধর্ম্ম নামের যোগ্য নহে। এজন্য প্রাচীনেরা নব্যদিগকে নাস্তিক বলেন, নব্যেরা প্রাচীনদিগকে অন্ধ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। নব্য-প্রাচীনের এই বিসংবাদ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

মথুরাবাটীতেও বিধবাবিবাহ লইয়া নব্য ও প্রাচীন দলে এইরূপ একটা বিবাদ উপস্থিত হইতেছিল। প্রাচীনেরা সত্যচরণকে নিন্দা ও তিরস্কার করিতেছিলেন, নব্যদল তাঁহাকে উৎসাহ ও আশ্বাস দিতেছিল। প্রাচীনেরা সমাজধর্ম্মের বিলোপ আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আর নব্যগণ দেশের ও সমাজের অসাধারণ উন্নতির কল্পনায় বিভোর হইয়াছিল। প্রাচীনেরা বলিতেছিলেন, "হতভাগা মেয়েটাকে গ্রাম হ'তে দূর করে দাও।"

নব্যেরা বলিতেছিল, "এই দম্পতীর নামে একটা স্মৃতিমন্দির স্থাপন কর।"

প্রাচীনেরা বলিতেছিলেন, "আমরা এ বিবাহ কিছুতেই হইতে দিব না।"

নব্যেরা উত্তর দিয়াছিল, "আমরা পুলিশ খাড়া করিয়া বিবাহ দিব।"

প্রাচীনেরা বলিলেন, "আমরা পুরোহিত ও শালগ্রাম আটক করিয়া রাখিব।"

নব্যেরা বলিল, "আমরা কলিকাতা হইতে মহা মহা পণ্ডিত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগ্রাম আনাইব।"

প্রা। আমরা এ বিবাহবাটীতে যাইব না, জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিব না।

ন। তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিব না, তোমাদের জলযোগের যোগাড়ও করিব না। আমরা কলিকাতার "হিন্দু-আশ্রম" হইতে রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্য আনয়ন করিব।

শুনিয়া প্রাচীনেরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, এবার জাতি, ধর্ম্ম সকলই বুঝি যায়। ঘোষজা মহাশয় গাঙ্গুলী মহাশয়কে ইহার সুযুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বিপত্তে মধুসূদন ছাড়া উপায় নাই। ছোঁড়ার দলকে ঠেকিয়ে রাখা দায়। আবার বলে খানা খাব।"

চাটুয্যে মহাশয় ক্রোধে ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'খেলেই হ'লো আর কি? সমাজচ্যুত করবো।"

বোসজা সহাস্যে বলিল, "ঠিক বাছতে গাঁ উজোড় হবে যে দাদা ঠাকুর। কা'কে রহিত করবেন?"

চাটু। যে খাবে তাকেই।

বোসজা। আপনার ভাইপো, ঘোষজার ছেলে, গাঙ্গুলী মশায়ের জামাই, দত্তজার নাতি, এদের সমাজ রহিত করতে পারবেন?

চাটুয্যে মহাশয় হুঁকায় টান দিয়া ঘন ঘন কাসিতে লাগিলেন। তখন সকলে গিয়া শিরোমণি মহাশয়কে ধরিলেন। শিরোমণি তাঁহাদিগকে ভরসা দিয়া তারিণী বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

সমস্ত শুনিয়া তারিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ের সব ঠিক হয়েছে কি?"

শিরোমণি বলিলেন, "সব ঠিক, দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গিয়েছে। আবার ছোঁড়ারা বলে, গোরার বাজনা, হোটেলের খানা আসবে।"

তারিণী বাবু মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "ও সব বাজে কথায় আপনার মত লোকের কান দেওয়া উচিত নয়।"

শিরোমণি সপ্রতিভভাবে উত্তর করিলেন, "তা নাই আসুক, বিয়েটা তো দেবে। সেইটাই বন্ধ করা চাই।"

তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

বিস্মিত-দৃষ্টিতে তারিণী বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া শিরোমণি বলিলেন, "কেন? আপনি থাকতে গাঁয়ের মাঝে এমন অধর্ম্মটা হবে?"

তারিণী। কোন্‌টা অধর্ম্ম?

শিরো। বিধবা-বিবাহটা।

তারিণী বাবুর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া আসিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "দেখুন শিরোমণি মশায়, আপনার ষাট বৎসর বয়সে চতুর্থ পক্ষগ্রহণে যদি অধর্ম্ম না হয়, আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহে যদি অধর্ম্ম না থাকে, তা হ'লে এই পনরো বছরের মেয়েটার বিবাহে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই, অন্ততঃ আমার এইরূপ বিশ্বাস।"

শিরোমণি মহাশয় স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তার পর সলজ্জ-কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না, অন্য হ'লে আমি এত উৎকণ্ঠিত হতাম না, কিন্তু আপনার ভাইপো ব'লেই —"

মেঘগম্ভীর-কণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "আমার ভাইপোরই এ রকম সাহস, এতটা বুকের পাটা হ'তে পারে, অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার ছেলে পঞ্চাশ বছরে তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করতে পারবে, কিন্তু একটা দশ বছরের বিধবা মেয়ের বিবাহসভায় উপস্থিত হ'তে সাহসী হবে না।"

শিরোমণি মহাশয় লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া উঠিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে তারিণী বাবুর ভীমরথী হইয়াছে কি না, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া পড়িল।

বীরেন মুখুয্যের ছেলে সুরেন মুখুয্যের সহিত গৌরীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। বাচস্পতি মহাশয়ের এত তাড়াতাড়ি ছিল না, সত্যচরণের হস্তেই গৌরীকে দান করবার আগ্রহ ও ইচ্ছা তাঁহার সম্পূর্ণ ছিল। সত্যচরণের বিধবাবিবাহে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়াও তিনি একেবারে হতাশ্বাস হন নাই। ভাবিয়াছিলেন, এটা যৌবনসুলভ সাময়িক উত্তেজনামাত্র, কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই এ উত্তেজনার নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু তারিণী বাবু বড় গোল বাধাইলেন, তিনি যত শীঘ্র হয়, গৌরীর বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন। বিবাহের ব্যয় দিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। মেয়েও নিতান্ত ছোট নাই। এ অবস্থায় বাচস্পতি তারিণী বাবুর সাহায্য ও সন্তোষ পরিত্যাগ করিয়া সত্যচরণের মুখ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি আজিকালি করিয়া কয়েকদিন বিলম্ব করিলেন, সত্যচরণকেও আর একবার বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না, সত্যচরণ আপন প্রতিজ্ঞা ছাড়িল না। এ দিকে তারিণী বাবুর ক্রোধোদ্রেকের সম্ভাবনা দেখিয়া বাচস্পতি হতাশ হইয়া গৌরীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে বাধ্য হইলেন।

বিবাহের দিন ঠিক হইয়া গেল। আর সাত দিন পরে বিবাহ। সত্যচরণ সে দিন গৌরীকে সম্মুখে পাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এবার গৌরি, সত্যই তোর বিয়ে।"

গৌরী মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "তোমারও তো সাঙ্গা।"

সত্যচরণ বলিল, "সাঙ্গা নয়, আমারও বিয়ে।"

গৌরী বলিল, "সে তোমার বিধানে।"

সত্য। আর তোর বিধানে?

গৌরী। নিকে।

সত্য। কেন বল দেখি?

গৌরী। সে যে বিধবা।

সত্য। হ'লেই বা বিধবা? বিধবার বিয়ে হয়।

গৌরী। বিয়ে হয় না, নিকে হয়। মেয়েমানুষের আবার দু'বার বিয়ে। মুখে আগুন।

সত্যচরণ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই একরত্তি মেয়ে, এত কথা শিখলি কোথা হ'তে?"

গৌরী মাথা নাড়িয়া ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিল, "আর তুমিও একরত্তি ছোঁড়া, জ্যেঠামশায়ের বিধানের উপর এত বিধান শিখলে কোথা হ'তে বল দেখি?"

সত্যচরণ গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গৌরী বলিল, "হাঁ সত্যদা।"

"কেন গৌরি।"

"তোমাদের কি একটু লজ্জা হবে না?"

"কিসের লজ্জা?"

"তা তুমি বেটাছেলে, তোমার না হোক, তার তো লজ্জা হওয়া উচিত।

"অন্যায় কাজ করলে লজ্জা হ'তো।"

রাগে চোখ কপালে তুলিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে গৌরী বলিল, "অন্যায় কাজ! এর চেয়ে আবার অন্যায় কাজ আছে?"

গম্ভীরভাবে সত্যচরণ বলিল, "একটুও অন্যায় নয় গৌরি, শাস্ত্রে বিধবার বিবাহের বিধান আছে।"

ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে গৌরী বলিল, "রেখে দাও তোমার বিধান। যে মেয়েমানুষ বিধবা হয়ে আবার বিয়ে করতে চায়, তার অসাধ্য কাজ কি আছে? তার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত?

সত্যচরণ সহাস্যে বলিল, "তোর বড় রাগ হয়েছে, না গৌরি?"

গৌরী বলিল, "রাগ! আমার এমন ইচ্ছা হচ্ছে—"

সত্য। কি ইচ্ছা হচ্ছে?

গৌরী। ইচ্ছা হয়, মাগীকে একগাছা দড়ি আর একটা কলসী পাঠিয়ে দিই.

গৌরী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল।

— —

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

"অপি!"

"কেন বাবা?"

তারিণী বাবুর জ্বর হইয়াছিল। তিনি শুইয়াছিলেন, অপর্ণা কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতেছিল। তারিণী বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা চোখ মেলিয়া ডাকিলেন, "অপি!"

অপর্ণা উত্তর দিল, "কেন বাবা?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "ভাবছি, একখানা উইল কর্‌বো।"

অপর্ণা শঙ্কিত স্বরে বলিল, "উইল কেন বাবা?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "বিষয়ের তো একটা বন্দোবস্ত করা দরকার। আগে হ'তে যদি তার বন্দোবস্ত না ক'রে যাই, এর পর—"

বাধা দিয়া অপর্ণা বলিল, "না না, বিষয়ের বন্দোবস্তে দরকার নাই। তুমি থাম বাবা।"

তারিণী বাবু মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, "ভয় নাই অপি, তোর বাবা আজই মচ্ছে না। কিন্তু মানুষ আজ আছে, কা'ল নাই চিরকাল কি তোর বাবাকে ধ'রে রাখতে পার্‌বি?"

মুখ ভার করিয়া অপর্ণা বলিল, "হাঁ, পার্‌বো। তুমি চুপ ক'রে একটু শুয়ে থাক।"

তারিণী বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পাগল মেয়ে!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারিণী বাবু বিষাদ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "শোন্ অপি, আমার যা কিছু যুক্তি-পরামর্শ, সব তোর সঙ্গে, আর যে পরামর্শের লোক ছিল, সে চ'লে গেছে।"

তারিণী বাবু একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পিতার অন্তরের বেদনার গুরুত্ব অনুভব করিয়া অপর্ণা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "আগে হ'তে যদি বিষয়ের একটা বন্দোবস্ত না করি, তবে এর পর এই বিষয় নিয়ে ছোঁড়াছেঁড়ি হবে। যা এত দিন বুক দিয়ে রেখে আস্‌ছি, সেই জমীদারীর এক একটা মহাল নীলামে উঠবে, মহাল চুলোয় যাক, এই বাড়ীর এক একখানা ইট দিয়ে উকীল-মোক্তারদের বাড়ীর ভিত গাঁথা হবে। সেটা কি দেখতে শুন্‌তে ভাল হবে অপি?"

অপর্ণা শিহরিয়া বলিল, "তুমি কি কর্‌তে চাও বাবা?"

তারি। আমি একখানা উইল ক'রে রাখতে চাই।

অপ। উইলে যদি ভাল হয়, তাই কর।

তারি। শুধু উইল কর্‌লেই হবে না, উইলে কার কি ব্যবস্থা করা যাবে, সেইটাই হচ্চে আসল কথা।

অপ। তোমার যাকে যা দিলে ভাল হয়, তাই কর্‌বে।

তারি। কাকে কি দেব, সেইটাই তো হচ্চে ভাবনার কথা। ধর, তুই এ সম্পত্তির একজন ওয়ারিশ।

অপ। আমার কথা ছেড়ে দাও বাবা।

একটু উত্তেজিত স্বরে তারিণী বাবু বলিলেন, "তোর কথা ছাড়বো, ওর কথা ছাড়বো, তবে কার কথাটা ধর্‌বো?"

অপর্ণা নিরুত্তরে রহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "শোন্, ছাড়লে চল্‌বে না। যত দিন আমি আছি, তত দিন তুই জমীদারের মেয়ে, কিন্তু আমি গেলে ঐ যশী চাকরাণীও যা, তুইও তাই। বুঝেছিস?"

অপর্ণার চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া তারিণী বাবু সহাস্যে বলিলেন, "তুই বুঝি ভাবছিস, তোর বাবা আজই চ'লে যাচ্ছে।"

অপর্ণা রাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তোমার কাছে আর কোন্ বেটী আস্‌বে।"

ঈষৎ হাসিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "ঐ কথাটি বলিস্ না অপি, তা হ'লে তোর এই বুড়ো ছেলে আর দু'দিনও বাঁচবে না।"

অপর্ণাও একটু হাসিয়া বসিয়া পড়িল। তারিণী

বাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "শোন, আমি কি রকম ব্যবস্থা করবো, ইচ্ছা কচ্চি। বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছি, তার তো একটা সংস্থান চাই, সুতরাং নতুন বোয়ের চার আনা। রাধাবল্লভজীর সেবার জন্য থাকবে চার আনা। ছোট বৌমা অনাথা বিধবা, দাসী-বাঁদীর মত খেটেছে, তার রকম দু'আনা। বাকী ছ'আনা তোর।"

অপর্ণা নীরবে বসিয়া রহিল। তারিণী বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বলিস্?"

অপর্ণা মৃদুস্বরে বলিল, "আর কাকেও কিছু –"

তারিণী বাবু বলিলেন,"আর কে? চাকর-বাকর, তাদের নগদ কিছু কিছু ব্যবস্থা ক'রে রাখব।'

অপর্ণা বলিল, "আমি চাকরবাকরদের কথা বল্‌ছি না।"

তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আর কে আছে?"

অপর্ণা কোন উত্তর করিল না, বাপের পায়ের আঙুলগুলা লইয়া নাড়িতে লাগিল। তারিণী বাবু একটু অপেক্ষা করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বুঝেছি অপি, কিন্তু যে কুলাঙ্গার আমার অপমান করে, চৌধুরীবংশের নাম ডুবাতে চায়, তাকে কি আমি কিছু দিয়ে যেতে পারি?"

অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি মনে করলেই পার বাবা।"

ক্রুদ্ধস্বরে তারিণী বাবু বলিলেন, "কিছুতেই না, সে হতভাগাকে আমি বিষয়ের এক পয়সা দেব না।"

অপর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারিণী বাবু মুখ ফিরাইয়া শুইলেন।

একটু পরে অপর্ণা ধীরে ধীরে ডাকিল, "বাবা।"

তারিণী বাবু মুখ ফিরাইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। অপর্ণা নতমুখে বলিল, "আমি বিধবা, এক মুঠো আলো চাল হ'লে দিন চ'লে যায়। আমার এত বিষয়ের দরকার কি?"

ভ্রূকুটি করিয়া তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরকার নাই?"

অপর্ণা বলিল, "না।"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "উত্তম, যার দরকার আছে, তাকে দিয়ে যাব।"

পিতা-পুত্রীতে আর কোন কথা হইল না। কিছুক্ষণ পরে পিতাকে নিদ্রিত দেখিয়া অপর্ণা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

সে দিন সন্ধ্যার পর অপর্ণা পিতাকে যখন ঔষধ খাওয়াইতে গেল, তখন তারিণী বাবু ঔষধটা লইয়া পিকদানীতে ঢালিয়া দিলেন। অপর্ণা কিয়ৎক্ষণ গালে হাত দিয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল, তার পর নতমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

তরঙ্গিণী ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে গা?"

তারিণী বাবু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই নতুন বৌ, তোমার ভাগে আট আনা।"

তরঙ্গিণী পাশে বসিয়া স্বামীর কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "পাগল হ'লে না কি? ও মা, কপালটা যে গরম দেখছি।"

তারিণী বাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "হঁ।"

তরঙ্গিণী সভয়ে বলিল, "আজ আবার জ্বর এলো কেন?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "সেটা জ্বরের দোষ, আমার তাতে কোন হাত নাই।"

তরঙ্গিণী নীরবে বসিয়া স্বামীর কপালে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে তারিণী বাবু চোখ না মেলিয়াই ডাকিলেন, "নতুন বৌ!"

তরঙ্গিণী উত্তর দিল 'কেন?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "কা'ল তাকে স্বপ্নে দেখিছি।"

তর। কাকে? দিদিকে?

তারি। হাঁ, সে যেন এসে বল্‌ছে, আর কেন, এসো না, আমি কত দিন একা থাকবো?

তরঙ্গিণীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। একটু থামিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "সত্যি নতুন বৌ, বিয়ে হয়ে অবধি সে এক দিনের জন্য আমাকে ছেড়ে থাকে নি। এত দিন যে কি রকমে ছেড়ে আছে, তাই ভাবছি।"

তারিণী বাবু জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। তরঙ্গিণী নীরব নিশ্চল-ভাবে বসিয়া রহিল। তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবচো নতুন বৌ?"

ধরা গলায় তরঙ্গিণী বলিল, "জ্বর হ'লে মানুষ কি বাঁচে না?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "বাঁচবে না কেন? জ্বর হ'লে মানুষ বাঁচে, তবে কালের ডাক পড়লে বাঁচে না।"

তরঙ্গিণী চোখে হাত চাপা দিল। তারিণী বাবু সহাস্যে বলিলেন, "ভয় নাই নতুন বৌ, আমি এত শীগগীর মর্‌বো না। আর যদিই মরি, তোমার জন্য যা রেখে যাব,তাতে তোমাকে কোন কষ্ট পেতে হবে না।"

তরঙ্গিণী রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রেখে যাবে?"

তারি। এই জমীদারীর অর্দ্ধেক।

তর। আমি মেয়েমানুষ, জমীদারী নিয়ে কি কর্‌বো?

তারি। তোমায় কিছুই কর্‌তে হবে না, শুধু উপস্বত্ব ভোগ কর্‌বে।

তরঙ্গিণী স্বামীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, আমি তোমার জমীদারী চাই না, উপস্বত্ব চাই না, আমি শুধু তোমাকে চাই।"

স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া তরঙ্গিণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তারিণী বাবু তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি জমীদারী চাও না নতুন বৌ?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে তরঙ্গিণী অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "না গো না, আমি চাই না।"

"সত্যি?"

"আমি তোমাকে ছুঁয়ে কি মিথ্যে বল্‌ছি?"

"এই সম্পত্তি যদি অন্য কারেও দিই?"

"স্বচ্ছন্দে দিতে পার।"

"তাতে তোমার মনে কষ্ট হবে না?"

তরঙ্গিণী ত্বরিতবেগে মাথা তুলিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সতেজ-কণ্ঠে বলিল, "আমি দেবেন গাঙ্গুলীর মেয়ে, ভুবন গাঙ্গুলীর নাতনী, আমাকে তুমি এতটা ছোটলোক মনে কর।"

তারিণী বাবু মৃদু হাস্য করিলেন, এবং তরঙ্গিণীর হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিয়া সহাস্য দৃষ্টিতে তাহার অভিমানক্ষুব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তারিণী বাবু বলিলেন, "একবার অপিকে ডেকে দাও নতুন বৌ, সে রাগ ক'রে গিয়েছে।"

তরঙ্গিণী উঠিয়া গেল, একটু পরে অপর্ণা আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

তারিণী বাবু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহকোমল-কণ্ঠে ডাকিলেন, "অপি।"

অপর্ণা মুখ নীচু করিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "তুই রাগ করেছিস্ অপি?"

অপর্ণা নিরুত্তরে দণ্ডায়মান। তারিণী বাবু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি বুড়ো হয়েছি, কথায় কথায় রাগ হয়, তাই ব'লে তোরাও যদি আমার উপর রাগ করিস্, তবে আমি আর কোথায় দাঁড়াব অপি?"

অপর্ণার চক্ষু দুইটা সজল হইয়া আসিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "শান্ত শিষ্ট মেয়েটির মত দাঁড়িয়ে রইলি যে, একটু ওষুধ ঢেলে দে না।"

অপর্ণা ব্যস্ত হস্তে ঔষধ ঢালিয়া পিতার হাতে দিল, তারিণী বাবু ঔষধ খাইয়া কন্যাকে পাশে বসিতে বলিলেন। অপর্ণা পাশে বসিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। তারিণী বাবু স্নিগ্ধ সজল কণ্ঠে ডাকিলেন, "অপি।"

অপর্ণা উত্তর দিল, "বাবা।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "আমি তোর বড় নিষ্ঠুর বাবা, না?"

অপর্ণা বাষ্পজড়িত স্বরে বলিল, "তা কেন, তুমি শুধু বাবা।"

তারিণী বাবু তাহার হাতখানা লইয়া আপনার বুকের উপর রাখিলেন। অপর্ণা চমকিত হইয়া বলিল, "এ কি, আজ আবার যে জ্বর এসেছে, বুকটা গরম আগুন।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "তোর হাতটা বুকে থাক অপি, ও আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

তারিণী বাবুর অসুখটা যে খুব সাঙ্ঘাতিক হইয়াছিল, তাহা নয়, সামান্য জ্বর মাত্র। কিন্তু সেই জ্বরটুকু সাত দিনের মধ্যে ছাড়িল না, জ্বরের উপর জ্বর আসিতে লাগিল। ঔষধ চলিল, কিন্তু জ্বর গেল না। জ্বরের সঙ্গে আবার একটু কাসি আসিল। ডাক্তার ভীত হইলেন। অপর্ণা দাসী দ্বারা ডাক্তারকে বলিয়া পাঠাইল, "আপনি যদি রোগ বুঝতে না পারেন, তবে বলুন, কল্‌কেতা থেকে ভাল ডাক্তার নিয়ে আসি।"

ডাক্তার উত্তর দিল, "বেশী বয়সের রোগ, ব্যস্ত হবার দরকার নাই, তেমন বুঝলে আমি আপনিই নিয়ে আসব।"

অপর্ণা কিন্তু সে আশ্বাসে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না,বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে তারিণী বাবুকে বলিল, "এ ডাক্তার কোন কাজের নয় বাবা, আমি দাওয়ানকে ব'লে কল্‌কাতা হ'তে ভাল ডাক্তার আনাই।"

তারিণী বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কলকাতার ডাক্তারের হাতে কি পরমায়ু আছে অপি? হরিশ বাবু একজন বিচক্ষণ ডাক্তার, এই কাজে চুল পাকিয়েছেন।"

অপর্ণা বলিল, "ছাই করেছেন, আট দশ দিনেও জ্বরটুকু ছাড়াতে পার্‌ছেন না।"

তারিণী বাবু সহাস্যে বলিলেন, "ডাক্তার জ্বর ছাড়াবার জন্য চেষ্টা কচ্চে, কিন্তু জ্বর না ছাড়লে সে কি কর্‌বে?"

অপ। কিছু যদি কর্‌তে না পার্‌বে, তবে কিসের ডাক্তার?

তারি। ডাক্তার ঔষধ দিতে পরে, আয়ু দিতে পারে না।

অপ। আমি শুনেছি, কলকাতার ডাক্তারেরা মরা মানুষের জীবন দেয়।

তারি। ভগবান্ ছাড়া আর কারো জীবন দেবার ক্ষমতা নাই অপি।

অপর্ণার মুখখানা বড় বিষণ্ণ হইল, চোখ দু'টা ছল-ছল করিতে লাগিল। তারিণী বাবু বলিলেন, এত ব্যস্ত হবার দরকার নাই অপি, আমি নিজেই বুঝ্‌ছি, আমার রোগ তেমন কঠিন নয়। বোধ হয়, ম্যালেরিয়ায় ধরেছে।"

পিতার কথায় অপর্ণা কতকটা আশ্বস্ত হইল।

তারিণী বাবু কন্যাকে আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু সেই দিন কাসির সঙ্গে যখন একটু রক্ত দেখা দিল, তখন তিনি বুঝিলেন, এ রোগ সামান্য নয়। যে রোগ কালের আহ্বানরূপে আসিয়া আক্রমণ করে, যাহার আক্রমণে সংসারের খেলাধুলা সব ফেলিয়া অজ্ঞাত অনন্তের পথে যাত্রা করিতে হয়, এ সেই রোগ। রোগের আক্রমণ হইতে মানুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে, কিন্তু এই কালের আহ্বান উপেক্ষা করিবার মত কোন কৌশল মানুষ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। এ আহ্বান একদিন সকলেরই আসে, এবং ক্ষমতা, প্রভাব, অর্থবল, লোকবল সকলকে উপেক্ষা করিয়া মানুষকে চিরগন্তব্যপথে টানিয়া লইয়া যায়। কি ভয়ানক, কি কঠোর এই আহ্বান।

তারিণী বাবু যেন প্রতি মুহূর্ত্তে কালের এই কঠোর আহ্বান শুনিতে লাগিলেন। এই সংসার—কত দিনের পরিচিত সংসার এই সযত্নে রক্ষিত জমীদারী, এই রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, এই দেশবিখ্যাত প্রতাপ, সকলই পড়িয়া থাকিবে, শুধু তাঁহাকে একা চলিয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে কিছুই যাইবে না, যাইবে শুধু কর্ম্মফল। সেই শুভাশুভ কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া কোন্ এক অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে যাত্রা করিতে হইবে। এই স্নিগ্ধশ্যামলা ধরণী নিত্য প্রভাত-সূর্য্য-কিরণে অনুরঞ্জিত হইবে, শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর নিদাঘ আসিয়া ধরণীর অঙ্গ নিত্য নবীন বেশে সজ্জিত করিবে, কিন্তু ধরণীর সে বেশ, প্রকৃতির সে নিত্য নবীন সৌন্দর্য্য তিনি আর দেখিতে পাইবেন না। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি চির-নিমীলিত, ইন্দ্রিয়দ্বার চির-রুদ্ধ হইয়া যাইবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—ইহাদের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। উ, মনুষ্যজীবনের এ কি ভীষণ অবস্থা!

তার পর আত্মীয়-স্বজন। যাহাদের তিনি ভালবাসেন, তাহারা আর ভালবাসা পাইবে না, যাহাদের স্নেহ করেন, তাহারা স্নেহ-হারা হইবে, যাহাদের শাসন করিতে চান, তাহারা নিরাতঙ্ক হইবে, যাহারা শত্রু, তাহারা হাসিবে, যাহারা আত্মীয়, তাহারা কাঁদিবে। এই বিশাল জমীদারী রক্ষকবিহীন, অপর্ণা পিতৃহীনা, দাসদাসী প্রভুহারা হইবে। আর তরঙ্গিণী? হায়, কেন এই বয়সে—এই মহাযাত্রার প্রাক্-কালে বিবাহ করিলাম? এই নবোদ্গত-যৌবনা বালিকা যৌবনে যোগিনী সাজিয়া ফুটিবার আগেই কমল-কোরক বহ্নিস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইবে। হায়, কেন ইহাকে বিবাহ করিলাম, এই বয়সে রূপ দেখিয়া কেন মজিলাম। আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, কিন্তু এ পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই, এ অপরাধ যে ইহ-লোকে পরলোকে অমার্জ্জনীয়।

"তরু।"

তরঙ্গিণী পাশে বসিয়া ঢুলিতেছিল, স্বামীর আহ্বানে চমকিত হইয়া উত্তর দিল, "কেন?"

"সত্য কি বলে, জান?"

"কি বলে?"

"বলে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।"

"ও ছেলেমানুষ, কি জানে।"

"না নতুন বৌ, সত্য ছেলেমানুষ নয়।"

"ও পাগল, ওর কথা ছেড়ে দাও।"

তারিণী বাবু গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "এত দিন তো ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্চে, ওর কথাই ঠিক।"

তর। কোন্ কথা ?

তারি। বিধবার বিয়ের কথাটা।

তর। ও আবার একটা কথা। বিধবার আবার বিয়ে হয় ?

তারি। হ'লে দোষ কি ?

তর। দোষ সবটাই। স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ কি কেবল ইহকালে ? এ সম্বন্ধ যে জন্মজন্মান্তরের।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তরঙ্গিণীর মুখের দিকে চাহিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "এ সব কথা তুমি কোথা হ'তে শিখলে নতুন বৌ ?"

তরঙ্গিণী মুখ নীচু করিয়া মৃদুগম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "এ সব কথা মেয়েমানুষকে কারো কাছে শিখতে হয় না, তারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিখে।"

তারি। তবুও তো অনেক মেয়েমানুষ বিধবা হয়ে আবার বিবাহ করে ?

তর। অনেক মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করে।

তারিণী বাবু বিস্মিত, মুগ্ধ হইলেন। বুঝিতে পারিলেন, যে দেশের মেয়েরা স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতে পারে, সে দেশে বিধবা-বিবাহের চেষ্টা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিধবার বিবাহ যে অন্যায়, অসঙ্গত, ইহাই ইহাদের সহজ বিশ্বাস, এ বিশ্বাসের নিকট শাস্ত্রের দোহাই, জ্ঞানীর যুক্তি, সকলই পরাভূত, নিষ্ফল।

তারিণী বাবু উকীলকে ডাকাইবার জন্য দেওয়ানকে আদেশ করিলেন।

সত্যচরণ মধ্যে মধ্যে জ্যেঠামশায়কে দেখিতে আসিত। কোন কথাবার্ত্তা হইত না, একপাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া যাইত। সে দিন কিন্তু সত্যচরণ দেখা করিতে আসিলে তারিণী বাবু তাহাকে ডাকিলেন। ঘরে তখন আর কেহ ছিল না, সত্যচরণ নতমস্তকে ধীরে ধীরে গিয়া জ্যেষ্ঠতাতের পাশে দাঁড়াইলেন। তারিণী বাবু তাহাকে বসিতে বলিলেন। সত্যচরণ তাঁহার পায়ের কাছে বসিল। তারিণী বাবু কিন্তু কোন কথা কহিলেন না, সত্যচরণও নীরবে বসিয়া রহিল।

সহসা গম্ভীরকণ্ঠে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, তারিণী বাবু ডাকিলেন, "সত্যচরণ !"

সত্যচরণ চমকিত হইয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "আমি উইল কচ্চি।"

সত্যচরণ নিরুত্তর। তারিণী বাবু বলিলেন, "এই সম্পত্তিতে তোমার কি কোন দাবী আছে ?"

সত্যচরণ মৃদু স্বরে উত্তর করিল, "না।"

তারিণী বাবু বক্রদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। একটু পরে তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই বদ্খেয়ালটা এখনো বোধ হয় সমানই আছে।"

সত্য। আমি আমার সঙ্কল্পকে বদ্খেয়াল মনে করি না।

তারি। তোমার মত নির্ব্বোধ বালক তা মনে কর্‌তেই পারে না।

তারিণী বাবু দেখিলেন, সত্যচরণের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। তিনি ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিলেন, "আর সেই মেয়েটা—সে পাপিষ্ঠাও কি তোমারই মত—"

সত্যচরণ সতেজ-কণ্ঠে বলিল, "সে পাপিষ্ঠা নয়—পবিত্রা।"

তারি। পবিত্রা কখন আবার বিবাহ করে না।

সত্য। তার এ বিবাহে সম্মতি নাই।

তারি। তথাপি তুমি তাকে বিবাহ কর্‌বার জন্য লালায়িত ?

সত্যচরণ নিরুত্তর। তারিণী বাবু বলিলেন, "কিন্তু জেনো, আমি যত দিন আছি। তার পর তোমার আর এ বাড়ীতে প্রবেশের অধিকার থাক্‌বে না।"

সহাস্যমুখে সত্যচরণ বলিল, "আমিও অনধিকার-প্রবেশে ইচ্ছুক নই।"

"ইচ্ছুক নও ?" গর্জ্জন করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "ইচ্ছুক নও ? উত্তম, আমার হুকুম, আজ হতেই—"

দ্বারপ্রান্ত হইতে অপর্ণা ডাকিল, "বাবা।"

তারিণী বাবু সে আহ্বানে কর্ণপাত না করিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন, "আজ হতেই তুমি এ বাড়ীর ছায়া স্পর্শ কর্‌বে না।"

শান্ত-স্থির-স্বরে সত্যচরণ বলিল, "আপনি গুরু, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু—"

গর্জ্জন সহকারে তারিণী বাবু বলিলেন, "আমার হুকুমের উপর আর কিন্তু নাই।"

সত্যচরণ বিনীতভাবে বলিল, "কিন্তু যে কয় দিন

আপনি শয্যাগত থাকেন, অন্ততঃ সে কয়দিন আপনার কাছে আস্‌বার অনুমতি—"

চীৎকার করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "নাঃ, তোমার মত কুলাঙ্গারের সেবা আমি চাই না, তোমার মুখ দেখাও মহাপাপ।"

সত্যচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং জ্যেষ্ঠতাতের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। অত্যধিক উত্তেজনায় তারিণী বাবুর জোরে কাসি আসিল। কাসির সঙ্গে খানিকটা রক্ত উঠিল। অপর্ণা ব্যস্তভাবে পিতাকে শোয়াইয়া দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে তারিণী বাবু একটু সুস্থ হইলেন। তিনি দেওয়ানকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, "আজ হ'তে সত্যচরণ যেন এ বাড়ীর দরজায় পা না দেয়। আর এখনই রামজীবন চক্রবর্ত্তীর মেয়েটাকে বাড়ীতে এনে তার থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

অপর্ণা গিয়া কল্যাণীকে বলিল, "সর্ব্বনাশ হ'লো খুড়ীমা, বাবা হুকুম দিয়েছেন, সত্য আর এ বাড়ীতে ঢুকতে পাব্‌বে না।"

কল্যাণী বলিলেন, "ঠাকুর ঠিক হুকুমই দিয়েছেন অপি, যে হতভাগা গুরুজনের আদেশ অমান্য ক'রে বিধবাকে বিয়ে কর্‌তে চায়, এটা তার পক্ষে খুব লঘু শাস্তি।"

অপর্ণা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'সত্য যথার্থই হতভাগা খুড়ীমা, কেন না, সে তোমার মত মা পেয়েছে।"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া কল্যাণী বলিলেন, "তার চেয়েও আমি হতভাগী অপু, কেন না, আমি এখনও ভুল্‌তে পাচ্চি না যে, সত্য আমার ছেলে, আমি তার মা।"

কল্যাণীর চোখের কোলে জল টল-টল করিতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া অপর্ণা বলিল, "আমারই ভুল হয়েছে খুড়ীমা, সত্য হতভাগা নয়।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বিমলা বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছিল। সে বিধবা—বালবিধবা। স্বামীকে চিনিবার পূর্ব্বেই সে স্বামিসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। স্বামীর ছায়াটুকু পর্য্যন্ত তখনও তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। যে দিন শুনিয়াছিল, সে বিধবা হইয়াছে, সে দিন সে বুঝিতে পারে নাই তাহার কি ছিল, কি হারাইয়া গেল। শুধু বুঝিল, সে বিধবা হইয়াছে। শুধু জানিল, তাহার আর সুখভোগে কিছুমাত্র অধিকার নাই, সংসারের সকল সুখের দ্বার তাহার নিকট চিররুদ্ধ হইয়াছে। বিমলা বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে সেই রুদ্ধ দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া দুঃখের আর্ত্তচীৎকার শুনিতে লাগিল, চারিদিকে সুখের—বিলাসের শত শত উপকরণ অট্টহাসি হাসিয়া তাহাকে উপহাস করিতে থাকিল।

এ উপহাস বিমলা সারা জীবন উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারিত, যদি সত্যচরণ আসিয়া তাহাকে বুঝাইয়া না দিত যে, সে যাহাকে চিররুদ্ধ জ্ঞান করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছে, বাস্তবিক সে দ্বার তাহার পক্ষে চিররুদ্ধ নয়, সে ইচ্ছা করিলেই দ্বার ঠেলিয়া সংসারের হাটে প্রবেশ করিতে পারে, এই লোকাচারের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিলেই জীবনব্যাপী দুঃখের কঠোর প্রাচীর অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। সে যাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া ভাবিয়াছে, তাহা বস্তুতঃ নির্ম্মম লোকাচার, যাহাকে জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছে, তাহা জীবনের একটা ঘোরতর বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কিন্তু এই লোকাচারের গণ্ডী কি কঠিন, কি দুর্লঙ্ঘ্য! ইচ্ছা করিলেই ইহাকে অতিক্রম করা যায় না, অসার বুঝিলেও ইহাকে ভাঙ্গিতে সাহস হয় না। এ গণ্ডী সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, ভিতরে, বাহিরে সর্ব্বত্র হিমাচলের তুঙ্গ শৃঙ্গ লইয়া দণ্ডায়মান, বিরাটকায় অজগরের ন্যায় ইহার বিশাল বপু সর্ব্বত্র বিজড়িত। ইহার নিকট শাস্ত্র লাঞ্ছিত, যুক্তি-তর্ক পরাভূত, মানবীয় সর্ব্ববিধ চেষ্টা নিষ্ফল। হায় সত্যচরণ, অনাথা বিধবার দুর্ব্বল হৃদয়ে কেন তুমি এই দুর্ভেদ্য গণ্ডী ভেদ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা জাগাইয়া দিলে, যে দুঃখকেই আপনার সারসর্ব্বস্ব বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল, কেন তাহাকে বৃথা সুখের আশ্বাসে বিমুগ্ধ করিলে; নৈরাশ্যের তমোময় গর্ভে চিরনিমগ্ন ব্যক্তির সম্মুখে কেন আশার আলোক আনিয়া ধরিলে। ক্ষুদ্র বিমলা-পতঙ্গ যে এই আলোকরশ্মির প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না, ইহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আপনাকে ভস্মীভূত করিতেও যে সে সাহসী হয় না!

বিমলা হিন্দু-রমণী। হিন্দু-রমণী যে উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে পারে, বিমলাও সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারিত, যদি তাহার ধরিয়া দাঁড়াইবার কিছু থাকিত। কিন্তু বিমলা অন্তরে, বাহিরে, সংসারের সর্ব্বত্র নেত্রপাত করিয়া দেখিল, সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কোথাও একটু তৃণ খণ্ডের অবলম্বনও পাইল না, অন্তর বাহির সব শূন্য, সর্ব্বত্র মরুভূমির বিকট শূন্যতা ধূ ধূ করিতেছে। কোথাও স্মৃতির একটু ছায়ামাত্র নাই, সব শূন্য, সব অন্ধকার। বিমলা আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "ওগো, কোথায় তুমি, কেমন তুমি, জাগ্রতে না হয় স্বপ্নে এস, শুধু স্বপ্নে একবার দেখা দাও, আমি সেই স্বপ্নের ছায়াটুকু লইয়া এই দুর্ব্বহ জীবনভার-বহনের শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইব।"

কেহ আসিল না, কেহ তাহার কাতর আহ্বানের উত্তর দিল না।

সত্যচরণ আসিয়া বলিল, "বিমলা, বিবাহের দিন স্থির।"

বিমলা কাঁদিয়া বলিল, "আপনি কি বিধবার সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বেন না?"

সত্যচরণ হাসিয়া উত্তর দিল, "যদি সর্ব্বনাশ মনে কর, বিবাহের প্রয়োজন নাই।"

বিমলা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে ভাবিয়াছিল, সত্যচরণ তাহার রূপে উন্মাদ হইয়াই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু সত্যচরণের মুখে তাহার বিপরীত উত্তর শুনিয়া একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "প্রয়োজন নাই যদি, তবে এতটা করলেন কেন?"

সত্য। সেটা আমার নির্ব্বুদ্ধিতা।

বিম। এটা কি আপনার রাগের কথা নয়?

সত্য। আমি একটুও রাগি নাই, বিমলা, রেগেছ তুমি।

বিম। অন্যায় কথা বল্লেই মানুষের রাগ হয়।

সত্য। আমি একটুও অন্যায় কথা বলি নাই।

বিম। বিধবাকে বিয়ে করতে বলা কি অন্যায় নয়?

সত্য। অন্যায় মনে হ'লে ও কথা মুখেও আন্তাম না।

বিম। আপনি অন্যায় মনে করতে না পারেন, কিন্তু আমি অন্যায় মনে করি। আমি বিধবা—আবার বিয়ে করলে আমার ধর্ম্মনাশ হবে।

সত্যচরণ মৃদু হাসিল, বলিল, "ধর্ম্ম জিনিসটা এত ভঙ্গুর নয় বিমলা যে, বিয়ে করলেই সেটা ভেঙ্গে যাবে। ও জিনিসটা কিসে ভাঙ্গে, কিসে ভাঙ্গে না, তা বড় বুড় মুনি-ঋষিরাও ঠিক ক'রে যেতে পারেন নি। তুমি আমাদের শিরোমণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর, তিনি উত্তর দিবেন—'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।' সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে ও জিনিসটা কোথায় কোন্ গুহায় যে চাপা প'ড়ে আছে, তা এ পর্য্যন্ত কেহ খুঁজে বের কত্তে পারে নি।"

বিমলা ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিল,—"আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের এত খোঁজাখুঁজির দরকার নাই। আমরা বেদ-পুরাণে যা শুনে আস্‌ছি, তাকেই ধর্ম্ম ব'লে মানি।"

সত্যচরণ বলিল, "সে শুধু তুমি কেন, শিরোমণি চূড়ামণি মহাশয়রাও তাই মেনে চলেছেন। তবে শুনতে পাই নাকি, বেদে গরু খাবার ব্যবস্থা আছে।"

বিমলা নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ছি ছি, আপনি ঘোর নাস্তিক।"

সত্যচরণ হাসিয়া বলিল, "শুধু ঘোর নয়, ঘোরতর—তম পর্য্যন্ত। তা না হ'লে কি বিধবা-বিবাহ করতে চাই?"

বিমলা বলিল, "বিধবা-বিবাহ করতে চান, স্বচ্ছন্দে করুন গে, আমার কাছে কিন্তু আর ও ছাই কথা বলবেন না।"

সত্য। উত্তম, তা হ'লে তুমি হবিষ্য ক'রেই কাটাবে?

বিম। আমার তাই ইচ্ছা।

সত্য। মন্দ ইচ্ছা নয়, তা হ'লে আবার মণখানেক আলো চাল পাঠিয়ে দিই?

বিমলা ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "আপনার পাঠাতে হবে না।"

সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে পাঠাবে?"

বিমলা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "ভগবান্।"

সত্যচরণ মৃদু হাসিল। তার পর স্থির-প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল, "বেশ, ভগবানের উপর এই দৃঢ় বিশ্বাসটুকু যদি রাখতে পার বিমলা, তা হ'লে তোমার বিবাহের আর প্রয়োজন নাই। আমি চল্লাম।"

সত্যচরণ চলিয়া গেল, বিমলা নিশ্চল-নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হায়, এই যুবককে লোকে উচ্ছৃঙ্খল, অধার্ম্মিক, পাষণ্ড বলে? এই পরোপকারী, এই

সংযমী যুবক— বিমলা কি ইহার পদরেণুরও যোগ্য! যে ইহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, সেই ধন্য, তাহারই নারীজন্ম সার্থক। এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের ইন্দ্রিয়-বিজয়ে যে শক্তি, সে শক্তির একাংশও কি বিমলার আছে?

বিমলা দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সজলকণ্ঠে ডাকিল, "ভগবান্! আমি দুর্ব্বলহৃদয়া রমণী, আমায় ক্ষমা কর, রক্ষা কর!"

জমীদারবাড়ীর দাসী বাড়ী ঢুকিয়া বলিল, "ওগো ঠাকরোণ, তোমারই নাম কি, ঐ যে গো কি বলেক তাই? তুমিই তো বিয়ে করতে চেয়েছিলে?"

বিমলা বিস্মিত-দৃষ্টিতে দাসীর মুখের দিকে চাহিল। দাসী বলিল, "নাও, এস, পাল্কী এসেছেক, আমার দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই, চল।"

বিমলা আশ্চর্য্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব?"

দাসী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "কোথায় আবার, কত্তা বাবু নিয়ে যেতে পাল্কী পাঠিয়েছেক, কোথায় আবার, কত্তা বাবুর কাছে।"

শঙ্কিতস্বরে বিমলা বলিল, "কেন?"

দাসী বলিল, "কেন, তা গেলেই বুঝতে পাবেক। তোমার ভাইপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিবেক। কাপড়-চোপড় কিছু নিতে হয় তো নিয়ে পাল্কীতে উঠে পড়।"

বিমলা বলিল, "আমি যাব না।"

দাসী মুখ ঘুরাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "ইস। যাবেক না বল্লেই হ'লো আর কি। মগের মুল্লুক কি না। কত্তা বাবুর হুকুম, দেওয়ান বাবু বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেক।"

সদর-দরজা হইতে দেওয়ান উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ওগো বাছা, বাবু তোমাকে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন। তোমার কোন ভয় নাই, এস।"

"বিয়ে হবেক, তার আবার ভয় কিসের লেগে" বলিয়া দাসী মুখ মুচকাইয়া হাসিল। দেওয়ান বাহির হইতে তাহাকে ধমক দিলেন। বিমলা দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল, তার পর ঘরে চাবী বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গিয়া পাল্কীতে উঠিল।

সড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

হীরুর মা জানিত না যে, বিমলা জমীদারবাটীতে গিয়াছে। সে আপনার ঘরের কাজকর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যার একটু আগে বিমলার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল, ঘরের দরজায় চাবী। ভাবিল, বিমলা গা ধুইতে গিয়াছে। বিমলার পাড়া বেড়ান অভ্যাস ছিল না, কখনো কাহারও বাড়ী বেড়াইতে যাইত না। সুতরাং হীরুর মা তাহার গা ধুইতে যাওয়াই স্থির করিয়া দাবায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, এবং যতই বিমলার ফিরিতে বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সে বিরক্ত হইয়া আপন মনে গজগজ করিতে থাকিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আকাশে দুই একটা নক্ষত্র ফুটিল, ধীরে ধীরে অন্ধকার আসিয়া গাছের মাথা কালো করিয়া দিল, তথাপি বিমলা ফিরিল না। হীরুর মা অধীর হইয়া উঠিল, সে একবার সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়, আবার গিয়া দাবার উপর বসে, আর ভর সন্ধ্যেবেলায় গা ধুইতে যাওয়ায় বামুনের মেয়ের উদ্দেশে অজস্র তিরস্কার করিতে থাকে। শুনিবার কেহ সেখানে না থাকিলেও বিমলা যেন তাহার সম্মুখেই আছে, এমনই ভাবে সে বিমলার উপর তিরস্কার, শেষে কটূক্তি পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইয়া নীরব হইল, তথাপি বিমলা ফিরিয়া আসিল না। হীরুর মা আর থাকিতে পারিল না, সে ছুটিয়া পুকুর-ঘাটে গেল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি ঠাক্‌রোণ, ও দিদি ঠাক্‌রোণ।"

পুষ্করিণীর স্তব্ধ জলরাশি অন্ধকারে কালো হইয়া গিয়াছিল জলের ভিতর দপ-দপ করিয়া তারা জ্বলিতেছিল। গাছের ডালে, বাঁশের ঝোপে ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছিল। হীরুর মা চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি ঠক্‌রোণ গো, ওগো দিদি ঠাক্‌রোণ।"

কেহ উত্তর দিল না, শুধু স্তব্ধ অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা গম্ভীর প্রতিধ্বনি উঠিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। হীরুর মা গালে হাত দিয়া স্তম্ভিতভাবে ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। তাই তো, মেয়েটা গেল কোথায়? কেউ ভুলিয়ে নিয়ে যায় নি তো? না, না, সে ভুলবার মেয়ে নয়। কেউ কি তবে ধ'রে নিয়ে গেল? তা হ'লে সে চীৎকার করতো, আর এমন সন্ধ্যেবেলা গাঁয়ের ভিতর দিয়ে কি কেউ ধ'রে

নিয়ে যেতে পারে? তবে— তবে জলে ডুবে মরে নি তো?

হীরুর মা'র বুকটা দুর্-দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে পুষ্করিণীর জলরাশির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কালো জলের বুকে তারাগুলা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া নাচিয়া উঠিল। হীরুর মা ভয়ে ভয়ে দৃষ্টি ফিরাইয়া ঘাট হইতে ছুটিয়া পলাইল।

বাড়ী ঢুকিয়া হীরুর মা চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি ঠাকুরোণ, ওগো দিদি ঠাকুরোণ।"

শূন্য বাড়ীখানা অন্ধকারে খাঁ খাঁ করিতেছিল, প্রতিধ্বনিতে যেন হো হো শব্দে উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

হীরুর মা বাড়ীর বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসীর গৃহে গেল, এবং তাহারা বিমলার কোন সংবাদ জানে কি না, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হাসিয়াই অস্থির হইল, তার পর হাসিতে হাসিতে বলিল, 'শ্বশুরবাড়ী গেছে গো বুড়ী, সে শ্বশুরবাড়ী গেছে।"

হীরুর মা আশ্চর্য্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্বশুরবাড়ী।"

প্রতিবাসী হাসিয়া উত্তর দিল, "আসল শ্বশুরবাড়ী না হলেও নকল শ্বশুরবাড়ী, হবু শ্বশুরবাড়ী।"

হীরুর মা কিছু বুঝিতে পারিল না। সে অপর এক প্রতিবাসীর কাছে গেল। কিন্তু সেখানেও ইহা অপেক্ষা কঠোর উপহাস ছাড়া আর কোন সদুত্তর পাইল না। হীরুর মা রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল অন্ধকারের ভিতর দাঁড়াইয়া গাছগুলা সর্ সর্ শব্দ করিতেছিল, আশে-পাশে জোনাকী উড়িতেছিল; ঝোপের ভিতর শৃগাল ডাকিতেছিল। সহসা হীরুর মা'র মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাইল, সে ছুটিয়া জমীদার বাড়ীর দিকে চলিল। একে বুড়া মানুষ, তাহাতে অন্ধকার। ছুটিতে ছুটিতে সে কতবার পড়িল, কতবার উঠিল, উঠিয়াই বিমলাকে গালি দিতে দিতে আবার ছুটিতে লাগিল।

জমীদারের কাছারীতে আমলারা তখন আলো জ্বালিয়া হিসাব নিকাশ করিতেছিল। হীরুর মা ছুটিয়া একেবারে কাছারীতে উঠিল, এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা, খোকাবাবু কোথায় গা?"

আমলারা মুখ তুলিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। হীরুর মা ব্যস্তভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা বাবু কোথায় গা বাবা?"

একজন আমলা চোখের চশমা খুলিয়া কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল, "খোকা বাবুকে কেন? খোকা বাবু নাই।"

খোকা বাবু নাই? বিস্মিত-কণ্ঠে হীরুর মা বলিয়া উঠিল, "নাই।"

আমলা বলিল, "না, নাই। হতভাগা মাগী, এখানে এসেছে খোকা বাবুর খোঁজ নিতে।"

হীরুর মা ভয়ে ভয়ে কাছারী হইতে পলাইয়া আসিল। বাড়ী ঢুকিতে গেল, কিন্তু দরোয়ান বাধা দিল। হীরুর মা তাহাকে খোকা বাবুর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে দরোয়ান বলিল, "খোকা বাবু এ বাড়ীতে নাই, তার বাড়ী ঢোকবার হুকুম নাই, কা'ল হ'তে সে বাড়ী আসে না।"

অগত্যা হীরুর মা জমীদারবাড়ী ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া চলিল। এবারে আর সে দ্রুত চলিল না, ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চলিল। সারা পথ ভাবিয়া ভাবিয়া সে বিমলার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন স্থির-সিদ্ধান্ত করিল, "আর কিছু নয়, ছুঁড়ীকে নিয়ে ছোঁড়া উধাও হয়েছে। বিয়ের কথা সব মিছে, দু'জনে এত দিন পালাবার মতলব আঁটছিলো। তা নৈলে ভদ্দর ঘরের ছেলে কি নিকে করে? কি দমবাজ এই ছোঁড়াটা, আর ছুঁড়ীটারও পেটে পেটে এত বুদ্ধি! চুলোয় যাক্, তবে শেষে ছুঁড়ীটা অকূলে না ভাসে।"

বাড়ী ঢুকিয়া হীরুর মা অন্ধকারে দাবার উপর বসিয়া পড়িল, এবং গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে বলিয়া উঠিল, "মর ছুঁড়ী, গেলি গেলি, তা আমাকে একটা কথা ব'লে গেলি না? আমি কি তোর এতই মন্দকারী!"

বুড়ীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। সে আঁচল বিছাইয়া দাবার উপর শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া আপন মনে বকিল, "যদি ঘুণাক্ষরেও একটু জান্‌তে পাত্তাম, তা হ'লে এমন তো শুনিয়ে দিতাম না! হয় না কেন বাবুনের মেয়ে, মুড়ো খেংরায় তার পীরিতের বিষ ঝেড়ে দিতাম। এমন হীরুর মা নই আমি, হ্যাঁ।"

আপন মনে গজ-গজ করিতে করিতে বুড়ী ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই হীরুর মা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং অভ্যাসমত ডাকিল, "দিদি ঠাক্‌রুণ!"

সহসা ঘরের তালার দিকে নজর পড়িতেই হীরুর মা চমকিয়া উঠিল, সে দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইল।

পথে কান্তর পিসী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও হীরুর মা, তোর দিদি ঠাক্‌রুণকে খুঁজে পেলি ?"

হীরুর মা রুদ্ধস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ গো মা, তাকে আবার খুঁজে পাব।"

কান্তর পিসী হাসিয়া বলিল, "গেল কোথায় ?"

হীরুর মা সগর্জ্জনে বলিল, "চুলোয়, যমের বাড়ী।"

কান্তর পিসী আস্তে আস্তে ডান হাতটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সেখানে যায় নি হীরুর মা, শ্বশুরবাড়ী গেছে।"

"যমের বাড়ী গেছে" বলিয়া হীরুর মা গোঁভরে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। পথে সত্যচরণের সহিত তাহার দেখা হইল। সত্যকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল; ভাবিল, ছোঁড়া যদি রইল, তবে ছুঁড়ী কোথায় গেল ? কিন্তু এ সব বিষয়ে বুড়ীর অভিজ্ঞতা খুব বেশী। সে জানিত, এরূপ হলে যুগলে একসঙ্গে যায় না, যাইলে লোকের মনে সন্দেহ হয়। এজন্য লোক দিয়া বামাকে আগে সরাইয়া দেয়, তার পর বাবু সাধু পুরুষের মত আস্তে আস্তে নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হয়। সুতরাং সত্যচরণকে দেখিয়াও তাহার রাগের কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইল না, বরং রাগ একটু বাড়িল। সে চড়া গলায় সত্যচরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা বাছা, তোমার এই কাজ ?"

সত্যচরণ বলিল, "কি কাজ হীরুর মা ?"

হীরুর মা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিল। তার পর হাত নাড়িতে নাড়িতে উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "দেখ বাছা, মনে ক'রো না তুমি বামুন, আর জমীদারের ছেলে ব'লে হীরুর মা ভয়ে কথা কইবে। হীরুর মা সে মেয়েই নয়।"

একটু বিস্ময়ের সহিত সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "নয়, তা তো জানি। কিন্তু হয়েছে কি ?"

সত্যচরণের এই ন্যাকামো দেখিয়া হীরুর মা আরও চটিয়া গেল। সে সত্যচরণের মুখের কাছে হাত দুইটা নাড়িয়া বলিল, "ওগো বাবু, আর তোমার সাধুগিরি ফলাতে হবে না। গলায় দড়ি দাও গে। শুধু তুমি নয়, ছুঁড়ীকেও দিতে ব'লো।"

হীরুর মা গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল; সত্যচরণ ডাকিল, "হীরুর মা !"

হীরুর মা দাঁড়াইল। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোর এত রাগ কেন হীরুর মা ?"

"কেন ?" আহতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া হীরুর মা বলিল, "কেন ? তুমি ভদ্দর ঘরের ছেলে, তুমি কি বুঝবে আমার রাগ কেন। আমি যে এত কাল তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলাম, আর আজ কি না সে আমাকে একটা কথা না ব'লে চ'লে গেল। বাগ্দীর মেয়ে ব'লে আমার কি মায়া-মমত্ব কিছুই নেই ?"

কথা কহিতে কহিতে হীরুর মা'র গলা ক্রমেই ভারী হইয়া আসিল। সে সত্যচরণের মুখের উপর একটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

"তোমারই নাম বিমলা ?"

বিমলা নতমুখে মস্তক সঞ্চালন করিল। তরঙ্গিণী বলিল, "এই তোমার রূপ ? এই রূপের জন্য সত্য বাবু উন্মাদ ?"

বিমলা লজ্জারক্ত মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তরঙ্গিণী বলিল, "আমার চেয়েও কি তুমি নিজেকে সুন্দরী মনে কর ?"

বিমলা মৃদুস্বরে সবিনয়ে বলিল, "আমি আপনার পায়ের ধুলার যোগ্য নই।"

ঈষৎ গর্ব্বের হাসি হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "অতটা বাড়িয়ে ব'লো না। আমার মত না হ'লেও তোমাকে সুন্দরী বলা যায়।"

বিমলা বলিল, "আপনি রাজরাণী, আমি ভিখারিণী।"

তরঙ্গিণী বলিল, "রূপ রাজরাণী ভিখারিণী বিচার করে না। অনেক ভিখারিণীর কাছে রাজরাণী কালপেঁচা।"

বিমলা নিরুত্তরে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তরঙ্গিণী বলিল, "তা বাছা, একটু রূপ আছে ব'লেই যে বিধবা মেয়েকে আবার বিয়ে করতে হবে, এমন বিধান কোন শাস্ত্রে নাই।"

বিমলা নীরবে মৃদু হাস্য করিল। তরঙ্গিণী বলিল, "পুরুষমানুষ যেন অবুঝ, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে তুমি

কি রকমে এমন কাজ কর্‌তে চেয়েছিলে বাছা? বিয়ে কর্‌লে কি তোমার ভাল হ'তো?"

বিমলা বলিল, "কি জানি।"

তরঙ্গিণী ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কি জানি কি? তুমি কি জান না যে, মেয়েমানুষের স্বামিই সর্ব্বস্ব, ইহকাল পরকাল। সেই স্বামীকে ছেড়ে তুমি আবার বিয়ে কর্‌তে গেলে?"

বিমলা বলিল, 'আমার স্বামী নাই।"

ক্রুদ্ধস্বরে তরঙ্গিণী বলিল, "তোমার এই চামড়ার চোখের সামনে নাই, কিন্তু মনের ভিতর যে চোখ আছে, সেই চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাবে।"

বিম। স্বামীকে আমার মনে পড়ে না, কখন তাঁর মুখ দেখি নাই।

তর। দেবতাকে কেউ কখন দেখে নাই, তবে লোকে দেবতার রূপ ধ্যান করে কিরূপে?

বিম। কল্পনায়।

তর। তুমিও কি কল্পনায় স্বামীর একটা রূপ খাড়া ক'রে তার ধ্যান কর্ত্তে পার না?

বিম। কল্পনায় সে রূপ ধারণা কর্ত্তে পারি না।

তর। বিয়ের ধারণা কর্ত্তে পার, আর স্বামীর রূপ ধারণা কর্ত্তে পার না?

বিমলা নীরব। তরঙ্গিণী তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিল, "তুমি কি হিঁদুর মেয়ে নও? তোমার কি নরকের ভয় নাই?"

বিমলা বলিল, "আমার জীবনই যে নরক।"

তরঙ্গিণী বলিল, "এ নরক তুচ্ছ, এর চেয়েও ভীষণ নরক আছে।"

বিমলা বলিল, "আগুনের আর অল্প বা বেশীতে কি তফাৎ? আগুনমাত্রেই পুড়িয়ে মারে।"

গর্জ্জন করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "দেখছি, পুড়ে মরাই তোমার অদৃষ্টে আছে।"

বিমলা বলিল, "অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে?"

রাগে চক্ষু কপালে তুলিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "যম পারে।"

বিমলা সহাস্যে বলিল, "সত্য?"

তরঙ্গিণী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বিমলার মুখের দিকে চাহিতেই ক্রোধের পরিবর্ত্তে তাহার মনে বিস্ময়ের ভাব জাগিয়া উঠিল। সে বিমলার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে পরিহাস কচ্চো?"

বিমলা উত্তর করিল, "কি পরিহাস?"

তরঙ্গিণী বলিল, "এই বিয়ের কথা? সত্যই কি এই বিবাহে তোমার মত আছে?"

বিমলা মুহূর্ত্তকাল নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর কাঁপিতে কাঁপিতে তরঙ্গিণীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "না মা, আমি হিঁদুর মেয়ে, বামুনের মেয়ে, বিধবা, আমি কেন বিয়ে ক'রে ইহকাল পরকাল নষ্ট কর্‌বো মা?"

বিমলার দুই চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। তরঙ্গিণী হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিল, স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে বলিল, "আমি না বুঝে তোমাকে অনেক রূঢ় কথা বলেছি, আমায় মাপ কর বাছা।"

রোদনজড়িত-কণ্ঠে বিমলা বলিল, "তুমিই আমাকে মাপ কর মা, আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস ক'র্‌ছি।"

তরঙ্গিণী আপনার আঁচল দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিল। বিমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। তরঙ্গিণী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'থাক বাছা, আমাকে আর গড় কর্ত্তে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার বয়সের বেশী তফাৎ নাই।"

বিমলা বলিল, "বয়সে তফাৎ না থাক্‌লেও আপনি মানে বড়।"

তরঙ্গিণী সহাস্যে বলিল, "ছাই মান! আমি কিন্তু বাছা তোমার উপর খুব রেগেছিলাম। মনে মনে তোমাকে কত গালও দিয়েছি।"

বিমলা মৃদু হাসিল; বলিল, "আমার মত পোড়ারমুখীকে কে গাল না দেয় মা!"

তরঙ্গিণী বলিল, "বালাই, যে তোমাকে না চিনে, সেই গাল দেয়।"

বিমলা একটু ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিল। যষ্ঠী আসিয়া তরঙ্গিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হ্যাদে মা, তুমি এনার সাথে গল্পে মেতেছ, ও দিকে যে কর্ত্তা বাবু তোমাকে ডাক্‌তি নেগেচে।"

তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

যষ্ঠী ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "কেনে আবার কি গা? অসুখ মানুষ, একটু কাছে বস্‌বে, গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দেবে, দুটো ভাল মন্দ বাক্যি কইবে, তা নয়, তুমি বাঁরে বাঁরে বেড়াচ্ছ।"

সহাস্যে তরঙ্গিণী বলিল, "তুই তো ভাইনে আছিস্, একটু কাছে বস্‌লে তো পারিস্?"

যশী গালে হাত দিয়া আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিল, "হাদে মা, তুমি কেমনতর মেয়েমানুষ গা? আমরা কাছে বস্‌লে হয়? হাজার হোক আমরা দাসী বাঁদী।"

তরঙ্গিণী বলিল, "আর আমিই সত্যপীর না কি যে, কাছে বস্‌লেই অসুখ সেরে যাবে?"

যশী বলিল, "বাপ্ রে মা, তোমাতে আর আমাতে? তুমি হ'লে গিন্নি। আমাদের কর্ত্তার যখন অসুখ-বিসুখ কর্‌তো, এক তিল ঘর ছাড়্‌বার যো ছিল না। শাশুড়ী-ননদ সব ছিল, কিন্তু কেউ কাছে গেলে পছন্দ হতো না, রাগে চেঁচিয়ে বাড়ী ফাটিয়ে দিত। আমি যদি বল্‌তুম, হাগা, ঠাক্‌রুণ তো কাছে ছিল, তবে এত রাগ কচ্ছিলে কেন? তা হ'লে বল্‌তো কি জান, দেখ যশোদা, তোমার হাতখানা বুকে রাখ্‌লে বুকটা যেন ঠাণ্ডা হয়, মা-ই বল আর বোনই বল, ওদের হাত কি এমন নরম? যেন আধপোড়া বেঁখারির মত।"

বিমলা মুখে আঁচল চাপা দিল। তরঙ্গিণী হাসি চাপিয়া বলিল, "তোর হাতটা যখন এত নরম, তখন সেটা একবার তোর বাবুর বুকে বুলিয়ে দিস্ না কেন?"

যশোদা বলিল, "ও কি কথা মা, আমি দিলে কি হবে? বলে—যার যে তার সে। আর আমারই কি সে হাত আর আছে, বাসন মেজে, ঝাঁটা ধ'রে বেথার হয়ে গেছে।"

তরঙ্গিণী বলিল, "তোর কর্ত্তা নাকি তোকে খুব ভালবাস্‌তো?"

যশোদা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভালবাসা! সে কথা আর কইও নি মা, উঠে বস্‌তে দিত না। একটা কাজকর্ম্ম কর্ত্তে গেলে বল্‌তো, কেন যশোদা, মা আছে, দিদি আছে, কাজ কর্‌বে তারা, পরের মেয়ে তুমি, তোমাকে কি গতর-খাটিয়ে খেতে এনেছি? হায় মা, এমন মানুষ ছিল যে, এক দিনের তরে একটা উঁচু কথা কয় নি, সদাই যেন তটস্থ। তবে এক দিনের কথা বলি, শোন।"

অপর্ণা ডাকিল, "নতুন মা!"

"যাই মা" বলিয়া তরঙ্গিণী ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল, শ্রোত্রীর এরূপ আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে যশোদা কিছু দুঃখিত হইল। কিন্তু বিমলা ছিল। সুতরাং সে জাঁকিয়া বসিয়া বিমলার নিকটেই স্বামীর অগাধ ভালবাসার কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল, বলিতে বলিতে যশোদা এক একবার আঁচল দিয়া শুষ্ক চক্ষু মুছিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

দেশের ডাক্তার কবিরাজ সব আসিয়া জড় হইল, কিন্তু তারিণী বাবুর রোগের কিছুমাত্র প্রতীকার হইল না। অপর্ণা কলিকাতা হইতে সাহেব ডাক্তার আনাইল, দেশ-বিদেশের নামজাদা বড় বড় কবিরাজদের ডাকাইল, কিন্তু পিতার রোগশান্তির লক্ষণ কিছু দেখিল না। অপর্ণা বড় অস্থির হইয়া পড়িল, এবং গ্রামের বুড়া কবিরাজ মৃত্যুঞ্জয় বিশারদকে ডাকাইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ ডাক্তার বা কবিরাজকে আনা উচিত। বুড়া কবিরাজ বলিলেন, "বৃথা চেষ্টা মা, জীবমাত্রেই যে ব্যাধির অধীন, এবং যে ব্যাধির কোন ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, এ সেই ব্যাধি। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরিও এ ব্যাধির হাত এড়াতে পারেন নি।"

অপর্ণা রাগিয়া ধন্বন্তরিকে গালি দিল, বুড়াকে তিরস্কার করিল, বুড়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, অপর্ণা ঠাকুরঘরে গিয়া রাধাবল্লভের সম্মুখে মাথা কুটিতে কুটিতে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "ঠাকুর, শুনেছি, তোমার নামে যমও ভয়ে পলায়। তুমি বাবাকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর, আমি বুক চিরে তোমার পায়ে রক্ত দেব।"

পাষাণ-বিগ্রহ নীরবে রহিল। শুধু অদৃষ্ট-দেবতা অলক্ষ্যে খল্-খল্ হাসিয়া উঠিল।

তারিণী বাবু আপনার অবস্থা বেশ বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। উইল করা হইয়া গেল, জমীদারীর ব্যবস্থা হইল, যাহাকে যাহা দিবার দিলেন, কর্ম্মচারীদিগকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিলেন। এই সকল শেষ কার্য্য করিয়া তিনি আসন্ন-মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তারিণী বাবু ভাবিয়াছিলেন, এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া তিনি শান্তচিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না, মনে শান্তি তো আসিল না। অশান্তির প্রধান কারণ জমীদারী

যে জমীদারীকে তিনি এতকাল বুক দিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, যাহার চিন্তায় তিনি সময়ে সময়ে আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতেন, অন্যায়কে ন্যায় করিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না, সেই সযত্ন-রক্ষিত বিপুল সম্পত্তি তাঁহার অবর্ত্তমানে কে রক্ষা করিবে! তরঙ্গিণী, অপর্ণা উভয়েই স্ত্রীলোক, শুধু স্ত্রীলোক নহে, বালিকা বলিলেই হয়। কর্ম্মচারীরা বিশ্বাসী বটে, কিন্তু লোভের নিকট বিশ্বাস কতক্ষণ স্থায়ী হয়? এত কাল তিনি স্বয়ং সকল দিক্ দেখিয়া আসিতেছিলেন, কাজেই অন্ততঃ ভয়ে ভয়েও সকলে বিশ্বাসী হইয়া ছিল। কিন্তু সুযোগ পাইলে তাহারা যে বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না, এ কথা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? তখন টাকাকড়ি সকলে ভাগ-বাঁটরা করিয়া লইবে, মহালের পর মহাল নীলামে উঠিবে। শেষে যে স্ত্রীকন্যাকে তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া যাইতেন, তাহারা হয় তো কপর্দ্দকবিহীন হইয়া পথে দাঁড়াইবে। চৌধুরী-বংশের মান-সম্ভ্রম, নাম, যশ সব লোপ পাইবে। সে কি ভয়ানক দুর্দ্দিন? সে দিনের কথা মনে করিতেও তারিণী বাবু শিহরিয়া উঠিলেন!

কিন্তু উপায় কি! এমন আর কে আছে, যাহার হাতে তিনি আপনার সকল মমতার আধার এই জমীদারীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে ইহলোক ত্যাগ করিতে পারেন? কে এমন তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র, সম্পত্তির যোগ্য অধিকারী আছে, যে তাঁহার সকল কীর্ত্তি, সকল গৌরব, সকল প্রভাব বজায় রাখিতে পারিবে? কেহই নাই। তারিণী বাবু উদ্বেগকাতর-চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেন, এমন কেহই নাই। তাঁহার অস্থির চিত্ত যেন আরও অধীর হইয়া উঠিল। হায়, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাঁহার সকল কীর্ত্তিই বিলুপ্ত হইবে? একবার ভাবিলেন, হয় হউক; যখন সঙ্গেই যাইতেছি, তখন আর এ সকল থাক্ যাক্, তাহাতে আমার কি? মানুষের জীবনই যখন অস্থায়ী, তখন তুচ্ছ বিষয় যে স্থায়ী হইবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। সুতরাং এখন এই তুচ্ছ জমীদারীর মায়া ত্যাগ করিয়া মহামায়ার চরণ চিন্তা করাই কর্ত্তব্য।

তারিণী বাবু কিন্তু সে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন না; মন কিছুতেই বশে আসিল না। ক্রমেই অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন, মৃত্যুশয্যা যেন কণ্টকশয্যা হইল। হায় ঐশ্বর্য্য! তুমি জীবনে মরণে সমান অশান্তি!

অনেক ভাবিয়া শেষে তারিণী বাবু দেওয়ানকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যচরণ এ বাড়ীতে আসে না কি?"

দেওয়ান বলিল, "না।"

তারি। কেন?

দেও। তাঁকে বাড়ী ঢুকতে দেওয়া আপনার নিষেধ ছিল।

ভ্রূকুটি করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "হাঁ, সে বাড়ী ঢুক্‌লে দরোয়ান দ্বারা গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবার হুকুম দিয়েছিলাম বটে।"

দেওয়ান কোন উত্তর করিতে পারিল না। তারিণী বাবু বলিলেন, "আগে দেখ্‌তাম, অনেক কাজের কথাও তোমার মনে থাকতো না, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, যত বয়স হচ্ছে, তত তোমার স্মরণ-শক্তিটা বেড়ে উঠছে।"

দেওয়ান নীরবে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "যাক্, এখন তাকে এখানে আন্‌তে পারবে?"

দেওয়ান বলিল, "আপনার হুকুম হলেই পারি।"

তারিণী বাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "হাঁ হাঁ, হুকুমই হয়েছে। এর জন্য আবার হুকুমনামা লিখে দিতে হবে না কি?"

দেওয়ান ব্যস্তভাবে উঠিয়া গমনোদ্যত হইল। তারিণী বাবু বলিলেন, 'শোন, কি ব'লে আনবে?"

দেওয়ান বলিল, "আপনি ডাক্‌ছেন, এই ব'লে।"

বিরক্ত-কণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "আমি ডাক্‌ছি? কেন, তাকে ডাকিয়ে এনে আমার কি স্বর্গলাভ হবে? সে হতভাগা ছোঁড়া কি আমার পরকালে মুক্তির রাস্তা দেখিয়ে দেবে?"

প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া দেওয়ান ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "এই বুদ্ধি নিয়ে তোমরা জমাদারী চালাবে? শোন, হাজার হ'ক ভাইপো, এ সময়ে যদি একবার আসে, তবে তাকে বিষয়ের কিছু দিয়ে যেতে পারি, ভাবটা এই, বুঝলে?"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দেওয়ান চলিয়া গেল। তারিণী বাবু আপন মনে হাসিয়া বলিলেন, "ও

ছোঁড়াকে তাড়াতে পারলে তোমাদেরই পোয়া বারো, তা কি আমি বুঝতে পারি না ?"

দেওয়ান চলিয়া গেলে তরঙ্গিণী ঘরে ঢুকিল। তারিণী বাবু ডাকিলেন, "নতুন বৌ।"

তরঙ্গিণী স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তর দিল, "কি ?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "তুমি অর্দ্ধেক বিষয়ের মালিক।"

তরঙ্গিণী নীরবে নত-নেত্রে বসিয়া রহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "কিন্তু নতুন বৌ, বিষয় রাখতে পারবে ?"

তরঙ্গিণী নিরুত্তর। একটু স্থির থাকিয়া তারিণী বাবু ডাকিলেন, "আচ্ছা, নতুন বৌ।"

তরঙ্গিণী মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, বিষয়টা - এই জমীদারী, টাকাকড়ি যা কিছু সব যদি সত্যকে দিয়ে যাই ?"

তরঙ্গিণী বলিল, "খুব ভাল হয়।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "ভাল যে খুব হয়, এমন কথা বলা যায় না, তবে সম্পত্তিটা বজায় থাকতে পারে।"

তরঙ্গিণী বলিল, "সেটা কি ভাল নয় ?"

তারিণী বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, "এক দিকে ভাল বটে, কিন্তু অন্য দিকে --তোমাকে যদি ফাঁকি দেয় ?"

তরঙ্গিণী বলিল, "ফাঁকি—আমাকে আর কি ফাঁকি দেবে ? বিষয় ? বিষয় নিয়ে আমার কি হবে ?"

একটু বিস্ময়ের সহিত তারিণী বাবু বলিলেন, "বিষয় নিয়ে কি হবে ? বিষয় তুমি চাও না ?"

সহসা তরঙ্গিণী মুখ তুলিয়া দৃঢ়-সতেজ-কণ্ঠে বলিল, "চাই। কিন্তু এ রকম আধাআধি চাই না।"

তারিণী বাবু মুহূর্ত্তকাল হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "সব চাও ?"

জোর গলায় তরঙ্গিণী উত্তর দিল, "হাঁ, সব।"

একটু ভাবিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "কিন্তু রাখতে পারবে ?"

তর। সে পরের কথা। অনেক পুরুষেও তো বিষয় রাখতে পারে না। আবার অনেক মেয়েমানুষের বিষয়-বুদ্ধির কাছে পুরুষকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

তারি। যেমন রাণী রাসমণি, মহারাণী স্বর্ণময়ী ; কিন্তু তুমি কি আপনাকে তাদেরই একজনের মত মনে কর ?

তরঙ্গিণী কোন উত্তর করিল না। তারিণী বাবু তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া শুইয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বলিল, "তবে এক কাজ কর, সত্যচরণকে সব সম্পত্তি দিয়ে যাও।"

সহসা মর্ম্মস্থলে সূচী বিদ্ধ হইলে লোকে যেরূপ শিহরিয়া উঠে, তারিণী বাবু সেইরূপ শিহরিয়া উঠিয়া ঘাড় ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাকে দেব কেন ?"

তরঙ্গিণী বলিল, "তা হ'লে সম্পত্তিটা নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে না।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্রূপের এমন একটু কঠোর হাসি হাসিল, যাহা তারিণী বাবুর অন্তরে গিয়া বিদ্ধ হইল। তারিণী বাবু দ্রুত পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া উগ্র-বিচলিত-কণ্ঠে বলিলেন, "সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে। ও হতভাগা ছোঁড়ার উপর আমার একটুও বিশ্বাস নাই। ও যদি মানুষ হ'তো—"

তর। তা হ'লে কি হ'তো ?

তারি। কি হ'তো ? তা হ'লে মরবার সময় আজ আমাকে রাবণের চিতা বুকে নিয়ে মরতে হ'তো না। তুমি জান না নতুন বৌ, ও ছোঁড়া আমার সর্ব্বনাশ করেছে, তোমার সর্ব্বনাশ করেছে, নিজের সর্ব্বনাশ করেছে। আমি ওকে একটি পয়সাও দিয়ে যাব না।"

তারিণী বাবু পাশ ফিরিয়া অবসন্নভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তরঙ্গিণী সন্তর্পণে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেওয়ান ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, সত্যচরণ আসিতে সম্মত নহে। ভ্রূকুটি করিয়া তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, সমস্ত বিষয়টা পাবে না, সেই রাগে বুঝি।"

দেওয়ান বলিল, "না। তিনি বলেন, জ্যেঠামশায়ের কাছে স্নেহ ভিক্ষা করতে যেতে পারি, কিন্তু বিষয় ভিক্ষা করতে যাব না।"

মৃদু হাসিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "হুঁ, খুব উঁচু

মেজাজের কথা বটে। আমি কি তাঁকে বিষয় দেবার জন্য হাত ধুয়ে ব'সে আছি যে, তিনি একবার এসে দর্শন দিলেই জমীদারীটা তাঁকে দিয়ে দেব ?"

দেও। বলেন—এখন গেলে সকলেই মনে করবে, জ্যেঠামশায়ও ভাবিতে পারেন, বিষয়ের লোভেই এসেছে। সম্পত্তির বন্দোবস্ত আগে হয়ে যাক্, তার পর গিয়ে জ্যেঠামশায়ের পায়ে ধ'রে মাপ চাইব।

গম্ভীরকণ্ঠে "হুঁ" বলিয়া তারিণী বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। একটু অপেক্ষা করিয়া দেওয়ান ধীরে ধীরে বলিল, "বাচস্পতি মশায় এসেছেন।"

চক্ষু মেলিয়া তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

দেওয়ান উত্তর করিল, "তাঁর ভাইঝির বিবাহ। বিবাহের খরচ দিবার কথা ছিল।"

চমকিত হইয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "বিবাহ কবে ?"

দেওয়ান বলিল, 'আজ।"

তারিণী বাবু বিকৃত মুখভঙ্গী করিলেন। একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।"

দেওয়ান চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরে বাচস্পতিকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। তারিণী বাবু বাচস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌরীর বিবাহ কবে ?"

বাচস্পতি বলিলেন, "আজ।"

তারি। একেবারে আজ ? বেশ সুপাত্র পেয়েছেন ?

বাচ। সুপাত্র না হ'লেও নিতান্ত কুপাত্র নয়।

তারি। সত্যচরণের চেয়ে বোধ হয় ভাল ?

বাচ। সত্যচরণকে স্বামিরূপে লাভ করবার অদৃষ্ট গৌরীর নাই।

তারি। সেটাকে কি আপনি তার শুভাদৃষ্ট মনে করেন না ?

বাচ। আমি তার নিতান্ত দুরদৃষ্ট ব'লেই বোধ করি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "ও ছোঁড়ার বিধবা-বিবাহের পরিণামটা শুনেছেন বোধ হয়।"

বাচস্পতি বলিলেন, "শুনেছি, আপনি সেই অনাথা বিধবাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছেন।"

তারি। কাজেই। কেউ যখন তাকে আশ্রয় দিলে না, একটা উচ্ছৃঙ্খল যুবক তার ইহকাল পরকাল নষ্ট করতে উদ্যত হ'ল, তখন অগত্যা বাড়ীতে একটু ঠাঁই দিতে বাধ্য হ'লাম।

বাচ। আপনি মহত্তের কাজই করেছেন।

তারি। মহত্তের কাজ না হ'লেও মানুষ হয়ে এত বড় অন্যায়টা কেউ কখন সহ্য করতে পারে না। কাজেই সত্যর মনে কষ্ট হ'লেও—

বাধা দিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "তার মনে একটুও কষ্ট হবে ব'লে বোধ হয় না, এজন্য সে বরং আনন্দিত হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "মানুষের মন দেবতার অগোচর। তবে সঙ্কল্পে বাধা পেলে লোকে যে আনন্দিত হয়, এ কথাটা যেন নূতন শুনলাম।"

বাচস্পতি বলিলেন, "তার যদি শুধু বিধবা-বিবাহের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প থাকতো, তা হ'লে কথাটায় নূতনত্ব বোধ হতো। কিন্তু সে শুধু সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, সে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র।"

মুহূর্ত্তের জন্য তারিণী বাবুর মুখখানা গর্ব্বে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাহা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। একটু নীরবে থাকিয়া তারিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর আজই বিবাহ ?"

বাচস্পতি বলিলেন, "হাঁ।"

"উত্তম" বলিয়া তারিণী বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে পুনরায় চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আর কোন বক্তব্য আছে ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাচস্পতি বলিলেন, "এই বিবাহের সমগ্র ব্যয় দিতে—"

তারিণী বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম। কিন্তু মাপ করবেন বাচস্পতি মশায়, আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলাম না।"

বাচস্পতি শিহরিয়া উঠিলেন; দেওয়ান বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। তারিণী বাবু পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ভাবছেন কি ? ইহাও কি সম্ভব ? তারিণী চৌধুরী কি অমন কাজ করতে পারে ? কিন্তু মানুষের এমন একটা সময় আসে, যখন তার জীবনের সকল ঘটনাই ওলট-পালট হয়ে যায়, যা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমন কাজকে খুব সহজ ভাবেই সম্ভব ক'রে ফেলে। আমারও এখন সেই

অবস্থা। আমি এ বিবাহে একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব না।”

শঙ্কাজড়িত-কণ্ঠে বাচস্পতি বলিলেন, “রক্ষা করুন, মেয়ের গাত্রহরিদ্রা, অধিবাস পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে। আজ তাকে সম্প্রদান কর্‌তে না পার্‌লে—”

বাধা দিয়া তারিণী বাবু কঠোর-স্বরে বলিলেন, “আপনার জাতি-ধর্ম্ম সব যাবে, এই তো? কিন্তু আমার—আমার কি যাবে জানেন? যাক্‌, যাকে টাকা দিতে হবে না, এমন একটি পাত্র দেখে আপনি গৌরীকে সম্প্রদান করুন, আমি একটি পয়সাও দেব না।

তার পর দেওয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কাল একখানা নূতন উইল লিখতে হবে, প্রস্তুত হয়ে এসো।

বাচস্পতি ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দেওয়ানের সহিত বাহিরে চলিয়া গেলেন। তারিণী বাবু দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া স্থিরভাবে পড়িয়া রহিলেন।

অপর্ণা ঘরে ঢুকিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, “কি কর্‌লে বাবা?”

তারিণী বাবু স্থির দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন, “কি করেছি অপি, ব্রাহ্মণকে আশা দিয়ে নিরাশ করেছি? কিন্তু নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে অপি, আমি পাষাণ নই, মানুষ, আমার এই বুকটা লোহা দিয়ে তৈরী নয়, এর ভেতরেও—”

তারিণী বাবু আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার দুই চোখ দিয়া হু হু জল গড়াইয়া পড়িল। অপর্ণা বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পিতার অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

হীরুর মার কথা শুনিয়া সত্যচরণ প্রথমে খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তার পর অনুসন্ধানে যখন জানিতে পারিল, বিমলা তারিণী বাবুর নিকট আশ্রয় পাইয়াছে, তখন সে বিমলার সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু এই নিশ্চিন্ততাটুকুর মধ্যেও তাহার মনের ভিতর কোথায় যেন একটু বাধিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়াও সত্যচরণ তাহার কারণটুকু স্থির করিতে পারিল না। সে যে বিমলার রূপের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বা তাহাকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এ কথাটা সে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিল না। অনাথা বিধবার উপর সহানুভূতির প্রাবল্যেই যে তাহার এই আগ্রহ, ইহাই সে জানিত। সেই বিধবা যখন উপযুক্ত স্থানে আশ্রয় পাইল, তখন তাহার জন্য দুঃখ করিবার আর কি থাকিতে পারে? তথাপি কেন যে একটু দুঃখ—একটু বেদনা আসে, তাহা সত্যচরণ বুঝিতে পারিল না।

ভাবিতে ভাবিতে সত্যচরণ বাচস্পতি মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। সে দিন গৌরীর বিবাহ; বাড়ীতে উৎসবের কোলাহল চলিতেছিল। গৌরী হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া হাতে সূতা বাঁধিয়া সহাস্যমুখে ঘুরিতে ফিরিতে ছিল। সত্যচরণ বাড়ী ঢুকিতে যাইতেছিল, কিন্তু গৌরীকে দেখিয়াই ফিরিবার উপক্রম করিল। গৌরী ডাকিল, “সত্যদা।”

সত্যচরণ ফিরিয়া দাঁড়াইল। গৌরী উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল, “চ'লে যাচ্ছ যে?”

বাচস্পতি মহাশয়ের গৃহিণী ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে রে গৌরি?”

গৌরী বলিল, “সত্যদা। ঐ দেখ না, পালিয়ে যাচ্ছে।”

অগত্যা সত্যচরণকে বাড়ী ঢুকিতে হইল। বাড়ী ঢুকিয়া, গৌরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “হাঁ, পালিয়ে যাচ্ছি, তোর ভয়ে।”

গৃহিণী ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, “এস বাবা এস।

তার পর গৌরীকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্য তিরস্কারের সহিত বলিলেন, “পালাবে কেন লা, ও তো ঘরের ছেলে।”

মৃদু হাসিয়া গৌরী বলিল, “ঘরের ছেলেও মাঝে মাঝে পর হয় কি না।”

সত্যচরণ ভ্রূকুটী করিল, গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “দেখুন, গৌরী বড় জ্যেঠা হয়ে পড়েছে।”

গৌরী হাসিতে হাসিতে বলিল, “এত পড়াশুনা ক'রে ব্যাকরণ ভুল ক'রো না সত্যদা, জ্যেঠা নয়, জেঠী বল।”

গৃহিণী হাসিয়া উঠিলেন। সত্যচরণও হাসিল, কিন্তু সে হাসি কেবল প্রাণশূন্য কাষ্ঠহাসি মাত্র। গৌরী

তাহা লক্ষ্য করিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া একবার বক্র কটাক্ষে সত্যচরণের দিকে চাহিল। তার পর সহাস্যে বলিল, "তোমার নেমন্তন্ন সত্যদা।"

গৃহিণী বলিলেন, "ভাগ্যে তুই নেমন্তন্ন কর্‌লি, নয় তো সত্য আস্‌তো না।"

ঘাড় দোলাইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া গৌরী বলিল, "হাঁ আস্‌তো বৈ কি, কক্ষণো না

গৃহিণী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "না, আস্‌তো না হতভাগা মেয়ে!"

গৌরী জোরে মাথা নাড়িয়া, মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া জোর গলায় বলিল, "আমি হত-ভাগা মেয়ে বৈ কি। কে হতভাগা, তা জিজ্ঞাসা কর।"

গৌরী দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। গৃহিণী তাহার গমনপথের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মেয়েটা যেন কি। পাগলও নয়, মানুষও নয়। মা-বাপমরা মেয়ে ব'লে উনি কখনো একটা চড়া কথা পর্য্যন্ত বল্‌তে দেন না। কিন্তু এর পর পরের ঘরে গিয়ে কি যে কর্‌বে, তাই ভাবি।"

সত্যচরণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহিণী বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা, ব'স না।"

সত্যচরণ বলিল, "এখন আসি মা, এর পর আস্‌বো।"

সত্যচরণ বাটীর বাহির হইয়া ধীরে ধীরে চলিল। টোল-ঘরের কাছে যাইতেই দেখিল, গৌরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সত্যচরণ একবার তাহার দিকে চাহিয়াই নতমুখে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। গৌরী মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল, "শোন।"

সত্যচরণ দাঁড়াইল। গৌরী বলিল, "সে বিয়ে-টার কি হ'লো।"

সত্য। কোন্ বিয়ে?

গৌরী। কোন্ বিয়ে আবার? সেই নিকে।

সত্যচরণ তীব্র ভ্রূকুটী করিল। মৃদু হাসিয়া গৌরী বলিল, "ভাল না হয় বিয়েই হ'লো, তার কি হলো?"

সত্য। কিছুই হয় নি।

গৌরী। বিয়ে হবে?

সত্য। বোধ হয়, না।

গৌরী। বেশ হয়েছে।

সত্য। কিসে বেশ হ'লো?

গৌরী। সর্ব্বরকমে। তুমি একটা ভয়ানক দুর্নামের হাত থেকে বেঁচে গেলে।

সত্য। আমি দুর্নামের ভয় করি না।

গম্ভীর-স্বরে গৌরী বলিল, "তুমি ভয় কর না, তা জানি, কিন্তু তোমার যারা আপনার লোক, তাদের শুন্‌লে কষ্ট হয়।"

সত্যচরণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার তেমন আপনার লোক ত দেখতে পাই না।"

গৌরী। তুমি না দেখতে পেলেই যে থাকবে না, এমন কোন কথা নাই।

গৌরীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এত কথা কোথা হ'তে শিখলি গৌরি?"

গৌরী উপরদিকে একটা আঙ্গুল বাড়াইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "আকাশ থেকে।"

সত্যচরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কোমল-কণ্ঠে ডাকিল, "গৌরি!"

গৌরী। কি?

সত্য। আজ তোর বিয়ে।

গৌরী। তাই তো শুন্‌ছি।

সত্য। আজ তোর খুব আহ্লাদ, না?

সত্যচরণের মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গৌরী বলিল, "তোমার চেয়ে বোধ হয় বেশী নয়।"

কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই গৌরী বিদ্যুদ্বেগে অন্তর্হিত হইল। সত্যচরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিতেই দেখিল, সম্মুখে বাচস্পতি মহাশয়।

বাচস্পতি মহাশয়ের মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া সত্যচরণ ভীত হইল। সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, শুধু ভীতি ও বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার বিষাদ ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাচস্পতি মেঘগম্ভীর-কণ্ঠে ডাকিলেন, "সত্যচরণ!"

সত্যচরণ কোন উত্তর করিতে পারিল না। বাচ-স্পতি বলিলেন, "গৌরীর কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা হ'লো।"

বিস্ময়ের সহিত সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ফল?"

বাচ। কোষ্ঠীর ফলে তার রাজরাণী বা তদ্রূপ সৌভাগ্যবতী হবার কথা। কিন্তু আজ হয় তাকে,

যে কোন কুপাত্রের হাতে অর্পণ ক'রে তার কুমারীত্ব খণ্ডন করতে হবে, নয় তাকে চিরকৌমার্য্য-ব্রতে দীক্ষিত করাতে হবে।

সত্য। কারণ?

বাচ। কারণ, আজ হিমাচল শৃঙ্গ বিচলিত হ'য়েছে, তারিণী চৌধুরী প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছে।

তারিণী চৌধুরী প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছে। সত্যচরণের হৃৎস্পন্দন যেন স্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাচস্পতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাচস্পতি তখন কিরূপে তারিণী বাবুর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "সুরেশের বাপ প্রার্থিত অর্থ ব্যতীত পুত্রের বিবাহ দিবেন না, আমাকে স্থির জানিয়েছেন। সুতরাং গৌরীর

রুদ্ধ অভিমানে বাচস্পতির কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সত্যচরণ বলিল, "তা হ'লে উপায়?"

গভীর নৈরাশ্যপূর্ণ স্বরে বাচস্পতি বলিলেন, "নিরুপায়। এমন কোন সঙ্গতি নাই, যাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেড় হাজার টাকার সংগ্রহ করি। আমি নিরুপায়।"

সত্যচরণ নতমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। বাচস্পতি প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই সত্যচরণ ডাকিয়া বলিল, "শুনুন।"

বাচস্পতি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সত্যচরণ বলিল, "জ্যেঠামশায় কেন এমন কাজ করলেন, বলতে পারেন?"

বাচস্পতি বলিলেন, "পারি, কিন্তু সেটা আমার অনুমান মাত্র।"

সত্য। আপনার কি অনুমান হয়?

বাচ। সম্ভবতঃ স্নেহ। মানুষ যতই কঠোরতা অবলম্বন করুক, স্নেহের নিকট তার সকল পৌরুষ দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। আমার অনুমান, এই দুর্ব্বলতার বশেই তিনি আপনার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছেন।

সত্যচরণের মুখখানা মুহূর্ত্তে গর্ব্বপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "উত্তর, আমি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবো।"

আশাপূর্ণ স্বরে বাচস্পতি বলিয়া উঠিলেন, "করবে?"

সত্যচরণ বলিল, "নিশ্চয়।"

বাচ। অর্থ দিয়ে?

সত্য। আমি নিঃস্ব।

বাচস্পতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিলেন, সত্যচরণ মস্তক নত করিল। দেখিতে দেখিতে বাচস্পতির বিষাদ-গম্ভীর মুখমণ্ডল আনন্দের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি অগ্রসর হইয়া সত্যচরণের হাত ধরিলেন, স্নিগ্ধ-প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "তবে এস।"

সত্যচরণ নতমুখে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

ছোট খাঁচার পাখীকে আনিয়া সহসা বড় খাঁচার মধ্যে ছাড়িয়া দিলে সে যেমন খানিকটা খুব অস্থিরতা প্রকাশ করে, কোন্ দিকে যাইবে, কোন্‌খানটায় বসিবে, ঠিক করিতে পারে না, বিমলাও তদ্রূপ আপনার ক্ষুদ্র গৃহখানি হইতে সহসা এত বড় বাড়ীটার মধ্যে পড়িয়া বড় অস্থির হইয়া উঠিল। এত বড় বাড়ী, এত লোকজন, তাহাদের সহিত উপযুক্ত ব্যবহার, ইহার কোনটাই তাহার অভ্যাসের মধ্যে ছিল না। সুতরাং উঠিতে বসিতে, ঘুরিতে ফিরিতে প্রত্যেক কার্য্যেই সে যেন একটা দারুণ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল। এক জনের সহিত কথা কহিতে গেলে পাঁচ জন আসিয়া গোল বাধাইয়া দেয়, একটু চুপ করিয়া থাকিলে জনে জনে আসিয়া কৈফিয়ৎ লইতে চায়, চলা-বলার আদব-কায়দায় তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইলে উপদেশের বিদ্রূপ-বাণ আসিয়া পড়ে বিমলা বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল।

তা ছাড়া তাহার একটা নিদারুণ লজ্জা ছিল। সে যে পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এই কথা লইয়া বাড়ীতে একটা খুব আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। সে আন্দোলনে বিমলা নিজেই নিজের কাছে একটা লজ্জা অনুভব করিত যে, উপায় থাকিলে সে লোকের স্মৃতি হইতে এই কথাটা মুছিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে উপায় ছিল না, কাজেই সে মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরিয়া উঠিত। কেহ মুখের দিকে চাহিলেই বিমলা তাহার দৃষ্টির মধ্যে বিদ্রূপপূর্ণ তিরস্কারের তীব্রতা অনুভব করিয়া মাথা নীচু করিত,

কেহ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিলে সে সহানুভূতির সীমা ছাড়াইয়া তাহার পলাইতে ইচ্ছা হইত। কেহ রূপের কথা তুলিলে বিমলার ইচ্ছা হইত, আগুন জ্বালিয়া রূপটাকে পোড়াইয়া দেয়। বিমলা সর্ব্বদাই আপনাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু এই চেষ্টার ফলেই যেন শত শত চক্ষু নিয়ত তাহার অনুসরণ করিতে থাকিত। তা ছাড়া অপর্ণা তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিত। ইহাতে বিমলা যেন আপনাকে বন্দিনী ভাবিয়া আরও আকুল হইয়া পড়িত।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। শুক্লা দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্র পশ্চিমাকাশে উদিত হইয়াই চক্রবালপ্রান্তে মিলাইয়া যাইতেছিল, সারি সারি নক্ষত্র ফুটিয়া আকাশের নীলিমাকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিতেছিল। নিদাঘ বায়ু চম্পকের তীব্র গন্ধ লইয়া কখনও মৃদু কখনও দ্রুত বহিয়া যাইতেছিল। দূর হইতে কে জানে কাহার মিলনবাসরে সানায়ের প্রাণঢালা সুরে ইমনের মধুর তান ভাসিয়া আসিতেছিল। বিমলা ছাদের আলিসায় ভর দিয়া চক্রবালপ্রান্তে অস্তোন্মুখ চন্দ্রের উপর স্থির-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অন্ধকারের ধূসর আবরণ আসিয়া ধীরে ধীরে ধরণীর মুখ ঢাকিয়া দিতেছিল।

বিধবার জীবন, সেও ঠিক এই ক্ষীণ চন্দ্রকলার মত নয় কি? এমনই ক্ষণদীপ্তি, এমনই উদিত হইয়াই অস্তগামী। তার পর অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র নিবিড় বিরাট্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে অন্ধকারের পার নাই, সীমা নাই, তাহা অসীম, অনন্ত, অপার। এই বিশ্বগ্রাসী বিরাট্ অন্ধকারের স্তূপে নিমগ্ন হইয়া ব্যর্থ জীবনের বিরামবিহীন করুণ ক্রন্দন কে শুনিতে চায়? বাহিরে বিশ্ব সজীব, প্রকৃতি চঞ্চল, ক্রীড়াশীল, জগৎ আনন্দের কল-কোলাহলে মুখরিত। সেই আলোকময় আনন্দময় সজীব বিশ্বের মাঝে এমন নির্জ্জীব নিরানন্দ জীবনভার বহনের প্রয়োজন কি? যাহার বর্ত্তমান নাই, ভবিষ্যৎ নাই, লক্ষ্য নাই, আশ্রয় নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই, সে কেন এই সুখসৌন্দর্য্যময়ী ধরণীর ক্রোড়ে প্রকৃতির পরিত্যক্ত অনাদৃত সন্তানের মত বিশ্বের কঠোর বিদ্রূপ সহ্য করিয়া একপাশে পড়িয়া থাকিবে? অনন্ত অন্ধকারের বুকে এই উদ্দেশ্যহীন আলোকশূন্য জীবনটাকে ডুবাইয়া দিতে ক্ষতি কি?

চাঁদ ডুবিয়া গেল, অন্ধকার আসিয়া আকাশ, পৃথিবী, বৃক্ষলতা, পথ-ঘাট সব ঢাকিয়া ফেলিল। একটা নিশাচর পক্ষী তীব্র চীৎকারে চমকিত করিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। বিমলা ভয়ে ভয়ে আলিসা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পল্লী তখন নিস্তব্ধ হইয়াছে, শুধু দূর প্রান্ত হইতে সানায়ের করুণ রাগিণী উত্থিত হইয়া বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত বেদনা জাগাইয়া তুলিতেছে। বিমলা আর দাঁড়াইতে পারিল না। ছাদের উপর বসিয়া পড়িল।

তরল অন্ধকারাবৃত ছাদের উপর বসিয়া বিমলা কত কথাই ভাবিতে লাগিল। মায়ের কথা, বাপের কথা মনে পড়িল, বিবাহ-রজনীর উৎসবের কথা মনে করিতে শিহরিয়া উঠিল, পিতার মৃত্যুশয্যার বিকট দৃশ্য স্মরণে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর সত্যচরণের অযাচিত করুণার কথা মনে পড়িতেই একটা অপূর্ব্ব পুলকোচ্ছ্বাসে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। হায়, সে সত্যচরণকে কেন প্রত্যাখ্যান করিল? কোন্ সুখের প্রত্যাশায় সে সত্যচরণের প্রাণঢালা ভালবাসা অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিল? সংসারে তাহার কি আছে, সংসার তাহাকে কি দিতে পারে? যাহার হৃদয় শূন্য, তাহাকে বাহিরে কি দিয়া সেই শূন্যতা পূর্ণ করিবে! যাহার অন্তরে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে, বাহিরে সপ্ত সমুদ্রের জল ঢালিয়া দিলেও কি তাহার চিতা নির্ব্বাপিত হইবে! সে যে বাহিরে কিছু চায় না, অন্তরে এমন একটা কিছু চায়, যাহাতে তাহার হৃদয়ের এই বিরাট্ শূন্যতা পূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কে তাহা দিবে? যে দিতে চাহিয়াছিল, বিমলা নিতান্ত রুক্ষভাবে তাহার দান ফিরাইয়া দিয়াছে। হতভাগিনী আপনার প্রাণঘাতী তৃষ্ণার শেষ জলবিন্দু তপ্ত-বালুকা ক্ষেত্রে ঢালিয়া দিয়া আজি পিপাসার মর্ম্মন্তুদ যাতনায় ছটফট্ করিতেছে। ওগো, তোমরা তাহার বাহিরের সব লইয়া তাহাকে অন্তরের একটা অবলম্বন দাও! কিন্তু কে তাহা দিবে?

বিমলা ছাদের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সহসা কাহার স্পর্শে চমকিত হইয়া বিমলা ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিল। অপর্ণা শান্ত-মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছ বিমলা?"

বিমলা। আবেগবিহ্বল প্রাণে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে

বলিল, "ওগো, আমি তোমাদের কিছুই চাই না, আমাকে শুধু এমন একটা কিছু দাও, যাকে দিয়ে আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করতে পারি।"

সেই তরল অন্ধকারের মধ্যেও অপর্ণা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া বিমলার মুখে এমন একটা অভাবজনিত কাতরতা দেখিতে পাইল, যাহাতে সকল বিদ্বেষ, সকল ঘৃণা বিস্মৃত হইয়া এই অনাথা বিধবার প্রতি সমবেদনায় তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর বিমলাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া করুণস্বরে বলিল, "এস।"

বিমলার হাত ধরিয়া অপর্ণা ঠাকুরঘরের সম্মুখে আসিল, এবং দরজা খুলিয়া বিমলাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল। সম্মুখে সুগঠিত, সিংহাসনের উপর রাধাবল্লভের কৃষ্ণপ্রস্তরখচিত বিগ্রহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। দুই পাশে দুই ঘৃতপ্রদীপ দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহাদের স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল আলোকসম্পাতে বিগ্রহের মুখমণ্ডল যেন এক অপূর্ব্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, স্থির-শান্ত নয়নযুগল হইতে যেন কোন্ দেবলোকের অক্ষয় শান্তির ধারা ক্ষরিত হইতেছিল, গলদেশে লম্বিত পুষ্পমাল্য হইতে স্বর্গীয় সৌরভ বিকীর্ণ হইয়া গৃহ আমোদিত করিতেছিল। বিমলা সহসা যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হইল। সে ভীতি-বিকম্পিত হৃদয়ে বিস্ময়বিহ্বলদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, সেই স্নিগ্ধ দীপালোকসমুজ্জ্বল কুসুম-সুবাসিত কক্ষমধ্যে অঙ্গে বিশ্বের সমগ্র সৌন্দর্য্য, নয়নে অনন্ত প্রীতি, মৃদুহাস্যরঞ্জিত ওষ্ঠে সুগভীর শান্তির আশ্বাস লইয়া বিশ্বেশ্বরের বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে বিরাজিত। বিমলা পুলকাঞ্চিত শরীরে মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে বিগ্রহের শান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিল।

অপর্ণা বিগ্রহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রশান্ত-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "কোন্ ছার মানুষ বিমলা! এই অনন্তসুন্দরের পদে আত্মসমর্পণ কর, এই বিরাট্ পুরুষকে ক্ষুদ্র হৃদয়ের শূন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবন যৌবন সার্থক করিয়া লও।"

বিমলা ভক্তিবিহ্বল-হৃদয়ে বিগ্রহের পদে আপনার মস্তক লুণ্ঠিত করিল।

বাহির হইতে সত্যচরণ ডাকিল, "দিদি!"

"কে রে, সত্য এসেছিস্?"

"হাঁ দিদি।"

সত্যচরণ আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সময় ঠাকুরঘরে? এ কি, বিমলা?"

বিমলা উঠিয়া দরজার কাছে আসিল এবং হাস্য-প্রফুল্ল-মুখে শান্তস্বরে বলিল, "হাঁ সত্যবাবু, আমি। আমার আর কোন অভাব নাই সত্যবাবু, আমি আজ আমার জীবনের অবলম্বন পেয়েছি, আমার শূন্য হৃদয় কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।"

সত্যচরণ বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে বিমলার হর্ষ-সমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিল। তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "চল্লি যে?"

সত্যচরণ পশ্চাতে না ফিরাইয়া উত্তর দিল, "এখন আসি।"

অপ। কি বল্তে এসেছিলি?

সত্য। কিছু বল্তে নয়, যা জান্তে এসেছিলাম, তা জানা হয়েছে।

সত্যচরণ অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। অপর্ণা ও বিমলা বিস্মিতভাবে পরস্পর মুখের দিকে চাহিল।

তরঙ্গিণী আপনার ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। সত্যচরণকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিল, "ওগো সত্যবাবু!"

চমকিতভাবে সত্যচরণ ফিরিয়া দাঁড়াইল। ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "ভয় নাই, আমি শ্রীমতী তরঙ্গিণী, ওরফে তরু।"

সত্যচরণ ধীরে ধীরে বলিল, "কেন, নতুন মা!"

এই নূতন সম্বোধনে তরঙ্গিণীর বুকটা যেন সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে জোরে এই ভাবটাকে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় এসেছিলে?"

সত্যচরণ নতমস্তকে উত্তর দিল, "বিমলার কাছে।"

তর। বিয়ের কথা বল্তে বুঝি?

সত্য। না, তার কোন অভাব আছে কি না, জান্তে।

তর। কিছু জান্তে পার্লে?

সত্য। জেনেছি, তার কোন অভাব নাই।

তর। না থাক্বারই কথা। বাবু উইলে তাকে অনেক টাকা দিয়ে যাচ্ছেন।

সত্যচরণ মৃদু হাসিয়া বলিল, "টাকার অভাব ছাড়া

মানুষের অপরও অনেক অভাব থাকে না কি নতুন মা ?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "থাক্‌তে পারে। কিন্তু মানুষের সকল অভাব কি পূরণ হয় ?"

সত্য। না হ'লেও লোকে পূরণ করবার চেষ্টা করে।

তর। অনেকে আবার চেষ্টা করেও না, যেমন তুমি।

সত্যচরণ একটু গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হাস্য করিল। তরঙ্গিণী বলিল, "তুমি তো দিন-রাত পরের অভাব পূরণের চেষ্টায় ছুটে বেড়াচ্ছ, কিন্তু নিজের অভাব পূরণের চেষ্টা কখনো করেছ কি ?"

সত্যচরণ মুখ তুলিয়া স্থির-গম্ভীর-স্বরে বলিল, "নিজের অভাব পূরণের জন্যই পরের অভাব-পূরণের চেষ্টা, নতুন মা। যে দিন নিজের অভাব পূর্ণ হবে, সে দিন আর পরের জন্য কোন চেষ্টা থাক্‌বে না, এটা স্থির জেনো।"

তরঙ্গিণী বলিল, "ভাল বুঝতে পারলাম না।"

সত্যচরণ বলিল, "এখন বোঝবার সময়ও নাই।"

তর। এত ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলেছ ?

সত্য। নিজের অভাব পূরণের চেষ্টায়।

সত্যচরণ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। তরঙ্গিণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

পরদিন দেওয়ান আসিয়া উইল লিখিতে বসিলে, তারিণী বাবু বলিলেন, "লেখ, আমার নগদ সম্পত্তি এক লক্ষ টাকার মধ্যে বিশ হাজার টাকা আমার বিধবা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবী এবং বিশ হাজার টাকা আমার বিধবা পত্নী শ্রীমতী তরঙ্গিণী দেবী পাইবে। বিশ হাজার টাকা আমার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত ৺রাধাবল্লভ জিউর নামে ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে। উহার সুদ হইতে ৺বিগ্রহের নিয়মিত নিত্যপূজা ও দোলযাত্রা, রাসযাত্রা প্রভৃতি নৈমিত্তিক উৎসবের ব্যয়াদি নির্ব্বাহিত হইবে। অত্র গ্রামবাসী ৺রামজীবন চক্রবর্ত্তীর বিধবা কন্যা শ্রীমতী বিমলা দেবী একান্ত অসহায় বিধায় উহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ দশ হাজার টাকায় কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে; ঐ টাকার সুদ হইতে উহার গ্রাসাচ্ছাদন ও বার-ব্রতাদির আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। উহার অবর্ত্তমানে ঐ টাকা আমার উত্তরাধিকারীর ইচ্ছামত কোনও লোক-হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। পাঁচ হাজার টাকা আমার কর্ম্মচারী ও বিশ্বস্ত দাসদাসীগণের মধ্যে যোগ্যতানুসারে বিতরিত হইবে। অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার টাকায় আমার বিধবা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর নামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে। উক্ত আশ্রম হইতে অনাথা বিধবাগণ গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। আমার ভাবী উত্তরাধিকারী আশ্রমের একমাত্র ট্রাষ্টি হইবেন।"

দেওয়ান আদেশমত সমস্ত লিখিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। তারিণী বাবু বালিসটা বুকে চাপিয়া মাথা তুলিয়া বলিলেন, "তার পর লেখ, আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, মায় জমীদারী আমার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী শ্রীমান্ সত্যচরণ চৌধুরী পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিবে।"

দেওয়ান হাতের কলমটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। দেওয়ানের বিস্ময়ভাব দেখিয়া তারিণী বাবু ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবচো দেওয়ান ?"

দেওয়ান নিরুত্তরে মস্তক নত করিল। তারিণী বাবু ধীর-প্রশান্ত-স্বরে বলিলেন, "যে সত্যচরণ চিরদিন আমার অবাধ্যতাচরণ করেছে, যাকে আমি চিরকাল অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হতভাগ্য ব'লে জানি, সেই সত্যচরণকে আমার সমগ্র জমীদারীর অধিকার দিয়ে যাচ্ছি। এর চেয়ে আমার আর কি বুদ্ধিভ্রংশ হ'তে পারে। কেমন, না ?"

দেওয়ান আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আপনার বিষয়, আপনি ইচ্ছামত—"

বাধা দিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "বিষয় আমার হ'লেও এবং যাহাকে ইচ্ছা দিবার ক্ষমতা আমার থাক্‌লেও আমার কর্ত্তব্য ব'লে যে একটা জিনিস আছে, তার কাছে আমি বাঁধা। সে কর্ত্তব্য পৈতৃক সম্মান-রক্ষা। সে সম্মান রক্ষা করবার উপযুক্ত সত্যচরণ ছাড়া আর কেউ নাই। স্নেহের বশে বা আত্মীয়তার অনুরোধে আমি এ কথা বলছি না। এখানে তার কাজ দেখেই তার বিচার করেছি। ঠিক জেনো দেওয়ান, কেউ

যদি আমার এই বিস্তৃত জমীদারী রক্ষা করতে পারে, আমার এই প্রতাপ, এই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে পারে, সে সত্যচরণ। তা ছাড়া—"

একটু থামিয়া একবার দম লইয়া তারিণী বাবু গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "তা ছাড়া এটা ঠিক আমার স্বেচ্ছাকৃত দান নয়, এটা তার মহান্ আত্মত্যাগের পুরস্কার, আর আমার ঘৃণ্য লালসা ও নির্ব্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত।"

তারিণী বাবু শুইয়া পড়িলেন। দেওয়ান লিখিতে লাগিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "তার পর লেখ, এই উইল দ্বারা আমার পূর্ব্বকৃত উইল সম্পূর্ণ অসিদ্ধ হইল, এবং ইহাই আমার চরম উইল বলিয়া গণ্য ও আইন অনুসারে গ্রাহ্য হইবে।"

দেওয়ান লেখা শেষ করিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিল। তারিণী বাবু বালিস বুকে দিয়া উপুড় হইয়া নাম স্বাক্ষর করিলেন, এবং স্বাক্ষরিত অংশটা চোখের খুব কাছে আনিয়া বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেওয়ান বলিল, "সাক্ষী।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "বাইরের কোন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে না। তুমি এখন যেতে পার।"

দেওয়ান চলিয়া গেল। তারিণী বাবু শুইয়া পড়িয়া উইলখানাকে বুকের উপর রাখিয়া আকুল-কণ্ঠে বলিলেন, "রাধাবল্লভ! জীবনে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য অনেক করেছি। কিন্তু রূপের মোহে তরঙ্গিণীর পাণিগ্রহণের মত অকর্ত্তব্য, আর সত্যচরণকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করার মত মহৎ কর্ত্তব্য বোধ হয় একটাও করি নাই। এই শেষ কর্ত্তব্যটুকু পালন ক'রে পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য তোমার কাছে মার্জ্জনা পাব না কি দয়াময়।"

বৃদ্ধের শীর্ণ পাণ্ডুর গণ্ডে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

তারিণী বাবু চোখের জল মুছিয়া অপর্ণা ও তরঙ্গিণীকে ডাকাইয়া এবং তাহারা আসিলে উইলের সাক্ষীর স্থলে তাহাদিগকে নাম স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। অপর্ণা কলম লইয়া স্বাক্ষর করিতে উদ্যত হইলে তারিণী বাবু বলিলেন, "আগে প'ড়ে দেখ্।"

অপর্ণা উইল পড়িতে আরম্ভ করিল, তরঙ্গিণী পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে অপর্ণা বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল; এবং পিতার দিকে ফিরিয়া অতিমাত্র বিস্ময়-পূর্ণ-কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

তারিণী বাবু বলিলেন, "কি অপি!"

অপর্ণা বলিল, "সত্যচরণ!"

তারিণী বাবু স্থির-স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সত্যচরণই আমার জমীদারীর একমাত্র মালিক।"

অপর্ণা ফিরিয়া তরঙ্গিণীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, তাহার মুখখানা যেন সাদা হইয়া গিয়াছে। অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু বাবা—"

তারিণী বাবু বালিস হইতে মাথাটা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "এর আর কিন্তু নাই অপি, এটা আমার প্রবৃত্তির দান নয়, বিবেকের দান, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, আর সত্যচরণের ত্যাগের পুরস্কার।"

অপর্ণা পিতার মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। উত্তেজিত কণ্ঠে তারিণী বাবু বলিলেন, "তবে শোন্ অপি, সত্যচরণের যে মহত্ত্বের কথা এতদিন মনের ভিতর চেপে রেখে বাইরে তার উপর ক্রোধ প্রকাশ ক'রে আস্ছি, আজ আর তা চেপে রাখ্তে পাচ্ছি না। তবে শোন্, সে তরঙ্গিণীকে যে রকম ভালবাসে, জগতে সে রকম ভালবাস্তে কেউ পারে কি না, জানি না। তবু সে তরঙ্গিণীকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হয়েছিল কেন, তা জানিস্?"

অপর্ণার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তারিণী বাবু বলিতে লাগিলেন, "সে শুধু আমার জন্য। সে বুঝতে পেরেছিল, আমি এই বয়সে তরঙ্গিণীর রূপে মুগ্ধ হয়েছি। তাই সে আমার লালসা-রাক্ষসীর তৃপ্তির জন্য নিজের প্রাণ বলি দিয়েছিল। কিন্তু এইখানেই তার ত্যাগের—ভালবাসার শেষ নয়। পাছে তরঙ্গিণীর পরিবর্ত্তে আমি তাকে সম্পত্তির অধিকারী করি, এই আশঙ্কায় সে নিজের বিবেকের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছে, পদে পদে স্বেচ্ছায় আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে আমার বিরাগভাজন হবার চেষ্টা করেছে। পুরাণে ভীষ্মের আত্মত্যাগের কথা পড়েছিস্, কিন্তু সত্যচরণের আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য তার চেয়ে কম না বেশী অপি?"

অপর্ণা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। তরঙ্গিণী বাতাহিতা লতার ন্যায় একবার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই কাঠের মত শক্ত হইয়া অপর্ণার হাত হইতে উইল ও কলমটা কাড়িয়া লইয়া অকম্পিত-হস্তে নিজের নাম স্বাক্ষর করিল। অতঃপর অপর্ণাও ধীরে ধীরে স্বাক্ষর করিয়া তারিণী বাবুকে উইল ফিরাইয়া দিল। তারিণী বাবু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "জানি না অপি, এইতেই আমার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ

হ'লো কি না। কিন্তু আমার আর একটা প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। জীবনে যা কখন করি নাই, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তা করেছি, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি—"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই অপর্ণা বলিয়া উঠিল, "এই যে সত্য!"

সত্যচরণ কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি আপনার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছি জ্যেঠা মশায়।"

তারিণী বাবু সত্যচরণের মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সত্যচরণ ধীর-নম্রস্বরে বলিল, "আপনার অনুমতির অপেক্ষা না ক'রেই গত রাত্রে আমি গৌরীর পাণিগ্রহণ করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন।"

সত্যচরণ অগ্রসর হইয়া জ্যেষ্ঠতাতের পদধূলি গ্রহণ করিল। তারিণী বাবুর দুই চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন মুখমণ্ডলে আনন্দের দিব্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দ্বারপ্রান্ত হইতে কল্যাণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠাকুরকে বল্ অপু, অবোধ সন্তানের অবাধ্যতা যেন ক্ষমা করেন।"

তারিণী বাবুর ওষ্ঠে হাস্যরেখা দেখা দিল। তিনি হর্ষ-গদগদ-কণ্ঠে বলিলেন, "বুড়াদের যে কেবল ক্ষমা কর্‌বারই অধিকার আছে, তা নয় মা, অনেক সময় তাহাদের ক্ষমা চাইবারও দরকার হয়। কিন্তু সে কথা যাক, এখন যে এই জমীদারীর একমাত্র মালিক, তার বিবাহে সকলে আনন্দোৎসব কর। আমার অনন্ত যাত্রার পথ উৎসব শঙ্খনাদে মুখরিত হয়ে উঠুক।"

বিশাল ভবন কম্পিত করিয়া মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সত্যচরণ বিস্ময়-স্তব্ধনেত্রে জ্যেষ্ঠতাতের হর্ষ--সমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সম্পূর্ণ

ত্যাজ্য-পুত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈকুণ্ঠপুরের বলরাম মল্লিকের মৃত্যুর পর তৎকৃত উইলের মর্ম্ম শুনিয়া লোকে যেমন আশ্চর্য্যান্বিত হইল, পূর্ব্বের সূর্য্যকে পশ্চিমে উদিত হইতে দেখিলেও তাহারা ততদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইত কি না সন্দেহ। বলরাম উইলে একমাত্র পুত্র মহিমকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া সমগ্র বিষয়-সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্র বেহারী ও বধূ চারুর নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

বত্রিশ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইবার পর অনেকেই যখন বলরামকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন বিবাহ করিলে পাছে ছেলেটি পর হইয়া যায়, পাছে মাতৃস্নেহবঞ্চিত পুত্র পিতৃস্নেহ হইতেও বিচ্যুত হয়, এই আশঙ্কাতেই বলরাম আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেরই উপদেশ ও অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। যদিও ছেলেকে মানুষ করিবার ভার ভ্রাতৃবধূ কালীতারাই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি পিতৃহৃদয়ের যে প্রচ্ছন্ন স্নেহধারা পুত্রের উপর অবিরাম বর্ষিত হইতেছিল, তাহার লাঘব করিয়া পুত্রের হৃদয়ে বেদনা দিতে বলরাম ইচ্ছুক হইলেন না।

মহিমও যে ছেলে মন্দ নয়, এ কথা গ্রামের সকলেই জানিত। তবে মাতৃহীন বলিয়া স্বভাবতই একটু বেশী আবদার, একটু বেশী জেদ ছিল। সময়ে সময়ে কতকটা নিজের খেয়ালের বশেই চলিত, এবং সে খেয়ালটাকে কেহ অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে, তাহার জেদটা যেন আরও বাড়িয়া যাইত। বাপের পয়সা ছিল, কিন্তু বিলাসিতা ছিল না। সুতরাং ছেলে যখন স্কুলে ঢুকিয়া বিলাসিতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, তখন বলরাম তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, বিলাসিতায় ভদ্রতার বৃদ্ধি পায় না, অর্থের অপচয় হয় মাত্র। মহিম কিন্তু অর্থ অপচয়ের ভয়ে বিলাসিতা হইতে আদৌ নিবৃত্ত হইল না, বরং কেশের প্রসাধন, পরিচ্ছদের পারিপাট্য প্রভৃতি আড়ম্বরের দিকে একটু বেশী মনোযোগী হইল।

তার পর হঠাৎ বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত বহিলে মহিম সে স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিল। সে খাটো করিয়া চুল ছাটিয়া ফেলিল, বিদেশী পরিচ্ছদ ত্যাগ করিল, এবং মোটা কাপড় পরিয়া ছেলের দল লইয়া পাড়ায় পাড়ায় "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে লোকে বিস্মিত হইল। মহিম কুস্তীর আড্ডা খুলিয়া লাঠি-খেলার বন্দোবস্ত রাখিয়া, দেশের শারীরিক শক্তির উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিল।

কিন্তু দিনকতক পরে যখন ভাবের বন্যা হ্রাস পাইয়া আসিল, এবং পুলিশের রুদ্রমূর্ত্তির ভীতি ক্রমশই বাড়িতে লাগিল, তখন মহিম দল ছাড়িয়া, কুস্তীর আড্ডা তুলিয়া দিয়া পুনরায় পাঠ্যপুস্তকে মনোযোগ প্রদান করিল। তার পর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশিক্ষালাভের জন্য কলিকাতায় বৌবাজারে একটি মেসের মেম্বর-শ্রেণীভুক্ত হইল। খুড়তুত ভাই বেহারী তখন স্কুলের দ্বিতীয়শ্রেণী হইতেই বিদায় গ্রহণ করিয়া গ্রামের পুষ্করিণী সমূহের মৎস্যকুল-সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং বিশ্বাসদের বৈঠকখানায় তাসের আড্ডায় যাতায়াত জন্য জ্যেষ্ঠতাতের নিকট তিরস্কৃত হইতেছিল। লোকে বলরামের কাছে বেহারী ও মহিমের চরিত্র তুলনায় সমালোচনা করিয়া মহিমের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশা দিতেছিল।

তার পর যে বৎসর মহিম ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়া বি, এ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইল, সেই বৎসর বলরাম এমনই সমারোহ সহকারে ভ্রাতুষ্পুত্র বেহারীর বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিল যে, তাহাতে অনেকেই বেহারীর উপর ঈর্ষান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। এই বিবাহের পর হইতে বেহারী যেমন জ্যেষ্ঠতাতের

আনুগত্য স্বীকার করিতে লাগিল, তেমনই বলরামের মেজাজটা যেন অতিরিক্ত রুক্ষ হইয়া আসিল। যে বলরাম মল্লিক বাপু বাছা ভিন্ন কথা কহিতেন না, সেই বলরাম মল্লিকের মুখ শুধু কড়া কথা নয়, অশ্লীল গালি শুনিয়া লোকে স্তম্ভিত হইতে লাগিল। অনেকেই মল্লিক মহাশয়ের এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণ-নির্দ্দেশে গবেষণা আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তাহাদের গবেষণা স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই মল্লিক মহাশয় সকলের বিচার-বিতর্কের অতীত দেশে চলিয়া গেলেন। লোকে হায় হায় করিয়া বলিতে লাগিল, গ্রামের চূড়া খ'সে গেল।

বলরামের মৃত্যুর পর গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর লোকের সম্মুখে যখন তৎকৃত চরমপত্র পঠিত হইল, তখন লোকে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। এমন কি, অনেকেই গোপনে বলাবলি করিল, "এ উইল সম্পূর্ণ জাল।" অনেকে এরূপও বলিল যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে মল্লিক মহাশয়ের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল। নতুবা তিনি মহিমের মত সোনার চাঁদ ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া এই হতভাগা ভাইপোকে বিষয় দিয়া যাইবেন কেন?

মহিম কিন্তু ইহাতে একটুও বিস্ময় বা দুঃখ প্রকাশ করিল না, এবং যাহারা উইলকে জাল প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত সামান্যও সহানুভূতি দেখাইল না। সে এমনই সহজভাবে বিনা প্রতিবাদে উইলখানাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল যে, দুইটা পাশ করিলেও লোকে তাহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ও মূর্খ ভাবিয়া লইতে একটুও ইতস্ততঃ করিল না।

ত্যাজ্যপুত্র হইলেও মহিম কাচা গলায় দিয়া একমাস হবিষ্য করিল, এবং মাসান্তে পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিল। বেহারী জ্যেষ্ঠতাতের শ্রাদ্ধে উইলের নির্দ্দেশিত দুই হাজার টাকার একটি পয়সাও কম খরচ করিল না।

শ্রাদ্ধশান্তি-শেষে মহিম কাপড়-চোপড় বাঁধিয়া কলিকাতা-যাত্রার উদ্যোগ করিল। বেহারী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যেঠামশায়ের উইল সম্বন্ধে তোমার কোন আপত্তি আছে?"

মহিম স্পষ্টভাবে উত্তর দিল, "কিছুমাত্র না।"

কালীতারা বলিলেন, "আমার কিন্তু আপত্তি আছে।"

বেহারী বিস্মিত দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিল। কালীতারা বলিলেন, "বড়্ঠাকুর উইল ক'রে গেলেও বাপের বিষয় থেকে মহিম যে একেবারে বঞ্চিত হবে, তা হ'তেই পারে না।"

বেহারী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "বেশ তো, মহিম যদি চায়,—"

বাধা দিয়া মহিম বলিল, "না না, আমি কিছুই চাই না।"

বেহারী। তা হ'লে তুমি কি এখন পড়াশোনাই ক'র্‌বে?

মহিম। কি কর্‌বো, তা এখন ঠিক বল্‌তে পারি না।

কালীতারা। বল্‌তে পারিস্ না কি, আর দুটো বছর বৈ তো নয়, প'ড়ে পাশটা কর্।

মহিম নিরুত্তরে রহিল। বেহারী বলিল, "পড়ার খরচ—যদি অকুলান হয়, আমাকে লিখবে।"

মহিম নতমস্তকে বলিল, "আচ্ছা।"

যাত্রার পূর্ব্বে বেহারীর স্ত্রী চারু তাহার সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া দিয়া বলিল, "আবার আস্‌বে তো ঠাকুরপো?"

মহিম হাসিয়া বলিল, "তোমাদের ভুলে থাক্‌তে পার্‌ব কি বৌদি?"

চারু বলিল, "ভুলে তুমি খুব থাক্‌তে পার্‌বে। সে বিষয়ে যে তোমার যথেষ্ট দক্ষতা আছে, তা জান্‌তে আমার বাকী নাই।"

কথাটা এমনই কঠোর তিরস্কারের মত শুনাইল যে, মহিম লজ্জায় মাথা নীচু করিল। চারু বলিল, "এখানে তোমার মনে রাখবার মত কিছুই নাই, তা জানি, কিন্তু জন্মভূমি তো বটে, তার মায়াও একেবারে কাটিও না।"

সহাস্যে মহিম বলিল, "আর তোমাদের মায়া বুঝি একেবারে কাটিয়ে দিই, এইটাই তোমার ইচ্ছা? তা আমি পার্‌ব না বৌদি, ছুটী পেলেই এসে তোমাদের কি রকম ব্যতিব্যস্ত করি, তা দেখে নিও।"

মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া চারু বলিল, "সে আমি ছেলেবেলা হ'তে দেখে আস্‌ছি, তোমায় আর নূতন ক'রে দেখাতে হবে না।"

মহিম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চারু বলিল, "বিষয়টা একেবারে ছেড়ে দিলে?"

মৃদু হাসিয়া মহিম বলিল, "আমি এমন যোগী সন্ন্যাসী নই বৌদি যে, অনিত্যজ্ঞানে পার্থিব বিষয়ের মায়া ত্যাগ কর্‌তে পারি।"

"কিন্তু আপাততঃ তো ত্যাগ কর্‌লে ?"

"যাতে আমার অধিকার নাই, তার উপর লোভ না করা যদি ত্যাগ হয়, তবে তাই করেছি।"

"বিষয়ে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার। তুমি জ্যেঠা-মশায়ের একমাত্র বংশধর।"

"তিনিই কিন্তু আমায় অধিকার হ'তে বিচ্যুত ক'রে গেছেন।"

"সেটা রাগে।"

"তাই যথেষ্ট।"

একটু নীরব থাকিয়া চারু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি অর্দ্ধেক সম্পত্তি নেবে ?"

"দাদার কাছ হ'তে ?"

"না, আমি দেব।"

"তুমি যে দিতে পার, তা আমি জানি।"

"জান যদি, তবে নিতে আপত্তি কি ?"

"আপত্তি কিছু নাই, তবে এখন দরকারও নাই।"

"যখন দরকার হবে ?"

"তখন নিলেও নিতে পারি।"

চারু আর কিছু বলিল না। মহিম তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু খুড়ীমার কাছে বিদায় লইতে গেলে খুড়ীমা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। মহিম তাঁহাকে অনেক আশ্বাস, অনেক সান্ত্বনা দিল। কালীতারা কিন্তু শান্ত হইলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুই যতই বলিস্ মহিম, আমি জানি, তুই আর আস্‌বি না।"

মহিম বহুকষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিদায় লইল। বেহারী তাহাকে বিদেশে সাবধানে থাকিতে এবং প্রয়োজন হইলে সাহায্য প্রার্থনা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় দিল। মহিম চলিয়া গেল। বেহারী বিষয়-সম্পত্তির নূতন বন্দোবস্তে মনোযোগ দিল। আর গ্রামের লোকেরা বলরাম মল্লিকের অদ্ভুত উইলের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বলরাম মল্লিকের এই সম্পত্তির একটু গুপ্ত ইতিহাস ছিল। সে ইতিহাস বলরাম ছাড়া আর কেহ জানিত না। আর যে জানিত, সে বহুপূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিল।

সে বলরামের প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু বৃন্দাবন সরকার। উভয় বন্ধুরই অবস্থা ভাল ছিল না। ইহার উপর বিবাহ করিয়া পুত্রকলত্র লইয়া যখন তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, দিন চলা ভার হইয়া উঠিল, তখন উভয় বন্ধুতে যুক্তি করিয়া হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হইলেন। তাঁহারা যে কোথায় গেলেন, তাঁহাদের কি হইল, লোকে তাহার কোন সন্ধানই পাইল না। বৃন্দাবনের স্ত্রী কান্নাকাটি করিতে লাগিল, বলরামের স্ত্রী শিশুপুত্র মহিমকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। বলরামের ছোটভাই শ্রীদাস পৃথগন্ন হইলেও দিনকতক কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ভ্রাতার অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোন সন্ধান না পাইয়া নিরস্ত হইল। বৃন্দাবনের স্ত্রী এক বৎসরের মেয়ে চারুকে, এবং বলরামের স্ত্রী পাঁচ বৎসরের ছেলে মহিমকে বহু কষ্টে পালন করিতে লাগিল।

এ দিকে বন্ধুদ্বয় নানা স্থানে ঘুরিয়া শেষে বহুকষ্টে বর্ম্মায় উপস্থিত হইল। বলরাম একটু লেখাপড়া জানিতেন, তিনি চাকরীতে ঢুকিলেন। বৃন্দাবন লেখাপড়া জানিতেন না, তিনি অনেক চেষ্টায় এক মাড়োয়ারী মহাজনের সঙ্গে মিশিয়া কাঠের চালানী কারবার আরম্ভ করিলেন। পাহাড় অঞ্চলে জঙ্গল জমা লইয়া কাঠ কাটাইয়া সেই কাঠ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে চালান দেওয়া হইত।

বছর দুই পরে বৃন্দাবনের হাতে যখন হাজার তিনেক টাকা জমিল, তখন তিনি মাড়োয়ারীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিজেই কারবার আরম্ভ করিলেন, এবং বলরামকে চাকরী হইতে ছাড়াইয়া লইয়া স্বীয় ব্যবসায়ের সহকারী করিলেন। উভয় বন্ধুর অধ্যবসায় ও ব্যবসায়-চাতুর্য্যের ফলে কারবারে প্রচুর লাভ হইতে থাকিল।

পাঁচ বৎসরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে উভয়ে যখন হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের মূলধন পঞ্চাশ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে, তখন তাঁহারা একবার দেশে ফিরিতে মনস্থ করিলেন

এই দীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে তাঁহারা দেশে কোন সংবাদ দেন নাই, দেশেরও কোন সংবাদ পান নাই। অর্থচিন্তায় ব্যস্ত হইয়া তাঁহারা দেশের কথা, স্ত্রীপুত্রের কথা যেন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তার পর যখন আশাতীত অর্থ হস্তগত হইল, তখন দেশের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উভয়ে পরামর্শ করিলেন, একবার দেশ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া পুনরায় নবোদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে।

কিন্তু পরামর্শমত কাজ হইল না। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য নির্দিষ্ট দিনের পক্ষকাল পূর্ব্বে বৃন্দাবন হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। বলরাম বহু যত্নে বন্ধুর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করিলেন, কিন্তু বন্ধুকে বাঁচাইতে পারিলেন না। মৃত্যুকালে বৃন্দাবন তাঁহাকে বলিয়া গেলেন, "ভাই, দেশের মুখ দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটিল না, কিন্তু তুমি যত শীঘ্র পার, ফিরিয়া যাও। আর আমার স্ত্রী কন্যা যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের দেখিও। কিন্তু আমার অংশের টাকা তাহাদের হাতে দিও না, স্ত্রীলোকের হাতে পড়িলে তিন দিনও তাহাদের ভোগে আসিবে না। মেয়েটা যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহার বিবাহ দিয়া জামাতার হাতে টাকা দিবে। না বাঁচে, স্ত্রীর জীবনকাল পর্য্যন্ত ভরণপোষণ করিও। তার পর সমস্ত অর্থই তোমার। আর একটা অনুরোধ, তুমি অর্থলোভে আর এই দূরদেশে আসিও না, এবং যদি সম্ভব হয়, তোমার ছেলের সঙ্গে মেয়েটার বিবাহ সম্পন্ন করিও।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া বৃন্দাবন দেহত্যাগ করিলেন। বলরাম তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করিলেন, এবং ব্যবসা তুলিয়া দিয়া প্রচুর অর্থ সহ কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে ফিরিলেন।

দেশের লোক দুই জনকেই মৃত সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল। এমন সময় বলরাম প্রচুর অর্থসহ ফিরিয়া আসিলেন। গ্রামে খুব একটা কোলাহল পড়িয়া গেল, এবং সকলেই তাঁহাকে বৃন্দাবনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলরাম তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করিলেন, আর কোন কথা ভাঙ্গিলেন না। বৃন্দাবনের স্ত্রী আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তার পর বলরাম জমী জায়গা কিনিলেন, তেজারতী করিবার আরম্ভ করিলেন, বাড়ী-ঘরের অবস্থা ফিরাইয়া দিলেন। ছোট ভাই শ্রীদাম মারা গিয়াছিল, তাহার স্ত্রীপুত্রকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। বৃন্দাবনের স্ত্রীকন্যার ভরণ-পোষণে সাহায্য করিতে লাগিলেন। নূতন পুকুর কাটান হইল, নূতন বাগান-বাগিচা হইল, বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব ক্রিয়া-কলাপ চলিতে লাগিল। বলরামের এই উন্নতিতে কেহ আনন্দিত হইল, কেহ বা মুখে আনন্দ প্রকাশ করিলেও মনের ভিতর ঈর্ষা পোষণ করিতে লাগিল, এবং বলরাম মল্লিক কোথাও ডাকাতি বা জাল-জুয়াচুরী করিয়া হঠাৎ বড় মানুষ হইয়া পড়িয়াছে কি না, তাহারই গুপ্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

সুখভোগের আশায় উভয় বন্ধু অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থ হস্তগত হইলেও তাঁহাদের আশা ফলবতী হইল না। একজন ভোগের পূর্ব্বেই মারা গেলেন, বলরাম ভোগ করিবার অবসর পাইলেন বটে, কিন্তু সে ভোগ সুখের হইল না। দেশে ফিরিবার বছরখানেক পরেই তাঁহার স্ত্রী স্বর্গারোহণ করিলেন। বলরামের সুখের গাছের মূলটা কে যেন মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিল।

লোকে তাঁহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া নূতন সংসার পাতিতে পরামর্শ দিল। বলরাম কিন্তু দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র মহিমের মুখ চাহিয়া সে কথা কানে তুলিলেন না। তিনি মহিমের শিক্ষা ও সুখসাধনকেই জীবনের প্রধান কার্য্য করিয়া লইলেন।

অত পর বৃন্দাবনের কন্যা চারুর বিবাহযোগ্য বয়স হইলে বলরাম স্বীয় পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইহাতে বন্ধুর বাক্যরক্ষা হইবে, অথচ কষ্টার্জ্জিত এবং অধুনা বর্দ্ধিত বিষয়টাও পরের হাতে যাইবে না। টাকা নাড়াচাড়া করিয়া তাহার উপর বলরামের এমনই একটা মমতা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, সেগুলাকে এতকাল পরে অন্যের হাতে তুলিয়া দেওয়া তিনি নিতান্তই কষ্টকর জ্ঞান করিতেন।

মহিম কিন্তু সাধে বাদ সাধিল, সে কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হইল না। বলরাম পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, পুত্র কিন্তু বুঝিল না। বলরাম ক্রুদ্ধ হইলেন, বিবাহ না করিলে ত্যাজ্যপুত্র করিবার ভয় দেখাইলেন। তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল; পিতার ভীতিপ্রদর্শনে মহিমের জেদ আরও বাড়িয়া গেল, এবং পিতার সকল আশা, সকল উদ্যম পণ্ড

করিয়া দিয়া সে কলিকাতায় প্রস্থান করিল। পুত্রের ব্যবহারে বলরাম মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন।

এ দিকে বিবাহের সকল উদ্যোগই হইয়াছিল। পুত্রের মত লইয়া যে তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে হইবে, এ কথা বলরাম আদৌ ভাবেন নাই। কিন্তু যাহা ভাবেন নাই, তাহাই যখন ঘটিল, তখন তিনি ক্রোধে ক্ষোভে মৃহ্যমান হইয়া পড়িলেন। এ দিকে বিবাহের আয়োজন পণ্ড হইলে লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িতে হইবে, লোকের নিকট সম্মান প্রতিপত্তি সকলই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অথচ ইহার মূল তাঁহার ঔরস পুত্র। বলরাম কথাটা যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই পুত্রের উপর তাঁহার চিত্তটা ক্রোধে বিরূপ হইয়া উঠিতে থাকিল। পরশু-রাম পিতার আজ্ঞায় মাতৃমস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, আর কলিকালের এই পুত্র। ছি ছি, এরূপ পুত্রকে পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেও ঘৃণা হয়। চারু যে অযোগ্য পাত্রী, তাহাও নহে, তাহার রূপ, গুণ কিছুরই অভাব ছিল না। তথাপি মহিম কেন যে তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিল, বলরাম তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ভাল করিয়া বুঝিবারও তখন সময় ছিল না, বিবাহের একমাস মাত্র বাকী। বলরাম বিবাহের উদ্যোগ পণ্ড হইতে দিলেন না। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র বেহারীর সহিত চারুর বিবাহ দিয়া স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, এবং বিবাহের পরেই মহিমকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া বেহারী ও চারুর নামে সমগ্র সম্পত্তি লিখিয়া দিলেন। লোকে ভিতরের সব কথা জানিল না, শুধু মহিমের বিবাহ-উৎসবকে বেহারীর বিবাহোৎসবে পরিণত হইতে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বলরাম তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, জ্যেষ্ঠ বেহারী থাকিতে কনিষ্ঠ মহিমের বিবাহ অগ্রে হইতে পারে না। তাঁহার কাছে মহিম ও বেহারী উভয়েই সমান।

ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর বলরামের এই আকস্মিক স্নেহাতিশয্য দর্শনে লোকের বিস্ময়ভাব আরও একটু বৰ্দ্ধিত হইল।

স্ত্রীর মৃত্যুতে বলরামের হৃদয়ের যে স্থানটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, পুত্রের অবাধ্যতা সেই স্থানে এমন একটা গভীর ক্ষত উৎপাদন করিল যে, বলরাম আর সামলাইয়া উঠিতে পারিল না। বিবাহের এক বৎসর পরে চারু যে দিন স্বামীর ঘর করিতে আসিল, সেই দিন বলরাম শয্যা লইলেন, এবং চারু ও কালীতারার প্রাণপণ সেবা-যত্নকে উপেক্ষা করিয়া চারুকে আশী-র্ব্বাদ করিতে করিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে চারু একবার তাঁহাকে মহিমের অস-হায় অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিল, এবং লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করিল। বলরাম তাহাকে সাফ কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন, এবং তিনি একবার যাহা করিয়াছেন, তাহার আর পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না, ইহাও বুঝাইয়া দিয়া-ছিলেন। পরিশেষে এইটুকু বলিয়াছিলেন, যদি মহি-মের তেমনই শোচনীয় অবস্থা হয়, এবং সে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে চারু নিজের অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি হইতে তাহাকে সাহায্য করিতে পারে।

চারু বুঝিল, এই করিতে পারে কথাটার অর্থ 'অবশ্যই করিও' এইরূপ আদেশ। চারু পিতৃবন্ধু ও শ্বশুরের সে আদেশ অবিলম্বে পালন করিতে উদ্যত হইল, মহিম কিন্তু তাহার উদ্যমকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করিয়া দিল। চারু ইহাতে রাগ বা দুঃখ করিল না। কেন না, সে জানিত, ইহা অবজ্ঞার প্রত্যাখ্যান নয়, ভালবাসার অভিমান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে দিন হইতে চারুর জ্ঞান হইয়াছিল, সেই দিন হইতে সে মহিমকে যতটা আপনার বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছিল, এতটা আর কাহাকেও আপন ভাবিতে পারে নাই। পাশাপাশি বাড়ী, বয়সে চার বৎসরের মাত্র প্রভেদ, সুতরাং দুইজনে দিনের অধিকাংশ সময়ই একত্র খেলাধুলা করিয়া কাটাইত। সে খেলা-ধুলার মধ্যে পরস্পরের ভালবাসাটা এমনই অন্তঃ-সলিলভাবে বহিয়া যাইত যে, বাহিরের লোকে তাহার ভিতর বালকবালিকার পরস্পর অনৈক্য ছাড়া ঐক্যের লক্ষণ কিছুমাত্র দেখিতে পাইত না।

চারু ধুলার খেলা-ঘর গড়িত, কিন্তু মহিমের তাহা আদৌ পছন্দ হইত না, সে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া অতি পরিপাটীরূপে এমন সুন্দর ঘর গড়িয়া দিত যে, তাহা দেখিয়া অন্য সকল বালিকাদের ঈর্ষা হইত। অথচ চারু তাহা ভাল বলিয়া স্বীকার করিত না;

স্বীয় নৈপুণ্য ব্যর্থ হওয়ায় সে ভয়ানক রাগিয়া উঠিত, এবং মহিমের সযত্নে প্রস্তুত ঘরখানা পা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত। মহিম রাগে তাহার মাথায় পিঠে চড বসাইয়া দিয়া প্রতিশোধস্বরূপ অন্য বালিকার গৃহ-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইত। চারু দাঁড়াইয়া খানিকটা কাঁদিত, তার পর মহিমের কাছে গিয়া তাহার ঘর গড়িয়া দিবার জন্য আবার অনুনয়-বিনয় করিত। ইহাতে প্রতিযোগিনী বালিকা তাহাকে উপহাস করিতে থাকিলে মহিম আসিয়া পুনরায় চারুর গৃহ-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইত।

তার পর মহিম যখন স্কুলে যাইত, তখন চারু সমস্ত দিনটা ছটফট্ করিয়া কাটাইত, এবং কখন চারিটা বাজিবে, সাগ্রহে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে থাকিত। মহিম স্কুল হইতে ফিরিবার পথে ডাকিত, "চারি, ও চারি।"

চারু তখন এমনই গভীর মনোযোগের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইত যে, মহিমের ডাকের উত্তর দিবার অবসর পর্য্যন্ত তাহার থাকিত না। আবার মহিম যখন পড়িতে বসিত, তখন সে তাহাকে ডাকিয়া, বই টানিয়া উত্যক্ত করিতে থাকিত। মহিম ধমক দিত, চারু তাহাতে কর্ণপাত করিত না। মহিম তাহাকে টানিয়া লইয়া পড়াইতে যাইত, চারু পড়িতে চাহিত না, বর্ণমালার অক্ষরগুলাকে কাক, বক প্রভৃতি আখ্যা দিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত। মহিম যত মারিত, তাহার হাসির বেগ ততই বাড়িতে থাকিত। শেষে হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইত। কিন্তু খানিক পরেই মহিম যখন পড়ায় মনোযোগ দিত, তখন আসিয়া পড়াইবার জন্য মহিমকে অনুনয়-বিনয় করিতে থাকিত।

বালিকাদের অনুরোধে মহিম গাছে উঠিয়া জাম পাড়িত, এবং ভাগ করিয়া বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করিত। চারু আপনার ভাগটা লইয়া পায়ের তলায় ফেলিয়া চটকাইতে থাকিত। মহিম রাগিয়া তাহাকে গরবী, ডাইনী প্রভৃতি বলিয়া গালি দিত, সেও হাতমুখ নাড়িয়া মহিমকে একচোখো, আদুরে গোপাল প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিত, এবং অপর বালিকাদের ভাগের জামগুলা কাড়িয়া লইয়া নষ্ট করিতে উদ্যত হইত। তার পর প্রহৃত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিত।

এমনই করিয়া দ্বন্দ্ব ও ভালবাসার মধ্য দিয়া উভয়ের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইতেছিল।

মহিমের অপেক্ষা বেহারী তিন চারি বৎসরের বড়। সুতরাং তাহার সহিত চারুর মিশিবার সুযোগ হইত না। সুযোগ হইলেও সে মিশিত না। কারণ, বেহারীকে সে ভীতি ও বিরক্তির দৃষ্টিতেই দেখিত। বেহারীও কখনো তাহার উপরে প্রীতির ভাব প্রকাশ করে নাই।

তার পর মহিমের বাপ যখন দেশে ফিরিল, তখন চারুর বয়স আট, মহিমের বয়স বার বৎসর। তখন হইতে চারু মহিমের সহিত নিজের প্রভেদ বুঝিতে পারিল। মহিমের বাপ আছে, সে পিতৃহীন, মহিমরা বড় লোক, তাহারা গরীব, মহিমদের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী। শাখাশ্রয়ে বর্দ্ধিতা পুষ্টকায়া লতা যেমন সহসা আঘাতে আশ্রয়চ্যুত হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়ে, এবং আপনার দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতি সন্তর্পণে মাটীর উপরে আপনার ক্ষীণ দেহটি গড়াইয়া দিতে থাকে, চারুও তেমনই পিতৃহীনতার সংবাদ শ্রবণে আপনাদের দৈন্য বুঝিতে পারিয়া উদ্ধত প্রকৃতিকে সহসা সংযত করিয়া লইল। একদিকে চারুর প্রকৃতিটা যেমন নম্র হইয়া পড়িল, অন্যদিকে তেমনই মহিমের প্রকৃতিতে যেন অনেকটা গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্যের আভাষ ফুটিয়া উঠিল। তাহার প্রতি কথায়, প্রতি কার্য্যে চারুর উপর এমনই একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল যে, ধীরভাবে সহ্য করিলেও চারু তাহাতে মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারিত না। ব্যথিত হইলেও চারু সে ব্যথা কথায় বা কার্য্যে প্রকাশ করিত না, কেন না, এই ব্যথা প্রকাশ করাকেই সে সব চেয়ে অপমান, সব চেয়ে লজ্জা বলিয়া জানিত।

তার পর মহিম এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া যখন কলিকাতায় পড়িতে গেল, তখন চারু যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কলেজের ছুটীতে মহিম বাড়ী আসিলে আবার তাহার সহিত চারুর দেখা-শোনা হইত। মহিম তাহাকে কলিকাতার গল্প বলিত, সেখানকার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর করিত; চারু চুপ করিয়া বসিয়া তাহা শুনিত. ছুটী শেষে মহিম পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া যাইত। চারু তাহার গল্পগুলা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতে থাকিত।

সেবার ছুটীতে বাড়ী আসিয়া মহিম শুনিল যে, চারুর সহিত তাহার বিবাহের কথা হইতেছে। কথাটা শুনিয়া মহিম যে দুঃখিত হইল, তাহা নহে, বরং একটু

আনন্দ অনুভব করিল। লজ্জাবশতঃ সে আর চারুদের বাড়ী যাইতে পারিল না। চারুর সঙ্গেও আর প্রায় দেখা হইত না। দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইলেও পরস্পর কথা-বার্ত্তা দূরে থাক, কেহ কাহারও মুখের দিকে পর্য্যন্ত চাইতে পারিত না। মহিম চাহিবার চেষ্টা করিলেও চারু এমনই ভাবে মুখ গুঁজিয়া পলাইয়া যাইত যে, মহিমের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া পড়িত। ইহাতে মহিম নিজের লজ্জার কথাটা মনে না আনিয়া শুধু চারুর লজ্জার কথাটাই ভাবিত, এবং সেই প্রগল্‌ভা চারুর এতটা লজ্জা যে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, ইহাই ভাবিয়া লইত।

ছুটীর দিনগুলা যখন প্রায় শেষ এবং বিবাহের কথাটা পাকাপাকি হইয়া আসিতেছিল, তখন বেহারী একদিন মহিমকে বলিল, "হাঁ হে মহিম, জ্যেঠামশায় কাজটা কি ভাল কচ্ছেন?"

বিস্ময়ের সহিত মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কাজটা?"

বেহারী বলিল "এই চারুর সঙ্গে তোমার বিয়েটা।

মহিম কিছু বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিতভাবে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বেহারী অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল, "চারুর মা লোকের কাছে ব'লে বেড়াচ্চে কি জানো, 'ওরা আমাদের চাইতে কুল-মর্য্যাদায় অনেক ছোট, অসমান ঘর,' শুধু দায়ে পড়েই ওখানে চারুর বিয়ে দিতে হচ্চে?"

মহিম ঈষৎ রাগত স্বরে বলিল, "দায়টা কি?"

বেহারী একবার কাসিয়া গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "বলে—বড় কর্ত্তা দু'টাকা সাহায্য কচ্চে, তাঁর কথা তো এড়াতে পারি না। তা ছাড়া মহিমেরও চারুকে বিয়ে কর্‌বার ঝোঁক আছে।"

গর্জ্জন করিয়া মহিম বলিল, "মিথ্যা কথা, আমার একটুও ঝোঁক নাই।"

বেহারী বলিল, "তা কি আমি জানি না? কি-ই বা এমন পদ্মিনী মেয়ে। তুমি বি এ পাশ কর্‌লে কত রাজা-রাজড়ার পরমা সুন্দরী মেয়ে এসে পায় গড়াগড়ি দেবে। এ সব জেনে শুনেও জ্যেঠামশায় কেন যে এ কাজ কচ্চেন,তা তো বল্‌তে পারি না। শেষটায় লোকে বল্‌বে, ওরাও চিরকাল মনে কর্‌বে, অনাথা ব'লে জোর ক'রে—বুঝ্‌লে কি না।"

মহিম গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি এক কাজ কত্তে পার্‌বে দাদা?"

বেহারী বলিল, "কি কাজ?"

"তুমি বাবাকে বল্‌বে, আমি ওখানে বিয়ে কর্‌বো না।"

বেহারী যেন অতিমাত্র বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বিয়ে কর্‌বে না?"

মহিম দৃঢ়স্বরে বলিল, "কক্ষণো না।"

একটু ভাবিয়া বেহারী বলিল, "কিন্তু তাতে জ্যেঠা-মশায় খুব রাগ কর্‌বেন।"

মহিম বলিল "তা করুন, লোকে তো তাঁর নিন্দা কর্‌তে পার্‌বে না।"

ঘাড় নাড়িয়া বেহারী বলিল, "তা পার্‌বে না বটে, আর সেইটাই আগে দেখা আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু —"

মহিম বলিল, "এর আর কিন্তু নাই দাদা, তোমাকে আমার এই অনুরোধটি রাখ্‌তেই হবে।"

চিন্তিতভাবে বেহারী বলিল, "তা রাখ্‌বো, তবে ভাবছি, জ্যেঠামশায় পাছে তোমার উপর বড্ড বেশী রেগে উঠেন। তাঁর মেজাজ জান তো।"

মহিম বলিল, "তিনি যতই রাগ করুন, আমার সঙ্কল্প অটল।"

অগত্যা বেহারী জ্যেঠামহাশয়কে অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল, এবং অবসরমত জ্যেঠামহাশয়ের নিকট মহিমের সঙ্কল্প জানাইয়া দিল। শুনিয়া বলরাম যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া তাহার এরূপ সঙ্কল্পের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহিম কোন কারণের উল্লেখ করিল না, শুধু বিবাহ করিবে না, এই কথাটাই সংক্ষেপে জানাইয়া দিল। বলরাম তখন নানা প্রকারে পুত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, অনেক দিক্ বিবেচনা করিয়াই তিনি এ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, ইহাতে অসম্মত হইলে রীতিমত ক্ষতির সম্ভাবনা। মহিম কিন্তু ক্ষতি-বৃদ্ধির কথা কানে তুলিল না, শুধু বিবাহ যে করিবে না, ইহাই স্পষ্টভাবে জ্ঞাপন করিল।

বলরাম ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, বিবাহ না করিলে তিনি মহিমকে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন। কথাটা শুনিয়া মহিম শুধু হাসিল, এবং ছুটী শেষে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

কলিকাতায় যাইবার মাসখানেক পরে মহিম পিতার একখানা পত্র পাইল। তাহাতে পিতা তাহাকে বেহারীর বিবাহ উপলক্ষে বাটীতে উপস্থিত হইতে লিখিয়াছেন। কলেজে ছুটী লইয়া মহিম বাড়ী আসিল।

বাড়ী আসিয়া মহিম কিন্তু আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া

থাকিতে পারিল না। দেখিল, চারুর সহিত বেহারীর বিবাহের উদ্যোগ হইয়াছে। বেহারী যেন লজ্জিতভাবে তাহাকে বলিল, "কি করি ভাই, জ্যেঠামশায়ের কড়া হুকুম।"

মহিম খুব উৎসাহ দেখাইয়া বলিল, "বেশ করেছ দাদা, গুরুজনের হুকুম কি অমান্য করে আছে?"

বিবাহে মহিম খুব উৎসাহ দেখাইল, কিন্তু পিতার সম্মুখীন হইতে পারিল না। বৌভাতের পরদিনই সে পুনরায় কলিকাতা যাত্রা করিল।

তার পর এক বৎসর পরে একেবারে পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া মহিম কাচা গলায় দিয়া দেশে ফিরিল। দেশে আসিয়া সে যখন পিতার উইল দেখিল, তখন বেহারীর সম্বন্ধে তাহার মনে যেন একটা ধাক্কা লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা ভয়ানক ক্ষোভ উপস্থিত হইল। সে ক্ষোভটা সম্পত্তির জন্য নয়, চারুর জন্যও নয়, পিতার নিকট অবাধ্যতা প্রকাশের জন্য। স্নেহময় পিতা হৃদয়ে কি নিদারুণ আঘাত পাইয়া তাহার উপর এই কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন, অন্তরে কি দুঃসহ বেদনা লইয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছেন, তাহা সে যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার অনুতাপের সীমা রহিল না। সে অনুতাপের নিকট সম্পত্তি, প্রণয়, চারু সব চাপা পড়িয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া মহিম বৌবাজারের মেসে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং এমনই গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল যে, মেসের অন্যান্য ছাত্রেরা তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। পড়ায় মহিমের কোন দিন আলস্য না থাকিলেও আগে সে দিবা-রাত্রির সকল সময়টাই উহা লইয়া ব্যস্ত থাকিত না, কতকটা সময় মেসের বন্ধুদের সহিত আমোদ-প্রমোদ ও গল্প-গুজবেও অতিবাহিত করিত। কিন্তু এবারে তাহাকে তেতালার নির্জ্জন ঘরটিতে বদ্ধ থাকিতে দেখিয়া ছাত্রমহলে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল, এবং কেহ কেহ ইহার কারণ জানিবার জন্য প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। মহিমের কিন্তু একই সংক্ষিপ্ত উত্তর, "পাশটা তো করা চাই।" কিন্তু পাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা যে নূতন নহে, এবং তজ্জন্য সে কোন দিনই এই তেতালার ঘরটিকে কেন্দ্র করিয়া এরূপ নির্জ্জনবাসের আবশ্যকতা অনুভব করে নাই, ইহা সকলেই জানিত, সুতরাং তাহার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না।

মহিম কিন্তু তাহাদের সন্তোষ-অসন্তোষের দিকে লক্ষ্য করিয়া আপনার এই নির্জ্জন-বাস ত্যাগ করিল না। কলেজের সময় ব্যতীত বাকী সমস্ত সময়টাই সে এই ক্ষুদ্র গৃহখানির মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিত। স্নানাহারের সময়ে একবার করিয়া নীচে যাইত মাত্র। সেইটুকু সময়েই ছাত্রমণ্ডলী হইতে এত প্রশ্ন ও বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইত যে, নিতান্ত অসহ্য হইলেও মহিম তাহা নীরবেই সহ্য করিয়া যাইত। কেহ বলিত, "ওহে, মহিম বাবু আজকাল রাজনীতির আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত আছেন।" কেহ বলিত, "না হে না, প্রেমনীতির আলোচনা, এবার মহিমচন্দ্র দেশে গিয়ে প্রেমে পড়েছে।" অপরে বলিত, "প্রেমটা দেশের আমদানী নয় হে, বৈদেশিক। দেখনি, পাশের বাড়ীতে একঘর নতুন ভাড়াটে এসেছে।" মহিম রাগে ফুলিতে ফুলিতে আপনার ঘরে চলিয়া যাইত।

পাশের বাড়ীতে নূতন ভাড়াটে আসিয়াছিল, অথবা পুরাতন ভাড়াটিয়া ছিল, প্রকৃতপক্ষে মহিম তাহা জানিত না, জানিবারও কোন প্রয়োজন অনুভব করিত না। তবে আজকাল সে এইটুকুমাত্র দেখিত, রোজ সকালে একটি চৌদ্দ পনের বছরের মেয়ে পাটের কাপড় পরিয়া, ভিজা চুল পিঠে দিয়া ছাদে উঠিত, এবং ছাদের এক কোণে বিলাতী টালি দিয়া ছাওয়া যে একটি ছোট ঘর আছে, সেই ঘরে ঢুকিত। সে ঘরটা জানালা দিয়া দেখা যাইত না। সম্ভব পূজা আহ্নিক করিত। প্রায় আধঘণ্টা পরে মেয়েটি সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া খানিকক্ষণ ছাদে বেড়াইত এবং অনেক সময় মহিমের ঘরের জানালার সম্মুখেই ছাদের আলিসার উপর বুকে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। সে যখন ছাদের অপর দিকে বেড়াইত, মহিম তখন বরং এক একবার তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিত, কিন্তু সে জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে

মহিম এতই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত যে, সে আর মুখ তুলিয়া সে দিকে চাহিতে পারিত না। মেয়েটি কিন্তু বেশ সঙ্কোচশূন্য দৃষ্টিতে তাহার খোলা জানালার দিকে চাহিয়া থাকিত। জানালাটা বন্ধ করিয়া দিতে মহিমের এক একবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু লজ্জাবশতঃ বন্ধ করিতে পারিত না। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি নীচে নামিয়া যাইত, সমস্ত দিবা-রাত্রির মধ্যে আর তাহাকে ছাদে দেখা যাইত না।

মহিম প্রায় তিন বৎসর এই মেসে আছে। কিন্তু এবার বাড়ী হইতে আসিবার আগে সে আর কখনও এই মেয়েটিকে দেখে নাই। সুতরাং মেয়েটি কে, ইহা জানিবার জন্য সময়ে সময়ে তাহার একটা কৌতূহল উপস্থিত হইত, কিন্তু সে কৌতূহল-পরিতৃপ্তির কোন উপায় সে দেখিতে পাইত না। সে বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল, মেয়েটির সীঁথায় সিন্দুর নাই, কিন্তু বামহস্তের প্রকোষ্ঠে লোহা আছে। সুতরাং মেয়েটি যে অবিবাহিতা, সে সম্বন্ধে মহিমের কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হিন্দুর ঘরে এত বড় কুমারী মেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়। ব্রাহ্ম হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্ম-রমণীদের হাতে লোহা থাকে না। এ দিকে সময়ে সময়ে সেই বাড়ী হইতে হার্ম্মোনিয়ম-সংযোগে বামা-কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনিও শুনা যাইত। যদিও মহিম কোন দিনই মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনে নাই, তথাপি সে শপথ করিয়া বলিতে পারিত যে, এই গলা সেই মেয়েটি ছাড়া আর কাহারও নহে। হিন্দুর ঘরে এত বড় মেয়ে, সে আবার গান গায় অথচ অবিবাহিতা, মেয়েটির সম্বন্ধে মহিম যতই ভাবিত ততই তাহার পরিচয় জানিবার জন্য তাহার একটা প্রবল ঔৎসুক্য জন্মিত।

এক একবার মহিম বিরক্ত হইয়া ভাবিত, 'মেয়েটি যেই হোক্ না, আমার তাতে কি? তার পরিচয় জেনে আমার কি লাভ?' লাভ না থাকিলেও মহিম কিন্তু আপনার ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি করিতে পারিত না, এবং দৃঢ় সংকল্প সত্ত্বেও সকালবেলা জানালাটা বন্ধ না করিয়াই ঠিক তাহার সম্মুখে চৌকীটা টানিয়া বই লইয়া বসিত, এবং যতক্ষণ না মেয়েটি ছাদে আসিত, ততক্ষণ বার বার সেই দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকিত।

কিন্তু এই বিষয়টা লইয়া মেসের ছেলেরা যখন পরিহাস আরম্ভ করিল, এবং ঘরের অন্তদিকের জানালার পাশে যথেষ্ট আলোক সত্ত্বেও ঐ ছাদের দিকের জানালাটার পাশে বসিবার কারণ জানিবার জন্য মহিমকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, তখন মহিম বিরক্ত হইয়া একদিন সকালে জানালাটা বন্ধ করিয়া রাখিল। সে দিন কিন্তু মহিম অন্তরে এমন একটা অশান্তি ভোগ করিয়াছিল যে, পরদিন সে জানালা না খুলিয়া থাকিতে পারিল না, এবং লোকের অমূলক সন্দেহের উপর আস্থাস্থাপন করায়, আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

এ দিকে মাসকাবারে যখন মেসের অধ্যক্ষ মনোমোহন বাবু চৌদ্দ টাকা পাঁচ আনার বিল লইয়া উপস্থিত হইল, তখন মহিম যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। স্কলারসিপের বারটি টাকা মাত্র সম্বল, কিন্তু কলেজের মাহিনা পাঁচ টাকা দিতে হইবে, তা ছাড়া হাতখরচ আছে। মনোমোহন বাবুকে দুই চার দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া মহিম সে দিন কলেজ কামাই করিয়া একটা প্রাইভেট টিউশনীর চেষ্টায় সারাদিন বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইল।

সপ্তাহখানেক চেষ্টা করিয়াও মহিম যখন একটা দশ টাকা মাহিনারও প্রাইভেট টিউশনীর যোগাড় করিতে পারিল না তখন সে হতাশ হইয়া ভাবিল, আর পড়ার আশা বৃথা। কিন্তু পড়া ছাড়িলেও মেসের দেনাটা তো শোধ করিতে হইবে? মহিম স্থির করিল, বই, বিছানা, কাপড়-চোপড় বেচিয়া মেসের দেনা শোধ করিবে এবং তার পর সে কোন দূর-দেশে গিয়া জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা দেখিবে। মহিম আপন সঙ্কল্পের কথা মনোমোহন বাবুকে জানাইল। মনোমোহন বাবু মহিমকে একটু ভালবাসিতেন, সুতরাং তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ওহে, একেবারে হতাশ হয়ো না, আরও হপ্তাহখানেক ঘুরে দেখ, আমরাও চেষ্টায় রইলাম।"

মহিম কিন্তু এমনই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার আর চেষ্টা দেখিতে প্রবৃত্তি হইল না। কলেজ যাওয়াও ছাড়িয়া দিল। দিনরাত ঘরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। এক একবার বই লইয়া বসিত; কিন্তু বসিত মাত্র, তাহাতে আদৌ মন দিতে পারিত না, বই হাতে শুধু ছাদের দিকে সেই খোলা জানালাটির পাশে বসিয়া অদৃষ্টের ভীষণ নিষ্ঠুরতা চিন্তা করিত।

সে দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া মহিম তাঁর

অদৃষ্টের কথা কথা চিন্তা করিতেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে চাঁদ ছিল না, সন্ধ্যার পর হইতেই একটা জমাট মেঘে আকাশটা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। মহিম সেই জমাট-বাঁধা স্তব্ধ মেঘের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

সহসা পাশের ছাদে আলোকরেখা দেখা গেল। মহিম কোন দিনই এমন সময়ে এই ছাদে কোন আলো বা কোন লোককে আসিতে দেখে নাই। সুতরাং সে একটু বিস্মিতভাবে আলোর দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে আলোটা সমগ্র ছাদে ছড়াইয়া পড়িল এবং শেষে তাহারই জানালার কাছে আসিয়া থামিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু অথচ শঙ্কা-কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "আপনি জেগে আছেন?"

সেই মেয়েটি। মহিমের বুকের ভিতর যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে স্তব্ধকণ্ঠে উত্তর দিল, "হাঁ।"

মেয়েটি বলিল, "আমাদের বড় বিপদ্।"

মহিম উঠিয়া জানালার গরাদে দুইটি চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বিপদ্?"

উত্তর হইল, "বাবার বড অসুখ। একজন ডাক্তার—"

কথা-সমাপ্তির অবসর না দিয়াই মহিম ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "এখনই ডেকে দিচ্ছি। পাশের বাড়ীর দরজা তো?"

মেয়েটি বলিল, "হাঁ, আমি দরজা খুলে রাখ্‌ছি।"

মহিম আল্‌না হইতে সার্টটা টানিয়া লইয়া গায়ে দিতে দিতেই ঘরের বাহির হইল, এবং নীচে গিয়া বেহারাকে তুলিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহাকে বলিয়া গেল, "তুই একটু সজাগ থাকিস্, আমি ডাকলে দরজা খুলে দিবি।"

এত রাত্রে বাবুকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া বেহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেলা আটটার সময় মহিম চোখ রগড়াইতে রগ-ড়াইতে বিছানা হইতে উঠিয়া দেখিল, তাহার ঘরের সামনে ছাদের উপর রমেশ, সতীশ, করুণা প্রভৃতি চার পাঁচ জন ছেলে আসিয়া জটলা করিতেছে। মহি-মকে উঠিতে দেখিয়া সতীশ বলিল, "কি হে মহিম, আজ এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম যে? কা'ল অনেক রাত অবধি পড়েছিলে বুঝি?"

কথাটা বলিয়াই সতীশ ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। করুণা বলিল, "ওহে, মহিম বাবু আজকাল নিশাচর হয়েছেন। বাবা, ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও জানতে পারে না বটে, কিন্তু মেসের ছেলেদের কাছে তা লুকোনো থাকে না।"

রমেশ একটু গম্ভীরভাবে বলিল, "হাঁ হে মহিম, কা'ল রাত দু'টোর সময় দরজা খুলে চুপি চুপি বাইরে গেলে, ব্যাপারটা কি?"

মহিম বিরক্তভাবে বলিল, "চুপি চুপি যাব কেন, ভজুকে ডেকে তুলে তবে গিয়েছিলাম।"

রমেশ বলিল, "সেটাও চুপি চুপির সামিল। কিন্তু রাত দু'টোর সময়—"

করুণা পরিহাস-তীব্রকণ্ঠে বলিল, "পড়তে গিয়ে-ছিল, প্রেমের পাঠ নিতে গিয়েছিল। তার পর ফির্‌লে কখন্? ভোরের বেলায় বুঝি?"

বলিয়া গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল—

"ভোরের বেলা চিকণ কালা কুঞ্জে এলে কি কারণ।"

ইহাদের কথায় মহিম শুধু বিরক্ত হইল না, শঙ্কিত দৃষ্টিতে বার বার জানালার দিকে চাহিতে লাগিল, পাছে এই সময় মেয়েটি ছাদে আসে, এবং এই সকল কুৎসিত পরিহাস তাহার কানে যায়। নগেন এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এখন সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাই তো বলি, মহিম বাবুর পড়ার উপর হঠাৎ এতটা ঝোঁক পড়লো কেন। ওহে, আমরাও পড়া-শোনা ক'রে থাকি, আমাদেরও পাশ করবার আশা আছে।"

সতীশ এবার তাহাকে পাইয়া বসিল, বলিল, "সেটা কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ দুরাশা। আমি দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, তুমি যদি কোন দিন পাশ কত্তে পার, তা হ'লে আমি আমার পুঁথি-পত্র সব গঙ্গাজলে নিক্ষেপ ক'রে দেশে ফিরে যাব।"

নগেন রাগিয়া বলিল, "পাশ যদি সাত বছর না কত্তে পারি, তবু বাপের পয়সায় খরচ চালিয়ে এ রকম প্রেমের পড়া পড়্‌তে পার্‌বো না।"

মহিম এবার গম্ভীরভাবে বলিল, "দেখ, তোমরা বাজে ভুল ধারণা নিয়ে এত বক্তৃতা দিচ্চ। ব্যাপারটা কি, যদি শোন—"

করুণা বলিল, "সেটা দয়া ক'রে শুনিয়ে দিলেই

পার। ফুল হাতে কর্ত্তে হবে না কি? ওহে নগেন, গোটাকতক ফুল নিয়ে এস।"

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আসল ব্যাপারটা কি হে মহিম?"

মহিম আঙ্গুল বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "পাশের ঐ বাড়ীতে একটি ভদ্রলোক ভাড়াটে আছে, জান?"

সতীশ বলিল, "ভাড়াটে যে আছে, তা জানি, তবে ভদ্র কি অভদ্র, সাধু কি অসাধু, এত পরিচয় নেবার অবশ্যক হয়ে ওঠেনি।"

রমেশ বলিল, "ভাল, ধ'রে নিলাম ভদ্রলোক। তার পর?"

মহিম বলিল, "কা'ল রাত বারোটার পর হঠাৎ তাঁর ভেদবমি আরম্ভ হয়। অথচ বাড়ীতে এমন পুরুষমানুষ নাই যে, ডাক্তার ডেকে আনে। চাকরটা পর্য্যন্ত কা'ল বাড়ী ছিল না।"

করুণা বলিল, "তাই ডাক্তার ডাক্‌তে তোমার ডাক পড়েছিল বুঝি?"

মহিম, বলিল, "পাশাপাশি থাকলেই এ রকম বিপদে লোকে সাহায্যের প্রত্যাশা ক'রে থাকে। পল্লীগ্রামে এরূপ স্থলে এক পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় পর্য্যন্ত ডাক পড়ে। আর মানুষের সমাজবদ্ধ হয়ে বাস কর্‌বার কারণও তাই।"

সতীশ গম্ভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন করিয়া উত্তর করিল, "তার কোনই সন্দেহ নাই। তবে শুধু এইটুকুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, নীচে ভজু, দোতালায় আমরা, এই ব্যূহ ভেদ ক'রে ডাকটা তেতালায় তোমার কাছে কিরূপে উপস্থিত হ'লো?"

করুণা বলিল, "তা বুঝি জান না, ওঁদের ছাদের সঙ্গে মহিমের জানালার যে টেলিফোঁ আছে।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। বিরক্তভাবে মহিম বলিল, "এই সোজা কথাটা নিয়ে এত রসিকতা দেখান অনাবশ্যক। মেয়েমানুষ রাস্তায় গিয়ে দরজা ঠেলে ডাক্‌তে পারে না, তার চাইতে ছাদে উঠে পাশের জানালায় ডাকাটা খুব সহজ।"

সতীশ বলিল, "তা হ'লে আহ্বানকর্ত্রী রমণী।"

করুণা বলিল, "এবং পঞ্চদশী। কৈশোর যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।"

মহিম তাহাদের উপর একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, এবং সার্টখানা গায়ে দিয়া চটী-জুতায় ফট্-ফট্ শব্দে যেন তাহাদের এই বিরাট্ সমালোচনার উপর আপনার সম্পূর্ণ অবজ্ঞা জানাইয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেল। তখন সকলে মহিমের অধঃপতন সুনিশ্চিত কি না, ইহাই লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। নগেন দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল যে, মহিমের এই কার্য্যটার ভিতর পরোপকার-প্রবৃত্তির গন্ধমাত্র নাই, ইহা সম্পূর্ণ গুপ্ত প্রণয়ের উত্তেজনা-সম্ভূত। তাহার নিজের পরোপকার-প্রবৃত্তি মহিমের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে, এবং সুযোগ পাইলে সে ইহা অপেক্ষা পরোপকারের মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে, কিন্তু অভিভাবকদিগকে ফাঁকি দিয়া গুপ্ত প্রণয়ের জন্য সে এরূপে সময় নষ্ট করিতে আদৌ রাজি নহে।

সতীশ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, নগেনের মত লোকের দ্বারা কোন মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইতে পারে না। মহিমের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা তাহার সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। নগেন ইহাতে রাগিয়া উঠিল, এবং রাগের মাথায় সতীশকে দুই চারি কথা শুনাইয়া দিল। সতীশও তাহার উত্তর দিতে ছাড়িল না। তখন উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত দেখিয়া রমেশ মাঝে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল।

মহিম মেস হইতে বাহির হইয়া পাশের বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইল, এবং বাড়ীর ভিতর যাওয়া উচিত কি না, দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। এমন সময় চাকরটা নীচে আসিলে মহিম তাহাকে বাবু কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করিল। চাকর উত্তর দিল, বাবু একটু ভাল আছেন। অতঃপর মহিম উপরে যাইবার প্রয়োজন জানাইবে, অথবা চলিয়া যাইবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। কিন্তু তাহাকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না, উপরের বারান্দা হইতে আহ্বান আসিল, "উপরে আসুন।"

মহিম একবার উপরের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল, এবং ধীরপদে সিঁড়ির উপরে উঠিল। সেই মেয়েটি তাহাকে লইয়া পিতার রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত করিল। মহিম ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন?"

রোগী বাবু অভ্যর্থনাপূর্ব্বক মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "অনেকটা ভাল। বস্‌তে জায়গা দে লতি।"

লতি একখানা জলচৌকি ঝাড়িয়া পাতিয়া দিল। মহিম তাহাতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার ডাক্‌বার দরকার হবে কি?"

বাবু বলিলেন, "আমার বোধ হয়, না ডাক্‌লেও চলে। বদ্‌হজমের জন্যই হঠাৎ—"

বাধা দিয়া লতি বলিল, "না বাবা, আজ আর একবার ডাক্তার এসে দেখে যাওয়া দরকার।"

লতি মহিমের মুখের দিকে চাহিল। মহিম বলিল, "আমারও মত তাই।"

বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনাদের সকলেরই যখন মত, তখন তাই হোক। কিন্তু বৃথা আপনি আর কষ্ট করবেন।"

মহিম চৌকী ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এ আর এমন কষ্ট কি?"

বলিয়াই মহিম ঘরের বাহির হইয়া গেল, এবং একটু পরেই ডাক্তার সঙ্গে উপস্থিত হইল। ডাক্তার রোগী দেখিয়া বলিলেন, "আর কোন ভয় নাই। তবে ওষুধটা আজও চলুক, দু'চার দিন একটু সাবধানে থাকবেন।"

ডাক্তার প্রেস্‌ক্রপসন্ লিখিয়া দিয়া দর্শনী লইয়া প্রস্থান করিলেন। মহিম ঔষধ লইয়া আসিতে চাহিল। বাবু বলিলেন, "না না, আপনার আর কষ্ট করতে হবে না, চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছ।"

বাবু লতিকে চাকর ডাকিতে বলিলেন। লতি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সে এইমাত্র বাজারে গিয়াছে।"

বাবু বলিলেন, "বাজার থেকে ফিরে ওষুধ আনবে এখন। আপনাকে আর ছুটোছুটি কত্তে হবে না।"

মহিম বলিল, "ছুটোছুটি আর কি, মোড়েই ডিস্‌পেন্সারী, বেড়াতে বেড়াতে ওষুধটা নিয়ে আসি। চাকরের বাজার হ'তে ফিরে ওষুধ আনতে দেরী হয়ে যাবে।"

লতি বাপের বিছানার নীচে হইতে চাবী লইয়া বাক্স খুলিয়া মহিমের হাতে টাকা দিল। মহিম টাকা লইয়া ঔষুধ আনিতে গেল। সে চলিয়া গেলে লতি বলিল, "ভাগ্যে এই বাবুটি ছিলেন বাবা।"

বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অনাথের দৈব সথা মা।"

আধঘণ্টার মধ্যেই মহিম ঔষধ লইয়া ফিরিল। লতি পিতাকে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। অতঃপর মহিম বিদায় প্রার্থনা করিল। বাবু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি যে উপকার করেছেন, তা আমাদের জীবনে ভুলবার নয়। কা'ল রাত্রে আপনি না এসে পড়্‌লে মেয়েগুলা যে কি কর্ত্তো তা বলা যায় না।"

উত্তরে মহিম মাথা নীচু করিয়া বিনীতভাবে বলিল যে, সে তাঁহাদের এমন বিশেষ কোন উপকার করে নাই, মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, সে তাহাই করিয়াছে মাত্র। ইহাতে প্রশংসার এমন কিছু নাই।

অতঃপর বৈকালে পুনরায় আসিয়া দেখিয়া যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া মহিম বিদায় গ্রহণ করিল। মেসে গিয়া ভাবিতে লাগিল, "লতি—লতিকা, স্বর্ণলতা, হেমলতা পুরো নামটি কি?"

বৈকালে মহিম আসিলে বাবুটি তাঁহাকে যত্ন করিয়া বসাইলেন, এবং তাহার নামধামাদির পরিচয় জানিতে চাহিলেন। মহিম আপনার পরিচয় দিল, তবে তাহার পিতা যে সম্পত্তিশালী ছিলেন, এবং সে সেই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এই কথাটুকু গোপন করিল।

বাবু অযাচিতভাবে নিজের পরিচয় দিলেন। তাঁহার নাম বিপিনবিহারী বসু, নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত কোন এক গ্রামে। তিনি কোম্পানীর কাগজের দালালি করেন। কার্য্য উপলক্ষে বহু দিন হইতেই তিনি দেশত্যাগী। আগে দর্জ্জিপাড়ায় ছিলেন। কিন্তু সেখানে অসুবিধা হওয়ায় দুই মাস হইল এই বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীটার ভাড়া বড় বেশী, সত্তর টাকা। তবে সুখের মধ্যে বাতাস রোদ বেশ আছে। পরিবারও বেশী নয়, স্ত্রী আর কন্যা হেমলতা। বেশীর মধ্যে একজন উড়ে বামন, আর একজন বেহারবাসী ভৃত্য।

গৃহিণীও তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপস্থিত হইলেও তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মহিম বিমুগ্ধ হইল, এবং হেমলতা যে তাঁহার উপযুক্ত কন্যা, ইহা বুঝিতে পারিল। গৃহিণী প্রথমটা নীরবেই ছিলেন, কিন্তু বিপিন বাবু যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, মহিম তাঁহাদের ছেলের মত, তাহার সহিত কথা কহিতে কোন দোষ নাই, তখন তিনি এমনই সহাস্য স্নেহকোমল স্বরে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যে, মহিম তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না।

এই সকল কথাবার্ত্তার মধ্যে হেমলতা চা প্রস্তুত করিয়া মহিমকে খাওয়াইয়া দিল। শেষে বিপিন বাবু তাহাকে গান শুনাইয়া দিবার জন্য হেমলতাকে আদেশ করিলেন। হেমলতা একটু ইতস্ততঃ করিতে

লাগিল। কিন্তু মহিমও যখন তাহার সঙ্গীত শ্রবণ জন্য নিতান্ত ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন সে না গাইয়া থাকিতে পারিল না। হার্ম্মোনিয়মে সুর দিয়া অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে গলা ছাড়িল। কিন্তু গলা অধিকক্ষণ মৃদু রহিল না, ক্রমে তাহা উদারা ছাড়াইয়া মুদারায়, মুদারা ছাড়াইয়া তারায় উঠিল, কণ্ঠের উত্থানে পতনে সুরে ঢেউ খেলিতে থাকিল,গমকে মূর্চ্ছনায় সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া গৃহ-মধ্যে সুধার স্রোত ঢালিয়া দিতে লাগিল। মহিম বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে বসিয়া সে সুধা আকণ্ঠ পান করিতে থাকিল। ইমনের মধুর তান গৃহের ক্ষুদ্র আয়তন অতিক্রম করিয়া সান্ধ্য গগনে ছড়াইয়া পড়িল। হেমলতা যেন ভাবে তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিল,—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।
কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ স্মরি সরমে যে হই সারা॥"

গান থামিল, কিন্তু সুর যেন থামিতে চাহিল না। তাহা মহিমের সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়কে ঝঙ্কৃত করিয়া বাজিতে লাগিল—তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা। মহিম যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতে লাগিল।

বিপিন বাবু শেষে বলিলেন, "তিনি হিন্দু হইলেও এবং হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা থাকিলেও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কতকগুলি আচার গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যেমন স্ত্রীশিক্ষা, মেয়েদের গান-বাজনা শেখান ইত্যাদি। ইহাতে ঘরে বসিয়া এমন কতকগুলি বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করা যায়, যা আমাদের হিন্দু-গৃহে দুর্লভ।"

মহিম এ বিষয়টা লইয়া কখনও মাথা না ঘামাইলেও অকপটচিত্তে বিপিন বাবুর মতের সমর্থন করিল। অতঃপর বিপিন বাবু হেমলতার জন্য একজন মাষ্টার দেখিয়া দিতে মহিমকে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "মেয়েটা বাঙ্গালা বেশ শিখেছে, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষাটা বড় বেশী হয় নাই। অথচ মেয়েকে কলেজে দিতেও প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং বিএ পাশ বা বিএ পড়ে, এরূপ একটি সচ্চরিত্র মাষ্টার অনেক দিন হইতেই খুঁজিতেছি, কিন্তু পাইতেছি না। কোন অজানা অচেনা ছোকরার কাছে এত বড় মেয়েকে পড়াতে দেওয়াও ভাল দেখায় না। সুতরাং টাকা তিরিশ মাহিনায় বেশ জানাশুনা ভাল মাষ্টার যদি দেখিয়া দিতে পার, তবে বড়ই উপকৃত হই।"

মহিম চেষ্টা দেখিতে স্বীকৃত হইয়া সে দিন বিদায় গ্রহণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহিম চটীজুতার ফট্ ফট্ শব্দ করিয়া দোতালায় উঠিতেই পাশের ঘর হইতে সতীশ ডাকিয়া বলিল, "কে, মহিম না কি ?"

মহিম উত্তর দিল, "হাঁ।"

সতীশ বলিল, "কোথায় গিয়েছিলে? পরোপ-কৃতয়ে বুঝি ?"

মহিম তেতালার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া তাচ্ছীল্যের সহিত উত্তর দিল, "কেন ?"

সতীশ বলিল, "চলেই যাও যে? ওহে, পরোপ-কারটা তোমারই একচেটে নয়, সুবিধা হ'লে আমরাও যে ও পরম ধর্ম্মটার একটু আধটু অনুষ্ঠান কত্তে পারি না, এমন মনে করো না।"

মহিম দাঁড়াইয়া পশ্চাতে চাহিয়া বলিল, "এমন অস্বাভাবিক কথা আমি মনেই করি না।"

সতীশ বলিল, "মনে যখন কর না, তখন দয়া ক'রে কথাটা শুনলেই পার।"

ঈষৎ হাসিয়া মহিম বলিল, "তুমিও দয়া ক'রে গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে কথাটা বল্লেই পার।"

সতীশ একটু শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, "ওহো, তোমার আবার সময় বড় কম, পড়ায় বড় ব্যস্ত। আচ্ছা, সংক্ষেপেই বল্‌ছি, তোমার একটি পড়ানর যোগাড় করেছি দেড়ঘণ্টা পড়াতে হবে, পনর টাকা মাহিনা। বুঝেছ ?"

মহিম ফিরিয়া তাহার দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ।"

সতীশ বলিল, "শুধু ধন্যবাদ নয়, কা'ল থেকেই পড়াতে হবে।"

ঈষৎ চিন্তিতভাবে মহিম বলিল, "কা'ল থেকেই ?"

রুক্ষস্বরে সতীশ বলিল, "কেন, কা'ল তোমার কোথাও পরোপকারের এন্‌গেজমেন্ট আছে না কি ?"

মহিম একটু রাগিয়া বলিল, "দেখ সতীশ, পরোপকার কথাটা এমন তুচ্ছ নয় যে, তাই নিয়ে এত রসিকতা করা যায়।"

হাসিতে হাসিতে সতীশ বলিল, "ঠিক কথা মহিম, পরোপকারঃ পরমো ধর্ম্মঃ। পরম ধর্ম্মটাকে নিয়ে এত নাড়াচাড়া করা ভাল নয়। আচ্ছা, ওটার জন্য মাপ চাইচি, কিন্তু কা'ল পড়াতে যাওয়ার বাধাটা কি আছে, শুনতে পাই কি?"

মহিম মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া জুতার আগাটা দরজার উপর ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "বাধা অপর কিছু নাই, তবে আর একটা টিউশনীর যোগাড় হয়েছিল।"

ব্যস্তভাবে সতীশ বলিল,"তাই না কি? কত টাকা মাইনে?"

মহিম উত্তর দিল, "ত্রিশ টাকা।"

সতীশ বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া মহিমের মুখের দিকে চাহিল, উৎসাহিত-কণ্ঠে বলিল, "তিরিশ টাকা? বল কি হে, কোথায়? যেখানে হোক, লেগে যাও। আমি কা'ল এদের জবাব দিয়ে আসবো।"

মহিম বলিল, "এত তাড়াতাড়ি জবাব কেন, দুটো দিন যাক্ না।"

বিস্মিতভাবে সতীশ বলিল, "দুটো দিন গিয়ে কি হবে? তিরিশ টাকা ছেড়ে পনরো টাকায় লাগবে না কি?"

ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মহিম বলিল, "ত্রিশ টাকা বটে, কিন্তু ভাব্‌ছি—"

সতীশ বসিয়াছিল, লাফাইয়া উঠিল, এবং মহিমের কথা-সমাপ্তির অবসর না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "ভাবচো? তিরিশ টাকা মাইনে, দিব্যি খরচ চ'লে যাবে, তার আবার ভাবচো?"

ঈষৎ বিরক্তভাবে মহিম বলিল, "চীৎকার কর কেন, কথাটা আগে শোনই না।"

সতীশ পুনরায় বিছানার উপর বসিয়া পড়িল, বলিল, "আচ্ছা, কথাটা কি, বল।"

মহিম বলিল, "তিরিশ টাকা মাহিনা বটে, কিন্তু মেয়েছেলেকে পড়াতে হবে।"

হাতে হাত চাপড়াইয়া উত্তেজিত-কণ্ঠে সতীশ বলিল, "কুছ পরোয়া নেই, তিরিশ টাকায় মেয়ে মদ্দ চুলোয় যাক, আমি হিজড়েকে পর্য্যন্ত পড়াতে পারি।"

মহিম বলিল, "পনর ষোল বছরের মেয়েকে পড়ান একটু ভাবনার কথা নয় কি?"

এবার সতীশের মুখেও যেন একটু চিন্তার রেখা দেখা দিল। সে গম্ভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন করিয়া বলিল, "পনর ষোল বছরের মেয়ে, ভাবনার কথা বটে, কিন্তু তিরিশটে টাকা। যা থাকে কপালে, লেগে যা মহিম।"

মহিম বলিল, "একটা দিন ভেবে দেখি।"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে সতীশ বলিল, "আচ্ছা, আমিও ভাবি। ভাবনা একটু আছে বৈ কি। শেষে একখানা নাটকের সৃষ্টি, আর তার উপসংহারটা ট্র্যাজিডি হ'তে পারে।"

মহিম ঈষৎ গর্ব্বপূর্ণ স্বরে বলিল, "আমি কিন্তু অতটা আশা করি না সতীশ, মনের উপর আমার বেশ জোর আছে।"

চিন্তিতভাবে সতীশ বলিল, "গোড়ায় অমন জোর অনেকেরই থাকে হে, কিন্তু শেষে—না মহিম, কাজ নাই তিরিশ টাকায়, পনর টাকাই ভাল।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি" বলিয়া মহিম উপরে চলিয়া গেল। সতীশ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। একটু পরে করুণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওহে, মহিম যে সারা বিকেলটা ও বাড়ীতে কাটিয়ে এলো।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ বাড়ীতে?"

করুণা বলিল, "পাশের বাড়ীতে হে। প্রায় ৪টার সময় ঢুকেছিল, এই মাত্র বেরিয়ে এলো। ব্যাপারটা কি?"

রাগতভাবে সতীশ বলিল, "চুলোয় যাক্, 'যে কাঠ খাবে, সে আঙ্গরা ওগরাবে।' আমাদের কি বল, 'একবৃক্ষসমারূঢ়া নানাপক্ষি বিহঙ্গমা।' চুলোয় যাক্ মহিম, oil your own machine"

আঁকের খাতাটা টানিয়া লইয়া সতীশ আঁক কষিতে বসিল। করুণা একটু বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

মহিম সারারাত ভাবিল, কিন্তু কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। স্থির-সিদ্ধান্ত না হইলেও পনের টাকা অপেক্ষা ত্রিশ টাকার মাহিনার দিকেই তাহার মনটা যেন কিছু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার মধ্যেও বেতনের আধিক্যের প্রলোভন অপেক্ষা হেমলতাকে পড়াইবার প্রলোভনটাই যেন তাহাকে এই দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহিম কিন্তু সেটাকে

চাপা দিয়া অর্থাধিক্যের প্রলোভনটাকেই বেশী করিয়া দেখিতে লাগিল। সে মনকে বুঝাইল যে, এই ত্রিশ টাকা মাহিনার কাজটায় যদি হেমলতা না হইয়া হেমচন্দ্র হইত, এবং হেমলতা যদি পনের টাকার মধ্যে থাকিত, তাহা হইলেও সে হেমলতাকে ছাড়িয়া হেমচন্দ্রকেই স্বীকার করিয়া লইত। পড়াইবে, মাহিনা লইবে, ইহাতে হেমচন্দ্রই বা কি, আর হেমলতাই কি? পড়াইতে গিয়া সে তো আর প্রেমের অভিনয় করিতে যাইতেছে না।

কিন্তু একটা বিষয়ে বড় গোল বাধিল, বিপিন বাবু তাহাকে মাষ্টারের সন্ধান করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাকে স্বয়ং মাষ্টাররূপে নিযুক্ত করিবার কথা তো কিছু বলেন নাই। তিনি না বলিলে মহিমও তো সাধিয়া আপনাকেই শিক্ষকরূপে স্বীকার করিতে পারিবে না? অন্যত্র তাহা পারিলেও এখানে পারে না, পারা উচিত নয়। তাহাতে একটা লজ্জা আসিবে, হেমলতাও হয় তো কিছু মনে করিতে পারে। সুতরাং মুখ ফুটিয়া শিক্ষকতা-স্বীকার কিছুতেই চলিতে পারে না, এ জন্য বিপিন বাবুর অনুরোধের আবশ্যক। অথচ তাঁহার সে অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে যদি সতীশের সংগৃহীত কাজটাও হাতছাড়া হইয়া যায়? মহিম স্থির করিল, কা'লই গিয়া ইহার একটা শেষ নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

পরদিন অপরাহ্ণে মহিম বিপিন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর বিপিন বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাষ্টারের কোন সন্ধান হইল কি না! উত্তরে মহিম একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, মাষ্টার অনেক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হেমলতাকে পড়াইবার উপযুক্ত মাষ্টার বিরল। কারণ, অন্যের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দেওয়া দুষ্কর।

শুনিয়া বিপিন বাবু যেন একটু চিন্তিত হইলেন। গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা, মহিম বাবু তো বি এ পড়েছেন, উনিও তো পড়াতে পারেন।"

বিপিন বাবু ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিললেন, "খুব পারেন। কিন্তু মহিমের কি সময় হবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "ঘণ্টাখানেক সময় বৈ তো নয়। এটুকু সময় মহিম বাবু আমাদের দিতে পারেন না?"

গৃহিণী সাগ্রহ দৃষ্টিতে মহিমের মুখের দিকে চাহিলেন। মহিম মাথা নীচু করিয়া ইতস্ততঃ ভাবে উত্তর করিল, "এক ঘণ্টা সময়—তা আচ্ছা, চেষ্টা করিলে বোধ হয়—"

বাধা দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বোধ হয় নয়, আপনাকেই এ কষ্টটুকু স্বীকার ক'রে নিতে হবে।" তার পর স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু জোর গলায় বলিলেন, "সেই বেশ হবে। তুমি যতই বল, আমার তো লতিকে যে সে মাষ্টারের হাতে দিয়ে বিশ্বাস হয় না।"

ঈষৎ হাসিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "তোমার যখন মহিমের উপরেই এতটা বিশ্বাস, তখন মহিমকে কাজেই এ সময়টুকু দিতে হবে। অন্ততঃ তোমার অনুরোধে। কি বল মহিম?"

মৃদু হাসিয়া মহিম হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "আনন্দের সহিত।"

বিপিন বাবু একটু সোজা হইয়া বসিয়া যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "যাক্, বাঁচা গেল। তা হ'লে মহিম, কা'ল থেকে পড়াতে সুরু কর। সময়—যখন তোমার সময় হবে।"

মহিম নতমস্তকেই উত্তর দিল, "আচ্ছা।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "অপর কিছু পড়াবার দরকার নাই, শুধু এক আধটু ইতিহাস আর সাহিত্য। ইংরাজী সাহিত্যের উপরেই আমার ঝোঁকটা বেশী, বুঝলে কি না?"

মহিম মাথা নাড়িয়া ইহাতে সম্মতি জানাইল। বিপিন বাবু বলিলেন, "তা হ'লে এক মাসের মাহিনাটা আগাম নিয়ে যাও। লতি!"

বিপিনবাবু বালিসের নীচে হইতে বাক্সের চাবীটা বাহির করিয়া কন্যার দিকে বাড়াইয়া দিলেন। হেমলতা চাবী লইয়া বাক্স খুলিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "তিনখানা নোট নিয়ে আয়।"

মহিম একটু সঙ্কোচের ভাব দেখাইয়া বলিল, "মাহিনাটা না হয়—"

বাধা দিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "না মহিম, যখন এতটা স্বীকার করেছ, তখন এটুকুও তোমাকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। তোমার ত্রিশ ঘণ্টা সময়ের মূল্য এর চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো—"

ব্যস্তভাবে মহিম বলিল, "না না, ত্রিশ টাকাই সে পক্ষে যথেষ্ট। সে জন্ম আপনার কুণ্ঠিত হবার কোন দরকার নাই।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "যথেষ্ট না হ'লেও আমাদের মেয়ের দান ব'লে এই সামান্তকেই যথেষ্ট মনে কত্তে হবে।"

মহিম একটু আনন্দের হাসি হাসিল। হেমলতা নোট তিনখানা আনিয়া বাপের হাতে দিতে গেল। বিপিন বাবু বলিলেন, "মহিমকে দাও।"

হেমলতা একটু অগ্রসর হইয়া নত-মস্তকে নোট-সমেত হাতখানা মহিমের দিকে বাড়াইয়া দিল। মহিমও দৃষ্টি নত করিয়া কম্পিতহস্তে তাহা গ্রহণ করিল। গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নোটের ভিতর দিয়া যেন একটু বিদ্যুৎ-প্রবাহ আসিয়া মহিমের ইন্দ্রিয়গুলাকে মুহূর্ত্তের জন্ম অবসন্ন করিয়া দিল। সে কম্পিত হস্তে নোট তিনখানা পকেটে রাখিল।

তার পর চা খাইয়া, গল্প করিয়া মহিম যখন মেসে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

মেসে ফিরিয়া মহিম নোট তিনখানা পকেট হইতে বাহির করিল। বাক্সমধ্যস্থ এসেন্সের মিষ্ট গন্ধ তখনও তাহা হইতে নিঃসৃত হইতেছে। মহিম বারকতক নোট গুলাকে নাড়িয়া চাড়িয়া ট্রাঙ্কে তুলিয়া রাখিল, এবং পরদিন হাতের আংটী বেচিয়া মেসের দেনা শোধ করিল।

মহিম চাকরী গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া সতীশ বলিল, "ভাল কাজ না মহিম, আগুন নিয়ে খেলা ভাল নয়।"

মহিম হাসিয়া উত্তর করিল, "খেল্‌তে জান্‌লে আগুন নিয়েও খেলা যায়।"

"কিন্তু একটু অসাবধান হ'লেই হাত পোড়ে।"

"সে বিষয়ে আমি খুবই সাবধান।"

"কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, তোমার চেয়ে অনেক বড় বড় বীরপুরুষেরাও এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।"

মহিম গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "ভয় নাই, মানুষের উপর প্রেমের চাইতে টাকাটার উপরেই আমার বেশী প্রেম।"

সতীশ বলিল, "সেই জন্যই বুঝি বাপের অত বড় বিষয়টা হেলায় হারালি?"

মহিম বলিল, "পরস্ব গ্রহণ না করাই ভাল।"

সতীশ বলিল, "তা হ'লে দেখ্‌ছি, তোর বাবা তোর মত ধার্ম্মিক পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে খুব বুদ্ধিমানের কাজ ক'রে গেছেন।"

উচ্চ হাসি হাসিয়া মহিম বলিল, "নিশ্চয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নূতন চাকরী লইয়া প্রথম দিন পড়াইতে গিয়া মহিম এমনই বিপন্ন হইয়া পড়িল যে, তাহার মনে হইল, এখানে এই চাকরীটি লইয়া সে ভাল কাজ করে নাই। পড়াইতে গেলে হেমলতা বই লইয়া যখন তাহার সম্মুখে বসিল, তখন সে এই কিশোরী ছাত্রীটির সমক্ষে এমনি একটা লজ্জা অনুভব করিল যে, সে আদৌ মাথা তুলিতে পারিল না, তাহাকে কি বলিবে কি পড়াইবে, অনেক ভাবিয়াও তাহা খুঁজিয়া পাইল না। শিক্ষকতা করিতে গিয়া যে এমন লজ্জার তাড়না সহ্য করিতে হয়, ইহা সে এই প্রথম অনুভব করিল।

ছাত্রীর অবস্থাও তখন শিক্ষক অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল ছিল না। সে নীরবে নতনেত্রে একখানা বই খুলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল বটে, কিন্তু সেখানা যে কি বই এবং কি জন্মই বা তাহার পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে, তাহা সে আদৌ বুঝিতে পারিল না। কিন্তু বইখানার পত্রসংখ্যা এত অধিক ছিল না, যাহাতে খুব বেশীক্ষণ ধরিয়া এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা যায়। সুতরাং পুস্তকের শেষভাগে একটা বানরমুখের চিত্র বাহির হইলে হেমলতা তাহার উপরেই গভীর মনোযোগ প্রদান করিল।

কিন্তু শিক্ষকতা করিতে আসিয়া এরূপে ছাত্রীকে চিত্রদর্শনের সুযোগ প্রদান করিলে শিক্ষকের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় না। সুতরাং কর্ত্তব্যের অনুরোধে লজ্জাটাকে একটু দূরে ঠেলিয়া দিয়া মহিম ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা কি বই?"

হেমলতা ছবিটার উপরেই দৃষ্টি রাখিয়া, একটা ঢোক গিলিয়া উত্তর করিল, "বেঙ্গল রীডার নম্বর থ্রী।"

"ওখানার কতদূর পড়া হয়েছে?"

"সব।"

"গ্রামার পড়েছেন?"

হেমলতা মৃদুভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়াই স্বীকৃতিসূচক উত্তর প্রদান করিল। অতঃপর মহিম

কি জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা আর খুঁজিয়া পাইল না। কাজেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, "বইখানা দেখি।"

মহিম হাত বাড়াইল, হেমলতা কম্পিত হস্তে তাহার হাতে বইখানা তুলিয়া দিল। মহিম বইখানা উল্‌টাইয়া ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের একটা কবিতা বাহির করিল, এবং বইখানা হেমলতার সম্মুখে রাখিয়া সেই কবিতাটা আবৃত্তি করিতে বলিল। হেমলতা কিন্তু আবৃত্তি করিতে পারিল না, কবিতার দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মহিম একটু অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এতে আপনার লজ্জা কি? পড়্‌তে গেলে কি লজ্জা করলে চলে?"

হেমলতার মুখখানা লজ্জায় আরও বেশী লাল হইয়া উঠিল, মাথাটা নীচের দিকে আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। মহিম তাহার লজ্জার গুরুত্ব অনুভব করিয়া চিন্তিত হইল। নিজের লজ্জাটাকে কোন প্রকারে দূর করিলেও এই অতিমাত্র লজ্জাশীলা ছাত্রীর লজ্জাটা যে কিরূপে দূরীভূত করিবে, বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। আর ছাত্রীটি এইরূপে লজ্জাবনত-বদনে বসিয়াই থাকিবে, কি পলায়ন করিয়া এই নিদারুণ লজ্জার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। এ দিকে মহিম কবিতা আবৃত্তির জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া তাহার লজ্জার মাত্রাটা যেন আরও বাড়াইয়া দিতে থাকিল।

এমন সময়ে বিপিন বাবু ঘরে ঢুকিয়া হেমলতাকে যেন একটা বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি গৃহের অপর পার্শ্ব হইতে টুলখানা টেবিলের কাছে টানিয়া আনিলেন, এবং তাহার উপর বসিয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "দেখ্‌লে মহিম, পড়া কতদূর কি রকম হয়েছে! লতির স্মরণশক্তিটা আমার ত খুব বেশী ব'লেই বোধ হয়, যা পড়েছে, তার একটি বর্ণও ভোলে নি। আবার কবিতা এমন চমৎকার আবৃত্তি করে যে, শুন্‌লে অবাক্ হয়ে যাবে।"

পিতার মুখের উপর একটা মৃদু সলজ্জ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া হেমলতা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল। বাহিরে আসিয়া সে জোরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, পড়া-শুনা না হয় না হইবে, তথাপি সে এমন নিষ্করুণ শিক্ষকের সম্মুখে আর আসিবে না।

বিপিন বাবুর সহিত খানিকটা গল্প করিয়া, হেমলতার হাতের চা খাইয়া মহিম মেসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, এবং আপনার ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া বই-খাতা লইয়া বসিল। কিন্তু একটু পরেই এমন গরম বোধ হইতে লাগিল যে, পড়াটা আদৌ ভাল লাগিল না, আলোটার জোর কমাইয়া, জানালা খুলিয়া দিয়া পাশের অন্ধকার ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় চটী জুতার ফট্ ফট শব্দ করিতে করিতে সতীশ ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "ওহে মহিম, আজ মিনার্ভায় রাণা-প্রতাপ দেখ্‌তে যেতে হবে।"

মহিম কোন উত্তর করিল না। তখন সতীশ একটু জোর গলায় বলিল, "শুন্‌তে পাচ্চো, আজ মিনার্ভায় রাণা-প্রতাপ দেখতে যেতে হবে।"

মহিম দৃষ্টি না ফিরাইয়াই উত্তর দিল, "বেশ, তোমরা যাও।"

"আর তুমি?"

"আমার যাওয়া হবে না।"

"কারণ? পাঠের ব্যাঘাত হবে?"

"না।"

"চরিত্র কলুষিত হবে?"

মহিম নিরুত্তর। সতীশ তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "কাগজ-কলমটা দাও।"

বলিয়া সে আলোটাকে একটু উজ্জ্বল করিয়া দিল। কাগজ-কলমের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে না পারিয়া মহিম বিস্মিতভাবে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। সতীশ তাহার আঁকের খাতাটা টানিয়া লইয়া তাহার সাদা পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল, "আমি এগ্রীমেণ্ট লিখে দিচ্চি, রাণা-প্রতাপ দেখে যদি তোমার চরিত্র একটুও কলুষিত হয়, তবে তার জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী।"

তার পর দোয়াতে কলম ডুবাইয়া বলিল, "কত টাকার সিকিউরীটী দিতে হবে?"

মহিম হাসিয়া তাহার হাত হইতে কলমটা কাড়িয়া লইল, বলিল, "তোমার এগ্রীমেণ্ট লিখবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, আমার শরীরটা ভাল নয়।"

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার শরীর যে আজ খুব ভালই আছে, এ সম্বন্ধে আমি এম, ডি ডাক্তারের চাইতে ভাল সার্টিফিকেট দিতে পারি।"

মহিম নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। সতীশ তাহার

মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আসল কথাটা কি বল্ দেখি ?"

মহিম বলিল, "আসল কথা টাকা নাই।"

সতীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "লজিক্ প'ড়ে এমন বাজে উত্তরটা দেওয়ার আগে একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল। কা'ল তো এক মাসের মাহিনা তিরিশ টাকা আগাম পেয়েছিস ? তার মধ্যে গোটা পনের টাকা মেসের খোরাকী গিয়েছে। বাকী ?"

মহিম বলিল "আর কি খরচ নাই ?"

"বটে" বলিয়া সতীশ আলনার গায়ে ঝুলান জামার পকেট হইতে ট্রাঙ্কের চাবী বাহির করিল। মহিমের কোন জিনিসে হস্তার্পণ করিতে সতীশের একটুও সঙ্কোচ ছিল না। সুতরাং সে চাবী লইয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া ফেলিল, এবং খুলিতেই ধোয়া পাঞ্জাবী-টার উপরেই নোট দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "হুর রে, তাই না টাকা নাই ?"

সতীশ নোটগুলি বাহির করিয়া গণিতে লাগিল, "রাম, দুই, তিন, তিন দশে তিরিশ—"

বলিতে বলিতে সহসা থামিয়া, মহিমের উপর জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "বাহবা! তিরিশ টাকা সব মজুদ। তা হ'লে মেসের টাকাটা দিলি কোথা হ'তে ?"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া মহিম উত্তর করিল, "সে আলাদা টাকা ছিল।"

সতীশ বলিল, "পূর্ব্বসঞ্চিত ? জীতা রও, সঞ্চয়ী নাবসীদতি। কিন্তু কর্ত্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ। সুতরাং দু'খানা রেখে একখানা নোটের আশু সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

বলিয়া সতীশ ট্রাঙ্কে দুইখানা নোট যথাস্থানে রাখিয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিল। তার পর মহিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "আটটা বাজে, উঠে পড়।"

মহিম বলিল, "না সতীশ, ও নোট খরচ করা হবে না।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ ?"

"কারণ, আমার ওতে দরকার আছে।"

"নোট এবং টাকায় যে বিশেষ দরকার থাকে, এ কথা অতি বড় মূর্খেও যখন জানে, তখন সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র সতীশচন্দ্রকে সেটা বুঝিয়ে দিতে যাওয়া তোমার নিতান্তই ধৃষ্টতা।"

পর একটু হাসিয়া বলিল, "আর আমিও এমন মূর্খ নই যে, বিনা প্রয়োজনে এটাকে রাস্তায় ফেলে দেব। সে ভয় তোমার কিছুমাত্র নাই! এখন আমি অগ্রসর, তুমি পশ্চাৎ অনুসরণ কর।"

সতীশ নোট লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। মহিম তখন বিদ্যুদ্‌গতিতে উঠিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া খুব গম্ভীরস্বরে বলিল, "না সতীশ, আবার বল্‌ছি, ও নোট আমি খরচ কত্তে পাব্‌বো না।"

মৃদু হাসিয়া সতীশ বলিল, "তুমি না পার, আমি বেশ পাব্‌বো। পারি কি না, প্রত্যক্ষ কর্‌বে চল। ধর, ষ্টেশের টিকিট দু'খানা দু'য়ে দু'য়ে চার টাকা পাশের হোটেলে দু'জনার খাওয়া খরচ দু'টাকা, পটলডাঙ্গা হ'তে বিডন ষ্ট্রীট যাতায়াতের সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ভাড়া দেড় টাকা, পান, সিগারেট ইত্যাদি চার আনা, তা হ'লে থাকে কত ? ন'সিকে।"

মহিম যেন একটু রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল, "না সতীশ, তা কিছুতেই হবে না।"

সতীশ হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, "অবশ্যই হ'তে হবে। কারণ তোমার এরূপ অকারণ অসম্মতিতে আমার জেদ এতই বেড়ে যাচ্ছে যে, এর একটি পয়সা বাকী থাকতে আমার ঘুম হবে না। এর জন্য যদি যুদ্ধং দেহি বল, তাতেও আমি পশ্চাৎপদ নই।"

বলিয়া সতীশ হাসিতে হাসিতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। মহিম ফিরিয়া আসিয়া অবসন্নভাবে চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়িল।

খানিক পরে সতীশ আসিয়া ডাকিল, "মহিম।"

মহিম কোন উত্তর দিল না। সতীশ খুব কাছে আসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "রাগ করিছিস্ মহিম ?"

বিরক্তির সহিত মহিম উত্তর দিল, "না।"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "না কেন, খুবই রাগ করে-ছিস্। কিন্তু দেখ্, আমি তোর উপর একটুও রাগ কার নাই।"

মহিম জানালার দিকে মুখ রাখিয়াই বলিল, "তুমি মহাপুরুষ।"

সতীশ বলিল, "মহাপুরুষ নয় মহিম, তুই যে রকম ব্যবহার করেছিস্, তাতে মহাপুরুষেরও রাগ হ'তে পারে। কিন্তু বন্ধুত্ব ব'লে একটা জিনিস আছে, রাগ ক'রে তার অমর্য্যাদা আমি কত্তে পারি না।"

মহিম চুপ করিয়া রহিল। সতীশ একটু নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীর-প্রশান্তকণ্ঠে বলিল, "নে, ওঠ,

কাপড় ছেড়ে ফেল্। নয় তো করুণার কাছে আজ আমাকে ভারী টিট্‌কারী শুনতে হবে।"

মহিম উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া সতীশের সহিত বহির্গত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হেমলতা এই নিদারুণ মাষ্টারের কাছে আর পড়িতে আসিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা সে বজায় রাখিতে পারিল না, পরদিন মহিম পড়াইতে আসিলে সে ধীরে ধীরে গিয়া পড়িতে বসিল। তবে সে দিন আর ততটা লজ্জা ছিল না। কথায় বার্ত্তায় আর ততটা বাধবাধ-ভাব রহিল না, বেশ একটু পরিচিতভাবেই কথাবার্ত্তা চলিল।

মহিমের অনুরোধে হেমলতা সে দিন কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইল। তাহার মৃদুমধুর কণ্ঠের সে আবৃত্তি মহিমের কানে ঠিক বীণার স্বরের মতই ধ্বনিত হইতে লাগিল। শুধু ইংরাজী কবিতা নয়, বাঙ্গালা কবিতারও আবৃত্তি হইল। তার পর কবি ও কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। অতঃপর কোন্ বিষয় পড়া হইবে, তাহাও স্থিরীকৃত হইল। এইরূপে সে দিনকার পড়ান শেষ করিয়া মহিম বাসায় ফিরিল।

ক্রমে শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে অপরিচিত ভাবটা যখন সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল, তখন হেমলতা এক দিন প্রস্তাব করিল যে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ, কিন্তু গুরু যদি শিষ্যকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে সেটা যে শুধু শ্রুতিকটু হয়, তাহা নহে, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যেও যেন একটা ব্যবধান আসিয়া পড়ে। সুতরাং হেমলতাকে 'আপনি' সম্বোধনের পরিবর্ত্তে 'তুমি' সম্বোধন করাটাই প্রশস্ত।

মহিম মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "স্ত্রীলোককে সকল অবস্থাতেই সম্ভ্রমসূচক সম্বোধনে সম্মানিত করা ইউরোপীয় নীতির অনুমোদিত। আমাদের সমাজে সে প্রথার প্রচলন নাই বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে—"

বাধা দিয়া হেমলতা বলিল, "ইউরোপীয় সমাজের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের এটা ইউরোপীয় সমাজ নয়, খাঁটী বাঙ্গালীর সমাজ, সুতরাং বাঙ্গালী সমাজে যেটার প্রচলন আছে, সেই প্রথাটা চালানই উচিত নয় কি?"

মহিম ইহার আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না; অগত্যা তাহাকে হেমলতার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইল। কিন্তু প্রথম প্রথম ইহাতে বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। অভ্যাসবশতঃ পাঁচটা 'তুমি' সম্বোধনের মধ্যে একটা আপনি সম্বোধন এমনই অতর্কিতভাবে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল যে, তাহাতে হেমলতা উপহাসের হাসি না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তবে তাহার মধ্যে উপহাসের তীব্রতা অপেক্ষা মৃদু হাস্যের মধুরতাটুকুই মহিমের উপভোগ্য হইয়া উঠিল।

ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত হইয়া মহিম দেখিল, ইংরাজী সাহিত্য অপেক্ষা বাঙ্গালা সাহিত্যের উপরেই হেমলতার টান খুব বেশী, আবার সাহিত্যের মধ্যেও কবিতাটাই তাহার অধিকতর প্রিয়। তবে ইংরাজী সাহিত্যের উপরেও যে তাহার নিতান্ত বিতৃষ্ণা ছিল, তাহা নহে, কিন্তু সেটা যেন সে অবশ্যপাঠ্য হিসাবে পড়িয়া যাইত, তাহার প্রতি তেমন আন্তরিক আকর্ষণ দেখা যাইত না। মহিম তখন তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, ইংরাজী সাহিত্য একটা বিশ্বসাহিত্য, তাহার কাছে বাঙ্গালা সাহিত্য সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ তুল্য। উহার মধ্যে যে সকল মহান্ সুগভীর ভাব রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর আন্তরিক আকর্ষণ রাখা হেমলতার নিতান্ত অন্যায়।"

ইহার উত্তরে হেমলতা বলিল, 'সকল বিষয়েই অধিকারীর ভেদ আছে। এক জন মহা পণ্ডিতের কাছে যা সুন্দর হইতে সুন্দরতর, একটা চাষার দৃষ্টিতে সেটা নিবিড় শূন্য ছাড়া কিছুই নয়। আপনাদের মত উচ্চশিক্ষিতের নিকট ইংরাজী সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য ব'লে আদরণীয় হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের মত অল্পশিক্ষিত মেয়েমানুষের কাছে বাঙ্গালা সাহিত্যটাই খুব বড়, কেন না, সেইটাই সহজে আমাদের বোধগম্য।"

মহিম হাসিয়া বলিল, 'যা সহজে বোধগম্য, তাকেই যদি বড় ব'লে স্বীকার করতে হয়, তা হ'লে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের চেয়ে বড় আর কিছুই নাই।"

হেমলতা বলিল 'সাধারণতঃ দু'টো জিনিস দিয়ে ছোট বড় নির্দ্ধারণ করা যায়, এক যুক্তি, আর এক ধারণা। কিন্তু যুক্তি অনেক স্থলেই ধারণার কাছে পরাজিত হয়। একজন চাষাকে হাজার হাজার যুক্তি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিন যে, একমাত্র অচিন্ত্য অব্যক্ত পরব্রহ্মই সত্য

এবং উপাস্য, আর সকলই মিথ্যা। চাষা হয় তো আপনার যুক্তির অখণ্ডনীয়তা স্বীকার করবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বটগাছের তলায় সিঁদুর মাখান পাথরখানিতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা ভেবে মাথা না নুইয়ে থাকতে পারবে না।"

"এটা অন্ধ বিশ্বাসের ফল মাত্র।"

"কিন্তু এই অন্ধ বিশ্বাসের ভিতর দিয়েই সে এমন একটি আনন্দ পায়, যাতে সে জ্ঞানীর চোখ-চাওয়া বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল জ্ঞান করে।"

"অথচ তাকে জ্ঞানীর কাছে মাথা নীচু ক'রে জ্ঞানের পথে এক এক পা অগ্রসর হবার জন্য চেষ্টা ক'র্ত্তে হয়।"

"সে চেষ্টা থাকলেও যতক্ষণ না সে জ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছাবে, ততক্ষণ এই অন্ধ বিশ্বাসটুকুকেই আঁকড়ে ধ'রে থাকবে।"

ছাত্রীর তর্কশক্তি দর্শনে শিক্ষক মুগ্ধ হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি তুমিও যতক্ষণ না ইংরাজী জ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হও, ততক্ষণ বাঙ্গালা সাহিত্যটাকেই আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চাও?"

উত্তরে হেমলতা লজ্জায় মৃদু হাসি হাসিল।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ তর্কযুদ্ধ প্রায় প্রত্যহই হইত। সে তর্কস্রোতে পড়াটা যে কোথায় ভাসিয়া যাইত, এবং ঘড়ীতে কখন্ সাতটা বাজিত, তাহা শিক্ষক বা ছাত্রী কাহারও হুঁস থাকিত না। যখন হুঁস হইত, তখন উভয়েই লজ্জিত হইয়া পড়িত।

আগে তিনটায় কলেজের ছুটী পাইলেও মহিমের ঘুরিয়া ফিরিয়া মেসে আসিতে প্রায় ছয়টা বাজিয়া যাইত। এখন কিন্তু মহিম সাড়ে তিনটার আগেই বাসায় আসে, এবং হাত-মুখ ধুইয়া চারিটা বাজিবার পূর্ব্বেই বিপিন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। আগে প্রায়ই তাহার উপস্থিতির পর হেমলতা পড়িতে আসিত, কিন্তু এখন তাহার আগেই সে পড়িবার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকে। এটা যে হেমলতার অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগেরই ফল, ইহা ভাবিয়া মহিম পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারিত না, এবং প্রধানতঃ এই জন্যই তাহার প্রতীক্ষায় আগ্রহান্বিতা ছাত্রীটিকে নিজের অনুপস্থিতি দ্বারা কোন দিনই নিরাশ করিতে সাহসী হইত না। সে এমনই নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইত, যেন প্রলয়-ব্যাপারেও তাহার এই উপস্থিতির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতে পারে না।

একদিন কিন্তু ব্যাঘাত ঘটিল। কলেজ হইতে ফিরিতেই সতীশ তাহাকে ধরিয়া বসিল, আজ টাউন হলে বিরাট সভা, চিফ জষ্টিস্ সভাপতি, বক্তা সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি। সুতরাং সে বক্তৃতা শুনিতে যাইতেই হইবে। মহিম পড়াইতে যাইবার ওজর করিল। সতীশ রাগিয়া বলিল, "রেখে দে তোর পড়ানো, কলেজের প্রফেসারদের মাসে দশ দিন অনুপস্থিতি হয়ে থাকে, আর তোর একদিন পড়াতে না গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?"

মহিমের কোন ওজর-আপত্তিই খাটিল না, সতীশ জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। বড় বড় বক্তার বক্তৃতায় সভা সে দিন খুব জমিয়া উঠিলেও মহিমের যেন সব ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। বক্তৃতার একটা বর্ণও তাহার কানে ঢুকিল না, শুধু পাঠার্থে প্রতীক্ষাপরায়ণা হেমলতার আগ্রহ ও ঔৎসুক্যপূর্ণ মুখখানাই ছবির মত তাহার চোখের সামনে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সকল বিষয়েই অন্যমনস্ক করিয়া দিতে লাগিল।

সভা ভাঙ্গিলে বাহিরে আসিয়া সকলে যখন বক্তাদের বক্তৃতার দোষ-গুণ লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল, তখন মহিম একাই শুধু হুঁ হাঁ ছাড়া আর কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে পারিল না।

সতীশ কিন্তু এইখান হইতে রেহাই দিল না। সে দিন ষ্টারে একখান নূতন নাটকের অভিনয়। মহিমকে সঙ্গে লইয়া সতীশ থিয়েটারে ঢুকিল। রাত্রি চারিটার সময় মেসে পৌঁছিয়া মহিম ঢুলিতে ঢুলিতে শয্যার আশ্রয় লইল।

পরদিন মহিম যথাসময়ে পড়াইতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, হেমলতা অন্য দিনের মতই পড়িবার ঘরে বসিয়া রহিয়াছে। মহিম ঘরে ঢুকিতেই সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কা'ল যে আসেন নি? কোন অসুখ বিসুখ হয় নি তো?"

মহিম ঈষৎ সলজ্জভাবে বলিল, "না। কা'ল টাউন হলে বক্তৃতা শুনতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।"

হেমলতা যেন আশ্বস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "ওঃ, আমি কিন্তু অসুখের কথাটাই ভেবেছিলাম। পাঁচটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রেও যখন দেখলাম, আপনি এলেন না, তখন ভাবলাম, কোথাও বোধ হয় গিয়েছেন। কিন্তু রাত্রে দু'তিন বার ছাদে গিয়ে দেখলাম, আপনার

ধর অন্ধকার; তখন সত্যই আমার বড্ড ভাবনা হয়েছিল।"

মহিম নীরবে নতমস্তকে গিয়া আসন গ্রহণ করিল। হেমলতা ঈষৎ অভিমানের সুরে বলিল, "আপনার কিন্তু ব'লে যাওয়া উচিত ছিল।"

মহিম সলজ্জভাবে বলিল, "আমারও সেটা মনে হয়েছিল, কিন্তু সতীশ এমনি তাড়া দিলে যে—"

হাজার তাড়া দিলেও পাশের দরজায় খবরটা যে অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারিত, এবং শুধু সতীশের উপহাসের ভয়েই সেই সহজসাধ্য কাজটা করিতে সাহসী হয় নাই, ইহা মনে হইতেই মহিম কথাটা শেষ করিতে পারিল না। হেমলতা কিন্তু সে বিষয়ের কোন উল্লেখ না করিয়া বলিল, "তার উপর সকালে যখন দেখলাম, ততখানি বেলাতেও আপনি ঘুমুচ্চেন, তখন সত্যই মনে হ'লো, চাকরটাকে পাঠিয়ে খবর নিই।"

মহিম মনে মনে একটু লজ্জা অনুভব করিলেও ভালবাসার স্নিগ্ধতায় পূর্ণ দুইটি চঞ্চল চক্ষু যে সাগ্রহে তাহার উপর প্রহরা দিতেছে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারিল না।

হেমলতা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বুঝি কা'ল রাত জেগেছিলেন?"

লজ্জাজড়িতস্বরে মহিম বলিল, "হঁ্যা, কা'ল থিয়েটার দেখতে গিয়ে অনেকটা রাত হয়েছিল।"

সহাস্যে হেমলতা বলিল, "আপনার বুঝি থিয়েটার দেখার খুব ঝোঁক আছে?"

মহিম ব্যস্তভাবে বলিল, "না—না, শুধু সতীশের পেড়াপীড়িতে—"

বলিতে বলিতে মহিম থামিয়া গেল। হেমলতা মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া বলিল, "এটা কিন্তু নেহাৎ অন্যায়. একজনকে পেড়াপীড়ি ক'রে রাত জাগিয়ে—। না না, অপরের অনুরোধে এ রকম রাত জেগে আপনি শরীর নষ্ট করবেন না।"

শিক্ষকের উপর এই অল্পবয়স্কা ছাত্রীটির এত বড় একটা হুকুম অন্যের নিকট বিস্ময়কর হইলেও মহিম কিন্তু বিনা বিস্ময়ে নিঃশব্দে আদেশটি স্বীকার করিয়া লইল। কেন না, এই আদেশের ভিতর এমন একটা স্নেহশঙ্কাপূর্ণ চিত্তের সকরুণ নির্বন্ধ ছিল, যাহা মহিমের নিকট বর্ত্তমানে সুদুর্লভ।

বাসায় ফিরিলে সতীশ বলিল, "কি রে, বালকের গরহাজিরির জন্য কৈফিয়ত দিতে হ'লো না কি?"

মহিম অবজ্ঞার ভাবে উত্তর দিল, "কৈফিয়ত আবার কি?"

"তা না হ'লেও ক্ষমা প্রার্থনা, আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ, ইত্যাদি। বেহ্মরা ইংরাজী কায়দাটা সব হুবহু মুখস্থ ক'রে নিয়েছে কি না।"

মহিম যেন একটু রাগিয়া বলিল, "তোর মাথা! বেহ্ম আবার কে?"

"ওই যে, তোর ঐ ওরা।"

"কারা? বিপিন বাবুরা?"

"কে জানে তোর বিপিন বাবু কি অটল বাবু। যাদের ঘরে পড়াতে যাস।"

মৃদু হাসিয়া মহিম বলিল, "পাগল। কে বল্লে ওরা বেহ্ম?"

মাথা নাড়িয়া সতীশ বলিল, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্, হেতু—ধূমাৎ। পনর বছরের মেয়ে, অবিবাহিতা, মাষ্টার রেখে তাকে ইংরাজী পড়াচ্চে, গান-বাজনা শেখাচ্চে, এতে অতি বড় নির্ব্বোধ যে, তারও বুঝতে বাকী থাকবে না যে, ওরা ব্রাহ্ম।"

মহিম ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "মেয়েকে লেখাপড়া গান-বাজনা শেখান আজকালকার একটা ফ্যাসান, তা জানিস্? আজকাল অনেক বড় বড় ঘরে এ সব চলছে। আর মেয়েকে লেখাপড়া বা গান শেখালেই যে ব্রাহ্ম হ'তে হয়, তার কোন মানে নাই।"

"এবং ওরা যে খাঁটী হিন্দু, তারও কোন প্রমাণ নাই।"

"আপাতত একটা প্রমাণ দেখিয়ে দিচ্চি। তেতালায় ওদের ঠাকুরঘর আছে।"

"এবং তোমার ঐ ছাত্রীটি 'প্রত্যহ প্রভাতে উঠি শয্যা হ'তে ঐ ঘরে যায়। কিন্তু ওটা যে ঠাকুরঘর, উপাসনা-গৃহ নয়, তার প্রমাণ এ পর্য্যন্ত বোধ হয় পাওয়া যায় নি।"

সতীশের এই অকারণ সন্দিগ্ধতায় মহিম নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "ব্রাহ্ম হোক, হিন্দু হোক, খৃষ্টান হোক, আমাদের সে কথার আলোচনার দরকার কিছু নাই।"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "পথে এস। ব্যস, আর আমার উত্তর নাই। এখন খুব রেগেছিস্, দেখ দেখি, এই চিঠিখানা যদি একটু শান্তিজল ঢালতে পারে।"

বলিয়া সতীশ পকেট হইতে একখানা খাম-মোড়া ডাকের চিঠি বাহির করিয়া মহিমের হাতে দিল। চিঠিখানার শিরোনামার উপর চোখ বুলাইতেই মহিমের মুখটা যেন লাল হইয়া উঠিল। সতীশ সেটুকু লক্ষ্য করিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর, প্রণয়িনী নয় তো ?"

তর্জ্জন করিয়া মহিম বলিল, "চুপ রও, বৌদি।"

নবম পরিচ্ছেদ

বেহারী জল খাইতে বসিয়া চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহিমের চিঠি এসেছে ?"

চারু গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "এসেছে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বেহারী বলিল, "তোমরা বুঝি আগে চিঠি দিয়েছিলে ?"

চারু উত্তর দিল, "হুঁ।"

বেহারী নীরবে জলযোগ শেষ করিয়া পাশের ডাবরে হাত ধুইতে ধুইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছে ? আস্‌বে না কি ?"

চারু পানের ডিবাটা তাহার সম্মুখে রাখিয়া বিছানার নীচে হইতে মহিমের চিঠিখানা বাহির করিল, এবং খুব গম্ভীরভাবে তাহা বেহারীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল। বেহারী বলিল, "আমি চিঠি দেখতে চাই না, শুধু কি লিখেছে, তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।"

চারু বলিল, "প'ড়ে দেখলেই তা বুঝতে পারবে।"

বেহারী চিঠিখানা কুড়াইয়া লইল। চারু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বেহারী বিছানার উপর বসিয়া চিঠি পড়িতে লাগিল।

"বৌঠান্,—আমার প্রণাম জানিবে,—

তোমাকে প্রণামের কথা লিখিতে একটু সঙ্কোচ বোধ হয় বটে, কিন্তু এখন যেরূপ সম্পর্ক, তাতে ঐ কথাটাই লেখা উচিত। তুমি কিছু মনে করো না।

অনেক আগেই আমার চিঠি লেখা উচিত ছিল, কিন্তু কাকে লিখবো, তোমাকে, দাদাকে, না খুড়ী-মাকে, তা ভেবে ঠিক কত্তে পারি নাই। কাজেই চিঠি লেখা হয় নি। তা ছাড়া আমার চিঠি পাবার জন্য কারো যে আগ্রহ আছে, এমন কথাটাও মনে ওঠে নি। কিন্তু তোমার চিঠি পেয়ে আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। বুঝতে পেরেছি, সংসারে আমি নিতান্ত নিরাশ্রয় নয়। আমার জন্যেও ভাববার লোক আছে। আমার নির্ব্বুদ্ধিতা তোমরা ক্ষমা করো।

দাদাকে ও খুড়ীমাকে আমার প্রণাম জানাইবে। আমি বেশ ভাল আছি। পড়া-শোনাও এক রকম চল্‌ছে। আস্‌ছে গরমের ছুটীতে পারি যদি তোমাদের কাছে যাব। ইতি"

বেহারী চিঠিখানা মুড়িয়া খামের ভিতর রাখিল, এবং বিছানার উপর তাহা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় কালীতারা আসিয়া ডাকিলেন, "বেহারি, ঘরে আছিস্ ?"

"আছি, কেন ?"

"মহিম যে চিঠি দিয়েছে। পড়েছিস্ ?"

"পড়েছি।"

"গরমের ছুটীতে আস্‌বে লিখেছে।"

"আসে আস্‌বে।"

"তুই একখানা চিঠি দিবি ?"

"কেন ?"

কালীতারা পুত্রের এই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উত্তরে একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন কি রে, তাকে আস্‌বার জন্য একটু যত্ন ক'রে লিখে দিবি।"

বেহারী মুখখানাকে ভারী করিয়া উত্তর দিল, "যাদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চল্‌ছে, তারাই তো লিখতে পারে।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে কালীতারা বলিলেন, "কার সঙ্গে আর চিঠি লেখালেখি চল্‌ছে ? সে যাওয়া অবধি কোন খবরই পাই নাই। কাজেই বৌমাকে ব'লে একখানা চিঠি লিখিয়েছিলাম।"

বেহারী বলিল, "তাদের দিয়েই তো আর এক-খানা চিঠি লেখাতে পার।"

"তা পারি যেন, কিন্তু তুই বা একখানা লিখলি ?"

"আমার সময় নাই।"

"এত কি কাজ যে, একখানা চিঠি লিখ্‌তেও সময় নাই ?"

"পুরুষমানুষের কাজ তোমরা কি বুঝ্‌বে বল।"

মৃদু হাসিয়া কালীতারা বলিলেন, "জ্যেঠার বিষয় পেয়ে তুই যে মস্ত কাজের লোক হয়ে পড়লি রে বেহারি ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বেহারী বলিল, "হাতে কাজ থাক্‌তে বেকার থাকা যায় না।"

বলিয়া বেহারী দরজার দিকে অগ্রসর হইল। কালীতারা বলিলেন, "যাস্ যে, শোন্ না।"

বেহারী দাঁড়াইল। কালীতারা বলিলেন, "আমি মনে কচ্চি কি জানিস্, মহিম ছুটীতে এলে তার বিয়েটা দিয়ে দেব।"

বেহারী গম্ভীরস্বরে বলিল, "এখন পড়চে, বিয়ের জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"তাড়াতাড়ি আর কি, পড়চে পড়ুক না। বিয়ে কর্‌লে যে আর পড়া হবে না, এমন তো কোন কথা নাই।"

বেহারী চুপ করিয়া রহিল। কালীতারা বলিলেন, "কথাটা কি জানিস্, ছেলেটা একা কলকাতায় আছে, ঐতেই আমার দিন-রাত ভাবনা। একেই তো কলকাতা কেমন জায়গা, তার উপর তার মনটাও খুব উদাস হয়ে আছে। এখন তার মনটাকে যদি সংসারের সঙ্গে বেঁধে দিতে পারি, তা হ'লে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।"

একটু কর্কশ-কণ্ঠে বেহারী বলিল, "তোমাদের যে দেখ্‌ছি মহিমের ভাবনায় ঘুম ধরে না।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া কালীতারা বলিলেন "তুই বলিস্ কি রে বেহারি, আমরা তার জন্যে ভাবব না?"

রুক্ষস্বরে বেহারী বলিল, স্বচ্ছন্দে ভাবতে পার, আমি কাউকে কারো জন্য ভাবতে বারণ করি না। তবে আমার এত বাজে ভাবনা ভাববার সময় নাই।"

বেহারী পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কালীতারা স্তব্ধভাবে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চারু আসিয়া বলিল, "উনান ধ'রে উঠেছে মা।"

কালীতারা নিরুত্তর। চারু ডাকিল, "মা।"

কালীতারা চমকিত দৃষ্টি তুলিয়া বধুর মুখের দিকে চাহিলেন। চারু বলিল, "উনানটা জলে যাচ্চে মা।"

কালীতারা একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যাই। তুমি এক কাজ কর বৌমা, কা'লই মহিমকে একখানা চিঠি লিখে দাও। তাকে আস্‌বার জন্য খুব জেদ ক'রে লিখবে।"

চারু নতমুখে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আচ্ছা।"

কালীতারা চলিয়া গেলেন। চারু ঘরে ঢুকিয়া বিছানার উপর হইতে চিঠিখানা তুলিয়া লইল, এবং চিঠি-হাতে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

রাত্রিতে বেহারী ঘরে আসিয়া চারুকে বলিল, "দেখ, মা বল্‌ছিলেন, মহিমকে একখানা চিঠি লিখতে।"

চারু কোন উত্তর দিল না। বেহারী বলিল, "কিন্তু জান তো, আমার সময় নাই। আর চিঠি-পত্র লেখাও আমার বড় একটা আসে না। তুমিই একখানা চিঠি লিখে দিও, বুঝলে?"

চারু গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "আচ্ছা।"

"আর সেই সঙ্গে তার আস্‌বার কথাটাও লিখবে।"

"লিখবো।"

দশম পরিচ্ছেদ

"বল দেখি ঠাকুরপো, এটি কে?"

চারু একটি বারো তের বছরের ফুটফুটে মেয়েকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া, মহিমের মুখের উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বল দেখি ঠাকুরপো, এটি কে?"

মহিম বিস্ময়পূর্ণ-দৃষ্টিতে সেই বলপূর্ব্বক আকৃষ্টা লজ্জা-নম্রমুখী মেয়েটির দিকে খানিক চাহিয়া রহিল, তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "বল্‌তে পার্‌লাম না, বৌঠান।"

চারু হাসিয়া ঘাড় দোলাইয়া বলিল, "কিন্তু আমি যদি বল্‌তে পারি?"

মহিম সহাস্যে উত্তর করিল, "পারাই সম্ভব, কারণ, তোমার জানা আছে।"

চারু মেয়েটির হাত ছাড়িয়া দিল। মুক্তি পাইয়া মেয়েটি ছুটিয়া পলাইল। চারু তখন মহিমের উপর কৃত্রিম কোপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আর তুমিই বুঝি জান না?"

"কৈ, মনে তো পড়ে না।"

"তা পড়বে কেন? তোমাদের আবার কোন্ কথাটা মনে থাকে! তোমরা এমনি ভোলা জাত বটে!"

একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া মহিম বলিল, "রাগ ক'রো না বৌঠান, সত্যি বল্‌ছি, আমার তো মনে হচ্চে না যে দেখেছি।"

চারু মৃদু হাসিয়া বলিল, "সেই জন্যই তো বল্‌ছি,

তোমাদের জাতটাই ভোলা। ওকে আমাদের বাড়ীতেই তো কতবার দেখেছ।"

"তোমাদের বাড়ীতে ?"

"হাঁ গো মশায়, আমাদের বাড়ীতে। তখন আমি ছিলাম চারি, আর ও ছিল সরি। মনে পড়েছে ?"

চমকিতভাবে মহিম বলিল, "সরি ? সরলা ? তোমার মাসীর মেয়ে ?"

চাপা হাসির সঙ্গে চারু বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, সরলা, আমার মাসীর মেয়ে, এবং আমার মাসতুতো বোন্।"

"খুব বড় হয়ে উঠেছে।"

"কিন্তু কেমন দেখতে হয়েছে বল দেখি। এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেছ ?"

"দেখেছি।"

"কোথায় দেখলে ?"

"এইখানেই।"

বলিয়া মহিম চারুর দিকে সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। চারুর মুখখানা মুহূর্ত্তে লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "আমার তোষামোদ ক'রে তোমার আর কোন লাভ নাই।"

মহিম বলিল, "সত্য কথা বলা তোষামোদ নয়।"

রাগতভাবে চারু বলিল, "একশোবার তোষামোদ।"

মহিম চুপ করিয়া রহিল। চারু ক্রোধের ভাবটা সংবরণ করিয়া পুনরায় প্রসন্নমুখে বলিল, "সত্যি বল, আর কোথাও দেখেছ ?"

"ভয়ে বল্‌বো, না নির্ভয়ে ?"

"নির্ভয়েই বল।"

"তা হ'লে বল্‌বো দেখেছি।"

"কোথায় দেখলে ?"

"কলকাতায়।"

"এর চেয়ে সুন্দর ?"

"শতগুণে।"

ক্রোধে ভ্রুকুটি করিয়া চারু বলিল, "মিথ্যা কথা, এ আমি দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি।"

মৃদু হাসিয়া মহিম বলিল, "কিন্তু আমিও দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি, আমার কথাটা অখণ্ডনীয় সত্য।"

চারু স্থির-দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ মহিমের দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর তীব্র-কণ্ঠে বলিল, "আজকাল তুমি বুঝি পড়া-শোনা ছেড়ে এই রকম সুন্দরী দেখেই বেড়াও ?"

মহিম হাসিয়া বলিল, "তোমার দু'টো অনুমানের একটাও সত্য নয় বৌঠান।"

চারু বলিল, "আচ্ছা, সত্য কি মিথ্যা, তা বুঝিয়ে দেব।"

বলিয়া চারু জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মহিম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বাহির হইল। বাহিরে যাইবার সময় দেখিল, সরলা চারুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চোখে চোখ পড়িবামাত্র সে মুখ নামাইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পর মহিম বেহারীর ঘরের সম্মুখ দিয়া যখন বাহিরে যাইতেছিল, তখন বেহারী ঘর হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে, মহিম না কি ?"

মহিম উত্তর দিল, "হাঁ।"

বেহারী বলিল, "কোথায় যাও হে, শোন না।"

মহিম ফিরিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। বেহারী খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল, একটু দূরে মেজের উপর বসিয়া চারু পান সাজিতেছিল। মহিম দরজায় আসিলে চারু মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল।

বেহারী বলিল, "ক'দিন তুমি এসেছ, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তার অবকাশ হয়ে ওঠেনি। বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত নিয়ে এমনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, তিলমাত্র সময় নাই। লোকে বাইরে থেকে বিষয়-সম্পত্তিকে খুব চমৎকার দেখে, কিন্তু এর ভিতরে যে কতখানি খাটুনি, কত ভাবনা-চিন্তা, তা যাকে ভুগতে হয়, সেই বুঝতে পারে। যাক, ব'সো না। বিশেষ দরকারে যাচ্ছো কি ?"

"না" বলিয়া মহিম ঘরে ঢুকিয়া খাটের পাশে টুলখানা টানিয়া বসিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "পড়া-শোনা কি রকম চল্‌ছে ?"

মহিম উত্তর করিল, "চল্‌ছে মন্দ নয়।"

বেহারী গম্ভীরস্বরে বলিল, "মন্দ নয় কেন, খুব ভাল ক'রে পড়। বি, এটা দিয়ে ল'টা প'ড়ে ফেল। যেমন তেমন ক'রে ওকালতীটা পাশ কর্ত্তে পারলে আর ভাবনা কি ? অগাধ পয়সা, বুঝলে, অগাধ পয়সা। এক একটা মহকুমার উকীলেরা দু'পাঁচ বছরেই ফেঁপে উঠছে

আমাদের এই কালনায় এসে যদি বস্‌তে পারে, তা হ'লে এ তল্লাটে আর কেউ কি কল্‌কে পাবে? আমাদেরই তো দু' চারটে মোকদ্দমা লেগেই আছে।"

মহিম নতমুখে মৃদু হাস্য করিল। বেহারী পাশের বালিসে ভর দিয়া একটু কাত হইয়া পড়িয়া বলিল, "ভাল কথা, তোমার খরচপত্র চল্‌ছে কি রকমে? মনে করেছিলাম, মাসকাবারে তুমি টাকাটা চেয়ে পাঠাবে। কিন্তু তুমি চাইলে না, আমারও নানা ঝঞ্ঝাটে ওটা মনেই নাই।"

মহিম নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। বেহারী বলিতে লাগিল, "জ্যেঠামশায় সম্পত্তিটা আমাকে দিয়ে গিয়েছেন ব'লে তুমি পড়ার খরচটাও কি এ হ'তে পেতে পার না? আমাকে কি তুমি এতটাই স্বার্থপর মনে কর? যদি আমি এ সম্পত্তি নাই পেতাম, তা হ'লেও কি তোমায় দেখতে হ'তো না? মা'র পেটের ভাই না হ'লেও ভাই তো বটে।"

চারু খুব ব্যস্তভাবে সুপারি কাটিতে লাগিল। একটু থামিয়া বেহারী বলিল, "যাক, এখন চল্‌ছে কিসে? পড়ান জুটিয়েছ বুঝি?"

মহিম উত্তর দিল, "হাঁ।"

বেহারী বলিল, "দেখ, আমার কাছে সাহায্য না নেওয়ায় আমার একটু দুঃখ হ'তে পারে বটে, কিন্তু কাজটা যে তোমার খুব ভালই হয়েছে, এ কথা আমাকে একশোবার স্বীকার কত্তে হবে। সকলেরই উচিত নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা। এতে শুধু নিজের উন্নতি নয়, জাতটারও উন্নতি হয়। ইংরাজদের এই গুণটা খুব আছে। আমাদের জাতটা বাবার পয়সা, ঠাকুরদাদার সম্পত্তি, খুড়ার বিষয়, এই সকলের উপর ভর দিয়ে দেশটাকে উচ্ছন্ন দিলে।"

চেষ্টা সত্ত্বেও মহিমের ঠোঁটের পাশ দিয়া যে একটু তীব্র হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বেহারী তাহা লক্ষ্য করিল না। চারু একবার ঘাড়টা ফিরাইয়াই পুনরায় সুপারি কাটায় মনোনিবেশ করিল।

বেহারী গাম্ভীর্য্যসূচক কণ্ঠধ্বনি করিয়া বলিল, "পড়িয়ে কত ক'রে পাও?"

মহিম বলিল, "ত্রিশ টাকা।"

মহিমের মুখের উপর ব্যগ্র দৃষ্টিপাত করিয়া বেহারী বলিয়া উঠিল, "মাসে?"

মহিম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "ক'টি ছেলে পড়াতে হয়?"

"ছেলে নয়, একটি মেয়ে।"

"মেয়ে, একটা মেয়েকে পড়াবার জন্য মাসে ত্রিশ টাকা মাষ্টার-খরচ?"

মহিম মৃদু হাসিল। চারুর সুপারি কাটার কচ-কচ শব্দটা অপেক্ষাকৃত মৃদু হইয়া আসিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "বড় লোক বুঝি?"

"তেমন ধনী বলা যায় না।"

"কখন্ পড়াতে হয়?"

"চারটার পর এক ঘণ্টা।"

"মেয়েটি কত বড়?"

মাথাটা নীচু করিয়া মহিম মৃদুস্বরে বলিল, "চোদ্দ পনের বছরের হবে।"

"বিয়ে হয়েছে?"

"না।"

"ব্রাহ্ম বুঝি?"

'না, হিন্দু।"

বালিস ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়া বেহারী বিস্ময়-পূর্ণ-স্বরে বলিল, "হিন্দুর ঘরে এত বড় মেয়ে, বিয়ে হয় নি? বল কি হে, সেই মেয়েকে আবার মাষ্টার রেখে পড়াচ্চে।"

মহিম নিরুত্তরে আপনার হাতের আঙুলগুলা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। বেহারী পুনরায় কাত হইয়া পড়িল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চারুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমরা ব'সে ব'সে কি তোমার সুপারি কাটাই দেখবো? দু'টো পানের প্রত্যাশাও কি নাই?"

পান সাজা ছিল। ডিবায় ভরিয়া চারু ডিবাটা একটু আগাইয়া দিল। মহিম ডিবাটা হাত বাড়াইয়া লইয়া বেহারীর কাছে রাখিল। বেহারী একটা পান মুখে দিয়া বলিল, "তোমার ছুটী কত দিন?"

মহিম বলিল, "৪ঠা জুলাই পর্য্যন্ত।"

বাহির হইতে ভৃত্য জানাইল, রমেশ বাবু উপস্থিত হইয়াছেন। বেহারী উঠিয়া বসিয়া মহিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাল কথা, তোমার নামে বোধ হয়, একখানা নোটীশ আস্‌বে।"

বিস্ময়ভাবে মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "নোটীশ?"

বেহারী বলিল, "হাঁ, আমি উইল প্রোবেটের দরখাস্ত করেছি কি না। এই উইল সম্বন্ধে তোমার কোন দাবী-দাওয়া আছে কি না, তাই জান্‌বার জন্য তোমাকে আদালত হ'তে একখানা নোটীশ দেবে। তবে সে

জন্ম তোমায় আদালতে হাজির হতে হবে না, সাক্ষী দিতেও হবে না। তুমি দিনের দিন হাজির না হ'লেই জজ বুঝে নেবে, তোমার কোন আপত্তি নাই। না না, তাতে তোমার ভাববার কিছু নাই।"

বেহারী উঠিয়া চটীজুতার শব্দ করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া গেল। মহিম উঠিতে উদ্যত হইল। চারু তাহার দিকে সহাস্য কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই মেয়েটিই বুঝি তোমার দুনিয়ার সেরা সুন্দরী ঠাকুরপো?"

মহিম উঠিয়া হাসিতে হাসিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রিতে মহিম আহার করিতে বসিলে কালীতারা সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে মহিম, সেখানে রাত্তিরে কি খাস?"

মহিম উত্তর করিল, "যে দিন যেমন হয়। ভাত, রুটী।"

"রাঁধে কে?"

"উড়ে বামুন।"

"ও মা, উড়ে। কেমন রাঁধে রে?"

"অতি চমৎকার খুড়ীমা, একবার মুখে দিলে আর ভোলা যায় না।"

মহিমের কথার ভিতর যে শ্লেষটুকু ছিল, কালীতারা তাহা বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া বলিলেন, "এই রান্না খেয়েই তো ভুলে থাকিস্ বাছা, খুড়ীমার কথা মনেও থাকে না।"

মহিম নীরবে মৃদু হাস্য করিল। কালীতারা মুখখানা একটু ভারী করিয়া ঈষৎ অভিমান-ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "তা বাছা, খুড়ীমা ব'লেই ভুলে থাকিস, মা হ'লে থাক্‌তে পারিস্ না।"

সহাস্যে মহিম বলিল, "সে কথা বড় মিথ্যে নয় খুড়ীমা, মায়ের মত আদর-যত্ন কি খুড়ীমা কত্তে পারে? এই দেখ না, বাড়ীতে এসেছি, মা থাক্‌লে আজ কত আদর-যত্ন পেতাম।"

কালীতারা হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সত্যি নাকি রে মহিম, আমি তোকে আদর-যত্ন করি না? ওরে নেমকহারাম!"

মহিম গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "তা নিমক-হারামই বল, আর যাই বল খুড়ীমা, তোমার কিন্তু সে টান নাই।"

"কিসে বুঝলি?"

"সব রকমেই। লোক যখন কাউকে নিজে আর দেখা-শোনা কত্তে না পারে, তখনই অপরের উপর ভার দেবার চেষ্টা করে।"

তাহার মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কালীতারা বলিলেন, "বটে, তাই ব'লে তোকে বুঝি বিয়ে কত্তে হবে না?"

মহিম বলিল, "নিশ্চয়ই কত্তে হবে। কারণ, সংসারের ভার নেবার একজন চাই তো।"

কালীতারা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না মহিম, তুই রাগই কর্ আর যাই কর্, বিয়ে তোকে কত্তেই হবে।"

মহিম নিঃশব্দে একখানা লুচী ছিঁড়িতে লাগিল। কালীতারা বলিলেন, "লক্ষ্মী বাপ আমার, অমত করিস্ না, আমার এই কথাটি রাখ।"

মহিম বলিল, "খুড়ীমার কথা রাখতে আমি বাধ্য নই, মা হ'লে কথা রাখতাম।"

গম্ভীর হাসি হাসিয়া কালীতারা বলিলেন, "রেখে দে তোর ও সব বাজে কথা। আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি, বিয়ে না দিয়ে ছাড়ব না।"

মৃদু হাসিয়া মহিম বলিল, "ছাড়তেই হবে। কারণ, এখন এক বৎসর কালাশৌচ।"

"সে আমি জেনেছি, এক পুত্তুর হ'লেই বছরের মধ্যে সপিণ্ডীকরণ দিয়ে বিয়ে হয়।"

"সে আতুরে। আমি আতুরে নই।"

কালীতারা একটু গম্ভীরভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে তোর মতলবখানা কি? বিয়ে করবি না?"

মহিম হাসিয়া উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই করবো। তবে বছরটা যেতে দাও।"

একটু ভাবিয়া কালীতারা বলিলেন, "ওরা তো এক বছর রাখতে পারবে না?"

"না রাখতে পারে, বিয়ে দেবে। দেশে ঐটি ছাড়া আরও অনেক মেয়ে আছে বোধ হয়।"

"তা থাক, আমার কিন্তু ঐ মেয়েটিই বেশ পছন্দ হয়েছিল। দেখতে শুনতে সকল দিকেই ভাল।"

"জগতে ওর চাইতেও ভাল মেয়ের অভাব নাই খুড়ীমা।"

মহিম ব্যস্ত হস্তে অবশিষ্ট লুচী কয়খানা গালে তুলিতে লাগিল। কালীতারা একটু ভাবিয়া গম্ভীর-স্বরে ডাকিলেন, "মহিম।"

"কেন খুড়ীমা?"

"তোর মনের কথাটা কি বল্ দেখি?"

মহিম মৃদু হাসিল। কালীতারা বলিলেন, "আমায় বল্‌বি না?"

মহিম সন্দেশটা মুখে দিয়া জল খাইয়া বলিল, "স্ত্রীপুত্রকে ভরণ পোষণ কর্‌বার ক্ষমতা না থাক্‌লে বিয়ে করা কি উচিত হয় খুড়ীমা?"

গম্ভীরভাবে কালীতারা বলিলেন, "আমিও সে কথা বুঝি মহিম, কিন্তু বিষয়টা কি তোর বাপের বিষয় নয়?"

মহিম নিরুত্তর। কালীতারা বলিলেন, এই বিষয়ের কতকটা কি তুই নিতে পারিস না?"

"না।"

"এত রাগ?"

"রাগ নয় খুড়ীমা, মানুষমাত্রেরই একটা অহঙ্কার আছে।"

"তাই ব'লে মানুষ বুঝি কারো কাছে কিছু নেয় না?"

"তোমার নিজের কিছু আছে খুড়ীমা।"

ম্লান হাসি হাসিয়া কালীতারা বলিলেন, "আমার আর কি আছে মহিম?"

"দু চারটা টাকা? অন্ততঃ দু'চার পয়সা?"

"তা থাক্‌তে পারে।"

"বেশ, তাই আমায় দিও খুড়ীমা, তোমার স্নেহের দান সেই দু'চার পয়সা আমি দু'চার লাখ টাকা জ্ঞান ক'রে মাথা পেতে নেব। কিন্তু তা ছাড়া তুমি আর কিছু নেবার জন্ত আমাকে অনুরোধ করো না।"

মহিম উঠিয়া গেল। কালীতারা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ঘরে চিমনীটা মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। ঘরে ঢুকিয়া মহিম সেটাকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু বিছানার কাছে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহার বিছানায় শুইয়া সরলা ঘুমাইতেছিল। কিন্তু মহিমের প্রথমটা মনে হইল, সেই ধপ্‌ধপে বিছানার উপর কে যেন একরাশ টাট্‌কা গোলাপফুল ঢালিয়া রাখিয়াছে। তার পর যখন নিদ্রিতাকে সরলা বলিয়া চিনিতে পারিল, তখনও সে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না, অপলক দৃষ্টিতে নিদ্রিতা বালিকার স্থির-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিল। চিমনীর আলোটা সোজা আসিয়া সরলার মুখের উপর পড়িয়াছিল। সে আলোক-প্রদীপ্ত মুখখানা দেখিয়া মহিম ভাবিল, "হেমলতার মত না হ'লেও সরলা সুন্দরী বটে।"

সরলা পাশ ফিরিতে গেল, কিন্তু চিমনীর তীব্র আলোকরশ্মিটা চোখে লাগায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং চোখ চাহিতেই বিছানার পাশে মহিমকে দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ দিয়া যেন একটু ভীতিসূচক ধ্বনি বাহির হইল। মহিম শশব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'বৌঠান।"

সরলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া ইতস্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহিম আরও উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'বৌঠান!"

"ডাকচো ঠাকুরপো" বলিয়া চারু যেন একটু ব্যস্ত-ভাবে নিজের ঘর হইতে বাহির হইল, এবং মহিমের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি চাই?"

রোষগম্ভীর-স্বরে মহিম বলিল, "তোমাদের রকম কি বৌঠান? বিছানায়—"

মহিম কথাটা শেষ করিতে পারিল না। চারু যেন নিতান্ত অনভিজ্ঞের মত বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "কেন, বিছানায় কি হয়েছে? আমি তো নিজের হাতে বিছানা ক'রে গিয়েছি।"

বলিয়া চারু দরজার পাশ দিয়া ঘরের ভিতর দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল, এবং সরলার দিকে চাহিয়াই যেন বিস্ময়াপ্লুতস্বরে বলিয়া উঠিল, "ও কে, সরি না কি? ও মা, তুই এখানে। হাঁলা সরি, তোর আক্কেলটা কি বল্ দেখি? গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।"

ক্রুদ্ধস্বরে মহিম বলিল, "দেখ বৌঠান, তোমরা যদি এ রকম অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ কর, তা হ'লে কা'লই আমি কলকাতায় চ'লে যাব, তা বল্‌ছি।"

তীব্রদৃষ্টিতে মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া চারু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ভারি বাহাদুরাই কর্‌বে? তুমি চ'লে গেলে আমাদের তো ক্ষতির সীমা থাক্‌বে না। আমি তোমার ঘরে ব'সে পড়ছিলাম, ও আমায়

কাছে ব'সে ঢুল্‌তে লাগ্‌লো। তাই ওকে বিছানায় শু'তে বলেছিলাম। তার পর মা ডাকলেন, তাড়াতাড়ি চ'লে গেলাম। আমি তো জান্‌তাম না যে, তোমার মেজাজটা এত মিলিটারী গোছের হয়েছে, বা কেউ তোমার বিছানা ছুঁলে বিছানাটা অপবিত্র হয়ে যেতে পারে।"

মহিম নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। চারু ঘরে ঢুকিয়া সরলাকে টানিয়া নীচে নামাইল, এবং মহিমের দিকে ফিরিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "বিছানাটা পাল্‌টে দেব না কি?"

মহিম মাথা নীচু করিয়া রহিল। ক্রুদ্ধভাবে সরলাকে টানিয়া লইয়া চারু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া গেলেও মহিম লজ্জায় যেন মাথা তুলিতে পারিল না। তাহার এই আকস্মিক ক্রোধ-প্রকাশটা যে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও নিতান্ত অতিরিক্ত হইয়াছে, এবং তাহাতে সরলাও যে লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, অধিকন্তু তাহার এতটা চড়া মেজাজ দেখাইবার কোনই আবশ্যকতা ছিল না, ইহাই ভাবিয়া সে মর্ম্মে মর্ম্মে লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল।

অতঃপর মহিম যে কয়দিন বাড়ীতে থাকিল, সে কয়দিন সে চারুর সহিত বেশ মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিল না। চারুও তাহার সহিত যেন প্রসন্নভাবে কথাবার্ত্তা কহিত না, অথচ উভয়েই উভয়ের মনোভাব শুধু পরস্পরের নিকট নয়, অপর সকলের দৃষ্টি হইতেও যেন প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিত। চেষ্টা করিলেও ইহা বেহারীর দৃষ্টিকে কিন্তু অতিক্রম করিতে পারিল না। বেহারী যে ইহাতে মনে মনে আনন্দ অনুভব করিল, ইহা বলাই বাহুল্য। তথাপি সে স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া, মুখে যেন মহিমের উপর সহানুভূতি দেখাইয়া চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহিমের সঙ্গে কি তোমার মনান্তর হয়েছে?"

তাচ্ছীল্যসূচক স্বরে চারু উত্তর করিল, "না।"

বেহারী বলিল, "না হলেই ভাল। কেন না, ও যে কয়দিন থাকে, সে কয়দিন ওর উপর কেউ রূঢ় ব্যবহার না করে, এইটাই আমার ইচ্ছা।"

বিরক্তির সহিত চারু বলিল, "অকারণ কারো উপর রূঢ় ব্যবহার করা আমার অভ্যাস নয়।"

বেহারী গম্ভীরভাবে বলিল, "কারণ থাকলেও সেটুকুকে সহ্য ক'রে যাওয়াই উচিত। অন্ততঃ আমার অনুরোধে—"

বিরক্তির সহিত চারু বলিল, "কারো অন্যায় অনুরোধ পালন কর্‌বার শক্তি আমার নাই।"

বেহারী যেন ঈষৎ সহানুভূতির স্বরে বলিল, "ও বেচারা নিতান্ত অসহায়।"

ক্রুদ্ধস্বরে চারু বলিল, "অসহায় বেচারা হ'লেও তার অন্যায় অভদ্র ব্যবহার আমি কিছুতেই ক্ষমা কত্তে পারি না।"

চারু রাগিয়া সরিয়া গেল। বেহারী আপন মনে মৃদু হাসিল।

কলিকাতা-যাত্রার সময় বেহারী মহিমকে বলিল, "দেখ মহিম, সংসারের সকলের মন সমান নয়। যদি কারো কাছে কোনরূপ মন্দ ব্যবহার পেয়ে থাক, তবে সেজন্য কিছু মনে করো না, বা আমার উপর রাগ ক'রে থেকো না। কেন না, তুমি আমার ভাই, কিন্তু আর সকলের পর। স্নেহ-যত্নের যা কিছু প্রত্যাশা, সেটা আমার কাছ থেকেই পেতে পার, অন্যের কাছে নয়।"

এই অন্য পর যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, তাহা মহিম বুঝিল। বুঝিয়া একটু লজ্জার হাসি হাসিল। বেহারী তখন তাহাকে মনোযোগ সহকারে পড়া-শুনা করিতে উপদেশ দিল, এবং বি এ পরীক্ষা দিয়া যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ল'টা পাশ করা যায়, সে সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল।

অতঃপর মহিম চারুর নিকট বিদায় লইতে গিয়া তাহাকে বলিল, "দেখ বৌঠান্ যদি কোন অন্যায় ক'রে থাকি, তবে সেটা মাপ ক'রো।"

চারু গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "আচ্ছা।"

মৃদু হাসিয়া মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যই কি আমার উপর রাগ করেছ বৌঠান্?"

চারু বলিল, "পরের উপর রাগ ক'রে কোন ফল নাই।"

মহিম বলিল, "আমি কি পর?"

কঠোর-স্বরে চারু বলিল, "আপনও নয়।"

মহিমের মুখখানা যেন কালি হইয়া গেল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চারুকে নমস্কার করিল। তার পর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাকে আবার আস্‌তে বললে না, বৌঠান্?"

চারু মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া উত্তর করিল, "আমার বল্‌বার কোন দরকার নাই।"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে মহিম বলিল, "নাই?"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া চারু দৃঢ়-স্বরে উত্তর দিল, "না।

মহিম নতমুখে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে দরজার বাহির হইয়া গেল। চারু মুখ ফিরাইয়া তীব্র কঠোর দৃষ্টিতে দরজার দিকে চাহি । রহিল। এমন সময় বেহারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহিম চ'লে গেল?"

চারু তাহার দিকে ফিরিয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ।"

বেহারী বলিল, "কিছু ব'লে গেল না কি?"

"না" বলিয়া চারু প্রস্থানোদ্যত হইল। ঈষৎ হাসিয়া বেহারী বলিল, "তার উপরের রাগটা আমার উপর ঝাড়বে বুঝি?"

চারু তাহার মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ধীর-গম্ভীর-পদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রবিবারের মধ্যাহ্নে মেসে সতীশের ঘরে তাসের আড্ডা খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। বিন্তী, পঞ্চাশ, রঙ, তুরুপের উচ্চনাদে ঘরখানা যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। বাহিরে জমাট মেঘে সমগ্র আকাশ ছাইয়া গিয়াছিল, বৃষ্টির ঝর্-ঝর্ শব্দে তাসের আড্ডার কোলাহল ডুবিয়া যাইতেছিল। মহিম একখানা কবিতার বহি লইয়া জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, করুণা সতীশের বিছানার উপর বসিয়া আধভাঙ্গা হার্ম্মোনিয়মটা লইয়া সঙ্গীতচর্চ্চায় নিরত হইয়াছিল। তাসের পড়তা সতীশের বিপক্ষে পড়িয়াছিল; চারিখানা কাগজের উপর প্রতি-পক্ষ বিন্তী হাঁকিয়াছিল। সুতরাং সকলেরই মনোযোগ খেলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। মহিমও পুস্তক হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া ক্রীড়ার ফলাফল লক্ষ্য করিতে-ছিল।

এমন সময় করুণা হার্ম্মোনিয়মের পর্দ্দা টিপিয়া গাহিয়া উঠিল,—

"মেঘের প'রে মেঘ জমেছে আঁধার ক'রে আসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।"

রমেশ চীৎকার করিয়া বলিল, "ইস্তক কাবার।" সতীশ ম্লানমুখে হাতের কাগজগুলা ফেলিয়া দিল, এবং করুণার দিকে ফিরিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "রক্ষা কর্ করুণা, তোর ঐ ঘ্যানঘ্যানানি বন্ধ কর্।"

ঈষৎ হাসিয়া করুণা উত্তর করিল, "বন্ধ কত্তে হয় তো তোমাদের ঐ বিন্তী পঞ্চাশ বন্ধ ক'রে দেওয়া দরকার। কেন না, তোমাদের গোলমালে আমার বিদ্যাচর্চ্চার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হচ্চে।"

রমেশ তাস ভাঁজিতে ভাঁজিতে বলিল, "তোর ওটা বিদ্যাচর্চ্চা হচ্চে না কি?"

মাথা নাড়িয়া করুণা বলিল, "নিশ্চয়। ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরম্।"

সতীশ রাগিয়া বলিল, "পাকামো রাখ করুণা, তোর ঐ ঘ্যানঘ্যানানি বিদ্যা নয়, অবিদ্যা।"

করুণা হাসিয়া বলিল, "বিদ্যার প্রসন্নতা লাভ কত্তে হ'লে প্রথমত অবিদ্যার সাধনা করা দরকার। এ কথা তন্ত্রসারের আলোচনা কর্‌লে বুঝতে পার্‌বে।"

বলিয়া করুণা পুনরায় গান ধরিল,—

"তুমি যদি না দেখা দাও কর আমায় হেলা,
কেমন ক'রে কাটে আমার এমন বাদল বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি, কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।"

গান-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নগেন গাহিয়া উঠিল, "দুরন্ত বসন্তে সখি —"

করুণা ধমক দিয়া বলিল, 'চুপ চুপ, এই ভরা আষাঢ়ে দুরন্ত বসন্ত?"

নগেন বলিল, "আষাঢ় মাসে বসন্তের গান গাইতে নাই না কি?"

মাথা নাড়িয়া করুণা বলিল, "কক্ষণো না। অসাময়িক হ'লে রসভঙ্গ হয় যে। অলঙ্কার পড়েছিস্?"

নগেনও ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "রেখে দে তোর অলঙ্কার। তা হ'লে থিয়েটারে রাত দু'টোর সময় দণ্ডী এসে কোন্ লজ্জায় বলে, 'পশ্চিমে আরক্ত ভানু অস্তাচলগামী, আসে ছায়া বিকাশিয়া কায়া, পাখী ফেরে নিজ নীড়ে'?"

সকলে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। ঈষৎ অপ্রতিভভাবে নগেন বলিল, "শুধু হাস্‌লেই তো হ'লো না, কথাটা বুঝিয়ে দাও।"

করুণা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোর মত মূর্খকে বোঝান কিছু দুঃসাধ্য বটে। আরে মূর্খ, থিয়েটারে রাত

দু'টোর সময় দণ্ডীর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পশ্চিমে আরক্ত অম্বর সিন্টা সামনে ধ'রে দেয় তবে কি জন্য ?"

নগেন গম্ভীরভাবে বলিল, "কিন্তু যাত্রায় তো দিন্ থাকে না ?"

পুনরায় সকলে হাসিয়া উঠিল। রমেশ বলিল, "এবার কিন্তু করুণার হার।"

সতীশ হাতের তাসগুলিকে মাদুরের উপর ফেলিয়া বলিল, "শুধু এইটাই হার নয়। আমি দেখিয়ে দেব, ওর নিজের কথাতেই নিজের হার হয়েছে।"

করুণা হাঁটুর উপর হইতে হার্মোনিয়মটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা. দেখিয়ে দাও।"

সতীশ বলিল, "তোর মতে দৃশ্যের সঙ্গে গান বা কথার মিল না হ'লে রসভঙ্গ হয়, এই তো ?"

করুণা বলিল, "নিশ্চয়।"

সতীশ বলিল, "তুই গাইলি—'আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।' প্রথমতঃ তুই এখন একা নাই, দ্বিতীয়তঃ তুই দ্বার হ'তে দশ হাত দূরে বিছানার উপর ব'সে আছিস্। তার পর তুই 'দূরের পানে আঁখি মেলে চেয়ে' নাই, এবং তোর পরাণটা যে 'দুরন্ত বাতাসে কেঁদে' বেড়াচ্চে, তারও কোন প্রমাণ নাই।"

বিছানার উপর জোরে একটা চাপড় মারিয়া করুণা বলিয়া উঠিল, "আলবৎ প্রমাণ আছে। তবে অবশ্য আমি গেয়েছি ব'লে আমাকেই যে গানের নায়ক হ'তে হবে, এমন কোন কথা নাই।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে তোমার গানের নায়কটি কে ?"

মহিমের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া করুণা বলিল, "এখানে নায়ক হচ্চে মহিম। ঐ দেখ, দরজার পাশে না হ'লেও সে জানালার পাশে ব'সে আছে। আর ঘরে এত লোক থাকলেও ঠিক একার মতই ব'সে আছে কি না, সেটা বোধ হয় সকলেই বুঝতে পাচ্চো। তার পর ঐ দেখ, জানালা দিয়ে দূরের পানে চেয়ে আছে। তবে ওর মনটা বাতাসের সঙ্গে কেঁদে বেড়াচ্ছে কি না, সেটা অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

নগেন লাফাইয়া উঠিল, এবং হাতে হাত চাপড়াইয়া হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "জীতা রও করুণা ভায়া, থ্রী চিয়ার্স ফর্ ইওর নিউ কন্‌ভেন্‌সান্।"

মহিম তাড়াতাড়ি জানালার দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। সতীশ তাহার পক্ষসমর্থন করিয়া বলিল, 'না না, বেচারা কাব্যামৃতরসাস্বাদে বিভোর হয়ে আছে।"

করুণা বলিল, "তোমার আর ওকালতী কত্তে হবে না সতীশ, ও যদি মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে কারো একখানা মুখের ছবি না ভেবে থাকে, তবে আমার নামই মিথ্যা।"

ঈষৎ হাসিয়া মহিম বলিল, "তাই যদি ভাবি, তাতেই বা এমন কি দোষ হয়েছে ?"

করুণা বলিল, "দোষ কিছু হোক চাই না হোক, আমার গানটা যে সময়োপযোগী হয়েছে, আমি শুধু এইটাই প্রমাণ ক'রে দিলাম।"

ঘরের ভিতর আর একটা হাস্যরোল উত্থিত হইল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মহিম, তুই কি সত্য প্রেমে পড়েছিস্ ?"

মৃদু হাসিয়া মহিম উত্তর করিল, "বোধ হয়।"

রমেশ বলিল, "কিন্তু শেষটা কি দাঁড়াবে ? ট্র্যাজিডি না কমেডি ?'

করুণা বলিল, "গতিক দেখে বোধ হয় কমেডি।"

সতীশ বলিল, "কিন্তু আমি বল্‌ছি ট্র্যাজিডি।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এরূপ অনুমানের কারণ ?"

সতীশ বলিল, "ও যখন পিতার ত্যাজ্যপুত্র হয়েছে, তখন ওর জীবনটাই আস্ত ট্র্যাজিডি, এর ভিতর কমেডি আস্‌তেই পারে না।"

করুণা বলিল, "কিন্তু আমি বল্‌ছি আসবে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "রেখে দে তোর সুখানি দুঃখানি। ওর জীবনে যদি কখন 'সুখানি' আসে, তবে আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি. সে দিন আমার পুঁথিপত্র পর্য্যন্ত বেচে তোদের খাইয়ে দেব।"

সতীশ সশব্দে মাদুরের উপর চপেটাঘাত করিল। রমেশ হাসিয়া বলিল, "তোর মত কঠিন শপথ কেউ কখনো করেনি সতীশ।"

করুণা হার্মোনিয়মের পর্দ্দা টিপিয়া গান ধরিল,—

"সাধের তরণী আমারো কে দিল তরঙ্গে।"

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। শুধু একটা থমথমে মেঘে আকাশ ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। বর্ষাশীতল উদাস

বাবু হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। করুণা গাহিতে-ছিল—

"মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টকতরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।"

এমন সময় বিপিন বাবুর বাড়ীর চাকর আসিয়া ডাকিল, "মহিম বাবু আছেন?"

করুণা চীৎকার করিয়া বলিল, "দস্তুরমত আছেন। ওঠো হে মহিম, তোমার ডাক এসেছে।"

নগেন হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা আর আসবে না? 'এমন বাদল বেলা'—কি হে করুণা, তোমার গানটা কি, 'কেমন ক'রে কাটে আমার এমন বাদল বেলা'।"

করুণা মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "বাবা, এ কি যে সে লোকের গান, গানের রাজা রবি বাবুর কল্পনা। এ কল্পনার সঙ্গে বাস্তবকে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যেতে হবে।"

মহিম তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য জানাইল, বাবু তাঁহাকে ডাকিতেছেন। নগেন বলিয়া উঠিল, "কোন্ বাবু রে, দিদিবাবু না কি?"

রমেশ বলিল, "ছিঃ নগেন।"

মহিম দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। নগেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিমর্ষভাবে বলিল, "বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। এমন জানলে আমিই তেতলার ঘরটা নিতাম।"

সতীশ বলিল, "তেতলা ছেড়ে সাততলা নিলেও কিছু হ'তো না নগেন। মেয়েমানুষের অনুরাগ আকর্ষণ—সেও একটা ক্ষমতা থাকা চাই। সে ক্ষমতা তোর আমার মত লোকের নাই।"

উষ্মাপূর্ণস্বরে নগেন বলিল, "তোমার নাই ব'লে আর কারো যে থাকবে না, এমন হ'তে পারে না। তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি, কত গণ্ডা মেয়েমানুষ আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দেয়।"

সতীশ বলিল, "সে নতুন বাজারের বামী শ্যামী ক্ষান্তী। শিক্ষিত মেয়েমানুষ তোমার গায়ের গন্ধে নাক সিঁটকে চ'লে যায়।"

নগেন ছাড়া ঘরের আর সকলেই হাসিয়া উঠিল। নগেন আপন মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পড়াইবার ঘরে বিপিন বাবু ও হেমলতা বসিয়া-ছিল। মহিম দরজায় উপস্থিত হইলেই বিপিন বাবু কন্যার দিকে চাহিয়া সহাস্য-মুখে বলিলেন, "এই দেখ লতি, আমি যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটেচে। পশ্চিমে লোকগুলার রীতিই ঐ, ধ'রে আনতে বললে বেঁধে আনে। আমি শুধু বলেছিলাম, মহিম বাবুকে বল্‌বি, একবার যেন আজ আসে। তা নয়, ও একে-বারে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।"

মহিম ঘরে ঢুকিয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "ও বেচারীর কোন দোষ নাই। আমিই ওর সঙ্গে এসেছি।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "জরুরী ডাক দিয়েছে, কাজেই এসেছ। ও বেটাদের তো জ্ঞান নাই, কাজের সময়, "

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া মহিম বলিল, "কাজ কিছুই ছিল না, বসেছিলাম মাত্র।"

বলিয়া মহিম বিপিন বাবুর পাশের চেয়ারখানা অধিকার করিল। বিপিন বাবু সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "কথা অপর কিছুই নয়, আজ দু'চার জন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেছি। তুমি ঘরের ছেলে,—"

মহিম নতমস্তকে মৃদু হাস্য করিল। বিপিন বাবু বলিলেন "কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন একটা মতভেদ ঘটেছে মহিম যে, তার মীমাংসার জন্যই তোমাকে তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠান দরকার হয়েছে।"

মহিম বিস্ময়ের সহিত মুখ তুলিয়া চাহিল। বিপিন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং "একটু ব'সো" বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে তখনও খুব সূক্ষ্মধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল; কিন্তু তাহারই ভিতর দিয়া একটু চিক্‌চিকে রোদ ফুটিয়া মাঝে মাঝে মেঘাচ্ছন্ন আকাশটাকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছিল। মহিম খোলা জানালা দিয়া মেঘমলিন প্রকৃতির মুখের ক্ষীণহাসিটুকুর দিকে চাহিয়া রহিল। হেমলতা একখানা বই নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আজকার দিনটা যেন কেমন কেমন, না?"

দৃষ্টি না ফিরাইয়াই মহিম একটু হাসিয়া বলিল, "মন্দ কি?" বলিয়া সে আবৃত্তি করিল—

'মেঘৈর্মে দুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ''

ব্যস্তভাবে হেমলতা বলিল, "রক্ষা করুন, একে এই মেঘলা দিন, তার উপর ঐ অনুস্বার বিসর্গ, ও সব আমার মাথার ভিতরেই আসবে না।"

বলিয়া হেমলতা হাসিয়া উঠিল। মহিম দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সহাস্যে বলিল, "আচ্ছা, না হয় একটা বাঙ্গালা কবিতাই শোন,—'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'—"

হেমলতা এত জোরে হাসিয়া উঠিল যে, মহিমকে আবৃত্তি বন্ধ করিতে হইল। তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে হেমলতা ঈষৎ অপ্রতিভ-ভাবে হাস্যবেগ সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এটা বাঙ্গালা কবিতা, না মারাঠী লাঠী?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মহিম বলিল, "রীতিমত বাঙ্গালা কবিতা, এবং বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা।"

হেমলতা বলিল, "বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি আমার মাথায় থাকুন, আমি তো তাঁর লেখার এক বর্ণও বুঝতে পারি না।"

মহিম বলিল, "এ সকল কবিতার ভাব এত উচ্চ যে, তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।"

হেমলতা সহাস্যে বলিল, "এবং হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, এই কারণেই এ সকল শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং কবি একজন মহাকবি।"

বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া মহিম বলিল, "মহা-কবির উচ্চভাবপূর্ণ রচনা 'পাখী সব করে রব'—এর মত সরল হয় না।"

মৃদু গ্রীবা আন্দোলন করিতে করিতে হেমলতা বলিল, "তা হ'লে আপনার মতে যাঁর রচনা যত দুর্ব্বোধ্য, তিনি তত বড় মহাকবি।"

বলিয়াই হেমলতা ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। মহিম সে হাসিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "অবশ্য আমি এমন কথা বলি না যে, মহাকবির রচনামাত্রই দুর্ব্বোধ্য হ'তে হবে, আর বাস্তবিক তা হয় না। কালিদাসের রচনা খুব সরল, আবার মাঘের ভাষা দুর্ব্বোধ্য। মিল্টনের রচনা বুঝতে হ'লে অনেকখানি শক্তির দরকার। সুতরাং আমার বক্তব্য এই যে, মহাকবির প্রতিভার দান গ্রহণ করবার শক্তি সকলের থাকে না।"

মৃদু হাসিয়া হেমলতা বলিল, "আপনি দেখছি, রবি-বাবুর একজন অন্ধ ভক্ত।"

মহিম বলিল, "প্রতিভার পূজা যদি অন্ধভক্তি হয়, তবে এ অপবাদ স্বীকার ক'রে নিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

বলিয়া মহিম একটু হাসিল। এমন সময় গৃহিণী ব্যস্তভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা মহিম, তুমিই বল তো, নিমন্ত্রিত ভদ্র লোকদের কি নিরামিষ খাওয়ান উচিত হয়?"

মহিমের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিপিন বাবু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু নিরামিষ ভোজনটাই যে এ দেশের চিরন্তন রীতি, সেটা বিদেশীয়ের সম্পর্কে এসে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। নিরামিষ আহারই সাত্ত্বিক আহার। গীতায় ভগবান্ কি বলেছেন, জান তো—

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।

বাধা দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "গীতায় ভগবান্ বলেছেন, স্ত্রী, পুত্র, সংসার সব ছেড়ে দিয়ে বনে গিয়ে বাস কর। ভগবানের সে আদেশ তো কেউ মান্য করে না।"

বিপিন বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "এমন কথা গীতার কোন জায়গাতেই বলে নি। আচ্ছা, মহিম বলুক, এমন কথা গীতায় আছে কি না।"

মহিম পেন্সিলটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "গীতা আমি পড়ি নাই।"

গৃহিণী ইহাতে যেন অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া বলি-লেন, "পড়নি, বেশ করেছ মহিম। আমার অনুরোধ কখন পড়েও কাজ নাই। তা হ'লে প্রত্যেক অন্যায় কাজের সঙ্গে গীতার দোহাই দিতে পারবে না।"

মহিম মৃদু হাসিল। গৃহিণী বলিলেন, "আসল কথা কি জান মহিম, এই বাদলায় ঘরের বা'র হ'তে ওঁর ইচ্ছা নয়। কাজেই গীতার দোহাই দিয়ে নিরা-মিষ ভোজনের পক্ষসমর্থন করা হচ্চে।"

বিপিন বাবু চেয়ারখানা টানিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "কিন্তু সেটা কি নেহাত অন্যায় হচ্চে? আচ্ছা, তুমিই বল দেখি মহিম, নিরামিষ আহারটা কি আহার নয়?"

সহাস্যে মহিম বলিল, "নিরামিষ আহার যে আহার নয়, এমন কথা বলা যায় না। তবে আজ-কালকার প্রথায়—"

গৃহিণী সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "বল তো মহিম,

আজকাল একটু ভাল খেতে বা খাওয়াতে হ'লে মাছ-মাংস না হ'লে কি চলে ?"

তার পর স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি তো বলেছি, মহিম কখনই এমন অন্যায় মতের সমর্থন করবে না।"

বিপিন বাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন,"আমিও জানি, মহিম তোমার বিপক্ষে মত দেবে না। যাক, লতি, তুই কোন্ পক্ষে ?"

হেমলতা নীরবে মৃদু হাস্য করিল। গৃহিণী বলিলেন, "নাও ওঠো, চারটে বাজে।"

অগত্যা বিপিন বাবুকে উঠিতে হইল। যাইবার সময় তিনি মহিমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা হ'লে মহিম, সন্ধ্যার পরে—"

গৃহিণী যেন তাঁহাকে ধমক দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, তুমি আবার মহিমকে নেমন্তন্ন কচ্চো নাকি ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, নেমন্তন্ন নয়, তবে একবার বল্‌তে তো হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তবে নেমতন্ন আর কাকে বলে ? ও ঘরের ছেলে, চেয়ে খাবে, নেমতন্ন কর্‌লে ওকে অপমান করা হয়।"

বলিয়া তিনি মহিমের মুখের উপর সস্নেহ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। মহিম মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমারও তাই মত।"

বিপিন বাবু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সকলের যাতে মত, তাই কর, আমি তোমাদের কোন কথাতেই নাই।"

বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন, গৃহিণীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। মহিম আর কিছুক্ষণ হেমলতার সহিত গল্প করিয়া উঠিয়া গেল।

মহিমের ভাবগতিকটা সতীশের আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। সে বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল, মহিমের মনের ভিতর বেশ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পড়ায় আর সে আগ্রহ নাই, পড়িতে বসিয়া বই খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পাশের বাড়ীর ছাদে কেহ না থাকিলেও খোলা জানালা দিয়া সেই দিকেই ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সব সময়ে তাহার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। বেশী কথা কহিতে গেলে বিরক্ত হইয়া উঠে। কলেজে ক্লাসে বসিয়া ঘড়ীর কাঁটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে। পাশের বাড়ীতে যাতায়াতটাও যেন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিতেছে। পড়াইবার সময় ছাড়া অন্য সময়েও সে ঐ বাড়ীতে গিয়া বসিয়া থাকে, না গেলে চাকর ডাকিতে আসে। উহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও যেন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণও চলিতেছে। সতীশ বড়ই চিন্তিত হইল।

মহিমের সঙ্গে সতীশের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। এক জেলায় বাড়ী, তাহাও চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে। মেসের আর সকল ছাত্রের সঙ্গে যে সম্পর্ক, সতীশের সঙ্গেও তাই। তাহা হইলেও সতীশ যেন মহিমকে ইহাপেক্ষা একটু বেশী নিকট-সম্পর্কীয় বলিয়া জ্ঞান করিত। মহিমও যে সেরূপ মনে করিত না, তাহা নহে। আকর্ষণটা দুই দিক্ হইতেই ছিল। সুতরাং মহিমের ভাবগতিক দেখিয়া সে শুধু মেসের আর সকলের মত মহিমকে উপহাস করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারিল না, তাহার জন্য বেশ একটু চিন্তিত হইল। মহিম পিতার ত্যাজ্য পুত্র হইয়াছে শুনিয়া সে দুঃখিত হইয়াছিল, কিন্তু এতটা ভাবনা তাহার হয় নাই।

সতীশ বুঝিতে পারিল, এই বিপিন বাবু লোকটি বড় সহজ নহেন। মেয়ের রূপের ফাঁদে জড়াইয়া তিনি নির্ব্বোধ মহিমকে দিয়া নিজের কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু সে দুরভিসন্ধিটা কি ? মহিমের স্কন্ধে এই কন্যারত্নটিকে চাপাইয়া দেওয়া ? কিন্তু এজন্য মহিমের উপরেই তাঁহার এত অনুগ্রহ কেন ? দেশে কি আর সুপাত্র নাই ? অথবা তিনি এই উপায়ে মেয়ের বিবাহের খরচটা বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন ? কিন্তু যিনি মেয়েকে পড়াইবার জন্য ত্রিশ টাকা মাহিনা দিয়া মাষ্টার রাখিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে বাপে-খেদান মায়ে-তাড়ান ছেলের হাতে এমন শিক্ষিতা সুরূপা কন্যাকে সম্প্রদান করিবার জন্য এরূপ চেষ্টা সম্ভব হইতে পারে কি ? কে এই মহাত্মা যশোহর জেলা শূন্য করিয়া বৌবাজার উজ্জ্বল করিতে আসিয়াছেন, এবং মেসের পাশে বাড়ীভাড়া লইয়া মহিমচন্দ্রের মস্তকভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ?

সতীশ স্থির করিল, মহিমকে এই বেড়াজাল হইতে উদ্ধার করিতে হইলে এই মহাত্মার সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান লইতে হইবে, এবং সে জন্য যদি গোয়েন্দা সাজিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না।

এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া সতীশ একদিন মহিমকে

জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ হে মহিম, তোমার বিপিন বাবু না কোম্পানীর কাগজের দালালী করে?"

মহিম বলিল, "কেন, তোমার কোম্পানীর কাগজগুলো বেচবে না কি?"

সতীশ বলিল, "আমি তো বাপের ত্যাজ্য-পুত্র নই যে, কোম্পানীর কাগজ বেচে খাব?"

মহিম বলিল, "তবে বিপিন বাবুর সঙ্গে দরকার?"

"বিপিন বাবুর একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে।"

"ঘটকালী করবে নাকি?"

"সুবিধা পাওয়া গেলে সকল কাজই করা যায়।"

"কিন্তু তিনি এখন মেয়ের বিয়ে দেবেন না।"

"উপযুক্ত পাত্র পেলেই দেবেন।"

"তার উপযুক্ত পাত্র তোমার সন্ধানে নাই।"

"আর কেউ না থাকে, নিজে তো আছি।"

ঈষৎ হাসিয়া মহিম বলিল, "তাই না কি? তা হ'লে আমিই না হয় ঘটকালী করি।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "পারবে?"

মহিম বলিল, "পারি কি না, ভার দিয়েই দেখ না।"

সতীশ বলিল, "ভাল, দরকার হয়, সে ভার পরে দেওয়া যাবে। এখন আপাততঃ, বিপিন বাবুর সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দাও দেখি।"

গম্ভীরভাবে মহিম বলিল, "আচ্ছা।"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই হে, তোমার সঙ্গে আমি দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব না। আমার মামাত ভাই সুবোধ খানকতক কোম্পানীর কাগজ বেচবে, তারই জন্য বিপিন বাবুকে দরকার।"

মহিম বলিল, "তোমার প্রকৃতিটা নিতান্ত সন্দিগ্ধ।"

সতীশ বলিল, "তত্র সন্দেহো নাস্তি। কারণ, আমি মানুষ।"

সেই দিনই বেড়াইতে যাইবার সময় মহিম সতীশকে সঙ্গে লইয়া বিপিন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

হেমলতা পড়িবার ঘরে বসিয়া ছিল, দরজার বাহিরে মহিমের পায়ের সাড়া পাইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখুন মহিম বাবু, আপনার কিন্তু বড় অন্যায় যে, সাড়ে চারটা—"

সহসা দরজার উপর দৃষ্টি পড়িতেই মহিমের পশ্চাতে সতীশকে দেখিয়া হেমলতা থামিয়া গেল। লজ্জায় তাহার সমগ্র মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সতীশ ঘরে ঢুকিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে নমস্কার করিল, এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "মহিমের বিলম্বের জন্য যদি কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে, তবে সেটা আমার জন্যই হয়েছে। সেজন্য আমিই আপনার কাছে মাপ চাইচি।"

হেমলতা লজ্জায় মাথা নীচু করিল। মহিম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিপিন বাবু বাড়ীতে আছেন?"

হেমলতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, তিনি বাড়ীতে নাই। সতীশ বলিল, "তাঁর ফিরতে কি সন্ধ্যা হ'তে পারে?"

মৃদুস্বরে হেমলতা বলিল, "তার কিছু ঠিক নাই। তবে সন্ধ্যার আগে নিশ্চয় ফিরবেন।"

মহিমের দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, "তবে সন্ধ্যার পরেই এসে দেখা করবো, এখন যাই।"

বলিয়া সতীশ পুনরায় হেমলতাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। এবার হেমলতাও তাহাকে প্রতিনমস্কার করিল।

সতীশ চলিয়া গেলে মহিম হেমলতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও আমার বন্ধু সতীশ।"

ব্যস্তভাবে হেমলতা বলিল, "আপনার বন্ধু? তা আমাকে আগে বলতে হয়। ওঁর অভ্যর্থনা করা হ'লো না।"

মহিম বলিল, "তাতে কোন ক্ষতি হবে না। বৈষয়িক কাজের জন্য তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।"

হেমলতা মাথা নাড়িয়া বলিল, "যে জন্যই আসুন, আপনার বন্ধু তো। না না, এটা বড়ই অন্যায় হয়েছে।"

ঈষৎ হাসিয়া মহিম বলিল, "অন্যায় হয়ে থাকে, সন্ধ্যার পর তো আবার আসবে, তখন এই ত্রুটিটুকু সংশোধন ক'রে নিও।"

"কিন্তু উনি কি ভাববেন?"

"ভাববেন, মেয়েটির আর সব ভাল, শুধু লজ্জাটাই কিছু বেশী।"

"যান" বলিয়া হেমলতা ঘাড় বাঁকাইয়া মহিমের মুখের উপর সহাস্যকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

সন্ধ্যার পর সতীশকে সঙ্গে লইয়া মহিম যখন বিপিন বাবুর ঘরে উপস্থিত হইল, তখন বিপিন বাবু

তাকিয়ার উপর আড় হইয়া পড়িয়া গড় গড়ার নলে টান দিতেছিলেন, হেমলতা পিতাকে ভক্তিতত্ত্বের গান শুনাইতেছিল। মহিম ও সতীশকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া হেমলতা গান বন্ধ করিল। সতীশ বিপিন বাবুকে নমস্কার করিয়া হেমলতার দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "আপনার সঙ্গীতচর্চ্চা বাধা দিলাম, সেজন্য আমি মাপ চাইচি "

হেমলতা মৃদু হাসিয়া মস্তক নত করিল। বিপিন বাবু কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে এই নবাগত যুবকের দিকে চাহিলেন। তখন মহিম অগ্রসর হইয়া সতীশের পরিচয় দিল। বিপিন বাবু সোজা হইয়া বসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "তোমার বন্ধু, এস বাবা এস, তা হ'লে তো তুমি ঘরের ছেলে। কৈ, একদিনও তো তোমায় দেখি নাই।"

সতীশ বিছানার উপর জাঁকিয়া বসিয়া বলিল, "আপনার এ বাড়ীতে আসা অবধি আলাপ করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে আলাপ করতে আসা—সেটা এটিকেট বিরুদ্ধ।"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, ঐ এক এটিকেট নিয়ে জ্বালাতন। উঠতে, বসতে, হাঁচতে, কাসতে সকলতাতেই এটিকেট। দু'বেলা মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হ'লেও নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করবার যো নাই, এটিকেটের বিরুদ্ধ হবে। পল্লীগ্রামে এ বালাই নাই।"

এইরূপে কথার সূত্রপাত হইলে ক্রমে আধুনিক ও প্রাচীন সভ্যতা এবং সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক কথাই হইল। সতীশের বাক্‌চাতুর্য্যে শুধু বিপিন বাবু নহে, মহিম পর্য্যন্ত বিস্মিত হইল। পরিশেষে সতীশ নিজ প্রয়োজন জানাইল। তাহার মাতুলপুত্র বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিবেন, এইজন্যই সে বিপিন বাবুর কাছে আসিয়াছে। বিপিন বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কাগজ একদিনেই বিক্রী ক'রে দিতে পারি। কিন্তু কাগজের দর আজ কাল অনেক নেমে গিয়েছে। এখন কুড়িহাজার টাকার কাগজে ষোল হাজার হয় কি না সন্দেহ। তবে বাজারের যেরূপ গতিক, তাতে বোধ হয়, মাসখানেক পরেই দর উঠবে। সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেই ভাল হয়।"

সতীশ বলিল যে, মাতুলপুত্রের মত জানিয়া সে সংবাদ দিবে।

হেমলতা এতক্ষণ হার্ম্মোনিয়মের সম্মুখে চুপ করিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে পর্দাগুলার উপর আঙ্গুল ঘষিতেছিল। সতীশ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "যখন আমাকে দেখে গান বন্ধ করেছেন, তখন তার শাস্তিস্বরূপ আপনার গান না শুনে যাচ্চি না।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "অবশ্যই শোনাবে, বিশেষ তুমি যখন মহিমের বন্ধু। অনেকে নিন্দা করে সতীশ বাবু, আমি কিন্তু এটাকে বিশুদ্ধ আমোদ ব'লেই মনে করি।"

সতীশ বলিল, "নিশ্চয়। গান-বাজনার মধ্যে নিন্দার কিছুই নাই। আর সংস্কৃত নাটকাদিতেও দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে গান বাজনার প্রচলন ছিল।"

সোৎসাহে বিপিন বাবু বলিলেন, "এই দেখ। আমাদের সমাজটার কি শোচনীয় পরিবর্ত্তনই হয়েছে।"

পিতা ও সতীশের অনুরোধে হেমলতাকে গাহিতে হইল। কিন্তু লজ্জায় গলা বেশ খুলিল না, কোনরূপে গানটা শেষ করিল। সতীশ বলিল, "শুধু মিষ্ট নয়, তাল লয়েও ঠিক আছে।"

বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার এ বিষয়ে টেষ্ট আছে না কি?"

মহিম বলিয়া উঠিল, "রীতিমত আছে।"

তখন বিপিন বাবু তাহাকে গাহিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হেমলতাও সলজ্জভাবে সে অনুরোধে যোগ দিল। অগত্যা সতীশকেও অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। বলিল, "দেখ্‌চি, আমাকে অপ্রতিভ না ক'রে ছাড়বেন না।"

হেমলতা সরিয়া আসিল, সতীশ গিয়া হার্ম্মোনিয়মের সম্মুখে বসিল। বেলোতে পায়ের চাপ দিয়া পর্দ্দার উপর আঙ্গুল চালাইতেই যন্ত্রটা যেন এক নূতন সুরে, নূতন গুরুগম্ভীররবে বাজিয়া উঠিল, পর্দ্দার উপর আঙ্গুলগুলা ঠিক যেন যন্ত্রের মত ছুটিতে লাগিল। তাহার অঙ্গুলি-চালনা-কৌশল দেখিয়াই বিপিন বাবু বুঝিলেন, এই যুবক সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী। সতীশ এবার গৎ ছাড়িয়া গান ধরিল, সিন্ধু-ভৈরবীর গুরুগম্ভীর রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল,—

"উঠ গো করুণাময়ি খোল মা কুটীর-দ্বার,
আঁধারে রহিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার।"

গম্ভীর কণ্ঠের ভরা আওয়াজে ঘরখানা যেন ভরিয়া উঠিল। গমকে মূর্চ্ছনায় সুর আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে

লাগিল। হৃদয়ের সমস্ত একাগ্রতা সুরের ভিতর ঢালিয়া দিয়া সতীশ গাহিতে লাগিল,—

"সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে,
মা মা ব'লে কেঁদে আমার অস্থি-চর্ম্ম হ'লো সার।
খেলায় মত্ত ছিলাম ব'লে, তাই কি মা আছ ভুলে,
এবার নে মা কোলে তুলে খেলিতে যাব না আর।"

গান থামিল, কিন্তু সুর যেন তখনও শ্রোতাদের অন্তরিন্দ্রিয়কে ধ্বনিত করিয়া ঘরের ভিতর ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। হেমলতা নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া এই নবীন গায়কের গলার বিস্তার মাধুর্য্য অনুভব করিতে লাগিল।

রাত্রি দশটা বাজিল। সতীশ মহিমের সহিত বিদায় গ্রহণ করিল। বিপিন বাবু তাহাকে মাঝে মাঝে আসিবার জন্ম অনুরোধ করিলেন। সতীশ সানন্দে তাহাতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে মহিম ভাবিল, সতীশ একদিনে এই বাড়ীটায় যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে,এই কয়মাসেও সে তাহা করিতে পারে নাই। মহিমের চিত্তটা যেন ঈষৎ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বিপিন বাবুর বাড়ীতে সতীশের যাতায়াতটা যখন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন মহিম একদিন তাহাকে শ্লেষ করিয়া বলিল, "ওহে সতীশ, ব্রাহ্ম বিপিন বাবুরা হঠাৎ গোঁড়া হিঁদু হয়ে পড়লো না কি ?"

সতীশ হাসিয়া উত্তর করিল, "ও'রা হিন্দু হয়ে না পড়লেও আমি ক্রমশঃ ব্রাহ্ম হয়ে পড়ছি।"

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "তার উদ্দেশ্য ?"

সতীশ বলিল, "উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আমার এক হতভাগ্য বন্ধুর মানস-পতঙ্গকে এক সুন্দরীর রূপবহ্নি হ'তে উদ্ধার করা।"

মহিম বলিল, "এবং তার পর নিজে সেই রূপের আগুনে ঝাঁপিয়া পড়া।"

সতীশ হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোর খুব বুদ্ধি মহিম, কিন্তু আমারও কতটা আত্মত্যাগ বল্ দেখি ?"

মহিম কিন্তু তাহার এই হাসিতে বেশ প্রসন্ন হইতে পারিল না, ঈষৎ ম্লানমুখে বলিল, "আদর্শ আত্মত্যাগ বটে। কিন্তু আমার অনুরোধ, আপাততঃ এই ত্যাগের মহান্ দৃষ্টান্তটা না দেখিয়ে নিজে একটু সাম্‌লে চল্‌লে ভাল হয়।"

সতীশের মুখখানা অতিমাত্র গম্ভীর হইয়া উঠিল। জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা আর হয় না মহিম।"

মহিম বলিল, "কেন হয় না ?"

সতীশ দৃষ্টি উন্নমিত করিয়া স্থিরগম্ভীর স্বরে বলিল, "কেন হয় না ? ঐ সাগরগামিনী জাহ্নবীকে বল, অয়ি গঙ্গে! তুমি তোমার জন্মস্থান হিমালয়ের ক্রোড়ে ফিরে যাও। তা হ'লে জাহ্নবীর কুলুকুলু ধ্বনিতে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে, কেন হয় না। ঐ সূর্য্যাভিমুখী সূর্য্যমুখীর কাছে গিয়ে বল, অয়ি সূর্য্যমুখি, তুমি দৃষ্টিপ্রদাহী সূর্য্যের অভিমুখ হ'তে দৃষ্টি পরিবর্ত্তন কর, তা হ'লে দেখবে, সূর্য্যমুখী সমীরণ-ভরে হেলে দুলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবে—"

তাহার পৃষ্ঠদেশে চপেটাঘাত করিয়া মহিম বলিল, 'দেখ সতীশ, তোর এ অভিনয় রেখে দে।"

সতীশ হাসিয়া উঠিল, এবং পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কিন্তু কোন সুসভ্য দর্শকই অভিনেতার পৃষ্ঠদেশে এমন কঠোর চপেটাঘাত করে না মহিম।"

মহিম বলিল, "যেমন অভিনয়, তেমন পুরস্কার।"

সহাস্তে সতীশ বলিল, "কিন্তু ঘটকালীর পুরস্কারটা যেন এরূপে দিস্ না।"

একটু বিস্ময়ের সহিত মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "তুই ঘটকালী কত্তে যাস্ না কি ?"

তিরস্কারের স্বরে সতীশ বলিল, "তা নয় তো প্রেমের অভিনয় কত্তে যাই,এইটাই বুঝি তোর বিশ্বাস ? ধিক্ মূর্খ !"

সতীশের অলক্ষিতে মহিম যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবচিস্ কি ?"

"ভাবচি, ঘটকঠাকুর শেষে নিজেই প্রেমে না পড়েন।"

"আমার কোষ্ঠীতে কি আছে জানিস ? সপ্তমে রাহুর দৃষ্টি আছে।"

"তার ফল ?"

"তার ফল, স্ত্রীজাতির সহিত আমার কোন কালেই সদ্ভাব হবে না।"

মহিম হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু ঘটকালী করিতে গিয়া সতীশের একটা কাজ বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে মধ্যে মধ্যে হেমলতার সঙ্গীতবিদ্যার শিক্ষকতা করিতে যাইতে হইত। সতীশ যে সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে, তবে তাহার গলাটা বেশ মিষ্ট ছিল, এবং গায়কের মুখে কোন একটা গান শুনিলে তাহার অবিকল নকল করিয়া লইতে পারিত। ইহার উপর হার্মোনিয়মেও হাতটা বেশ দোরস্ত ছিল। এজন্য তাল লয়ে ঠিক বিশুদ্ধ না হইলেও তাহার গানটা বেশ মিষ্ট শোনাইত। ইহাতেই হেমলতা ও বিপিন বাবু উভয়েই তাহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহাদের অনুরোধে তাহাকে শিক্ষকতার ভারটুকুও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সতীশ যে উদ্দেশ্যে বিপিন বাবুর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিল,এই ভারটুকু তাহার সে উদ্দেশ্যসাধনের সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইরূপে ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে সে সহজেই বিপিন বাবুর আভ্যন্ত পরিচয় জানিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ-অন্ধ মানুষ জানিতে পারে না, বিধাতা কোন্ ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া কোন্ উদ্দেশ্যসাধন করিবে।

সে দিন মহিম পড়াইতে গেলে হেমলতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বন্ধু কোথাও গিয়েছেন নাকি ?"

মহিম উত্তর দিল, "না।"

"তবে দু'দিন আসেন নি কেন ?"

"বোধ হয়, পড়ার জন্য আসতে পারে নি।"

"তিনি সে দিন আমাকে যে গৎটা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি তার অন্তরাটা ভুলে গিয়েছি। কড়িমধ্যমটা কিছুতেই লাগচে না।"

মহিম চুপ করিয়া রহিল। হেমলতা বলিল, "আজ একবার তাঁকে আসতে বলবেন।"

"বলবো" বলিয়া মহিম অধ্যাপনায় মনোযোগ দিল। একটু পড়িয়া হেমলতা বলিয়া উঠিল,"সতীশ বাবু কিন্তু চমৎকার লোক, বেশ আমুদে।"

মুখ না তুলিয়াই মহিম উত্তর দিল, "হাঁ।"

হেমলতা বলিল, "গলাটিও যেমন ভারী, তেমনি মিষ্টি। সে দিন রবি বাবুর 'আমি নিশি দিন' গানখানা কি চমৎকারই গাইলেন।"

মহিম নিরুত্তরে নতমুখে বসিয়া রহিল। হেমলতা কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল, "এটাও মন্দ লাগলো না—'আজ তোমারে দেখতে এলাম রে গা রে মা মা গা—ঐ খানটাইতেই ভুল হচ্চে।"

বিরক্তভাবে মহিম বলিল, "পড়ার সময় এবং গানের গৎ ঠিক করবার সময়, দু'টোকে আলাদা না রাখলে কোনটাই বোধ হয় ঠিক হয় না।"

হেমলতা গ্রীবা সঞ্চালন করিয়া আবদারের সুরে বলিল, "আজ আর আমার পড়া ভাল লাগচে না মহিম বাবু। আপনি গিয়ে যদি সতীশ বাবুকে একবার—"

মহিম ম্লান-গম্ভীর-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমলতা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "ও কি, আপনি যে উঠে পড়লেন ?"

মহিম গম্ভীরভাবে বলিল, "হাঁ।"

হেমলতা হাত দুইটা বাড়াইয়া দিয়া সাগ্রহে বলিল, "না না, আপনি রাগ ক'রে যাচ্চেন। তা হবে না, বসুন, আমি পড়চি।"

মহিম পুনরায় বসিল। হেমলতা বই খুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু একটু পড়িয়াই সে বইখানা মুড়িয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মহিম বাবু, আপনি কেন গান-বাজনা শেখেন না ?"

মহিম বলিল, "গান আমার শুনতেই ভাল লাগে, শিখতে ভাল লাগে না।"

হেমলতা ঘাড় দোলাইয়া ভ্রূ নাচাইয়া বলিল, "আমার কিন্তু শোনার চেয়ে নিজে শিখতেই ভাল লাগে। নিজে গাইতে পারলে যতটা আমোদ হয়—"

মহিমের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া হেমলতা বক্তব্য শেষ না করিয়াই পাঠে মনোযোগ দিল। দুই চারি ছত্র পড়িয়াই বইখানা সরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "সত্যি বলছি মহিম বাবু, আজ পড়াটা মোটেই ভাল লাগচে না। রে গা রে সা মাথার ভিতর এমনি ঘুরে বেড়াচ্চে যে, কিছুতেই মন বসচে না।"

"তবে আজ থাক্" বলিয়া মহিম উঠিয়া পড়িল। হেমলতা ঈষৎ শঙ্কাসূচক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আপনি রাগ ক'রে যাচ্চেন না তো ?"

ম্লান হাস্যের সহিত "না" বলিয়া মহিম বাহির হইয়া গেল। হেমলতা জানালার দিকে চাহিয়া আপন মনে সুরের সহিত রে গা রে সা মা গা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মহিম মেসে ফিরিয়া সতীশকে বলিল, "ওহে, তোমার কল্ (call) আছে।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় হে ?"

"পাশের বাড়ীতে। দু'দিন যাও নাই যে ?"

"যেতে পারি না ব'লেই যাইনি।"

"আজ যেতে পারবে ?"

"বোধ হয় পারি।"

"কখন্ যাবে ?"

"সন্ধ্যার পর।"

"আচ্ছা" বলিয়া মহিম প্রস্থানোদ্যত হইল। যাইতে যাইতে সহসা পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিল, "আচ্ছা সতীশ।"

"কি ?"

"তুমি না ওদের ঘৃণা কত্তে ?"

"এখনই বা কোন্ ভক্তি কত্তে দেখলে ?"

"কিন্তু ঘৃণারও লক্ষণ কিছু দেখতে পাই না।"

মৃদু হাসিয়া সতীশ বলিল, "তবে কি ভালবাসার লক্ষণ কিছু দেখতে পাচ্ছো ?"

গম্ভীর-স্বরে মহিম বলিল, "তাই নয় কি ?"

সতীশের মুখখানা গম্ভীরভাব ধারণ করিল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীর-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "তুমি বন্ধু, তোমার কাছে মিথ্যা বল্‌বো না মহিম, সত্যই আমি হেমলতাকে ভালবেসেছি।"

মহিম নতমুখে দাঁড়াইয়া দরজায় জুতার ঠোকর দিতে লাগিল। সতীশ বেদনা-জড়িত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুব অন্যায় করেছি কি মহিম ?"

মহিম কোন উত্তর না দিয়া ধীরগম্ভীর-পদক্ষেপে আপনার ঘরে চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে সতীশ আপন মনে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর সতীশ বিপিন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শুনিল যে, বাবু বাড়ী নাই। সতীশ কিন্তু ফিরিল না, সে সটান উপরে উঠিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিল। ঘরে কেহই ছিল না, শুধু আলোটা মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। সতীশ আলোটাকে উজ্জ্বল করিয়া হার্ম্মোনিয়মের সম্মুখে গিয়া বসিল, এবং তাহার ডালা খুলিয়া ইমনকল্যাণের একটা গৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল।

গতের অন্তরা ধরিবার পূর্ব্বেই হেমলতা কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং সতীশের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "ওমা, আপনি কখন এলেন ?"

মৃদু হাসিয়া সতীশ উত্তর করিল, "অনেকক্ষণ। গৃহস্বামীদের কাউকে না পেয়ে শেষে তাদের যন্ত্রটার সঙ্গেই আলাপ আরম্ভ ক'রে দিয়েছি।"

হেমলতা হাসিয়া বলিল, "বেশ করেছেন। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে আড়ি দিয়েছি।"

শঙ্কার ভাব দেখাইয়া সতীশ বলিয়া উঠিল, "বলেন কি ? আড়ি ?"

গম্ভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন করিয়া হেমলতা বলিল "হাঁ, আড়ি। আপনার সঙ্গে আমি কথা কইবো না।"

ব্যগ্রস্বরে সতীশ বলিল, "বটে! তা হ'লে এতগুলা কথা ক'য়ে তো খুব অন্যায় ক'রে ফেল্লেন।"

"তাই নাকি" বলিয়া হেমলতা হাসিয়া উঠিল। সতীশও বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

হেমলতা একটু সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ওটা কি বাজাচ্ছিলেন ?"

সতীশ বলিল, "ও একটা ইমন-কল্যাণ।"

হেমলতা বলিল, "বেশ মিষ্টি তো। আমাকে কিন্তু ওটা শেখাতে হবে। বাজান না।"

সতীশ সম্পূর্ণ গৎটা বাজাইল। হেমলতা হার্ম্মোনিয়মের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পর্দ্দার উপর সতীশের আঙ্গুলচালনা-কৌশল লক্ষ্য করিতে লাগিল। বাজনা শেষ হইলে হেমলতা জিজ্ঞাসা করিল, "চমৎকার। গৎটা কি ?"

সতীশ বলিল, "সা রে গা মা পা পা, নি নি ধা পা মা গা—"

"মা তো কড়ি ?"

"হাঁ, ইমনে কড়িমধ্যমই ব্যবহার হয়।"

"কিসে কোন্‌টা লাগে, ঐগুলো আমাকে শিখিয়ে দেবেন ?"

"তা দেব। সেদিনকার সুরটা আপনার ঠিক হয়েছে ?"

হাসিতে হাসিতে হেমলতা বলিল, "মোটেই না। তার অন্তরাটা সব গোলমাল ক'রে ফেলেছি। আপনি একবার বাজান দেখি।"

সতীশ বাজাইতে আরম্ভ করিল। হেমলতা হার্ম্মোনিয়মের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সতীশের অঙ্গুলি-স্পৃষ্ট পর্দ্দাগুলা মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার ব্যগ্রতাজনিত দ্রুত নিশ্বাস-বায়ু

সতীশের অঙ্গুলিগুলাকে স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে যেন অবশ করিয়া দিতে লাগিল।

গৎ শেষ করিয়া সতীশ বলিল, "দেখলেন তো?"

হেমলতা বলিল, "আমি বাজাই, আপনি দেখুন, কোন্‌খানটায় ভুল হচ্ছে।"

সতীশ উঠিল, হেমলতা গিয়া হার্ম্মোনিয়মের সম্মুখে বসিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। যেখানে যেখানে ভুল হইল, সতীশ পাশে দাঁড়াইয়া তাহার সংশোধন করিয়া দিতে থাকিল।

অনেকক্ষণ পরে সুরটা কতক ঠিক হইল। তখন হেমলতা উঠিয়া সতীশকে বলিল, "আর ভাল লাগে না। এবার আপনি একটা গান ধরুন।"

ঈষৎ হাসিয়া সতীশ বলিল, "আমার ইচ্ছা, আমি আজ শ্রোতা হই।"

গ্রীবা আন্দোলন করিয়া হেমলতা বলিল, "তা হবে না, আপনাকেই গাইতে হবে।"

সহাস্যে সতীশ বলিল, "আমার অপরাধ?"

হেমলতা হাসিতে হাসিতে বলিল "অপরাধ—আপনার গলায় গান খুব মিষ্টি লাগে।"

সতীশ আর আপত্তি তুলিতে পারিল না। সে প্রথমতঃ অন্যমনস্কভাবে খানিকটা এ-সুর ও-সুর বাজাইয়া গেল। তার পর বেলোর চাপে এবং হস্ত-কৌশলে যন্ত্র হইতে গুরুগম্ভীর নাদ তুলিয়া তাহার সঙ্গে আপনার গলা মিশাইয়া গান ধরিল—

"আমি নিশি-দিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো।"

হার্ম্মোনিয়মের ডালার উপর বাঁ হাতের ভর দিয়া, ডান হাতটা চিবুকে রাখিয়া হেমলতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে গায়কের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। টেবিল-ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকরেখা আসিয়া তাহার দক্ষিণ গণ্ডকে রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া দিল। সতীশ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই আবেগ-বিহ্বলকণ্ঠে গাহিতে লাগিল—

"আমি নিশি-দিন হেথা বসিয়া আছি,
তুমি অবসরমত আসিয়ো।"

সহসা দ্বারপ্রান্তে মহিমের তীব্র কঠোর দৃষ্টি দর্শনে হেমলতা সভয়ে দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। সতীশের সঙ্গীতস্রোত অস্থানে রুদ্ধ হইয়া গেল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি মহিম?"

গম্ভীরস্বরে মহিম বলিল, "একখানা চিঠি এসেছে।"

"কার? তোমার?"

"হাঁ।"

"এমন কি চিঠি, কৈ দেখি।"

বলিয়া সতীশ উঠিয়া আসিয়া হাত বাড়াইল। মহিম তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "বাসায় এস।"

হেমলতা অগ্রসর হইয়া উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চিঠি মাষ্টার মহাশয়? সব ভাল তো?"

তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়াই সতীশকে টানিয়া লইয়া মহিম নীচে নামিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বেহারী ডাকিল, 'চারু।"

চারু আলোর কাছে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। সেই বইখানা মুড়িয়া সোজা হইয়া বসিল, এবং অসংযত গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া লইল। বেহারী খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া জামা খুলিতে খুলিতে বলিল, "আজ যে এত রাত পর্য্যন্ত জেগে আছ?"

চারু উঠিয়া বইখানা বাক্সে তুলিতে তুলিতে উত্তর করিল, "বই পড়ছিলাম।"

"কি পড়্‌ছিলে? উপন্যাস বুঝি?"

"হাঁ।"

"ওতে বুঝি খুব প্রেমের কথা আছে? একটা মেয়ে ছেলেবেলা হ'তে একজনকে ভালবাস্‌তো। তার পর সে ছেলেটার সঙ্গে তার বিয়ে হ'লো না, বিয়ে হ'লো আর একজনের সঙ্গে, যাকে সে দু'চক্ষে দেখতে পার্‌তো না। কেমন, এই তো?"

চারু নীরবে তীব্র ভ্রূভঙ্গী করিল। বেহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, "চুলোয় যাক উপন্যাস। এখন তোমার সেই সুন্দরী ভগ্নীটি কোথায় গেল?"

বিরক্তভাবে চারু বলিল, "কেন?"

বেহারী বলিল, "এসেছিল, তার পর চ'লে গেল, সেই জন্যই খোঁজটা নিচ্ছি। কোথায় গেল?"

"নিজের বাড়ীতে।"

"কাজেই। মহিম তো তাকে বিয়ে কত্তে চাইলে না।"

রাগতভাবে চারু বলিল, "মহিম বিয়ে কত্তে চাইলে না ব'লে যে তার বিয়ে হবে না, এমন নয়। দেশে মহিম ছাড়া আরও অনেক পাত্র আছে।"

হাসিতে হাসিতে বেহারী বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, বিশেষ অমন সুন্দরী। আমারই ইচ্ছা হয় যে, আর একটা বিয়ে ক'রে ফেলি।"

উদাস-গম্ভীর-স্বরে চারু বলিল, "স্বচ্ছন্দে করতে পার।"

বেহারী বলিল, "স্বচ্ছন্দে? তুমি মত দিচ্চো?"

চারু কোনও উত্তর দিল না, মুখ ফিরাইয়া রহিল। বেহারী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "কিন্তু তুমি মত দিলেই বা কি হবে? তারা সতীনের উপর মেয়ে দেবে কেন?"

চারু বলিল, "যদি দেয়?"

বেহারী উৎসাহে লাফাইয়া উঠিল; হাতে হাত চাপড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "দেবে! তা হ'লে এক্ষুণি। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—"

বেহারী অগ্রসর হইয়া চারুর গাত্র স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল, চারু ত্রস্তে পিছাইয়া দাঁড়াইল। বেহারী যেন মুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া পুনরায় খাটের উপর বসিয়া পড়িল, এবং মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "ভয়ানক ভুল ক'রে ফেলেছিলাম। আমার মনে ছিল না যে, আমার সঙ্গে তোমার ভাসুর-ভাদ্রবধূ সম্পর্ক। ছুঁয়ে ফেললে কি অন্যায়টাই হ'তো।"

চারু ফিরিয়া স্বামীর মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। বেহারী বলিতে লাগিল, "আর বাস্তবিক তো তাই হবার কথা। ঘটনাচক্রে না হয় অন্যরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়ালেও মনে মনেও তো তুমি আমাকে ভাসুর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পাচ্চো না।"

বেহারী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চারু রাগে মুখখানা লাল করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আজ কতখানি খেয়েছ?"

তর্জ্জন করিয়া বেহারী বলিল, "কি খেয়েছি?"

"যা খাও, মদ।"

"আমি মদ খাই?"

"খাও না কি?"

একটু ভাবিয়া বেহারী বলিল, "তুমি দেখছি, সব জানতে পেরেছ।"

চারু এ কথার কোন উত্তর দিল না। বেহারী বলিল, "আচ্ছা, বল দেখি, কত দিন মদ খাচ্চি?"

চারু বলিল, "মাসখানেক।"

ঘাড় নাড়িয়া বেহারী বলিল, "ঠিক। মহিম আস্‌বার দু'চার দিন আগে হ'তে। আচ্ছা, যে দিন হ'তে খাচ্চি, সেই দিন হ'তেই কি তুমি জানতে পেরেছ?"

"বোধ হয়।"

"কিন্তু কৈ, এক দিনও তো কিছু বল নাই?"

"প্রয়োজন বোধ করি নাই।"

"বারণও তো কর নাই?"

"না।"

"কেন?"

"তুমি বারণ শুনবে না ব'লে।"

বেহারী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঠিক বলেছ। তুমি বারণ কর্‌লে সে বারণ তো শুন্‌বোই না, বরং বেশী বেশী খাব।"

ম্লানমুখে চারু বলিল, "তা আমি জানি। এখন খাবার দেব?"

"দাও" বলিয়া বেহারী বালিসে একটু কাৎ হইয়া পড়িল। চারু আসন পাতিয়া জল দিয়া পাশের ঘর হইতে খাবার আনিয়া দিল। বেহারী উঠিয়া খাইতে বসিল, চারু সরিয়া আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। বেহারী বলিল, "দেখ, স্বামী খেতে বস্‌লে স্ত্রীকে কাছে ব'সে থাক্‌তে হয়, এটা খাও, ওটা খাও ব'লে অনুরোধ কত্তে হয়।"

চারু নিরুত্তরে রহিল। বেহারী বলিল, "মনে মনে যাই থাক, কিন্তু লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তো আমি তোমার স্বামী।"

মৃদু হাসিয়া চারু বলিল, "তা তো এত দিনও জান্‌তাম না।"

বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি জান্‌তে?"

চারু বলিল, "আমি জানতাম, বুঝি ঠাকুর-জামাই।"

বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বেহারী বলিল, "বাহবা! এই যে তুমি পরিহাসও কত্তে পার।"

গম্ভীর-স্বরে চারু বলিল, "সকলই পারি।"

তীব্রস্বরে বেহারী বলিল, "পার না শুধু মহিম ছোঁড়াকে ভুলতে।"

তাহার মুখের উপর জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া

চারু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল বেহারী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পরদিন বেহারী কালীতারাকে বলিল, "আমার ইচ্ছা, মহিমের বিয়েটা দিয়ে ফেলি।"

কালীতারা উত্তর করিলেন, "আমারও তো তাই ইচ্ছা, কিন্তু সে যে মত করে না।"

বেহারী হাসিয়া বলিল, "তুমিও মা যেমন পাগল। সে কি বল্‌বে যে হাঁ, বিয়ে কর্‌বো?"

কালীতারাও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি জানি বাছা, আজকালকার ছেলে।"

বেহারী বলিল, "হাঁ হাঁ, সে সব আমার জানা আছে। এখন তোমার মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি না, বল দেখি।"

কালীতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ মেয়েটি?"

ঈষৎ বিরক্তভাবে বেহারী বলিল, "কোন্ মেয়ে আবার! ঐ যে ওর মাস্তুতো বোন। কি নাম?"

কালীতারা বলিলেন, "সরলা? ও মা, অমন মেয়ে পছন্দ হবে না? চমৎকার মেয়ে! আমার তো একান্ত ইচ্ছা যে, ঐটিকেই মহিমের বৌ করি।"

বেহারী বলিল, "আমিও তো সেই কথাই বল্‌ছি। তা হ'লে কালই গিয়ে কথাবার্ত্তা স্থির ক'রে আসি। আষাঢ় মাসের তো আর বেশী দিন নাই, আসচে শ্রাবণের মধ্যেই কাজ শেষ ক'রে দেব।"

কালীতারা সহর্ষে ইহাতে সম্মতি দিলেন। অত-পর সরলার পিতার নিকট কিরূপ দাবী করা যাইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। কালীতারা বলিলেন, "দিতে কি কিছু পার্‌বে? গরীব ছাপোষা মানুষ।"

বেহারী বলিল, "হাজার গরীব হোক, দিতে কিছু হবেই, অন্ততঃ বিয়ের খরচ-খরচাটাও তো চাই। গরীবই হোক আর বড় লোকই হোক, মেয়ের বিয়ে শুধু হাতে হয় না। তার উপর বি এ পাশ করা ছেলে।"

কালীতারা এ সম্বন্ধে পুত্রের সহিত একমত না হইলেও তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। শুধু বলিলেন, "কিন্তু দেখিস্ বাছা, পয়সার তরে টানাটানি ক'রে মেয়েটিকে যেন হাতছাড়া করিস্ না।"

বেহারী সে বিষয়ে মাতাকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিল।

চারু শুনিয়া বেহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি না কি ঠাকুরপোর বিয়ের সম্বন্ধ কত্তে যাচ্ছ?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বেহারী বলিল, "তা নয়-তো তুমি কি মনে কর, নিজের সম্বন্ধ কত্তে যাচ্ছি?"

নতমুখে চারু উত্তর করিল, "কি জানি।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে বেহারী বলিল, "যা জান না, সে সম্বন্ধে কথা কইতে যাও কেন?"

চারু বলিল, "কথা কই এই জন্য যে, যার বিয়ে, তার মতটা আগে নিলে ভাল হ'তো।"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া পরুষকণ্ঠে বেহারী বলিল, "হাঁ, তার মত নিতে যাব, তোমার মত নেব, বাড়ীর ঝি-চাকরদের মত নেব! কেন, আমি বাড়ীর কেউ নই নাকি?"

চারু মুখ ফিরাইয়া নিরুত্তরে রহিল। বেহারী তাহার মুখের উপর কঠোরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীব্র-স্বরে বলিল, "দেখ, আমার ভালমন্দ বিবেচনা করবার ভার আমি তোমার উপর দিই নাই। তুমি তোমার নিজের ভাল মন্দ ভেবে চল্লেই আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হব।"

বেহারী ক্রোধভরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। চারু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সম্মুখের দেও-য়ালে দুলান ছবিখানার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সেখানা সীতার বনবাসের চিত্র! বিনাদোষে পতিপরিত্যক্তা নির্ব্বাসিতা সীতা বাল্মীকির তপোবনে ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে বসিয়া পতিপদ-ধ্যানে নিমগ্না। পতির হৃদয়হীন ব্যবহার তাঁহার মুখে বিরাগের একটি রেখাও অঙ্কিত করিতে পারে নাই। সে শান্ত স্থির মুখমণ্ডলে অকারণ নির্য্যাতনজনিত বেদনার বিন্দুমাত্র কাতরতা ব্যক্ত হইতেছে না, শুধু অসামান্য পতিভক্তির—অলৌকিক স্বামিপ্রেমের উচ্ছ্বাস মুখের প্রতি বর্ণে, প্রত্যেক রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই ভক্তিতে সমুজ্জ্বল, পতিপ্রেমে মহিমান্বিত মুখের দিকে চারু স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার অন্তর ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

হায় মা! কোন্ কঠোর সাধনায় তুমি এত সহিষ্ণুতা অর্জ্জন করিয়াছ? কোন্ হৃদয়বলে তুমি স্বামীর এত নির্য্যাতন, এমন অহেতুক লাঞ্ছনা ক্ষমা করিতে পারিয়াছ? আমিও হিন্দুরমণী, কিন্তু আমার তো সে শক্তি নাই। তোমার সেই হৃদয়বল আমাকে দাও মা!

বেহারী গিয়া মহিমের সহিত সরলার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিল, এবং বাড়ী ফিরিয়া মহিমকে একখানা পত্র লিখিয়া দিল। পত্রে লিখিল,—

"স্নেহাস্পদেষু,

বহুদিন তোমার পত্র না পাওয়ায় আমরা নিতান্ত উৎকণ্ঠিত আছি। তুমি কেমন আছ এবং তোমার পড়া-শুনা কেমন হইতেছে, সত্বর লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে।

নানা কারণে তোমার বিবাহ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত স্থির হওয়ায় তোমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। পাত্রী সুন্দরী এবং তাহাকে তুমি দেখিয়াছ ও তাহার সহিত পরিচিত আছ। পাত্রী চারুর মাসীর মেয়ে সরলা, কিন্তু সরলার পিতা নিঃস্ব বিধায় বেশী টাকা-কড়ি দিতে পারিবে না, বহু কষ্টে এক হাজার টাকা-মাত্র দিতে রাজী হইয়াছে। ইহাও বোধ হয় তাহাকে জোতজমা বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং ইহার অধিক দাবী করিয়া তাহাকে পীড়ন করা সঙ্গত মনে করিলাম না। আশা করি, তুমিও ইহাতেই সম্মত হইবে।

বিবাহের খরচপত্র এষ্টেট হইতেই দেওয়া হইবে। সুতরাং এই এক হাজার টাকা তোমার মূলধনস্বরূপেই থাকিবে। ভবিষ্যতে এই মূলধন লইয়া যে কোন ব্যবসায় দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। তোমার পক্ষে অল্প আশার কথা নহে।

আগামী ১০ই শ্রাবণ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। তাহার পর অকাল পড়িবে। ৬ই আশীর্ব্বাদের ও ৮ই গাত্রহরিদ্রার দিন। অতএব তুমি ৫ই তারিখের মধ্যে এ বাটীতে অবশ্য অবশ্য উপস্থিত হইবে। আসিবার কালীন দুই এক শিশি ভাল এসেন্স লইয়া আসিতে ভুলিও না। ইতি তাং ২৬শে আষাঢ়।

আশীর্ব্বাদক
বেহারী।"

পত্রখানা ডাকে পাঠাইয়া দিয়া বেহারী কতকগুলা কাগজপত্র লইয়া চারুর নিকট উপস্থিত হইল, এবং চারুকে তাহাতে সহি করিতে বলিল। সেগুলা চারুর নামীয় সম্পত্তির কাগজ। তাহার সম্পত্তি-সংক্রান্ত কার্য্যে তাহার সহির আবশ্যক হইত, এবং বেহারী সই করাইয়া চলিয়া যাইত।

চারু সই করিয়া দিলে বেহারী কাগজগুলা গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "দেখ চারু, বিষয়-সম্পত্তির কাজে দিনরাত সই-স্বাক্ষরের দরকার। দরকার পড়লেই আমি কাগজ-বগলে তোমার কাছে ছুটে আসবো, আবার তোমার সই নিয়ে ছুটে যাব, এও এক বিষম ফ্যাসাদ।"

চারু জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। বেহারী স্মিতমুখে বলিল, "তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না?"

চারু জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ?"

বেহারী বলিল, "ধর না, আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী। আমার থাকলে তোমার, তোমার থাকলে আমার। তাই বলছি, আমার উপর কি তোমার অবিশ্বাস আছে?"

চারু হাসি চাপিয়া উত্তর করিল, "না।"

বেহারী কাসিয়া গলাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "যখন অবিশ্বাস কিছু নাই, তখন দুটো সম্পত্তি এক ক'রে ফেললে হয় না? তাতে কাজের অনেক সুবিধা হয়। দুটো হিসাব, দুটো দপ্তর, এত ঝঞ্ঝাট থাকে না।"

চারু গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি করতে বল?"

বেহারী বলিল, "বলি এই যে, তোমার নামের সম্পত্তিটা আমার নামে লিখে দাও। ততদূর বিশ্বাস না হয়, আমমোক্তারনামা—"

চারু মুখ ফিরাইয়া লইল। মুখ ফিরাইতেই সীতার ছবিখানার দিকে চোখ পড়িল। সেই ছবির দিকে চাহিয়া ধীর-প্রশান্ত-কণ্ঠে বলিল, "কি রকমে লিখে দিলে ভাল হয়?"

হাস্যপ্রফুল্ল-মুখে বেহারী বলিল, "এই ধর বিক্রী কোবালা—না, সেটা অসিদ্ধ হবে। দানপত্র হ'তে পারে।"

চারু উত্তর করিল, "বেশ, তাই লিখে নাও।"

বেহারী আশা করে নাই যে, চারু এত সহজে এ প্রস্তাবে সম্মত হইবে। সুতরাং চারুর উত্তর শুনিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে তাহার চোখ দুইটা যেন বিস্ফারিত হইয়া পড়িল। চারুর লক্ষ্য কিন্তু সে দিকে ছিল না, তাহার লক্ষ্য ছিল ছবিখানার উপর। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চারু স্থির-গম্ভীরস্বরে বলিল, "তোমার যাতে ভাল হয়, সেই রকমেই তুমি লিখে নিতে পার।"

হর্ষগদ্গদ-কণ্ঠে বেহারী বলিল, "এই দেখ দেখি চারু, একেই বলে স্বামী স্ত্রী, এক প্রাণ, এক আত্মা। সত্যই চারু, আমি তোমাকে—"

চারুকে ধরিবার জন্য বেহারী হস্তপ্রসারণ করিল, চারু কিন্তু ধরা দিল না, সে তাহার মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল, এবং মুহূর্ত্ত পরেই ত্রস্তপদে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বেহারীর মুখের ভাবটাও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানা ক্রূরতার ছায়ায় অন্ধকার হইয়া আসিল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "কপাল তোমার।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পত্র পড়িয়া সতীশ লাফাইয়া উঠিল, এবং হর্ষসূচক শব্দ করিয়া বলিল, "চমৎকার! ওহে করুণা, ওহে নগেন?"

মহিম ব্যস্তভাবে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল, "কি যে পাগ্‌লামী করিস্!"

সতীশ তাহার হাত হইতে মুখ ছাড়াইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "পাগলামী! তোর বিয়ে, আর আমি চুপ ক'রে থাক্‌বো?"

বলিয়া সতীশ গান ধরিল, "প্রথম যখন বিয়ে হ'লো ভাবলাম বাহা বাহারে।"

মহিম তাহার হাত হইতে চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া রাগে ঘর হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিল। সতীশ ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ও কি, চ'লে যাস্ যে।"

রাগে হাত টানিয়া মহিম বলিল, "কাজেও।"

"আচ্ছা, এক্সকিউজ মি, মাইরি বল্‌ছি, আর হাস্‌বো না" বলিয়া সতীশ মহিমকে টানিয়া আনিয়া বিছানার উপর বসাইল, এবং তাহার হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া বলিল, "দেখি আর একবার পড়ে।"

চিঠি পড়িতে পড়িতে সতীশ বলিল, "দেখ মহিম, তুই বড় অকৃতজ্ঞ।"

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে বুঝলে?"

সতীশ বলিল, "তা না হ'লে তুই এমন হিতৈষী স্নেহময় দাদাকে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিস্ না।"

মহিম নিরুত্তরে রহিল। সতীশ পুনরায় চিঠি পড়িতে লাগিল। সহসা সে মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিল, "মাইরি মহিম, আমি থাক্‌তে পাচ্ছি না, আমার আহ্লাদে লাফাতে ইচ্ছা কচ্চে।"

গম্ভীর হাসি হাসিয়া মহিম বলিল, "স্বচ্ছন্দে লাফাতে পার। এ ঘরে সুবিধা না হয়, রাস্তায় যাও, রাস্তায় না হয়, গড়ের মাঠে গিয়ে লাফাও।"

সতীশ সে কথায় কান না দিয়া চিঠিখানার দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আচ্ছা, সত্য ক'রে বল্ মেয়েটি বাস্তবিক কেমন?"

"বাস্তবিক একটি মেয়ের মত।"

"মেয়ে মেয়ের মত হবে না তো পুরুষের মত হবে? বলি সুন্দরী কি না?"

"পরমা সুন্দরী।"

"মোটাও নয়, রোগাও নয়, দোহারা গড়ন, মুখখানি ঠিক—ঠিক—"

"পদ্মের মত।"

মাথা নাড়িয়া সতীশ বলিল "না না, সে বড় বিশ্রী দেখায়। ঠিক—ঠিক চাঁদের মত। নাকটি টিকালো, চোখ দু'টি যেন ভাসা ভাসা।"

মৃদু হাসিয়া মহিম বলিল, "তুই যে জ্যোতিষী হয়ে পড়্‌লি।"

সতীশ বলিল, "উঁহু, এ একটা আইডিয়া। সরলা নামের মেয়ের ঠিক এই রকম চেহারা হওয়াই উচিত।"

মহিম বলিল, "তার মানে কি?"

সতীশ বলিল, "তা নহলে সার্থকতা কোথায় থাকে? যেমন ধর, প্রমদা বল্লেই সেই স্বর্ণলতার প্রমদার কথা মনে পড়ে, জগদম্বা শুন্‌লেই নবীন তপস্বিনীর জগদম্বার মত একটা বিকট চেহারা স্মরণ হয়। আবার নলিনী নাম শুন্‌লেই যেন একটি নম্র-প্রকৃতি ছোট-খাটো মেয়ে ব'লে মনে হয়।"

মহিম বলিল, "নলিনী নামের মেয়েও কি এমন হ'তে পারে না?"

সতীশ বলিল, "হলেও সে খুব কম।"

মহিম চুপ করিয়া রহিল। সতীশ বলিল, "যাক্, আর একটা কথা, সরলার সঙ্গে তোর জানাশুনা আছে। কতদিনের জানাশুনা?"

"ছেলেবেলা হ'তে।"

"বাল্যপ্রণয়। ভালবাসা-বাসি আছে?"

"তুই তাকে ভালবাসিস্ ?"

"একটু বাসি বৈকি।"

"সে ?"

"ঐটুকুই জানি না।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে সতীশ বলিল, "তুই কেন, 'লভার' মাত্রেই ও কথাটা জান্‌তে পারে না, এই একটু সন্দেহ নিয়ে তারা সময়ে সময়ে এমন তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দেয় যে, তাতে এক একখানা উপন্যাসেরই সৃষ্টি হয়ে পড়ে।"

মহিম উত্তর করিল না। সতীশ বলিতে লাগিল, "তা হ'লে পাত্রী পরমা সুন্দরী, পরিচিতা, প্রণয়পাত্রী, তার উপর একটি হাজার টাকা। বাস্, তুই আর কি চাস্ মহিম ?"

বলিয়া সতীশ বিছানার উপর জোরে একটা চাপড় মারিল। ঈষৎ হাসিয়া মহিম বলিল, "কিছুই চাই না।"

একটু ভাবিয়া সতীশ বলিল, "কিন্তু এই বর্ষাকালে পাড়াগাঁয়ে যাওয়া। কুছ পরোয়া নেই, আর কেউ না যায়, আমাকে তো যেতেই হবে। তাতে সাপেই খাক্ বা ম্যালেরিয়াতেই ঘাড় ভাঙ্গুক।"

মহিম নিরুত্তরে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে কালই একখানা উত্তর লিখে দে। কি লিখ্‌বি বল্ দেখি ? আমার মত আছে—না, এটা নেহাৎ বেহায়াপণা হয়। তার চেয়ে, দাদা, আপনি গুরুজন, আপনার অনুমতি পালন কত্তে আমি বাধ্য।"

মহিম বলিল, "কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনার আদেশ পালন করিতে না পারায় আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।"

বিস্ময়বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, "সত্যি তাই লিখ্‌বি নাকি ?"

সহাস্যে মহিম বলিল, "এই রকমই তো মনে কচ্চি।"

"কারণ ?"

"কারণ, নিঃস্ব ভদ্রলোকের জোতজমি-বিক্রয়লব্ধ সহস্র মুদ্রা মাত্র কি আমার মূল্য ?"

একটু ভাবিয়া সতীশ বলিল, "বুঝেছি। তা টাকাটা না নিলেই পার।"

"দাদার অবাধ্য হ'ব ?

"মা ঠাক্‌রুণের নিষ্ঠাটুকু আছে।"

বলিয়া সতীশ হাসিয়া উঠিল। মহিম চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মতলবখানা কি মহিম ? বিয়ে কর্‌বি না না কি ?"

সহাস্যে মহিম বলিল, "যে প্রতিজ্ঞা কেউ কখন রাখতে পারে না, তেমন প্রতিজ্ঞা আমি কত্তে চাই না।"

সতীশ বলিল, "তবে কি 'স্বনামা পুরুষো ধন্য' হয়ে বিয়ে কর্‌বি ?"

মহিম বলিল, "তাই করা উচিত হ'লেও আমি কিন্তু ততটা আশা করি না।"

সতীশ বলিল, "সুবুদ্ধির কাজই করেছ। কেন না, তুই যে কখন তা হবি, এ কথা বরাহমিহিরের মত এষ্ট্রোলজা'র গণনা ক'রে বল্‌লেও আমি তাতে বিশ্বাস করি না। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্চি, তোর অদৃষ্টে যখন 'পিতৃনামা চ মধ্যমা'ও হ'লো না, তখন তোকে শেষে 'শ্বশুরনামা চ অধমা' হ'তে হবে।"

সতীশ হাসিয়া উঠিল। মহিম নিরুত্তরে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। সতীশ বলিল, "রাগ কল্লি মহিম ?"

মৃদু হাসিয়া মহিম বলিল, "ঈষৎ।"

সতীশ বলিল, "তা হ'লে বামুন ঠাকুরকে এক মুঠো চাল বেশী নিতে ব'লে দে।"

"তাই ব'লে আসি" বলিয়া মহিম উঠিয়া অন্যমনস্কভাবে শিষ দিতে দিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল। সতীশ বিছানার উপর আড় হইয়া পড়িয়া গান ধরিল—

"ওঠা নামা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায় রে ভেসে
কোথায় নে যায় কে জানে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেম বলিয়া যে কোন একটা জিনিস আছে, এবং তাহাতে ঠিক নদীর জলে তুফানের মত তুফান উঠে বা সেই তুফানে প্রাণটা ভাসিয়া যাইতে পারে, এ কথা সতীশ কোনদিনই স্বীকার করিত না। কিন্তু আজকাল সময়ে সময়ে তাহার মনে হয়, প্রেম বলিয়া একটা

জিনিস অদৃশ্য হইলেও বুঝি তাহার অস্তিত্ব আছে, এবং তাহাতে তুফানও উঠে, সে তুফানে একটু টানও আছে, আবার সে টানে প্রাণটাও ভাসিয়া যাইতে পারে। তবে নদীর টানে ভাসিয়া যাওয়ার মধ্যে আমোদ একটুও নাই, বরং ভীতির ভাবটাই যথেষ্ট থাকে, কিন্তু প্রেমের টানে ভাসিয়া যাওয়া যেমন আমোদজনক, তেমনই বেশ একটু বৈচিত্র্যপূর্ণ, এবং এই বৈচিত্র্যের মোহে প্রাণটা যেন ভাসিয়া থাকিতেই ব্যগ্র হইয়া থাকে। কি অদ্ভুত এই প্রেম জিনিসটা!

কিন্তু মহিমের রকমটা কি? সে কি এই প্রেমের তুফানে পড়িয়াই হাবুডুবু খাইতেছে, এবং এই জন্যই সরলার সহিত বিবাহে অসম্মত? কিন্তু এই প্রেমের মূল কোথায়? কোথায় আবার, বিপিন বাবুর বাড়ী। হেমলতা যেরূপ মেয়ে, তাহাতে তাহাকে কে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু শিক্ষকতা করিতে গিয়া প্রেমের অভিনয়—ইহা কি সম্ভব অসম্ভবই বা কি, গল্পে উপন্যাসে তো এমন ঘটনা অনেক পড়া যায়। অবশ্য, সে সকল গল্প যদিও বিলাতী গল্পের অনুবাদ, এবং সে সকল ঘটনা বিলাতী ঘটনার ছায়ামাত্র, তাহা হইলেও হেমলতাই বা কোন্ দেশী ছাঁচে ঢালা? তাহার প্রকৃতিতেও তো বিলাতী নায়িকার ভাব সম্পূর্ণ পরিস্ফুট। ছি ছি, মেয়েছেলেকে এতটা স্বাধীনতা দেওয়া কি ভাল? মেয়েকে এমন যাহার তাহার সঙ্গে মিশিতে দিয়া বিপিন বাবু কি ভাল কাজ করিয়াছেন? মহিমেরও কি জঘন্য রুচি! এই বিলাতী আদর্শে গঠিতা মেয়েটার জন্য সরলাকে প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত। ধিক্ তাহার শিক্ষায়! ধিক্ তাহার শিক্ষকতায়!

আচ্ছা, হেমলতা কি মহিমকে ভালবাসে? ভালবাসার তেমন লক্ষণ তো কিছু দেখিতে পাই না। কিন্তু কে জানে, ভিতরে ভিতরে ভালবাসাটা ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃসলিলভাবে বহিতেছে কি না। যদিও বহে, তাহা হইলে সে ভালবাসার পরিণাম কি ভয়াবহ! মহিমের তো এই অবস্থা, অন্তভক্ষ্য ধনুর্গুণ, বাপের ত্যাজ্যপুত্র। তাহার উপর পড়া অপেক্ষা পড়ানর উপর উহার যে রকম আগ্রহ দেখা যায়, তাহাতে বি-এ পাসটা যে দিতে পারিবে, এমনও বোধ হয় না। আর শুধু বি-এ পাশ করিলেই বা কি হইবে? বড় জোর ত্রিশ চল্লিশ টাকার চাকরী। তাহাতে বিলাতী ভাবে অনুপ্রাণিতা হেমলতার একটা সপ্তাহও চলে কি না সন্দেহ। ছি ছি, আপনার এইরূপ অবস্থা লইয়া নির্ব্বোধ মহিম একটা সরলা বালিকাকে ভালবাসার ফাঁদে জড়াইয়া তাহার পরিণামটা কি শোচনীয় করিয়া তুলিতেছে না?

ভাবিতে ভাবিতে মহিমের উপর সতীশ এমনই রাগিয়া উঠিল যে, তাহার ইচ্ছা হইল, সে এখনই গিয়া মহিমের সকল কথা বলিয়া দিয়া হেমলতাকে সাবধান করিয়া দিয়া আইসে। কিন্তু তাহাতে মহিমকে কতটা অপদস্থ, কতটা হীন হইতে হইবে ইহাই ভাবিয়া সতীশ সে সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইল, এবং এই শোচনীয় অবস্থা হইতে সরলা বালিকাকে কিরূপে রক্ষা যায়, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

আহা, সত্যই সে সরলা বালিকা। কতকগুলি বিলাতী ভাব আসিয়া তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিলেও তাহার অন্তরটা এখনও বিজাতীয় ভাবের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত রহিয়াছে। তাহা যেমন নির্ম্মল, তেমনিই সরল শান্ত সুমধুর।

ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। সতীশ বিরক্তভাবে আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "ধ্যেৎ, দুটো বাজ্‌লো, ঘুমাব কখন্।"

বলিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া সতীশ মুখে জল দিয়াই মহিমের ঘরে উপস্থিত হইল। এত সকালে তাহাকে ব্যস্তভাবে আসিতে দেখিয়া মহিম বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

সতীশ বলিল, "বাড়ীতে চিঠি লিখেছ?"

মহিম বলিল, "এই লিখ্‌চি।"

গম্ভীরভাবে সতীশ বলিল, "হাঁ, বেশ বিবেচনা ক'রে কিন্তু চিঠিখানা লিখ্‌বে।"

সহাস্যে মহিম বলিল, "এই কথাটা বল্‌তেই কি এসেছ?"

ঘরের এদিকে সেদিকে চাহিতে চাহিতে সতীশ বলিল, "না, আরও কয়েকটা কথা আছে।"

বলিয়া সে চেয়ারখানা টানিয়া বসিয়া পড়িল। মহিম বলিল, "উপদেশ নাকি?"

সতীশ একটু নড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "হাঁ, এবং আশা করি, সেগুলাকে তুমি বন্ধুভাবেই গ্রহণ করবে।"

বর্দ্ধিত বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মহিম

জিজ্ঞাসা করিল, "শত্রুভাবে মনে কখনও কিছু আছে নাকি?"

"কিছুমাত্র না" বলিয়া সতীশ টেবিলের উপর হইতে একখানা বই টানিয়া লইল। মহিম বলিল, "কথাটা কি সতীশ?"

সতীশ অন্যমনস্কভাবে বইখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, "কথাটা এই যে, তোমার আর ও বাড়ীতে পড়াতে যাওয়া হ'তে পারে না।"

বিস্মিতভাবে মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ?"

সতীশ এবার মুখ তুলিয়া মহিমের মুখের উপর রোষপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রাগতস্বরে বলিল, "কারণ যে কি, সেটা কি তুমি তোমার হৃদয় দিয়েই বুঝতে পাচ্ছো না?"

সহাস্যে মহিম বলিল, "হৃদয়টা সম্পূর্ণ অদৃশ্য জিনিস, তার বিশেষ খবর রাখি না, কিন্তু উদরনামক যে জিনিসটা প্রত্যক্ষ, তাকে দিয়েই বুঝতে পারি যে, ও বাড়ীতে পড়াতে যাওয়া আমার বিশেষ আবশ্যক।"

এ কথাটা সতীশও অস্বীকার করিতে পারিল না। তথাপি সে কথায় জোর দিয়া বলিল, "ঐ বাড়ী ছাড়া আরও অনেক বাড়ীতে পড়ান জুটতে পারে।"

মহিম বলিল, "তা পারে, কিন্তু তাতে মেসের খরচ, পড়ার খরচ দু'টাই বেশ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হ'তে পারে না।"

সতীশ এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সুতরাং সে একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু ভেবে দেখ মহিম, যে উদ্দেশ্যে পড়ান, তোমার সেই পড়ারই ব্যাঘাত হচ্ছে কি না।"

মহিম কোন উত্তর না দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। সতীশ এবার একটু জোরের সঙ্গে বলিল, "একজামিনের আর ক'টা মাস বাকী জান?"

মহিম মুখ ফিরাইয়া বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "ক'টা দিন বাকী বললেও ভয় পাবার কারণ ছিল না, এটাও তোমার জানা উচিত।"

মহিমের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কথা মেসের সকলেই জানিত, সুতরাং তাহার এই গর্ব্বপ্রকাশ সতীশের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল না। সে কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

একটু পরেই মহিম জামাজুতা পরিয়া নীচে নামিতেই করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, প্রভাত কোথায়?"

গম্ভীরভাবে মহিম উত্তর করিল, "বিপিন বাবুর বাড়ী।"

বলিয়াই সে অদূরে দণ্ডায়মান সতীশের মুখের উপর একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। সতীশ বুঝিতে পারিল, তাহাকে খোঁচা দিবার জন্য মহিমের এই বহির্গমন। সে সিগারেটটা হাতে লইয়া অন্যমনস্কভাবে একদিকে চাহিয়া রহিল। করুণা গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"কেন যামিনী না যেতে জাগালে না মোরে,
ছি ছি হরি মরি লাজে।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিতে মহিমের আকস্মিক আগমন ও নির্গমনের ব্যাপারটা হেমলতার নিকট বড়ই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। মহিম আসিল, সতীশের সহিত কথা কহিল, অথচ তাহাকে একটি কথাও বলিল না, তাহার আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পর্য্যন্ত দিল না। অনেক ভাবিয়াও হেমলতা মহিমের এই অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহারের কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। সে যে মহিমের কাছে কোন অপরাধ করিয়াছে, এমন কোন কথাই মনে পড়িল না, অথচ তাহার মুখ-চোখ দিয়া যে একটা বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বেশ লক্ষ্য করিয়াই দেখিয়াছে। এ বিরক্তির কারণ কি?

একবার মনে হইল, তাহাকে সতীশের কাছে গান শিখিতে দেখিয়াই হয় তো মহিম রাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাতে রাগের এমন কি আছে? সে মহিমের কাছে যেমন পড়ে, সতীশের কাছে তেমনি গান শিখিতেছে। তাহাতে এমন কি দোষ হইল যে, তজ্জন্য মহিম তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া যাইতে পারে? শিক্ষা যদি দোষ হয়, তবে মহিমের কাছে শিক্ষাও তো দোষ।

হেমলতা অনেক ভাবিয়াও মহিমের রাগের কারণটা স্থির করিতে পারিল না। ভাবিতে ভাবিতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

তার পরদিন সকালে হঠাৎ মহিমকে উপস্থিত দেখিয়া সে খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল। মহিমও এমন অসময়ে আসার জন্য যেন একটু সঙ্কুচিত হইল, এবং সে সঙ্কোচটা চাপা দিবার জন্য কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে গেল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই হেমলতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বসুন মাষ্টার মশাই।"

বলিয়াই সে ব্যস্তভাবে বসিবার ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। মহিম আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চা খাওয়া হয়েছে ?"

অন্যদিকে মুখ রাখিয়া মহিম উত্তর দিল, "না।"

হেমলতা চলিয়া গেল মহিম একখানা বই টানিয়া লইয়া তাহাতে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিল।

একটু পরে হেমলতা চা আনিয়া দিলে মহিম চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'বিপিন বাবু কি বাইরে গিয়েছেন ?"

হেমলতা কহিল, "না, তিনি এইমাত্র উঠেচেন, তাঁকেও চা দিয়ে এলাম।"

মহিম নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে লাগিল। তাহার এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও কঠোর মৌনভাবটা হেমলতার নিকট এমনই বিসদৃশ বোধ হইল যে, এই তীব্র অবজ্ঞা ও গভীর নীরবতার মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকাও তাহার যেন নিতান্ত বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল, এবং সে বিরক্তিটুকু গোপন করা নিতান্ত অসাধ্য বুঝিয়া আস্তে আস্তে গৃহত্যাগে উদ্যত হইল।

তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মহিম গম্ভীরস্বরে ডাকিয়া বলিল, "শোন।"

সে স্বরে একটু চমকিত হইয়াই হেমলতা ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং মহিমের কঠোর বক্তব্য শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। মহিম এক চুমুক চা খাইয়া বাটিটা টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি সতীশের কাছে গান শিখচো ?"

এতক্ষণে মহিমের রাগের কারণ হেমলতার নিকট যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল, কাল তাহাকে সতীশের কাছে বসিয়া গান শিখিতে দেখিয়াই যে মহিম তাহার উপর এরূপ রূঢ় আচরণ করিয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু ছিঃ, এ কি কুৎসিত বিদ্বেষ! কি জঘন্য সন্দেহ। কথাটা ভাবিতেই হেমলতার মুখখানা ঘৃণায় ক্ষোভে লাল হইয়া উঠিল, দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "হাঁ।"

স্বরে তাহার ক্রোধের লক্ষণ বুঝিয়াও মহিম দমিল না, বরং সে আরও একটু গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমি কিন্তু এ শিক্ষার অনুমোদন করি না।"

আর কোন বিষয় হইলে হেমলতা হয় তো মাষ্টার মশায়ের অননুমোদিত কাজ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিত, কিন্তু যেখানে শুধু একটা জঘন্য বিদ্বেষের উপর এই অননুমোদনটা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে হেমলতা ইহার সমর্থন করিয়া অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারিল না, সেও ভ্রূকুটী করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "কারণ ?"

তাহার রূঢ়তায় মহিম যেন অন্তরে একটু আহত হইল। সে চায়ের বাটিটা তুলিয়া লইয়া মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "কারণ, সতীশ সঙ্গীত-বিদ্যায় এমন কিছু পারদর্শী নয় যে, তার কাছে শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে। সে দু' পাঁচটা চুটকী গান জানে মাত্র। তা ছাড়া—"

হেমলতা জিজ্ঞাসা করিল, 'তা ছাড়া আর কি ?"

মহিম বলিল, "তা ছাড়া চরিত্রের দিক্ দিয়ে দেখ্‌লেও—"

বাধা দিয়া গভীর বিরক্তিসূচক স্বরে হেমলতা বলিল, "ছি মাষ্টার মশাই, সতীশ বাবু না আপনার বন্ধু ?"

মহিমের মুখখানা যেন মুহূর্ত্তে যেন কালি হইয়া গেল। হেমলতা তাহার লজ্জাবিবর্ণ মুখের উপর তিরস্কারসূচক তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মহিম চায়ের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল।

সত্যই তো, সতীশ যে তাহার বন্ধু। সামান্য উত্তেজনার বশে তাহার নিন্দা করিয়া মহিম যে কেবল তাহার নিকট অপরাধী হইল, তাহা নহে, সেই সঙ্গে সে হেমলতার কাছে আপনাকে কতখানি ছোট করিয়া তুলিল, তাহাই ভাবিয়া নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িল, লজ্জায় যেন তাহার মেঝের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল।

কতক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া সে পুনরায় চায়ের বাটিটা তুলিয়া লইল। চা তখন ঠাণ্ডা হইয়া বিস্বাদ

হইয়া গিয়াছে। তাহাতে একটা চুমুক দিয়াই মুখখানা বিকৃত করিয়া বাটিটা রাখিয়া দিল, এবং অতঃপর হেমলতার পুনরাগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া তাহার নিকট স্বীয় রূঢ়তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, অথবা তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই প্রস্থান করিবে, ইহাই বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

এমন সময় বিপিন বাবু খড়মের খট্-খট্ শব্দ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিলেন, এবং মহিমকে দেখিয়া প্রসন্ন হাস্যের সহিত "মহিম যে" বলিয়া সম্মুখের বিছানার উপর বসিলেন। তার পর মহিমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রাত্রে গরমে ভাল ঘুম হয় না, উঠ্তে অনেকটা বেলা হয়ে গেল। তুমি কতক্ষণ ?"

মহিম বলিল, "খুব বেশীক্ষণ নয়, বোধ হয় আধ ঘণ্টা হবে। সকালে কিছু কাজ ছিল না, মনটাও ভাল নয়, তাই—"

উহ্য বাক্যাংশটুকু বুঝিয়া লইয়া বিপিন বাবু যেন একটু অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "দেখ মহিম, তোমাকে আমরা সত্যই ঘরের ছেলের মত মনে করি। দিনে রাতে তোমার যখন ইচ্ছা আস্তে পার, কিন্তু তার জন্য যদি কৈফিয়ৎ দিতে যাও, তা হ'লে ভাল হবে না, তা ব'লে রাখছি।"

বলিয়া বিপিন বাবু একটু গম্ভীর হাস্য করিলেন, উত্তরে মহিমও মৃদু হাসিল। অতঃপর বিপিন বাবু একটা জৃম্ভণ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "লতি কোথায় গেল ? সে বুঝি তোমায় চা দিয়েই —"

মুখ নীচু করিয়া কিঞ্চিৎ ইতস্তত ভাবে মহিম বলিল, "না, সে ছিল, এই মাত্র—"

বিপিন বাবু পকেট হইতে একটা বর্ম্মা সিগার বাহির করিয়া ধরাইলেন, এবং তাহাতে টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সকালে তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে।"

মহিম আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। বিপিন বাবু বেশ সোজা হইয়া বসিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ঘরের ছেলে, তোমার কাছে কোন কথাই ছাপা নাই, আর তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেও কোন কাজ কত্তে পারি না। ধর, মেয়েটি যে রকম বড় হয়ে উঠেছে, তাতে আর রাখা চলে না। অথচ—ভাল কথা, তোমার মন ভাল নয়, কি বল্ছিলে ?"

বলিয়া তিনি মহিমের মুখের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার মুখে উদ্বেগের যে ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া লইলেন। মহিম উদ্বেগটা চাপিয়া একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, তেমন কিছু নয়, মনটা সামান্য -"

বিপিন বাবু যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "যাক, যে কথা বল্ছিলাম। মেয়েটি তো আর রাখা যায় না। কিন্তু সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাতে হাজারে হাজার টাকা না ঢাললে তো ভাল পাত্র পাওয়া যায় না। আবার টাকা দিয়েও যে মনোমত ছেলে পাওয়া যায় তাও নয়। অথচ আমার যেরূপ অবস্থা, তাতে বেশী টাকা দেবারও সঙ্গতি নাই। রোজগার যথেষ্ট করি বটে, কিন্তু সঞ্চয় কত্তে শিখি নাই। কাজেই পাঁচ সাত হাজার যে দিতে পার্‌বো, তারও ক্ষমতা নাই।"

বলিয়া বিপিন বাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মহিম যেন নিশ্বাস রোধ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিল। বিপিন বাবু একটু দম লইয়া বলিতে লাগিলেন, "সমাজের এই অবস্থা দেখে একবার মনে হয়েছিল, দূর হোক, ব্রাহ্মমতে মেয়ের বিয়ে দেব। কিন্তু এখন দেখছি, সে আশাও বৃথা। ওদের মধ্যে জাতিভেদ নাই বটে, কিন্তু ধনি-দরিদ্রের প্রভেদ যথেষ্ট আছে।"

বলিয়া বিপিন বাবু একটু শ্লেষের হাসি হাসিলেন। মহিমের বুকটা উদ্বেগে দুরু-দুরু করিতে লাগিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "চেষ্টা দেখছি, সম্বন্ধ যে না আসচে, তা নয়, কিন্তু সে ঐ এণ্ট্রেন্স পাশ, না হয় কেউ কুড়ি টাকা মাইনের কেরাণী, কেউ বা এপ্রেণ্টিস। তাই দু'হাজারের কম নয়, কিন্তু লতির মত মেয়েকে—"

বিপিন বাবুর চোখ দুইটা ছল-ছল করিতে লাগিল, কন্যার শোচনীয় ভবিষ্যৎ স্মরণে পুঞ্জীভূত বাষ্প আসিয়া কণ্ঠরোধ করিল, তিনি সকরুণ নেত্রে মহিমের মুখের দিকে চাহিলেন। মহিমেরও দৃষ্টিটা যেন বেদনায় চঞ্চল হইয়া আসিল, আবেগচঞ্চলকণ্ঠে বলিল, "সে কখনই হ'তে পারে না। উপযুক্ত পাত্র পাওয়া না গেলে—"

বক্তব্যটা শেষ করিতে মহিম একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বিপিনবাবু তাহা শেষ করিবার অভিপ্রায়েই যেন বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু উপযুক্ত পাত্রেরই যে অভাব ; হাজারে একটা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। হয় তো ধনী, কিন্তু অশিক্ষিত, হয় তো শিক্ষিত, কিন্তু মাতাল, চরিত্রহীন। আজকালকার বাজারে শিক্ষিত

সচ্চরিত্র পাত্র পাওয়া যে কি কঠিন, তা ভুক্তভোগী যে, সেই জানে।"

বিপিন বাবু জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। মহিম ম্লানমুখে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিপিন বাবু চিন্তামলিনমুখে বলিলেন, "যাক, ওর অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। ভাল কথা, তুমি নাকি এখন বিয়ে করবে না শুনলাম।"

মহিম মাথা নীচু করিয়া মৃদু হাসিল। বিপিন বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'হয় হে হয়, তোমাদের মত বয়সে এ রকম হয়েই থাকে। আমাদেরও যে না হয়েছিল, এমন নয়, কিন্তু শেষে বুঝলে কি না, সেই বিয়ে কত্তেই হলো। না ক'রে যে উপায় নাই।"

বলিয়া তিনি একটু জোরে হাসিলেন। মহিম লজ্জারক্ত-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপিন বাবু উদ্গত হাস্তবেগ দমন করিয়া গম্ভীরমুখে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আরো অনেক কথা আছে। কিন্তু আগে তুমি মনটাকে স্থির কর।"

মহিম তাঁহার মুখের উপর একবার উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। বিপিন বাবু নির্ব্বাপিত সিগারের ছাই ঝাড়িয়া তাহাতে পুনরায় অগ্নি সংযোগ করিলেন।

গৃহিণী ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু আশা আছে দেখলে?"

বিপিন বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা নইলে এত কাল কি বাজে দালালী ক'রে আসচি?"

অপাঙ্গভঙ্গীর সহিত গৃহিণী বলিলেন, "ও, তোমার মত অনেক দালাল দেখে আসচি।"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু ঠিক এমনটি কখনও দেখনি। এখন মেয়ের বিয়ের বরণডালা সাজাও। ঘটক বিদায়ের কথাটা ভুলো না কিন্তু।"

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে" বলিয়া গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন। বিপিন বাবু চিন্তিতভাবে সিগার টানিতে লাগিলেন।

"বাবা।"

চমকিতভাবে মুখ তুলিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "কে, লতি?"

হেমলতা আসিয়া ধীরে ধীরে পিতার পাশে বসিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "তোর তরে একখানা নূতন উপন্যাস এনেছি লতি, কাল সবে বেরিয়েছে।"

উপন্যাসের নামে কন্যার মুখে হর্ষের কোন চিহ্ন না দেখিয়া বিপিন বাবু একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, "বইখানা আমার পকেটেই আছে। থাম এনে দিচ্চি।"

বলিয়া তিনি উঠিবার উপক্রম করিতেই হেমলতা বাধা দিয়া বলিল "থাক্, পরে দেখবো।"

বিপিন বাবু বর্দ্ধিতবিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। হেমলতা ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে একখানা বাঙ্গালা গীতা এনে দেবে বাবা?"

চমকিতভাবে বিপিন বাবু বলিলেন, "গীতা! গীতার কি পড়্বি?"

হেমলতা নতমুখে বিছানার চাদরে আঙ্গুল ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "শুনেছি, গীতা খুব ভাল বই।"

বিপিন বাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "পাগল মেয়ে। ও সব ধর্ম্মের কথা, আষাঢ়ে গল্প কি তোদের ভাল লাগবে? 'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব' পড়্লেই তোদের গায়ে জ্বর আস্বে। তার চেয়ে বাব্য উপন্যাস লক্ষগুণে ভাল।"

মৃদুস্বরে হেমলতা বলিল, 'উপন্যাস আর ভাল লাগে না।"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "উপন্যাস ভাল লাগে না, আর ভাল লাগবে বুঝি গীতা?"

পিতার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া হেমলতা বলিল "কেন বাবা, তুমিই তো কতবার বলেছ, গীতার মত সুন্দর উপদেশ আর কিছুতেই নাই।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "পাগল আর কি, সে সব উপদেশ আমাদের মত বুড়োদের জন্য, তোদের জন্য নয়।"

ঈষৎ হাসিয়া হেমলতা বলিল, "উপদেশ কি ছেলে বুড়োর আলাদা আছে বাবা?"

এ প্রশ্নের উত্তর বিপিন বাবু সহসা দিতে পারিলেন না, তিনি চিন্তিতভাবে সিগারেটে জোর টান দিতে লাগিলেন। হেমলতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা বিপিন বাবু মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিমের সেই বন্ধুটির নাম কি লতি?"

হেমলতা বলিল, "কে, সতীশ বাবু?"

বিপিন বাবু, বলিলেন' "হাঁ হাঁ, সতীশ। সতীশ কৈ ক'দিন আসে নি?"

নতমুখে হেমলতা উত্তর করিল, "না।"

একটু ভাবিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "একবার

দেখা হ'লে ভাল হ'তো। মহিম আজ পড়াতে এলে সতীশকে ডেকে দিতে বলিস্‌

"আচ্ছা" বলিয়া হেমলতা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি মহিম ?"

সতীশের এই আকস্মিক প্রশ্নে মহিম কতকটা বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল। সতীশ বলিল, "বিপিন বাবু আমাকে কেন ডেকেছিলেন জানিস ?"

মহিম গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "কিছুমাত্র না।"

সতীশ বলিল, "হেমলতার বিবাহের জন্য বিপিন বাবু যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

উদাসভাবে মহিম বলিল, "মেয়ে বড় হ'লে সকল বাপ-মাই তার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে।"

মৃদু হাসিয়া সতীশ বলিল, "কিন্তু বিপিন বাবুর ব্যস্ততাটা যেন একটু বেশী।"

মহিম এ কথার কোন উত্তর দিল না, অন্যদিকে মুখ রাখিয়া হাতপাখাখানা ঘন ঘন নাড়িতে লাগিল। সতীশ বলিল, "তোর সন্ধানে তেমন পাত্র আছে ?"

মুখখানাকে ঈষৎ বিকৃত করিয়া মহিম বলিল, "ঘটকালী আমার ব্যবসা নয়।"

"পরোপকারের জন্য না হয় একবার ব্যবসাটা [illegible]লে।"

"সেটা নেহাৎ অব্যবসায়ীর ব্যবসা হবে। তাতে [illegible]সান ভিন্ন লাভ নাই।"

"গীতার উপদেশ--'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভা-[illegible]ভৌ জয়াজয়ৌ, ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব।"

"সে উপদেশ পরমহংসদের জন্য। আমি পরম-হংস নই।"

"পরমহংস দূরের কথা, তুমি যে পরম বকও নও, তা বেশ বুঝেছি।"

মহিম ভ্রূভঙ্গী করিল। সতীশ তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তা নইলে বিপিন বাবু তোমার মাথায় এমন ভারী বোঝাটি চাপাতে সাহস কত্তেন না।"

মহিম তাহার মুখের উপর বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সতীশ স্বরটাকে আরও একটু তীব্র করিয়া বলিল, "তুমি নাকি বিপিন বাবুর এই কন্যারত্নটিকে গ্রহণ কর্‌তে সম্মত ?"

এ প্রশ্নে মহিম প্রথমে একটু বিস্ময় অনুভব করিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে বিস্ময়ভাবটা দমন করিয়া সতেজকণ্ঠে উত্তর দিল, "সেটা বোধ হয় খুব অন্যায় কাজ হয় নি ?"

সতীশ বলিল, "ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষমতা যে তোমার আছে, এমন তো বোধ হয় না।"

রুক্ষস্বরে মহিম বলিল, "যে আপনাকে বুদ্ধিমান্‌ ব'লে জানে, সে জগৎটাকেই নির্ব্বোধ দেখে।"

সতীশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমার নিজের বুদ্ধিমত্তার গর্ব্ব না থাকলেও তুমি যে নির্ব্বোধ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।"

মহিম ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। সতীশ বলিল, "তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধি থাক্‌লে এত সহজে বিপিন বাবুর মেয়েকে বিবাহ কত্তে রাজি হ'তে না।"

"বিপিন বাবুর অপরাধ ?"

"অপরাধ তিনি অজ্ঞাতকুলশীল। 'অজ্ঞাতকুলশীলস্য' হিতোপদেশে পড়েছ তো ?"

"তাঁর মত ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তির কুলশীল সম্বন্ধে সন্দেহ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

"ফ্রি এডুকেশনের কৃপায় আজকাল অনেক ধোপাও শিক্ষিত হয়েছে।"

মহিম ক্রোধগম্ভীর-মুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। সতীশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীর-গম্ভীর-স্বরে বলিল, "এক কাজ কর্‌ মহিম।"

"কাজটা কি শুনি।"

"দেশে তোর বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক হয়েছে, সেই-খানেই বিয়েটা ক'রে ফেল।"

"এটা কি এমন একটা বোঝা যে, যে কোন রকমে মাথা হ'তে নামিয়ে দেওয়া দরকার ?"

"অপরের পক্ষে তা না হ'লেও তোর পক্ষে ঠিক তাই দাঁড়িয়েছে।"

"কিসে বুঝলে ?"

"হেমলতাকে বিয়ে কত্তে রাজি হওয়ায়।"

মাথাটা উঁচু করিয়া গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে মহিম বলিল "হেমলতাকে স্ত্রীরূপে পাওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা।"

"কিন্তু সে সৌভাগ্য তোমার নাই ?"

"তুমি যে দেখছি, একজন মস্ত 'ফোরটেলর' (ভবিষ্যদ্বক্তা) হয়ে প'ড়েছ।"

"কিন্তু আমার এ ভবিষ্যদ্বাণী অনিশ্চিত নয়, নিশ্চিত।"

মহিমের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। সতীশ তাহা লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "তার কারণ, বিপিন বাবুর রীতিমত পরিচয় যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ এ বিবাহ কিছুতেই হ'তে পারে না।"

মহিম বলিল, "আমি বিবাহ কর্‌লে কেউ তা আটকাতেও পারে না।"

তীব্র শ্লেষের হাসি হাসিয়া সতীশ বলিল, "কিন্তু তুমি বাপের ত্যাজ্য-পুত্র, এ কথা জান্‌তে পার্‌লে বিপিন বাবু কখনই তোমার মত সুপাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেন না।"

মহিম দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সতীশের মুখের উপর ক্রোধরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সতীশ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "কিন্তু এ ছাড়া আর এমন একটা মস্ত বাধা আছে যে সেটাকে কিছুতেই ঠেলে ফেল্‌বার নয়।"

মহিম নিরুত্তর। সতীশ বলিল, "এ বিবাহে হেমলতার মত নাই।"

গর্জ্জন করিয়া মহিম বলিল, "মিথ্যা কথা।"

সতীশ হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি তোর শত্রু নয় মহিম, আমি অনুমানে যেটুকু বুঝেছি, সেইটুকুমাত্র তোকে বল্লাম।"

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে মহিম বলিল, "না বল্‌লেও কোন ক্ষতি ছিল না।"

সতীশ বলিল, "ক্ষতি-বৃদ্ধির কথা তুই জানিস্, কিন্তু আমার যেটুকু কর্ত্তব্য, সেইটুকুতেই আমার অধিকার।"

মহিমের মুখখানা বিষাদপূর্ণ গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া আসিল। সতীশ বলিল, "এই জন্যই বল্‌ছি মহিম, দেশে গিয়ে বিয়েটা ক'রে আয়, তাতে তোর সকল দিকেই ভাল হবে।"

বিকৃত মুখে মহিম বলিল, "তুমি দেখছি আজ কাল অনধিকার-চর্চ্চাটা খুব বেশী বেশী কচ্চো।"

সহাস্যে সতীশ বলিল, "মানুষের স্বভাবই এই যে, শুধু নিজের অধিকারের মধ্যে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে না। যাই হোক, অধিকার অনধিকার ছেড়ে দিয়ে কথাগুলা তুই ভেবে দেখ।"

বলিয়া সতীশ উঠিয়া গেল। মহিম চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সতীশের কথাগুলা তাহার নিকট এতই উপেক্ষণীয় বোধ হইয়াছিল যে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি তাহার একটুও ছিল না। কিন্তু একটা কথা তাহার কানে বড়ই কঠোরভাবে বাজিয়াছিল—'এ বিবাহে হেমলতার মত নাই।' ইহাও কি সম্ভব? সে হেমলতাকে যেরূপ প্রাণ দিয়া ভালবাসে, তাহাতে এ বিবাহে তাহার অসম্মতির কোনই কারণ থাকিতে পারে না। থাকিলেও সতীশের তাহা জানিবার সম্ভাবনা কোথায়? সে কি সতীশের কাছে এমন ভাবের কোন কথা প্রকাশ করিয়াছে? তাহা আরও অসম্ভব।

সকলের উপর একটা বেশী অসম্ভব এই যে, তাহার সহিত যে হেমলতার বিবাহ হইবে, এই কথাটারই আদৌ স্থিরতা নাই। সতীশের প্রশ্নের উত্তরে শুধু আপনার জেদ দেখাইবার জন্যই সে এই ব্যাপারটাকে স্থিরতররূপে প্রকাশ করিলেও এখনও কোন পক্ষ হইতেই প্রস্তাব উঠে নাই, বিপিন বাবু এ সম্বন্ধে তাহাকে কোন অনুরোধ করেন নাই এবং সেও ইহাতে সম্মতি দিয়া আসে নাই। বিপিন বাবু তাহার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সে অসঙ্কোচে তাহাতে সম্মতি দিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার এই অপ্রকাশিত মনোভাবটা এখনও অপরের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। অথচ ইহার মধ্যে হেমলতা যে তাহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, এ কথা সতীশ স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গেল। সতীশ কি এত বড় মিথ্যাকে কল্পনার সাহায্যে ঠিক করিয়া লইয়াছে? ইহাতে সতীশের লাভ?

কাহার কিসে লাভ, সে কথাটা বড় সহজে বলা যায় না। স্থূলদৃষ্টিতে যেখানে একজনের কোনই লাভ দেখা যায় না, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সেইখানেই তাহার একটা মস্ত লাভ দেখা যায়। সতীশ যে ইদানীং হেমলতাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা মহিমের অবিদিত ছিল না। যাহাকে সে ভালবাসে, তাহাকে পাইবার আশাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। কিন্তু সে পথে প্রধান কণ্টক মহিম। মহিমকে দূরে সরাইতে না পারিলে, তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সে অনায়াসেই মিথ্যার আশ্রয় লইতে পারে। কেবল তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই মহিম যে সরিয়া দাঁড়াইবে, এমন বিশ্বাস করিয়া থাকিলে সে নিতান্ত নির্ব্বোধের

মত কাজ করিয়াছে। সতীশের মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ততটা নির্ব্বুদ্ধিতা সম্ভব নয়। সুতরাং কে জানে, স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সে মিথ্যা ছাড়া অন্য কোন কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে কি না।

আজ বিপিন বাবু সতীশকে ডাকিয়াছিলেন। খুব সম্ভব তাহার নিকট মহিমের সহিত হেমলতার বিবাহ-প্রস্তাব করিবার জন্যই এই আহ্বান। কিন্তু এ প্রস্তাবটা যখন সতীশের আশার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল, তখন সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে বিপিন বাবুর মন ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। মানুষ স্বার্থের জন্য কি না করিতে পারে? এই স্বার্থপরতার আঘাতেই তো সে জীবনের সুখময় কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া কক্ষভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় বিশ্বের অনির্দ্দেশ্য পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অথবা আপনার নীচতা প্রকাশ পাইবার ভয়ে সতীশ হয় তো বিপিন বাবুর মতি-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করে নাই, কৌশলে হেমলতারই মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। মহিম পিতার ত্যাজ্য-পুত্র, নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়, তাহার উপর সরলার সহিত সে বাল্য-প্রণয়ে আবদ্ধ, তাহার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধও স্থির হইয়াছে, এই সকল কথা প্রকাশ করিয়া হেমলতার কোমল হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে, এবং সেই আহত হৃদয়ে আপনার সহানুভূতির প্রলেপ দিয়া তাহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। তার পর সে মহিমের নিকট আসিয়া উপদেশচ্ছলে মহিমকে স্বতঃ দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে। উঃ, সতীশ কি বিষম স্বার্থপর!

কিন্তু এই স্বার্থপরের হীন মিথ্যাবাদিতায় হেমলতার মনটা কি এত সহজে বিরূপ হইয়া পড়িতে পারে? তাহার অনুরাগের মূলটা কি এতই শিথিল? বিশ্বাস হয় না। মহিমের ইচ্ছা হইল, এখনই ছুটিয়া গিয়া সে ইহার কঠোর সত্যতা পরীক্ষা করিয়া আইসে। কিন্তু এই রাত্রিকালে কি বলিয়া সেখানে যাইবে? সুতরাং মহিম সে প্রবৃত্তিটাকে আপাততঃ দমন করিয়া সতীশের নীচপ্রবৃত্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সকালে নগেন বলিল, "এ মেস ছেড়ে চল্‌লাম হে মহিম।"

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ?"

নগেন বলিল, "কারণ, এই মেসে এমন দু'একজন উপদেষ্টা জুটেছেন, যাঁদের অযাচিত উপদেশ অসহ্য হয়ে পড়েছে।"

গম্ভীরভাবে মহিম বলিল, "হুঁ।"

নগেন বলিল, "রাগ ক'রো না, তাঁদের মধ্যে তোমার বন্ধু সতীশ বাবু একজন।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে?"

নগেন বলিল, "কল্‌কাতা সহরে মেসের অভাব কি? আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটা মেসে মেম্বার ওয়াণ্টেড আছে।"

একটু ভাবিয়া মহিম বলিল, "যদি সিট্ খালি থাকে, আমিও যাব।"

নগেন উৎফুল্লভাবে হাসিয়া বলিল, "তুমিও? দাদারও ফলার না কি?"

গম্ভীরভাবে মহিম বলিল, "যদি পাও, আমাকে বলো।"

হাতে হাত চাপড়াইয়া নগেন বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, এ মেসেও কোন ভদ্রলোক থাকে!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মহিম সে দিন কলেজে গেল না মেসের বাহির হইল না, খাইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "শুয়ে পড়লি যে? কলেজে যাবি না?"

উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া মহিম উত্তর দিল, "না।"

"কারণ?"

"শরীরটা ভাল নয়।"

"বিয়ের কথায় মনটা চঞ্চল হয়েছে বুঝি?"

"হাঁ।"

সতীশ আর কিছু না বলিয়া কলেজে চলিয়া গেল। মহিম পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দিবানিদ্রার অভ্যাস না থাকায় ঘুম সহজে আসিল না, শুধু চোখ টিপিয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু খানিক পরে চোখ দুইটা যখন টন্-টন্ করিতে লাগিল, তখন বিরক্তভাবে উঠিয়া পাঠ্য পুস্তকের ভিতর হইতে একখানা উপন্যাস খুঁজিয়া বাহির করিল, এবং জানালাটা খুলিয়া দিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুই তিনবারের পড়া উপন্যাস তেমন চিত্তাকর্ষক

হইল না, কয়েক পাতা পড়িয়াই বইখানা পাশে ফেলিয়া পুনরায় নিদ্রার উদ্যোগ করিল। নিদ্রা কিন্তু আসিল না, তৎপরিবর্ত্তে একরাশি চিন্তা আসিয়া মনের চারিপাশ ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

সে এখন কি করিবে? কোন্ পথে যাইবে? বিপিন বাবুর যেরূপ আগ্রহ, তাহাতে একটু সম্মতি পাইলেই তিনি হেমলতাকে তাহার হস্তে অর্পণ করিবেন। কিন্তু এ সম্মতি সে দিবে কি না? সমস্যাটা এইখানেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নির্ব্বিচারে এত বড় একটা ভার গ্রহণ করা ভবিষ্যতের পক্ষে কষ্টকর হইবে কি না, কে জানে। অথচ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হেমলতাকে ত্যাগ করাও বড় অল্প কষ্টদায়ক হইবে না। একবার তো সে এইরূপ কাজ করিয়া রীতিমত ঠকিয়াছে। হায়, তখন যদি সে এমন নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ না করিত, তাহা হইলে আজ চারু—। দূর হউক চারু, তাহা হইলে আজি কি তাহাকে এইরূপে পড়ানর উপর নির্ভর করিয়া মেসে পড়িয়া থাকিতে হইত? অজ্ঞানে তো সে একজনকে হারাইয়াছে, এখন আবার সজ্ঞানেও কি আর একজনকে হারাইবে? তাহা হইলে জীবনে থাকিবে কি? ভবিষ্যৎ? দরিদ্র মুটে-মজুরেরাও তো বিবাহ করে। সে কি তাহাদের অপেক্ষা অক্ষম কাপুরুষ যে, সেই চিন্তায় হেমলতার মত স্ত্রী পাইবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিবে? না না, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বর্ত্তমান আলোক-সমুজ্জ্বল, এই আলোক ছাড়িয়া সে অন্ধকারকে জড়াইয়া ধরিতে পারিবে না।

যাহা চেষ্টায় আসে নাই, তাহা বিনা চেষ্টায় আসিল, ভাবিতে ভাবিতে মহিম ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্নে দেখিল, হেমলতার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে হেমলতাকে লইয়া সুখের সংসার পাতিয়া বসিয়াছে, হেমলতার প্রেমশীতল করস্পর্শে জীবনের সকল দৈন্য, সকল ব্যথা মুছিয়া গিয়াছে। তাই সে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে প্রেমগদগদ-কণ্ঠে হেমলতাকে বলিতেছে, "আজ আমি কত সুখী লতা!"

হেমলতা গ্রীবাভঙ্গী করিয়া অভিমানের স্বরে উত্তর দিল, "তাই তো বিয়ে কত্তে চেয়েছিলে না?

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে মহিম উঠিয়া দেখিল, বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরিয়া সে পড়াইতে বাহির হইল।

কিন্তু মেসের বাহিরে আসিয়াই মহিম একটা কথা ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সে আজ পড়াইতে যাইবে কি না? যাহার সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহাকে পড়াইতে যাওয়া উচিত কি না? অনুচিতই বা কিসে? হেমলতা যদি ঠিক লজ্জাশীলা হিন্দুবালিকার মত হইত, তাহা হইলে দোষ ছিল বটে, পড়াইতে গেলেও সে কখন সম্মুখে আসিত না। কিন্তু সে যে আদর্শে গঠিতা, তাহাতে তাহার স্বভাবের অতিরিক্ত তেমন লজ্জা আদৌ নাই। সুতরাং তাহার সম্মুখে যাইতে ইতস্ততঃ করিবার কারণ কিছুমাত্র নাই। বরং না যাওয়াটাই ভালবাসার উপর সংশয়ের ছায়া আনিয়া দিতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে মহিম অগ্রসর হইল, এবং বিপিন বাবুর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে কি না, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এমন সময় বিপিন বাবু বাহির হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মহিমকে তদবস্থ দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি মহিম, এখানে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? বাড়ীতে চল।"

বলিয়াই তিনি মহিমের হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। মহিম লজ্জারক্ত মুখে তাঁহার সহিত চলিল। বিপিন বাবু তাহাকে লইয়া পড়িবার ঘরে ঢুকিলেন, এবং খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া জামার বোতামগুলা খুলিয়া দিতে দিতে মহিমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কা'ল সতীশ এসেছিল, তার সঙ্গে সকল কথাই হয়েছে। তোমাকে কিছু বলেছে কি?"

মহিম সলজ্জ হাস্যের সহিত মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "হাঁ।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এ সম্বন্ধে তোমার আর কারো মত নেবার দরকার হবে?"

মহিম পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

বিপিন বাবু যেন একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হর্ষপ্রফুল্ল-কণ্ঠে বলিলেন, "যাক্, তা হ'লে শুভস্য শীঘ্রং। আমার কোন কাজে দেরী করার অভ্যাস নাই। পাঁজিটা একবার দেখি। দেশ থেকে কাউকে আনাবার দরকার হবে কি? আত্মীয়ের মধ্যে তো এক খুড়ী। তা তিনি আসেন ভালই, না আসেন, তাতেও ক্ষতি নাই। কি বল?"

বলিয়া তিনি মহিমের মুখের উপর সাগ্রহ দৃষ্টিপাত

করিলেন। মহিম নত-মস্তকে মৃদু হাস্য করিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "আর এক কথা, তোমার স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিবার দরকার নাই। যা কিছু সব এইখান হ'তেই হবে। তোমার শাশুড়ীরও তাই ইচ্ছা। আর আলাদা বাড়ীতে উদ্যোগ-আয়োজনই বা করবে কে? না না, এ রকম মত তুমি ক'রো না।"

মহিম লজ্জাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "না।"

বিপিন বাবু ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন, "বেশ, আজ সোমবার, আসচে সোমবারে যেন একটা দিন আছে ব'লে বোধ হচ্চে। এখনি পাঁজিটা দেখছি। তা হ'লে মাঝে সাতটা দিন—সাতটা কেন, ছ'টা দিন। তা হোক, এর মধ্যেই সব ঠিক ক'রে নিতে পারবো। আর উদ্যোগ-আয়োজনই বা এমন কি, এ তো আর আড়ম্বরের বিয়ে নয়, গরীবের মেয়ের বিয়ে।"

বলিয়া বিপিন বাবু হাসিয়া উঠিলেন। তার পর অস্থিরভাবে ঘরের ভিতর পদচারণ করিতে করিতে বলিলেন, "যাক্, এখন কাজটা শেষ কত্তে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ভাল কথা, তোমার শাশুড়ী বলছিলেন কি জান, বিয়ের পর তোমার আর মেসে থাকা চলবে না। তা আমি বলেছি, সে ভার আমি নিতে পারবো না, তোমরা শাশুড়ী-জামায়ে বোঝা-পাড়া ক'রে নেবে।"

বলিয়া তিনি আপন মনে খানিকটা হাসিয়া লইলেন। মহিম মাথা নীচু করিয়া আরক্তমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। হাসিতে হাসিতে বিপিন বাবু সহসা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "একটা কথা তোমায় ব'লে রাখি মহিম, যদিও আমি দু'পাঁচ হাজার দিতে পারবো না, তা হ'লেও তোমাকে যা দিচ্চি, তার তুলনা নাই, এ কথা আমি জোর গলায় বলছি। লতিকে নিয়ে তুমি সুখী হইবে। তার প্রকৃতি তুমি অনেকটা জেনেছ, তবু আমি বলছি, এ রকম শান্তশিষ্ট মেয়ে হাজারে একটা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। লতি শুধু আমার একমাত্র সন্তান নয়, আমার যথেষ্ট গর্ব্বের জিনিস।"

কন্যার গৌরবে পিতার মুখখানা গর্ব্বোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই গর্ব্বজাত আন্তরিক আনন্দটা যেন নীরবে উপভোগ করিবার জন্য তিনি জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। মহিম নিঃশব্দে বসিয়া ললাটে হস্তাব-মর্ষণ করিতে লাগিল।

একটু পরে বিপিন বাবু জানালার কাছ হ'তে সরিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত স্থির-স্বরে বলিলেন, "আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি। তুমি যেন চ'লে যেও না মহিম। লতি কোথায় গেল? আচ্ছা, তাকে ডেকে দিই।"

বলিয়া বিপিন বাবু দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। মহিম মাথা তুলিয়া জোরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। বাস্তবিক হেমলতার মত মেয়ে হাজারে কেন, লক্ষের মধ্যেও একটি পাওয়া যায় না। রূপের সঙ্গে এমন গুণের সম্মিলন, শিক্ষার সঙ্গে এত নম্রতার সমাবেশ, এমন মণিকাঞ্চন-সংযোগ অল্পই দেখা যায়। বিপিন বাবুর উক্তি সম্পূর্ণ সত্য, হেমলতাকে লইয়া সে সুখী হইবে। তাহার ব্যর্থ ব্যথিত জীবন একটা কল্পনাতীত পূর্ণতায় সার্থক হইয়া উঠিবে।

হেমলতা ধীর-মন্থর-পদে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মহিমের বোধ হইল, যেন একটা পরিপূর্ণ আনন্দ স্বীয় মাধুর্য্যে ঘরখানাকে মধুময় করিয়া তাহার সমক্ষে আবির্ভূত হইল। মহিমের বুকটা তীব্র আনন্দের বেগে একটু জোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। হেমলতা ধীরে ধীরে গিয়া মহিমের সম্মুখের চেয়ারের হাতলটা ধরিয়া দাঁড়াইল। মহিম তাহার দিকে হাস্য-প্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আর পড়বে না?"

হেমলতা টেবিলের উপর আঙ্গুলের টোকা দিতে দিতে নতমুখে উত্তর দিল, "না।"

ঈষৎ হাসিয়া মহিম বলিল, "পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে নাকি?"

হেমলতা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আজ কলেজে যান নি?"

একটু বিস্ময়ের সহিত মহিম বলিল, "কে বললে?"

হেমলতা বলিল, "আপনি তো দু'পোরবেলা ঘরে ঘুমিয়েছিলেন।"

এ উত্তরে মহিম অন্তরে যে একটা অব্যক্ত পুলক অনুভব করিল, তাহাতে সে ইহার কোন মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে পারিল না। সে কখন্ কি করে, না করে, হেমলতার সাগ্রহ দৃষ্টি সে সকলই লক্ষ্য করিয়া থাকে। হৃদয়ের আকর্ষণ না থাকিলে এতটা লক্ষ্য

হয়া কখনই সম্ভবপর হইত না। সে নিরুত্তরে হেম-লতার মুখের উপর প্রফুল্ল দৃষ্টিপাত করিল।

হেমলতা দৃষ্টি নত করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শরীর তো অসুস্থ হয় নি ?"

সহাস্যে মহিম বলিল, "হলেও তাতে তোমার উৎকণ্ঠিত হবার কোন কারণ নাই।"

হেমলতা নীরবে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মহিম তাহার অবনত মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আবেগ-চঞ্চল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার জন্য কি তোমার এতই উৎকণ্ঠা হয় হেম ?"

চকিতভাবে হেমলতা মুখ তুলিল। মহিম দেখিল, তাহার সমগ্র মুখখানা সৌরকররঞ্জিত প্রভাত-পদ্মের ন্যায় বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে, যেন তাহার অন্তরের সকল প্রেম, সকল আকাঙ্ক্ষা মুখ চোখের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশের জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছে। মুগ্ধ-বিহ্বল-কণ্ঠে মহিম বলিল, "কিন্তু আমি কি তোমার এই ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারবো ?"

সহসা হেমলতার আয়ত চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল, মুখের উপর দিয়া একটা উপহাসমিশ্রিত ক্রোধের ছায়া বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় খেলিয়া গেল, দেখিয়া মহিম একটু ভীত হইল। সতেজ-কণ্ঠে হেমলতা বলিল, 'আমায় মাপ করুন, আমি আপনার এই নবেলী ভালবাসার সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

বলিয়াই সে জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মহিম স্তব্ধ-বিস্ময়বিমূঢ়-ভাবে বসিয়া রহিল। পশ্চিম আকাশ হইতে একটা স্বর্ণচ্ছটা আসিয়া তীব্র বিদ্রূপের মত চোখের উপর নাচিতে লাগিল, বর্ষা-শীতল বায়ু-প্রবাহ ঘরের ভিতর দিয়া উদাসভাবে বহিয়া গেল, টেবিলের উপর রক্ষিত বাসি ফুলের গোছাটা গৃহমধ্যে একটা উৎকট গন্ধ ছড়াইয়া দিল। মহিমের সমস্ত অন্তঃকরণটা প্রগাঢ় বিস্ময়ে যেন অসাড় হইয়া আসিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বেহারী একখানি চিঠি-হাতে ঘরে ঢুকিয়া চারুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহিমের আক্কেলটা দেখ্‌লে।"

চারু বিস্ময়ের সহিত ফিরিয়া চাহিল। বেহারী তাহার দিকে চিঠিখানা ছুড়িয়া দিয়া, মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "প'ড়ে দেখ।"

চারু চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে লাগিল; বেহারী বক্র কটাক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চারু নিঃশব্দে চিঠি পড়িয়া তাহা ফিরাইয়া দিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "প'ড়ে দেখলে ?"

মৃদুস্বরে চারু উত্তর দিল, "হাঁ।"

বেহারী ভ্রূকুটি করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "একটি ছোট্ট হাঁ ব'লেই নিশ্চিন্ত হ'লে যে ?"

চারু বলিল, "আর কি করবো ?"

বিকৃত-মুখে বেহারী বলিল, "আমার শ্রাদ্ধ করবে।"

স্বামীর মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চারু ঘৃণার সহিত মুখটা ফিরাইয়া লইল। বেহারী অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। হঠাৎ একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বিয়েটাতেই তার এত আপত্তি কেন বল তো ?"

রুষ্টস্বরে চারু উত্তর করিল, "আমি তার কি জানি ?"

দাঁত-মুখ খিচাইয়া বেহারী বলিল, "তুমি জান না, আমি জানি না, তবে জানবে কে ? ও পাড়ার রামা গয়লা ?"

চারু নতমুখেই ভ্রূকুটি করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। বেহারী অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "বোবার শত্রু নাই, এ নীতি শুধু যে তুমিই জান, তা নয়, কিন্তু সকল বিষয়েই বোবা হয়ে থাকলে তাতে মিত্রতার পরিচয়ও দেওয়া হয় না।"

বিরক্তির সহিত চারু উত্তর করিল, "যে জানে না, তাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করলে বোবা সাজা ছাড়া উপায় নাই।"

বেহারী বলিল, "তুমি যেন বোবা সেজে নিষ্কৃতি পেতে পার, কিন্তু আমি—আমার তো নিষ্কৃতি পাবার

উপায় নাই। আর আমার এমন কোন দাদা নাই, যার ঘাড়ে এই বোঝাটা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি, যেমন সে হয়েছিল।"

বলিয়া সে চারুর মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই চারুর চোখে মুখে ঘৃণাবিমিশ্রিত ক্রোধের তীব্রতা দেখিয়া তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল, এবং অস্থিরপদে খানিকক্ষণ ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বিছানার উপর কাৎ হইয়া পড়িল। চারু এক পা এক পা করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া বেহারী গম্ভীরস্বরে বলিল, "আসল কথাটা কি জান, সে চায় একটি রাজ্য, আর তার সঙ্গে একটি স্বর্গের বিদ্যাধরী।"

চারু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শ্লেষতীব্র-কণ্ঠে বলিল, "অনেকেই তা চায়। তবে সকলের আশা পূর্ণ হয় না, কারো কারো হয়।"

এই শ্লেষের ভিতর যে একটা কঠোর সত্য ছিল, তাহার তীব্র আঘাত অনুভব করিয়া বেহারী ক্রোধবিকৃত-কণ্ঠে বলিল, "তুমি তাই মনে কর বটে, কিন্তু আসলে তুমিও বিদ্যাধরী নও, আর মহিমের বাবার এই তিন কড়ার বিষয়ও রাজত্ব নয়।"

রাগে মুখখানা লাল করিয়া চারু সতেজ-কণ্ঠে বলিল, "অথচ এই দু'টাকে পাবার তরেই—"

বলিতে বলিতে চারু স্বামীর পাংশুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল। বেহারীও মুখ ফিরাইয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে কড়িকাষ্ঠের স্থূলতানির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইল।

এমন সময় কালীতারা আসিয়া বাহির হইতে ডাকিলেন, "বেহারি, ঘরে আছিস?"

চারু তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। বেহারী কড়িকাঠ হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই উত্তর করিল, "কেন?"

দরজার কাছে আসিয়া কালীতারা বলিলেন, "এমন সময় শুয়েছিস্ যে? কিছু খাবি?"

গম্ভীরভাবে বেহারী উত্তর করিল, "কি আবার খাব?"

কালীতারা বলিলেন, "তালের ফুলুরী তৈরি করেছি, নিয়ে আসবো?"

নাসা কুঞ্চিত করিয়া বেহারী বলিল, "না, থাক্।"

কালীতারা বলিলেন, "থাক্ কেন, গোটাকতক নিয়ে আসি। দাও তো গা বৌমা, ঠাঁই ক'রে।"

বলিয়া তিনি প্রস্থানের উপক্রম করিতেই বেহারী রুক্ষভাবে বলিয়া উঠিল, "না না, আমি খাব না।"

"খাবি না কেন রে?"

"ভাল লাগে না।"

বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া কালীতারা বলিলেন, "ভাল লাগে না কি রে বেহারি? তুই যে তালের ফুলুরী খুব ভালবাসতিস্? নিজে ঘাড়ে ক'রে তাল এনে দিয়েছিস্। আর আজ—"

বিরক্তিতে মুখখানা বিকৃত করিয়া বেহারী বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, যখন এনে দিয়েছি, তখন দিয়েছি। এখন যদি ভাল না লাগে।"

বলিয়া সে চারুর দিকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। উদ্দেশ্য, তাহার এই তাল ঘাড়ে করার লজ্জাজনক ইতিহাসটা শুনিয়া চারুর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না দেখিবে। কিন্তু সেখানে গাম্ভীর্য্য ছাড়া একটুও বিদ্রূপের আভাস না পাইয়া আশ্বস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "মানুষের কি সকল জিনিস চিরদিন ভাল লাগে? আগে সন্দেশ খেতে ভালবাসতাম, এখন সন্দেশ দেখলে গায়ে জ্বর আসে।"

মৃদু হাসিয়া কালীতারা বলিলেন, "শুধু তোর কেন বেহারি, মানুষমাত্রেরি এই রকম হয়ে থাকে। যখন যে জিনিসটা সহজে পাওয়া যায় না, তখন সেটাকে পাবার তরে খুবই আগ্রহ হয়, কিন্তু সেই জিনিসটাই যখন বিনা আয়াসে পাওয়া যায়, তখন আর তার কদর থাকে না। তাই নাকি অনেক বড় লোক সন্দেশের খোসা ছাড়িয়ে খায়।"

কালীতারা সহজভাবে কথাটা বলিলেও বেহারী তাহার মধ্যে একটা ব্যঙ্গ অনুভব করিয়া ক্রোধ-গম্ভীর-মুখে বসিয়া রহিল। কালীতারা বলিলেন, "তার সাক্ষী দেখ না, আগে তোর কি খাওয়া ছিল, এখন কি দাঁড়িয়েছে। চেহারাও তেমন হয়েছে। ভাল, দিন দিন তোর চেহারা এমন হচ্চে কেন বল্ দেখি?"

"গম্ভীর-মুখে বেহারী বলিল, "ভাবলে মানুষের চেহারা এমনই হয়।"

"তা হয়, কিন্তু তোর এত কিসের ভাবনা? যে বিষয় আছে—"

বিষয় অমনি থাকে না। লোকে দেখে, এত বিষয়, এত টাকা, কিন্তু সে বিষয় রক্ষা কত্তে হয় যাকে, সেই জানে, তার জন্ম কত ভাবতে হয়। নিজের

শরীরের উপর মায়া-মমতা কত্তে গেলে বিষয় হয় না, থাকেও না।"

ম্লানমুখে কালীতারা বলিলেন, "সে কথা সত্যি বেহারি। বাস্তবিক, তোর এখনকার চেহারা দেখলে আগেকার চেহারা যখন আমার মনে পড়ে, তখন সত্যিই যেন চোখ ফেটে জল আসে। এক এক সময়ে মনে হয়, চুলোয় যাক্ বিষয়, তোর চেহারা আবার ফিরে আসুক।"

মাতার স্নেহকাতর মুখের দিকে চাহিয়া বেহারী বলিল, "অথচ যারা শুধু ঘরে ব'সে বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগ করে, তারা মনে করে, বিষয়-সম্পত্তি কি মজার জিনিস।"

বলিয়া সে চারুর মুখের উপর চকিত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গভীর আক্ষেপের স্বরে বলিল, "তুমি কি বল্‌চো মা, আমারি সময়ে সময়ে মনে হয়, চুলোয় হোক্, এ সব ছেড়ে ছুড়ে এক দিকে পালিয়ে যাই। কিন্তু ছেড়েই বা যাই কেমন ক'রে। মনে করেছিলাম, মহিম ছোঁড়াটা মানুষ হ'লে অনেকটা সাহায্য পাব। কিন্তু এখন দেখছি, সে আশা বৃথা।"

বলিয়া বেহারী সশব্দে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। কালীতারা পুত্রের বেদনা-ম্লান মুখের উপর সজল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "সত্যি বেহারি, তোর মুখের দিকে চাওয়া যায় না। যা হয় হবে, আমার কথা শোন্। মায়ে-পোয়ে মাসকতক পশ্চিমে ঘুরে আসি চল্। আমারো আর ক'দিন? এ সময়ে পাঁচটা তীর্থ-ধর্ম্ম কর্‌বো না?"

একটু ভাবিয়া বেহারী বলিল, "সে কথা ঠিক মা, কিন্তু আমি এ সব কার উপর ভার দিয়ে যাই? তেমন বিশ্বাসী কে আছে? একটু চোখের আড়াল হ'লেই সব লুটে-পুটে নেবে।"

কালীতারা বলিলেন, "হাঁ, লুটে-পুটে নেবে। মগের মুল্লুক আর কি।"

বেহারী মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি বোঝ না মা, যতগুলি কর্ম্মচারী আছে, সব বেটাই চোর। আমি কাউকে এক বিন্দু বিশ্বাস করি না।"

নিরুৎসাহভাবে কালীতারা বলিলেন, "তা হ'লে যাওয়া হচ্চে না বল?"

বেহারী বলিল, "যাওয়া হবে না কেন, তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন তুমি যাও না কেন, আমি বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্চি।"

মুখ ভার করিয়া কালীতারা বলিলেন, "তুই না গেলে আমারও যাওয়া হবে না।"

মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার যাওয়া হবে না কেন?"

কালীতারা বলিলেন, "কিসে আর হবে? আমি কি ঘরে মনটাকে রেখে সেখানে লাউমাচা পুঁইমাচা দেখতে যাব?"

বলিয়া তিনি পুত্রের মুখের উপর স্নেহসজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বেহারী ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বেহারী বলিল, "মহিমের যে চিঠি এসেচে।"

সাগ্রহে কালীতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখেছে? কবে আস্‌বে?"

বিরক্তির সহিত বেহারী উত্তর করিল, "আস্‌বে না।"

কালীতারা গম্ভীরভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি তা জানি বেহারি।"

বেহারী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্রোধগম্ভীরস্বরে বলিল, "তুমি জান, উনি জানেন, তবে বিয়ের যোগাড়টা কর্‌লে কে?"

সকলের নিষেধ সত্ত্বেও বেহারী নিজেই যে উদ্যোগ করিয়াছিল, সে কথাটা না বলিয়া কালীতারা বলিলেন, "আমি কিন্তু গোড়াতেই বলেছিলাম, আগে তার মত নাও।"

মুখভঙ্গী করিয়া বেহারী বলিল, "আমি কি কারো চাকর যে, আগে মত নিয়ে তার পর কাজে হাত দেব?"

চিন্তিতভাবে কালীতারা বলিলেন, "রাগের কথা নয় বেহারী, এখন উপায়?"

তীব্রস্বরে বেহারি বলিল, "এর পর্ আর কোন উপায় থাক্‌তে পারে না।"

কালীতারা নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। বেহারী গম্ভীরস্বরে বলিল, "অনেকে মনে করে, আমি ফাঁকি দিয়ে তার বিষয়টা হাত করেছি।

কিন্তু, তারা জানে না, ও ছোঁড়া কত বড় হতভাগা।”

বলিয়া বেহারী চারুর দিকে একবার তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। কালীতারা একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “সত্যই সে হতভাগা ব'লেই তার জন্য এত কষ্ট হয়।”

কর্কশকণ্ঠে বেহারী বলিল, “কষ্ট হয়! কষ্ট ক'রে কি কর্‌বে বল তো?”

দুঃখ-গম্ভীর-স্বরে কালীতারা বলিলেন, “কিছুই কর্ত্তে পার্‌ব না, বেহারি, মানুষে কারো কিছুই কর্ত্তে পারে না, শুধু ভাবতে পারে।”

বেহারী শুইয়াছিল, সহসা উঠিয়া বসিল, মুখভঙ্গী করিয়া ক্রোধবিকৃত-কণ্ঠে বলিল, “তার তরে তোমাদের এত ভাবনা, কেন বল তো? সে তোমাদের কে? আমি মরি, আর সে এসে বিষয়টা ভোগ করুক, এইটাই বোধ হয় তোমাদের ইচ্ছা?”

কালীতারা শুষ্ক-কঠোর দৃষ্টিতে বেহারীর মুখের দিকে চাহিলেন। বেহারী সে দৃষ্টির তীব্রতা সহ্য করিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া আড়ভাবে শুইয়া পড়িল। কালীতারা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

একটু পরে বেহারী মুখ তুলিল, এবং চারুকে লক্ষ্য করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, “তুমি যে দেখছি, মহিমের চিন্তায় তন্ময় হয়ে আছ।”

স্বামীর মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চারু বলিল, “দেখ, যারা নিতান্ত অভদ্র, তারাও মায়ের সঙ্গে একটু ভদ্রভাবে কথা কয়।”

“তা হ'লে তোমার মতে আমি অভদ্র হ'তেও অভদ্র, অতি ইতর, না?”

বলিয়া বেহারী উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। চারু ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। বেহারী হাস্যবেগ সংবরণ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, “আসল কথা কি জান, মহিমের নাম হ'লেই আমার অন্তরটা কেমন জ্বলে উঠে। কেন বল দেখি?”

চারু মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর করিল, “কেন, তা তুমিই জান।”

ঈষৎ শ্লেষের হাসি হাসিয়া বেহারী বলিল, “আমি জানি বটে, কিন্তু আমার চাইতে তুমি বেশী জান বোধ হয়।”

ক্রোধে ঘৃণায় মুখখানা লাল করিয়া চারু ঘরের বাহির হইবার উপক্রম করিল। বেহারী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “যেও না, শোন।”

চারু দাঁড়াইল। বেহারী উঠিয়া বসিয়া পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল, “এই তোমার দানপত্রের খসড়া। প'ড়ে দেখ, কোন দোষ না থাক্‌লে ষ্ট্যাম্প-কাগজে তুল্‌তে হবে।”

চারু হাত বাড়াইয়া কাগজখানা লইল। বেহারী তাহার হাতে কাগজ দিয়া বলিল “খুব ভাল উকীলের দ্বারা তৈয়ার করিয়েছি, দোষ কিছুই নাই, তবু একবার তোমার পড়া দরকার। কি বল?”

চারু কোন উত্তর না দিয়া কাগজের ভাঁজ খুলিয়া নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল। বেহারী সোৎসুকনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পড়া শেষ হইলে চারু কাগজখানাকে পুনরায় ভাঁজ করিতে লাগিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন, সব ঠিক হয়েছে তো?”

চারু কাগজ ভাঁজ করিতে করিতেই উত্তর দিল, “হয়েছে।”

বেহারী বলিল, “কত বড় উকীলের মুসাবিদা! দেখ, কোন পরিবর্ত্তনের দরকার হয় তো বল।”

কাগজখানা স্বামীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চারু বলিল, “এক জায়গায় একটু পরিবর্ত্তন হ'লে ভাল হয়।”

“কোন্ জায়গাটা বল” বলিয়া বেহারী কাগজখানা তাহার সম্মুখে প্রসারিত করিল। সেই প্রসারিত কাগজের উপর যেখানে দানগ্রহীতা বেহারীর নাম ছিল, চারু সেইখানে আঙ্গুল দিয়া বলিল, “এই জায়গাটা।”

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, “ওটা তো নাম?”

চারু গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, “হুঁ।”

“এখানে কি পরিবর্ত্তন হবে?”

“এখানে এই নামটা কেটে দিয়ে লিখতে হবে মহিমচন্দ্র মল্লিক।”

হঠাৎ কানের কাছে কড়কড় শব্দে বাজ ডাকিলে লোকে যেমন ভয়ে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠে, বেহারী তেমনই ভাবে চমকিয়া আপনার বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিটা চারুর মুখের উপর স্থাপন করিল। চারুর মুখে কিন্তু চাঞ্চল্যের একটু রেখাও প্রকটিত হইল না; সে সমান গম্ভীরমুখে স্থির প্রশান্তকণ্ঠে বলিল, “নামটার পরিবর্ত্তন ক'রে আন্‌লেই সই ক'রে দেব।”

ক্রোধে বেহারীর চোখ দুইটা প্রদীপ্ত, ললাটের

শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। চারু তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে স্বামীর ক্রোধে আপনার উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। বেহারী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। তার পর দানপত্রের খসড়াখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া অস্থির পদে বাহিরে চলিয়া গেল।

অন্তঃপুরের বাহির হইয়া বেহারী প্রথমে বৈঠকখানার দিকে যাইতেছিল, হঠাৎ ফিরিয়া কাছারীঘরে উপস্থিত হইল। সেখানে দুই তিন জন মুহুরী এবং একজন ম্যানেজার বসিয়া কাজ করিতেছিল। বেহারীকে দেখিয়া তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বেহারী কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একেবারে ম্যানেজারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চারুবালা দাসীর নামে যে সকল মহাল আছে, তার আয় কত?"

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি চোখে চশমা লাগাইয়া দুই তিনখানা খাতা উল্টাইয়া উত্তর দিল, "বত্রিশ হাজার সাত শত চল্লিশ টাকা পাঁচ আনা—"

বাধা দিয়া বেহারী রুক্ষস্বরে বলিল, "চুলোয় যাক্ আনা। এই সম্পত্তির কিছু দেনা আছে?"

গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে ম্যানেজার বলিল, "এক পয়সাও না।"

বেহারী ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "কতদিনের ভিতর এই সম্পত্তিটার নীলামের সম্ভাবনা আছে?"

বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া ম্যানেজার উত্তর করিল, "নীলাম।"

বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বেহারী বলিল,"হাঁ নীলাম। কত টাকা দেনা হ'লে এই সম্পত্তিটা নীলামে উঠ্‌তে পারে?"

একটু ভাবিয়া ম্যানেজার বলিল, "অন্ততঃ হাজার বারো টাকা।"

বেহারী বলিল, "বেশ, মাস দু'য়ের ভিতর বারো হাজার টাকা দেনা দাঁড় করিয়ে এই সম্পত্তিটাকে নীলামে তুলতে হবে। বুঝেছেন?"

স্পষ্ট না বুঝিলেও ম্যানেজার আভাসে যতটুকু বুঝিতে পারিল, তাহাতেই ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "যে আজ্ঞে।"

বেহারী দ্রুতপদে কাছারী ত্যাগ করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

চারু স্বামীর মুখের উপর যাহা বলিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না, আজ উত্তেজনার বশে তাহাই বলিয়া ফেলিয়া সে যে শুধু বেহারীকেই আঘাত দিল তাহা নহে, নিজেও এমন আঘাত পাইল যে বেহারীর সম্মুখ হইতে ধীরগম্ভীরপদে অপসৃত হইলেও বাহিরে গিয়া মনের ধৈর্য্য কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিল না। লজ্জা ও গৌরবহীনতার তীব্র কশাঘাতে মনটা জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। ছি ছি, মহিম তাহার কে যে, তাহাকে সে আপন সম্পত্তি দান করিয়া সম্পত্তির সার্থকতা সাধন করিবে। যে মহিম একদিন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে হীন করিয়া তুলিয়াছিল এবং যে প্রত্যাখ্যানের শাস্তিস্বরূপ সে এত বড় পৈতৃক সম্পত্তিটা ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, এবং এই ত্যাগের ফলে তাহার প্রত্যাখ্যানের অবমাননাকে আরও বড় করিয়া দিয়াছিল, চারু আজ কোন্ লজ্জায় স্বামীর সাক্ষাতে সেই মহিমকে আপনার সম্পত্তি দান করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া প্রত্যাখ্যানকারী নিষ্ঠুর মহিমের উপর আপনার আন্তরিক গূঢ় ভালবাসার স্থায়িত্ব জানাইয়া দিল? ইহাতে বেহারী যে তাহার ভালবাসায় সন্দিহান হইয়া ক্ষুব্ধ হইবে, এমন আশঙ্কা চারুর হইল না, কিন্তু এই ঘটনায় নিজের নির্লজ্জতাটা যে স্বামীর সম্মুখে প্রকটিত হইয়া পড়িল, ইহাই ভাবিয়া চারু নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিল।

কিন্তু সামান্য উত্তেজনায় এমন কথাটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। সে অনেকদিন হইতেই বুঝিয়াছিল, মহিমের সহিত সরলার এই যে বিবাহের উদ্যোগ, ইহা ভাণ মাত্র, আসল কথা, বেহারী নিজেই সরলাকে বিবাহ করিতে সমুৎসুক। নতুবা মহিম সহজে বিবাহে সম্মতি দিবে না জানিয়াও তাহার মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই এত তাড়াতাড়ি বিবাহের উদ্যোগ হইত না। সে স্থির বুঝিয়াছিল, মহিমের অসম্মতিতে যখন এই উদ্যোগটা পণ্ড হইবার উপক্রম ঘটিবে, তখন ভদ্রলোকের মানমর্য্যাদা রক্ষা করিবার অছিলায় বেহারী নিজেই সরলার পাণিগ্রহণ করিয়া লোকলজ্জা এবং চক্ষুলজ্জার হাত এড়াইবে। স্বামীর এই ঘৃণিত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেও চারু ইহার প্রতিবাদ করিল না; বাধা দিবার শক্তি থাকিলেও বাধা দিল না। বাধা দেও-

হইয়া রহিল। সে নিরস্ত থাকিলেও বেহারী যে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না. ইহাও চারু বুঝিয়াছিল। পুনরায় বিবাহ করিলে পাছে চারুর সম্পত্তিটা তাহার হস্তচ্যুত হয়, এই আশঙ্কাতেই সে নিজের নামে সমস্ত লিখাইয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

চারু স্বামীর সকল অপরাধ, সকল নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা করিয়া চলিলেও এই নীচ আশঙ্কাকে কিন্তু ক্ষমা করিতে পারিল না। বেহারী যদি স্পষ্ট করিয়া বলিত, তাহা হইলে হয় তো চারু স্বচ্ছন্দে সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া দিতে পারিত, কিন্তু বেহারী যখন প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়া, কপটতার আবরণে আপনার ঘৃণিত উদ্দেশ্যসাধন করিয়া লইতে ব্যস্ত হইল, তখন চারু আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না. তাহার সমগ্র অন্তঃকরণটা সহিষ্ণুতার প্রতিকূলে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল, এবং মহিমকে স্বীয় সম্পত্তি দান করিতে প্রস্তুত না থাকিলেও স্বামীর মুখের উপর সেই কথাটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ন্যায় জানাইয়া দিল।

কিন্তু এই আকস্মিক উত্তেজনা শেষে যে তাহার মনে এতটা অবসাদ, এতটা গ্লানি আনিয়া দিবে. ইহা বুঝিতে পারে নাই, যখন বুঝিল, তখন সে নিজের মনের উপরেই না রাগিয়া থাকিতে পারিল না। ছি ছি, যেখানে তাহার কিছুমাত্র স্থান নাই, সেইখানেই সে নিজের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য এতটা জোর দেখাইয়া আপনার সকল গর্ব্ব, সকল অভিমানকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে? স্বামী নীচতা প্রকাশ করিতেছে বলিয়া সেও কি স্বামীর সমক্ষে আপনার নীচতাকে এমন ভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে? সম্পত্তি? হায়, যে জগতের সকল সুখ, সকল সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, এই তুচ্ছ সম্পত্তি তাহাকে কি সুখ দিতে পারিবে? এখন গর্ব্বের সহিত ইহাকে বিলাইয়া দিয়া যদি সে আপনার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তবে তাহাই কি শ্রেয়ঃ নয়? চারু স্থির করিল, সে উপযাচিকা হইয়া স্বামীকে এই সম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক স্বামীর হীন উদ্দেশ্যের সম্মুখে স্বীয় গৌরব প্রদর্শন করিবে।

কাপড় কাচিয়া উপরে আসিয়া চারু দেখিল, স্বামী চলিয়া গিয়াছে. শুধু দানপত্রের খসড়ার ছিন্ন কাগজগুলা মেঝের উপর ছড়ান রহিয়াছে। চারু সেগুলিকে একটি একটি করিয়া কুড়াইয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। বৃষ্টিশূন্য ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে আকাশ ভরা; আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে সেগুলা ক্রমেই কালো হইয়া জমাট বাঁধিতেছিল; ঠাণ্ডা বাতাসটা মেঘগম্ভীরা সান্ধ্য-প্রকৃতির বেদনা-জড়িত দীর্ঘশ্বাসের মত অবসন্নভাবে বহিয়া যাইতেছিল। বৈঠকখানার কার্নিশের উপর পায়রাগুলা ডানা গুটাইয়া স্তব্ধ ভাবে বসিয়াছিল। প্রকৃতি যেন সন্ধ্যার সকল সৌন্দর্য্য কাড়িয়া লইয়া পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া একটা বিষাদের যবনিকা টানিয়া দিতেছিল।

চারু কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর ছিন্ন কাগজগুলাকে জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। সেগুলা বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া যখন বিক্ষিপ্ত ভাবে মৃত্তিকা স্পর্শ করিল, তখন সে জানালার পাশ হইতে সরিয়া আসিয়া ঘরে আলো জ্বালিল।

সন্ধ্যার পর বেহারী জল খাইবার জন্য একবার বাড়ীর ভিতর আসে। কিন্তু আজ আর সে আসিল না, চাকর আসিয়া পান লইয়া গেল। চারু তাহার নিকট বাবুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বাবু বৈঠকখানায় আছেন। চাকরের হাতে পান দিয়া চারু একখানা বই লইয়া বসিল। পড়ায় তেমন মন না বসিলেও সে বই ছাড়িল না, জোর করিয়া তাহাতে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই চেষ্টায় খানিকটা সময় কাটিয়া গেলে চারু বই মুড়িয়া ঘড়ীর দিকে চাহিল, এবং যেন হতাশভাবে বলিয়া উঠিল, "সবে আটটা!" বই ফেলিয়া চারু শুইয়া পড়িল। কিন্তু এমন সন্ধ্যাকালে ঘুম আসিল না, খানিকক্ষণ এ পাশ ও পাশ করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং কাগজ-কলম লইয়া মহিমকে চিঠি লিখিতে বসিল। সে কাগজখানা ভাঁজ করিয়া সম্মুখে রাখিল এবং কলমে কালি লইয়া দুর্গা নাম কাঁদিয়া লিখিল—

"ঠাকুরপো, তুমি এবার এখান হ'তে যাওয়া অবধি আমি তোমাকে চিঠি লিখি নাই, লিখবার দরকারও হয় নাই। কিন্তু—"

এই 'কিন্তু'র পর যে এক্ষণে চিঠি লিখিবার কি কৈফিয়ৎ দিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। খানিক ভাবিয়া সে কাগজখানা ফেলিয়া দিল, এবং আর একখানা কাগজ লইয়া লিখিল—

"শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন,

ঠাকুরপো, এখান হ'তে গিয়ে অবধি তুমি চিঠি লেখ নাই কেন? তোমার চিঠি না পেয়ে—"

লেখা আট্‌কাইয়া গেল; চিঠি না পাওয়ায় তাহার কি ক্ষতি বা কষ্ট হইয়াছে. এবং সেই ক্ষতি

বা কষ্টের কথাগুলা কিরূপে প্রকাশ করিবে, তাহা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না। অগত্যা সে কাগজখানাকেও বাতিল করিয়া দিয়া অপর একখানা কাগজ লইল, এবং একটু ভাবিয়া তাহার মাথায় দুর্গা নামের পরিবর্তে 'প্রজাপতয়ে নমঃ' লিখিয়া আরম্ভ করিল—

"সবিনয়নিবেদনমিদং,

আগামী ২৫শে শ্রাবণ শুক্রবার মদীয় পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীল শ্রীযুক্ত বেহারীলাল মল্লিকের সহিত যাদবপুরনিবাসী ৺গিরিশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সরলা দাসীর শুভ পরিণয় হইবে। অতএব মহাশয় সবান্ধবে বৈকুণ্ঠপুরের বাটীতে শুভাগমন পূর্ব্বক উক্ত শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করাইবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

পুনশ্চ—ঠাকুরপো, এ বিবাহে মেয়ের মা কিছুই দিতে পারিবেন না। সুতরাং যৌতুকের ভার আমার উপরেই পড়িয়াছে। আমি আমার সম্পত্তিটা যৌতুকস্বরূপ দিব প্রথমবারে তুমি তোমার সর্ব্বস্ব দিয়াছিলে, এবারে কিছু দিতে পারিবে কি? কিছু দিতে না পারিলেও অবশ্য অবশ্য আসিবে। তুমি না আসিলে বিবাহের আনন্দ অসম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। ইতি।"

পত্রখানা শেষ করিয়া চারু ঘড়ীর দিকে চাহিল, দেখিল, দশটা বাজিয়াছে। সে পত্রখানা খামে পুরিয়া শিরোনামা লিখিল, তার পর সেখানা বালিসের নীচে রাখিয়া, কালি-কলম তুলিয়া দক্ষিণদিকের জানালাটা খুলিয়া দিল, বাহিরে গভীর অন্ধকার। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের একপ্রান্তে ক্ষীণদীপ্তি বিদ্যুৎ থাকিয়া থাকিয়া চমকিতেছিল। বৈঠকখানা হইতে তবলার চাটী আর হার্ম্মোনিয়মের সুরের সঙ্গে গলা মিশাইয়া কে একজন বেশ মিঠা গলায় গাহিতেছিল—

"যে যাহারে ভালবাসে, সে তাহারে পায় না কেন?"

চারু ধড়াস্ করিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল, এবং আলোর জোর কম করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রি এগারটা, বারটা, একটা বাজিয়া গেল, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। চারু বিছানায় পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। একবার উঠিয়া জানালা খুলিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। তখন বৈঠকখানার সঙ্গীতস্রোত নিরুদ্ধ হইয়াছে, রুদ্ধ গবাক্ষের অবকাশ দিয়া আলোকের ক্ষীণ রশ্মি বহির্গত হইতেছে। জানালাটা খুলিয়া রাখিয়াই চারু পুনরায় শুইয়া পড়িল। ঠাণ্ডা বাতাস তাহার মুখের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। চারু ঘুমাইয়া পড়িল।

নিদ্রিতাবস্থায় একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চারু জাগিয়া উঠিল। আলোকটা তখনও মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছিল, কিন্তু বাহিরের অন্ধকারটা আরও গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে নৈশ প্রকৃতির বক্ষে তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে, বিদ্যুতের তীব্রদীপ্তি উন্মুক্ত গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণালোক-প্রদীপ্ত কক্ষমধ্যে বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে। চারু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিতে গেল, জানালার কাছে যাইতেই লেলিহমান জ্বলন্ত সর্পজিহ্বার ন্যায় বিদ্যুৎ চমকাইয়া তাহার চোখ দুইটা যেন ধাঁধিয়া দিল। সে চোখ বুজিয়া কোনরূপে জানালাটা বন্ধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কড়-কড় করিয়া বাজ ডাকিয়া উঠিল, চারু কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, এবং পাশের বালিসটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ভিতর মুখ গুঁজিয়া দিল।

সকালে চারু স্নান-পূজা শেষ করিয়া কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, বেহারী জানালার ধারে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছে। চারু ঘরে ঢুকিলে বেহারী তাহার দিকে ফিরিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে তোমার দানপত্রটা মহিমের নামেই হচ্ছে?"

অন্যদিকে মুখ রাখিয়া চারু উত্তর দিল, "হাঁ।"

তীব্র ভ্রূকুটীর সহিত "বেশ" বলিয়া বেহারী মুখ ফিরাইয়া পুনরায় সিগারেটে টান দিতে লাগিল। হঠাৎ মুখ হইতে সিগারেট সরাইয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিন্তু এর ফলে কি হবে জান?"

চারু স্থির-স্বরে উত্তর করিল, "জানি, তুমি আবার বিয়ে করবে।"

বেহারী যেন চমকিয়া উঠিল, ঈষৎ ব্যগ্রস্বরে বলিল, "বিয়ে? কে তোমায় বল্‌লে?"

উত্তরে চারু স্বামীর মুখের দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল মাত্র। বেহারী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "সেইটাই কি ভাল হবে?"

"মন্দই বা কি?"

"তবু বিষয়টা ছাড়বে না?"

"দুটো এক সঙ্গে না ছেড়ে একটাই ছাড়লাম। জান তো সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে—"

ললাট কুঞ্চিত করিয়া বেহারী বলিল, "তোমার এ রকম ঘরকন্না করা পোষায় না, একটা টোল খুলে বস্‌লেই পারতে।"

"তাই করাই উচিত ছিল" বলিয়া চারু একটু গম্ভীর হাসি হাসিল। বেহারী তাহার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এমন সময় কালীতারা আসিয়া ডাকিলেন, "বেহারি।"

দগ্ধাবশেষ সিগারেটটা জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বেহারী গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিল, "কেন?"

কালীতারা বলিলেন, "হাঁ রে, শিবু ঠাকুরের ঘর-বাড়ী সব বেচে নিবি নাকি?"

বেহারী নিরুত্তরে ভ্রূভঙ্গী করিল। কালীতারা তাহা দেখিতে পাইলেন না, তিনি করুণার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "আহা, নিরীহ বামুন। না বেহারি, বামুনকে বাসচ্যুত করিস্ না।"

ক্রুদ্ধস্বরে বেহারী বলিল, "আমি ইচ্ছা ক'রে কাউকে বাসচ্যুত করি না।"

কালীতারা বলিলেন, "ইচ্ছাতেই হোক, অনিচ্ছাতেই হোক, বামুনের উপর জোর জুলুম করা ভাল নয়। জানিস্ তো, ব্রহ্মশাপে সগরবংশ ধ্বংস হয়েছিল।"

শ্লেষতীব্রকণ্ঠে বেহারী বলিল, "সে এই কলিযুগের বামুন নয়।"

ঈষৎ শঙ্কিতভাবে কালীতারা বলিলেন, "অমন কথা বলিস না বেহারি, হাজার কলি হ'লেও দেবতা-ব্রাহ্মণ চারকালই আছে, আর আমাদের তা মেনে চল্‌তেই হবে।"

বেহারী বলিল, "এত মান্‌তে গেলে জমীদারী রাখা চলে না।"

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে কালীতারা বলিলেন, "রেখে দে তোর জমীদারী। তোর কোন্ পুরুষে জমীদারী চালিয়েছে রে? ভাগ্যে বড়ঠাকুর বিষয়টা তোকে দিয়ে গিয়েছেন, তাই তুই জমীদারী নাড়া নিচ্ছিস। কিন্তু খবরদার বেহারি, জমীদারীর অছিলায় বামুনের উপর অত্যাচার কত্তে পারবি না।"

বেহারীও এবার রাগিয়া বলিল, "খাজনা বাকী পড়েছে, না দিলে ঘর-ভিটে বেচে নেব। এতে অত্যাচারটা কিসে হ'লো বল তো?"

কালীতারা দরজার বাহিরে ছিলেন, ভিতরে ঢুকিলেন, এবং বেহারীর দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কঠোর-স্বরে বলিলেন, "দেখ বেহারি, আমি মা, আমার কাছে মিছে কথা বলিস্ না। এতকাল বামুনের খাজনা বাকি পড়ে নি, আর তার বিধবা মেয়েটা দু'মাস ঘরে না আস্‌তেই তোর খাজনা বাকি প'ড়ে গেল? আমি সব শুনেছি বেহারি, বামুনের মেয়ের উপর অত্যাচার করলে ভাল হবে না, তা ব'লে রাখ্‌ছি।"

মাতার অভিশাপতুল্য ক্রোধগম্ভীরস্বরে বেহারীর প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল, মাথাটা নীচু হইয়া পড়িল। কালীতারা ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "গরীবের ছেলে তুই, বিষয় পেয়ে তোর মাথা বিগড়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি তোর সেই গরীব মা-ই আছি। তোর জমীদারী আছে, বিষয় আছে, টাকা আছে, কিন্তু আমার তুই ছাড়া আর কিছুই নাই বেহারি। আমি প্রাণ থাকতে তোকে এ সব কাজ কত্তে দেব না।"

কালীতারার কণ্ঠস্বর গাঢ়, চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল। মুখের উপর কাতরতার সহিত এমন একটা কঠোরতা প্রকটিত হইয়া উঠিল যে, বেহারী তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইল না, সে নত-মস্তকে পাশ কাটাইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। কালীতারা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সেই দিন কালীতারা যখন শুনিলেন যে, মহিমের পরিবর্ত্তে বেহারী নিজেই সরলাকে বিবাহ করিবে, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি বেহারীকে ডাকাইয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই নাকি আবার বিয়ে করবি?"

বেহারী অম্লানমুখে উত্তর দিল, "কাজেই।"

উত্তর শুনিয়া কালীতারা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তার পর ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুই এক কাজ কত্তে পারবি বেহারি?"

বেহারী বলিল, "কি কাজ?"

কালীতারা বলিলেন, "বিষয়-সম্পত্তি সব মহিমকে ফিরিয়ে দে।"

"কেন দেব?"

"তোর মার হুকুম।"

"আমি কারো অন্যায় হুকুম শুনতে পারি না।"

একটু ভাবিয়া কালীতারা বলিলেন, "আচ্ছা,

আর একটা ন্যায্য হুকুম বোধ হয় শুনতে পারবি? আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে।"

বেহারী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "বেশ।"

কালীতারা বলিলেন, "শুধু বেশ নয়, তা হ'লে আজ তার বন্দোবস্ত কর, আমি কালই যাচ্চি।"

চিন্তিতভাবে বেহারী বলিল, "কিন্তু কা'ল গেলে চলবে কেমন ক'রে?"

তীব্রকণ্ঠে কালীতারা বলিলেন, "তুই জমীদার, তোর ধনবল লোকবল আছে, গরীব মায়ের তরে তোর কিছুই আট্‌কাবে না।"

ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বেহারী বলিল, "কিন্তু তুমি রাগ ক'রে যাচ্চো, রাগের উপর তোমাকে পাঠাতে পারি না।"

গম্ভীরভাবে কালীতারা বলিলেন, "বেশ, তুই না পারিস, আমি মহিমকে চিঠি লিখে দিচ্চি, সে কক্ষণো 'না' বলতে পারবে না, নিজে গিয়ে আমাকে রেখে আসবে।"

বলিয়া কালীতারা দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। বেহারী ম্লানমুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

চারু এতক্ষণ ঘরের বাহিরে ছিল, এক্ষণে সে ঘরে ঢুকিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "ভয় কি, মা যে'ত চাইচেন, যান না, আমি তো আছি।"

বেহারী তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। চারু ভ্রূ নাচাইয়া ঘাড় দোলাইয়া বলিল, "সত্যি বলছি, তুমি একটুও ভেবো না, বিয়ের যত ভার আমার।"

বেহারী বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া চারুর মুখের দিকে চাহিতেই চারু হাসিতে হাসিতে কক্ষ ত্যাগ করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বর্ষার অলস সন্ধ্যা মেসের কক্ষটাকে নিতান্ত গম্ভীর করিয়া তুলিল, এবং কক্ষের প্রত্যেক জিনিসটাই নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, তখন মহিম বিরক্তভাবে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া সতীশের কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু সতীশ তখন বাহির হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে খানিকক্ষণ তাহার বইগুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিল। পাশের ঘরে তখন আর সকল ছাত্র জমায়েৎ হইয়া গল্প ও হাস্যের উচ্চরোলে ঘরখানাকে জমাইয়া তুলিয়াছিল। মহিম সে ঘরে ঢুকিল না, সে ঘরের দরজা অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল। নীচে তখন উনান ধরাইবার গোলযোগ লইয়া ঝিয়ের সহিত বামুন ঠাকুরের তুমুল বিবাদ চলিতেছিল। বামুনঠাকুর উচ্চকণ্ঠে ঝিকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন যে, তিনি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামের বিখ্যাত কুলীনবংশকে উজ্জ্বল করিয়াও কেবল অদৃষ্ট-দোষেই এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার কিসের অভাব? তাঁহার পায়ের ধূলা পাইলে কত বড় বড় কুলীন উদ্ধার পায়, তিনি কি ঝির ন্যায় হীনকুল-জাতা রমণীর কথা সহ্য করিতে পারেন? ঝিও ইহার উত্তরে সগর্ব্বে জানাইয়া দিতেছিল যে, ঝির কাজ করিলেও সেও নিতান্ত হীনবংশসম্ভূতা নহে। তাহার বাপ দুইখানা হাল লইয়া চাষ করিত, শ্বশুরেরও দুইটা খেয়াঘাট জমা ছিল। কিন্তু অদৃষ্টদোষে যদি অকালে বিধবা না হইবে, এবং মুখপোড়া গোপাল চক্রবর্ত্তী তাহাকে সুখের প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক কলিকাতার রাজপথে আনিয়া নিঃসহায়ভাবে ছাড়িয়া দিয়া না পলাইবে, তবে তাহার আজ এমন দুর্গতি হইবে কেন? নতুবা তাহাকে কি আজ সাত টাকা মাহিনার রাঁধুনী বামুনের মুখঝামটা সহ্য করিতে হয়? সকলই অদৃষ্ট। পোড়া বিধাতার কি বিচার আছে? ইত্যাদি।

উভয়ের এই সগর্ব্ব আক্ষেপোক্তি শুনিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে মহিম মেসের বাহির হইয়া পড়িল, এবং বিপিন বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। কিন্তু অর্দ্ধেক সিঁড়ি অতিক্রম না করিতেই সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। উপরের ঘরে বসিয়া সতীশ তখন গাহিতেছিল—

"আমি তোমারি, আমি তোমারি।
এ দীন হৃদয়মাঝে তোমারি মুরতি রাজে,
তোমারি দ্বারেতে আমি দীন ভিখারী,
আমি তোমারি, তুমি আমারি।"

মহিম রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। গানের প্রতি কথা, প্রত্যেক ঝঙ্কার শাণিত তীরের ন্যায় আসিয়া তাহার অন্তরকে বিদ্ধ করিতে থাকিল, সুরটা কঠোর বজ্রধ্বনির ন্যায় কানের ভিতর বাজিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, দুড়-দুড়

করিয়া নীচে নামিয়া এমনই বেগে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল যে, একখানা জুড়ী যে বেগে আসিয়া তাহার সম্মুখে পড়িয়াছে, তাহা আদৌ লক্ষ্য করিতে পারিল না। গাড়ীর কোচম্যান ও মহিমের সমবেত চীৎকারে সচেতন হইয়া যখন মুখ তুলিল, তখন কোচ-ম্যানের প্রাণপণ চেষ্টায় রশ্মি আকর্ষণে ঘোড়া দুইটা ঠিক তাহার মাথার উপরই সম্মুখের পা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। মহিম ছুটিয়া অপর পাশের ফুটপাথে উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেল, মহিম জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কম্পিতপদে মেসের দিকে চলিল। পাশে বিড়ীর দোকানে বসিয়া একজন ছোকরা গাহিয়া উঠিল—

"ভালবাসতে গিয়ে কাঁদ্‌বো কেন সই।"

মহিম ভ্রূকুটী করিয়া দ্রুতপদে মেসের দরজায় উপস্থিত হইতেই দেখিল, নগেন সান্ধ্যভ্রমণোপযোগী বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া দরজার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মহিমকে দেখিয়াই সে সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "এমন সময় কোথায় গিয়েছিলে মহিম বাবু?"

কর্কশকণ্ঠে মহিম উত্তর করিল, "চুলোয়।"

হাসিয়া নগেন বলিল, "চুলোয় তো তুমি দিন-রাতই যাচ্চো। একটু ভাল যায়গায় বেড়িয়ে আসি চল না। যাবে?"

"চল" বলিয়া মহিম তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল, এবং তাহাকে টানিয়া রাস্তায় নামিল।

পথে যাইতে যাইতে নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মহিম বাবু, সতীশের রকমটা কি বল তো? দিন নাই, রাত নাই, সকালে, সন্ধ্যায়, দুপুরে পাশের বাড়ীতে যাচ্চে, গান-বাজনা চালাচ্চে, ব্যাপারটা কি?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া মহিম উত্তর করিল, "কি জানি।"

নগেন বলিল, "আমি কিন্তু শুন্‌চি, ঐ মেয়েটিকে বিয়ে কর্‌বার জন্ত সতীশ উঠে পড়ে লেগেছে। রমেশ বাবুও বল্‌ছিল, বিয়ের কথাবার্ত্তাও না কি চল্‌ছে।"

"মিথ্যা কথা" বলিয়া মহিম তাহার হাতটা এত জোরে আকর্ষণ করিল যে, নগেন যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া উঠিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে উভয়ে ক্রমে হাড়কাটার গলিতে উপস্থিত হইল। নগেন দুই ছড়া বেলফুলের মালা কিনিয়া এক ছড়া মহিমের গলায় দিল, একছড়া নিজে হাতে জড়াইল। তার পর সে মহিমের হাত ধরিয়া দ্রুতপদে একখানা বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। সে পল্লীটা কিরূপ, বাড়ীটা কাহার, তাহা বুঝিতে মহিমের বাকি রহিল না। বুঝিলেও সে কোন আপত্তি করিল না, নগেনের হাতে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বিনা প্রতিবাদে বাড়ীতে ঢুকিল।

সেখানে গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ খুব চলিল। তার পর আমোদের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্ত বোতলের আবির্ভাব হইল। নগেন পাত্র পূর্ণ করিয়া নিজে খাইল, এবং মহিমের হাতে দ্বিতীয় পাত্র দিল। মহিম পাত্রটি আস্তে আস্তে এক পাশে নামাইয়া রাখিল, এবং নগেনের উপর একটা কোপতীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নগেন তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। মহিম সবলে তাহার হাত হইতে নিজের হাতটা ছিনাইয়া লইয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

যখন মেসে পৌছিল, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। তেতালার সিঁড়িতে উঠিতে যাইতেই দেখিল, সতীশ সিঁড়ির কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মহিম যেন মুহূর্ত্তের জন্ত একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটাকে দূর করিয়া দিয়া জোরে জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলি?"

মহিম রুক্ষস্বরে উত্তর দিল, "যমালয়ে।"

উত্তর দিয়াই সে দ্রুতপদে উঠিয়া গেল। সতীশ একটু বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে তাহার অনুসরণ করিল।

উপরে উঠিয়া সতীশ দেখিল, মহিম শুইয়া পড়িয়াছে, ঘরে আলো পর্য্যন্ত জ্বালে নাই। সতীশ দেশালাই খুঁজিয়া লইয়া আলো জ্বালিল, তার পর চেয়ারখানাকে বিছানার কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাতে বসিল। মহিম ঘুমায় নাই, সে চোখ মুদিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। সতীশ একটু বসিয়া থাকিয়া ডাকিল, "মহিম।"

মহিম একবার চোখ চাহিয়াই আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গিয়ে-ছিলি?"

মহিম চোখ না চাহিয়াই উত্তর করিল, "নগেনের সঙ্গে বেড়াতে।"

সতীশ চমকিয়া উঠিল, বলিল, "নগেনের সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলি?"

মহিম বেশ সহজ স্বরেই উত্তর দিল, "হাড়কাটার গলিতে, একটা মেয়েমানুষের বাড়ী।"

সতীশের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মহিম ঈষৎ শ্লেষপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "চুপ ক'রে রইলে যে?"

সতীশ বলিল, "তুই মিথ্যা বলেছিস।"

সহাস্যে মহিম বলিল, "এক বর্ণও মিথ্যা নয়। বিশ্বাস না হয়, নগেনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পার। ডাকবো?"

বলিয়া মহিম উঠিয়া বসিল। সতীশ তাহার মুখের উপর তিরস্কারসূচক দৃষ্টিস্থাপন করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "আর তোমাকে এতটা সৎসাহস দেখাতে হবে না।"

ঈষৎ হাসিয়া মহিম বলিল, "তাই ব'লে আমি এমন কাপুরুষ নই যে, আর সকলের মত মন্দ কাজ ক'রে সেটাকে গোপন রাখবার চেষ্টা করব।"

ভ্রূকুটী করিয়া সতীশ বলিল, "তুই একেবারে অধঃপাতে গিয়েছিস্ মহিম।"

মহিম বলিল, "যা করতে হবে, তা সম্পূর্ণ রকমেই করা ভাল।"

কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাকভাবে থাকিয়া সতীশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এইটাই কি শেষে তোর জীবনের উদ্দেশ্য হ'লো?"

মহিমের হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানা সহসা বিবর্ণ হইয়া আসিল। সে সতীশের মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "উদ্দেশ্যটা যদি আমার হাতে রাখবার ক্ষমতা থাকতো সতীশ, তা হ'লে আজ আমার জীবনটা অন্য রকমে গড়ে উঠতো। কিন্তু আমি বরাবর দেখে আস্ছি, যখনই আমি একটা উদ্দেশ্য ধ'রে জীবনটাকে সোজা পথে চালাতে যাই, তখনই একজন না একজন মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে সম্পূর্ণ নিষ্ফলতার পথে চালিয়ে দেয়। কেন বল দেখি?"

সতীশ বলিল, "সে তোর অদৃষ্ট। কিন্তু তাই ব'লে আত্মহত্যা করা বুদ্ধিমানের উচিত নয়।"

তীব্রকণ্ঠে মহিম বলিল, "বন্ধুবান্ধবের অনিষ্ট করার চাইতে নিজের অনিষ্ট করা খুব ভালো মনে করি। এতে তুমি আমাকে নির্ব্বোধ বলতে পার, কিন্তু আমি কোন দিনই তোমার মত বুদ্ধিমান্ হ'তে চাই না।"

বলিয়া মহিম ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সতীশের মুখের উপর ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় শুইয়া পড়িল। সতীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

একটু পরে ঝি আসিয়া আহারের জন্য ডাক দিলে মহিম ক্ষুধার অভাব জানাইয়া তাহাকে বিদায় করিল। ঝি চলিয়া গেলে সে উঠিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল, এবং পাশের জানালাটা খুলিয়া দিয়া চেয়ারখানা জানালার পাশে টানিয়া বসিল। আকাশে তখন মেঘ ছিল না, তরল জ্যোৎস্নাধারায় পাশের ছাদটা ভরিয়া উঠিয়াছিল, ছাদের কোনে টবে ছোট একটা যুঁইফুলের গাছে গোটাকতক ফুল ফুটিয়াছিল, ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে তাহার মিষ্ট গন্ধটুকু ভাসিয়া আসিতেছিল। বাড়ীর ভিতর হইতে তখনও হার্ম্মো-নিয়মের সুর উত্থিত হইতেছিল, আর তাহারই সঙ্গে হেমলতার অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি একটু একটু শোনা যাইতেছিল। হেমলতা গাহিতেছিল—

"ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি।
রেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি।
তুমি এস হৃদি এস, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্যজ্যোতি।"

কোমল কণ্ঠ হইতে এই করুণ সুর উত্থিত হইয়া কাহাকে আহ্বান করিতেছে? কোন্ হৃদয়বল্লভের উদ্দেশে কনক-মন্দিরে কমলাসন বিস্তৃত করিয়া আকাঙ্ক্ষা-কাতর হৃদয় সকাতরে ডাকিতেছে—এস হৃদি এস হৃদয়েশ! মহিম আস্তে আস্তে গিয়া বিছা-নায় শুইয়া পড়িল। তন্দ্রার ঘোরেও সে শুনিতে পাইল—কে যেন করুণ রাগিণীতে কাতর আহ্বানের সুরে দয়িতকে ডাকিতেছে—"তুমি এস হৃদি এস, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ!"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে একটা অনুশোচনায় মহি-মের হৃদয়টা ভরিয়া উঠিল। ছি ছি, সে করিয়াছে কি। সামান্য উত্তেজনার বশে সে আপনার চরিত্র-টাকে এমনই দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিল যে, তাহা স্মরণ করিতেও তাহার অন্তরটা নিদারুণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কেবলতাদের

বাড়ীর দিকের জানালাটা খোলা ছিল, তাড়াতাড়ি সেটা বন্ধ করিয়া দিয়া মহিম বিছানার উপর আসিয়া বসিল।

ক্রমে অনেকটা বেলা হইল। নীচে হইতে ছাত্রদের কাহারও পড়ার শব্দ, কাহারও চা-পানের উৎসাহপূর্ণ কলরব, কাহারও বা সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইয়া কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল, তথাপি মহিম বিছানা ছাড়িয়া উঠিল না। জানালার ফাঁক দিয়া রোদ আসিয়া ঘরে ঢুকিল, মহিম জোর করিয়া চোখ টিপিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার মনে হইল, রাত্রিতে আকস্মিক উত্তেজনার বশে সে যে দুষ্কার্য্য-সাধন করিয়া আসিয়াছে, তাহার গুরুভারে হৃদয়টা এমনই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, সে অবসাদকে ঠেলিয়া সে বুঝি আর উঠিতে পারিবে না। অন্ততঃ ছেলেরা কলেজে যাইবার পূর্ব্বে সে তো ঘরের দরজা খুলিবেই না।

ছাদে কাহার পায়ের শব্দ শুনা গেল। মহিম জোরে চোখ বুজিয়া পাশের বালিসটা জড়াইয়া ধরিল। সতীশ দরজার কাছে আসিয়া ডাকিল, "তোমার দু'খানা চিঠি এসেছে মহিম।"

বলিয়া সে দরজাটা একটু ঠেলিয়া চিঠি দুইখানা ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিল। তার পর পুনরায় দরজা ভেজাইয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেল। তার পায়ের শব্দ মিলাইয়া গেলে মহিম আস্তে আস্তে উঠিল, এবং দরজা খুলিয়া চিঠি দুইখানা কুড়াইয়া লইল। খামের শিরোনামায় হস্তাক্ষর দেখিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। এ কি, এ যে চারুর হস্তাক্ষর! সে তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়িয়া রুদ্ধশ্বাসে চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিল। সেখানা চারুর পত্র। পত্র পড়িয়া মহিম মাথায় হাত দিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

দাদা আবার বিবাহ করিবে, চারু সেই জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। এই নিমন্ত্রণ, না বিদ্রূপ? বিদ্রূপই নিশ্চয়। বেহারী তাহারই জন্য সরলার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিল, কিন্তু সে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতেই বেহারী নিজে বিবাহ করিতেছে। তাই চারুর এই কঠোর বিদ্রূপ। কি ভীষণ সংবাদ! গ্রহ-নক্ষত্র সমেত সমগ্র আকাশটা ভাঙ্গিয়া যেন মহিমের মাথায় চাপিয়া পড়িল। তাহার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মহিম দুই হাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিল।

তার পর এ বিবাহে চারু আপনার সমগ্র সম্পত্তি – জমীদারীর অর্দ্ধাংশ স্বামীকে যৌতুক দিতেছে। ইহা যৌতুক, না আত্মবলি? চারু কেন এমন কাজ করিল? কেন এ বিবাহে সম্মতি দিল? অথবা তাহার সম্মতি অসম্মতিতে কি আসে যায়? দাদা যদি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া বিবাহ করেন, সে তবে স্ত্রীলোক, কিরূপে তাহার প্রতিরোধ করিবে? উঃ, এই লোকটার নিষ্ঠুরতা কি ভয়ানক! চারুর ন্যায় স্ত্রীর উপর এতটা অত্যাচার মানুষ হইয়া কেহ কি করিতে পারে? এ অত্যাচারের কি প্রতীকার নাই? মহিমের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল।

এবার মহিম দ্বিতীয় পত্রখানা খুলিয়া পাঠ করিল। সেখানা কালীতারার পত্র। পত্রখানা সংক্ষিপ্ত। তাহাতে এই বিবাহের কোন কথাই ছিল না। শুধু সংক্ষেপে লেখা ছিল, "মহিম, আমি কাশী যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি আমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। বুধবারের সকালের গাড়ীতে এখান হইতে রওয়ানা হইব। তুমি হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিও।"

পত্র পড়িয়া মহিম বিস্মিত হইল। খুড়ীমা হঠাৎ কাশী যাইতেছেন কেন? সম্ভবতঃ পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারেই ব্যথিত হইয়া তিনি কাশীবাসের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহাই সম্ভব, নতুবা এত লোকজন থাকিতে, দাদা নিজে থাকিতে তাহাকে এ অনুরোধ কেন? তাহা হইলে দাদা শুধু চারুর উপর অত্যাচার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, খুড়ীমার প্রতিও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন? অথবা চারুর উপর নিদারুণ অত্যাচারে ব্যথা পাইয়াই খুড়ীমা পুত্রের সংস্রব ত্যাগ করিতেছেন, দাদার পুনরায় বিবাহের অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি চলিয়া আসিতেছেন। তিনি চলিয়া আসিলেন, কিন্তু চারু তো আসিতে পারে না? উঃ কি দুর্ভাগ্য এই মেয়েটার!

এই মেয়েটার সঙ্গে বাল্যক্রীড়ার কথা মহিমের মনে পড়িল, তাহার মান অভিমান, আদর-আব্দারের স্মৃতি একে একে মনের ভিতর ছবির মত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তখন এই চারু প্রভাতের পুষ্পকোরক মাত্র: প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া এই ক্ষুদ্র কোরকটি যখন আপনার মাধুর্য্য বিস্তার করিত, তখন কেহ কি জানিত যে, ইহার পুষ্প-জীবনের মধ্যে এত বড় একটা অভিসম্পাত লুকায়িত আছে? তখন মহিম কত আগ্রহেই এই কোরকটির

দিকে আশাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করিত। তখন কে জানিত, তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ জীবনের এমনই নিদারুণ পরিণতি হইতে পারিবে।

হঠাৎ মহিমের মনে পড়িল, কা'ল বুধবার, কা'ল খুড়ীমা আসিবেন। তিনি আসিয়া অন্ততঃ দুই এক দিনও তো কলিকাতায় থাকিবেন, ট্রেণ হইতে নামিয়াই তৎক্ষণাৎ অন্য ট্রেণে উঠিবেন না, উঠিতে দেওয়াও উচিৎ নয়। সুতরাং তাঁহাকে দুই এক দিন রাখিবার জন্য একখানা ছোট খাট বাড়ী ঠিক করিয়া রাখা দরকার। কথাটা মনে পড়িতেই মহিম ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কাপড় ছাড়িয়া পাঞ্জাবীখানা গায়ে দিয়া কিছু টাকা লইবার জন্য ট্রাঙ্ক খুলিল। উপরকার কাপড় জামাগুলা সরাইয়া দেখিল, পাঁচখানা নোট মজুদ আছে। বাড়ীভাড়ায় ও খুড়ীমার দুই চারি দিন থাকিবার খরচে তিনখানা নোট যাইতে পারে। বাকী থাকে দুইখানা। এই কুড়ি টাকায় কি কাশী যাতায়াতের খরচা কুলাইবে? আসিবার খরচেরই বা প্রয়োজন কি? নাই বা ফিরিয়া আসিল? কি জন্যই বা আসিবে? সেখানে কি একটা কাজকর্মের যোগাড় করিতে পারিবে না? যদি পারে, তবে খুড়ীমার কাছে থাকিয়া স্বচ্ছন্দেই তো দিন কাটাইয়া দিবে। খুড়ীমাও যে আর ফিরিয়া আসিবেন, এমন বোধ হয় না, সুতরাং সেই বা কেন ফিরিয়া আসিবে?

বাড়ী ভাড়ার জন্য তিনখানা নোট পকেটে রাখিয়া বাকী নোটগুলা তুলিতে যাইতেই মহিমের মনে পড়িল, ট্রাঙ্কের তলায় বিছান খবরের কাগজের নীচে আরও দুইখানা নোট আছে। সে বিপিন বাবুর নিকট অগ্রিম বেতনস্বরূপ যে ত্রিশ টাকা পাইয়াছিল, সতীশ জোর করিয়া তাহার দশটাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছিল, বাকী দুইখানা নোট সে খরচ করে নাই, সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল। খবরের কাগজখানা তুলিতেই সেই নোট দুইখানা বাহির হইয়া পড়িল। তাহা হাতে করিয়া তুলিতে মহিমের হাতখানা যেন কাঁপিয়া উঠিল, তখনও সেই কাগজ দুইখানার মধ্য হইতে হেমলতার হস্তের মৃদু সৌরভ আসিয়া মহিমের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যেন আমোদিত করিতে লাগিল। মহিম সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিতেই অন্তরে যে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা অনুভব করিল, তাহাতে সে আর নোট দুইখানাকে হাতে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, ত্রস্তকম্পিত-হস্তে তাহাদিগকে ট্রাঙ্কের ভিতর ফেলিয়া দিল। উঃ, কলঙ্কমলিন হস্ত লইয়া সে কি এই পবিত্র হস্তের দান স্পর্শ করিবার যোগ্য? ইহা যে দেবতার স্পর্শপূত নির্ম্মাল্য, এ নির্ম্মাল্য হাতে লইবার সামর্থ সে যে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এখন ইহা তাহার স্পর্শে অশুচি হইয়া তাহার মস্তকে দেবতার জ্বলন্ত অভিশাপ বর্ষণ করিবে! উঃ সেই এক দিন, আর এই এক দিন। সে দিন সে আশার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া জীবনটাকে সুখস্বপ্নের চিত্রের মত মনোহর দেখিয়াছিল, আর আজ নৈরাশ্যের তমোময় কূপগর্ভে নিপতিত হইয়া আপনার চরিত্রের পূতিগন্ধে আপনিই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। মহিমের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে জলভারাকুল দৃষ্টিতে সেই নোট দুইখানার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সহসা পদশব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই দরজার উপর সতীশকে দেখিয়া মহিম ব্যস্তভাবে অশ্রু-ভারাক্রান্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। সতীশ ধীরে ধীরে ভিতরে আসিয়া সহাস্যস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সকালবেলাই কাপড়চোপড় গোছান হচ্ছে যে? কোথাও যেতে হবে না কি?"

মহিম অশ্রু রোধ করিয়া কোন প্রকারে উত্তর দিল, "হাঁ।"

সতীশ তক্তাপোষের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কত দূর যেতে হবে? বৃন্দাবন?"

এক একখানা করিয়া কাপড় জামাগুলা ট্রাঙ্কে তুলিতে তুলিতে মহিম গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "না, কাশী।"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে আমার অনুমান অনেকটা কাছাকাছি গিয়েছে।"

বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতে গান ধরিল,—

"এবার আমি যাব কাশী.
যাব কাশী তাই প্রকাশি,
কাশীধামে যাব, সদানন্দে রব,
আর কি আমি ফিরে আসি।"

মহিম বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূকুটী করিয়া খুড়ীমার পত্রখানা তাহার দিকে ছুড়িয়া দিল। সতীশ পত্রখানা তুলিয়া লইয়া তাহা পাঠ করিয়া বলিল, "ওঃ তাই বল,

খুড়ী-মা কাশী যাচ্ছেন। আমি ভেবেছিলাম, তুই বুঝি কাশীবাসী হবি।"

মহিম নিঃশব্দে কাপড়-চোপড় তুলিয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "ফির্তে কত দেরী হবে?"

"এখন সে কথা কেমন ক'রে বল্‌বো?"

"তবু? আট দিন?"

"বেশীও হ'তে পারে।"

"কত বেশী? দশ দিন—বারো দিন?"

"দশ মাসও যে হবে না, তাই বা কে বল্‌তে পারে?"

"তা বলা যায় না সত্য, কিন্তু—"

বলিয়া সতীশ মহিমের মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মহিম সে দৃষ্টিতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সহজ স্বরে বলিল, "এর মধ্যে কিন্তু কিছুই নাই। তবে শোন্ সতীশ, খুব সম্ভব ফির্‌বো না।"

তাহার স্বরের দৃঢ়তায় চমকিত হইলেও মুখে খুব তাচ্ছীল্যের ভাব দেখাইয়া সতীশ হাসিয়া বলিল, "একেবারেই না?"

"না।"

"সত্যি? মাইরি?"

মহিম তাহার মুখের উপর গভীর বিরক্তিপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া আলনার গায়ে ঝুলান ছাতাটা লইতে উদ্যত হইল। সতীশ বাধা দিয়া বলিল, "শোন্ শোন্, কোথায় যেতে হবে এখন?"

"একখানা বাড়ী দেখতে হবে।"

"খুড়ীমার তরে?"

"হাঁ।"

"আজই বাড়ী কোথায় পাবি?"

"যেখানে পাই, যোগাড় কর্ত্তেই হবে।"

"আচ্ছা, সে ওবেলা দেখা যাবে। এখন যা বল্‌ছিলাম সত্যই তুই আর ফির্‌বি না?"

ক্রুদ্ধস্বরে মহিম বলিল, "না, না, না। এখন নিশ্চিন্ত হয়েছ তো?"

একটু নিশ্চিন্তভাবে সতীশ বলিল, "নিশ্চিন্ত কি রকমে হ'তে পারি, তা হ'লে হেমলতার—"

মহিম গ্রীবা উন্নত করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, রোষদৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "দেখ সতীশ, আমি বন্ধুত্ব কা'কে বলে, তা জানি, কিন্তু তোর মত কপটতা জানি না। ছিঃ!"

এই ধিক্কারে সতীশের মুখখানা যেন এতটুকু হইয়া হইয়া গেল। সে মাথা নীচু করিয়া গভীর বেদনা জড়িত স্বরে বলিল, "তা হ'লে আমিই তোকে দেশ-ত্যাগী কর্‌লাম মহিম।"

বলিয়া সে জোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। মহিম তাহার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া একটু কোমল-স্বরে বলিল, "তোমার দোষ কি সতীশ, আমার অদৃষ্টটা এইরূপ নিষ্ফলতার উপাদানেই গড়া। আমি কোন দিন কারো সুখের হন্তারক হ'তে চাই না।"

গদ্‌গদ-কণ্ঠে সতীশ বলিল, "তা আমি জানি মহিম, সেই জন্যই তুই আজ বাপের ত্যাজ্যপুত্র অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হয়েও পথের ভিখারী।"

গর্ব্বপ্রফুল্লকণ্ঠে মহিম বলিল, "তার জন্য আমি একটুও দুঃখিত নই সতীশ। আমি প্রার্থনা করি, হেমলতাকে নিয়ে তুমি সুখী হও।"

মহিমের হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সতীশ বলিল, "তোর এই আত্মত্যাগের পুরস্কার কি, তা জানি না মহিম। এ ত্যাগের পুরস্কার ইহলোকে নাই, কিন্তু সেই লোকে আছে, যেখানে প্রণয়ে বিচ্ছেদ নাই, সুখে দুঃখ নাই, যেখানে পরের দুঃখ পরে বুঝে—"

চাপা হাসিতে সতীশের মুখখানা ফুলিয়া উঠিল। উচ্ছ্বাসিত হাস্যবেগ কিছুতেই আর দমন করিতে না পারিয়া সে এমনই উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল যে, ছাদের আলিসার উপর কয়েকটা কাক বসিয়াছিল, তাহারা ভয়ে কা কা শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া পলাইল। মহিম লজ্জায় মুখখানা লাল করিয়া নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। সতীশ হাসিতে হাসিতে তাহার বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কালীতারা যখন কাশীযাত্রার জন্য ব্যস্ত হইলেন, তখন চারু সাগ্রহে তাহার সকল উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া দিল, তাঁহার যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার সমস্তই একে একে গুছাইয়া দিল। তাহার এই আগ্রহ ও ব্যস্ততা দর্শনে কালীতারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাহার এই আগ্রহের মধ্যে যে একটা গভীর

বেদনা লুক্কায়িত আছে, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। সে যে কার্য্যতৎপরতা দিয়াই সেই বেদনাটাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সংসারের এই অশান্তি হইতে তাঁহাকে দূরে রাখিবার জন্য একটা অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় মনটাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে বধূকে সান্ত্বনা দিয়া গৃহস্থালী সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। চারু কিন্তু নিজের জন্য সান্ত্বনার কোনই প্রয়োজন নাই, ইহাই বুঝাইবার অভিপ্রায়ে শ্বশ্রূকে বলিল, "আমাদের জন্য তুমি কিছু ভেবো না মা, আমাদের এক রকমে চ'লে যাবে।"

একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া কালীতারা বলিলেন, "ভাবনা আমার কারো তরে নাই মা, শুধু তোর কি হবে, তাই ভাবছি।"

হাসিয়া চারু বলিল, "তুমি মা যেন কি? আমি কচি খুকী না কি যে, আমার তরে তোমার এত ভাবনা? আমি বল্‌ছি মা, আমার একটুও কষ্ট হবে না।"

বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে কালীতারা বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় তাই হোক মা, তুই আমার রাজরাণী হয়ে সুখে থাক্।"

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে কালীতারা যখন যাত্রা করিয়া ঘরের বাহির হইলেন, তখন চারু আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, কালীতারাকে প্রণাম করিতে গিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। কালীতারা তাহার মাথায় হাত দিয়া স্নেহ-সজলকণ্ঠে বলিলেন, "এমন সময়ে কেন ধৈর্য্যহারা হ'লি মা?"

"তুমি সত্যিই চল্লে মা" বলিয়া চারু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার দুই চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারা গড়াইতে লাগিল। কালীতারা নিজের আঁচল দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে অশ্রুপ্লুত কণ্ঠে বলিলেন, "তুই তো নিজেই বল্‌ছিস্ চারু, তোর কোন কষ্ট হবে না।"

তাঁহার মুখের উপর অশ্রুকাতর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া চারু আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "তোমায় ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হবে না? আমার আর কে আছে মা?"

কালীতারা অঞ্চলে স্বীয় নেত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিলেন, "কিন্তু এ কথা আগে কেন বল্‌লি না চারু?"

চারু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুর প্রবল বেগ রোধ করিতে প্রয়াস পাইল। কালীতারা কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তবে থাক্ চারু, তোকে ফেলে আমি যেতে পারবো না।"

চারু বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ব্যস্ত-হস্তে চোখ দুইটা মুছিয়া, অশ্রুমলিন-মুখে জোর করিয়া একটা দৃঢ়তা আনিয়া সতেজকণ্ঠে বলিল, "না মা, তুমি যাও, আর কাঁদ্‌ব না।"

কালীতারা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিলেন। চারু কাপড়ে ভাল করিয়া মুখখানা মুছিয়া, একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ছেলে মেয়ে কি সহজে মা-বাপকে ছেড়ে দিতে চায়?"

কালীতারাও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বিশেষ তোর মত পাগল মেয়ে।"

অতঃপর তিনি বাহিরের দিকে উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বেহারী কৈ এখনো এলো না?"

ভৃত্য আসিয়া জানাইল, বাবু এখনো ঘুমাইতেছেন।

বেলা আটটার সময়েও বেহারীর ঘুম ভাঙ্গে নাই; সুতরাং ইহা যে কপট নিদ্রা, তাহা বুঝিতে কালীতারার বিলম্ব হইল না। এ দিকে গাড়ীর সময় বহিয়া যায়। সুতরাং কালীতারা আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বধূকে সান্ত্বনা দিয়া গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন। বাহিরে গরুর গাড়ী ছিল, তাহাতে উঠিয়া বসিয়া একবার ব্যাকুল দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত গৃহের দিকে চাহিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কলিকাতা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য একজন ভৃত্য সঙ্গে চলিল।

চারু নিজের ঘরে আসিয়া বাহিরের দিকের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সেখান হইতে রাস্তাটা অল্প দেখা যায়। চারু জানালার গরাদে ধরিয়া সতৃষ্ণ-দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। কালীতারা গাড়ীর ছইয়ের ভিতর বসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখা না গেলেও গাড়ীখানা দেখা গেল, এবং দেখিতে দেখিতে মোড় ঘুরিয়া তাহা অদৃশ্য হইল। চারু কিন্তু নড়িল না, স্থির অপলক দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"মা চ'লে গেলেন চারু ?"

চমকিতভাবে চারু ফিরিয়া চাহিল। বেহারী ঘরের ভিতর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা চ'লে গেলেন ?"

চারু জানালার কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া উত্তর দিল, "হাঁ।"

বেহারী ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "আমার সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত ক'রে গেলেন না ?"

চারু বলিল, "তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে-ছিলেন। কিন্তু তোমার ঘুম ভাঙ্গে নি শুনে—"

মুখখানা বিকৃত করিয়া বেহারী বলিল, "আমি সারাদিনই ঘুমাব নাকি ?"

চারু বলিল, "গাড়ীর সময় হয়ে এল, কাজেই আর অপেক্ষা কত্তে পারলেন না।"

"বটে" বলিয়া বেহারী চৌকীখানা টানিয়া জানালার ধারে বসিয়া পড়িল, বলিল, "আজ আর বাইরে চা খাব না। কাউকে দিয়ে একটু চা তৈরি করাতে পারবে ?"

"পার্ব্বো" বলিয়া চারু বাহির হইয়া গেল। বেহারী একটা সিগারেট ধরাইয়া তাহাতে মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিল।

একটু পরে চারু চা প্রস্তুত করিয়া আনিলে বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নিজেই তৈরি করলে নাকি ?"

চায়ের জলে দুধ-চিনি মিশাইতে মিশাইতে চারু উত্তর করিল, "ঝিরা তো চা তৈরি কত্তে জানে না।"

বেহারী বলিল, "ঠিক, আমার ওটা মনেই ছিল না।"

চারু নিরুত্তরে কাপ পূর্ণ করিয়া বেহারীর দিকে আগাইয়া দিল। বেহারী বাঁ হাতে সিগারেটটা ধরিয়া ডান হাত বাড়াইয়া চায়ের পাত্রটা গ্রহণ করিল, এবং তাহাতে একটা চুমুক দিয়া বলিল, "মন্দ হয় নি তো।"

বলিয়া সে কাপটা জানালার উপর রাখিয়া বাঁ হাতের সিগারেটে একটা টান দিল। তার পর চারুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমি মনে করেছিলাম, মায়ের সঙ্গে তুমিও যাবে।"

চারু নিরুত্তরে চায়ের সরঞ্জামগুলা গুছাইতে লাগিল। বেহারী বলিল, "তুমি যে গেলে না ?"

চারু মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর করিল, "আমি—আমি কেন যাব ?"

বেহারী বলিল, "কেন যাবে, কি বৃত্তান্ত, এ কথার উত্তর আমি দিতে পারবো না। তবে অনেকে এমন যায় তো। বাড়ীর একজন কেউ তীর্থে গেলে তার সঙ্গে কত লোক যায়।"

চারু অন্যমনস্কভাবে কেট্‌লিটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আমি গেলে বাড়ীতে কে থাকবে ?"

বেহারী হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি ছাড়া বাড়ীতে আর লোক নাই নাকি ? ঝি আছে, বামুন আছে, চাকর-বাকর আছে।"

মৃদুগম্ভীর-স্বরে চারু বলিল, "ঝি-চাকরেরা, ঠিক বাড়ীর লোক নয়। তারা তোমার দেখা-শোনা কত্তে পারবে না।"

বেহারী হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে আমার সেবার জন্যই তুমি রইলে বল ?"

সেবা কথাটার উপর বেহারী এমন জোর দিল যে, তাহাতে চারুর মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে নীরবে লজ্জানত-মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বেহারী চায়ের বাটিটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে চুমুক দিতে দিতে বলিল, "আমার সেবা কত্তে তোমার ইচ্ছা হয় তা হ'লে ?"

চারু বলিল, "কাজেই। কেন না, সেটা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

"কিন্তু দু'চারদিন পরেই সে কর্ত্তব্যের একজন অংশীদার আসচে, তা জান তো ?"

"সে সুখ দুখের অংশীদার কর্ত্তব্যের ভাগ কেউ কারো নিতে পারে না।"

"তখনো তুমি এই স্বামিসেবারূপ কর্ত্তব্য পালন করবে ?"

"নিশ্চয়।"

"কিন্তু আমি যদি তোমার সেবা না চাই ?"

"না চেয়ে যদি তুমি সুখী হও, তবে তাহাতেই আমার কর্ত্তব্যের অবসান। তোমার যাতে সুখ, তাই করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

চায়ের পাত্রটা নিঃশেষ করিয়া বেহারী সেটাকে জানালার উপর রাখিতে রাখিতে বলিল, "তা ভাল, কিন্তু আপাততঃ তোমার সামনে যে একটা গুরুতর কর্ত্তব্য আছে, তার কি ?"

চারু কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। বেহারী বলিল, "মা তো চ'লে গেলেন, এখন বিয়েটার আয়োজন করবে কে ?"

চারু মৃদু হাসিয়া চট্‌ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি।"

"পারবে?"

"ভার দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ না।"

"কিন্তু শেষে মাঝ দরিয়ায় গিয়ে হাল ছাড়বে না তো?"

"এমন আনাড়ী মাঝি আমি নই।"

"কিন্তু মেয়েমানুষ।"

গ্রীবা উন্নত করিয়া ক্রোধস্ফুরিত-কণ্ঠে চারু বলিল, "মেয়েমানুষ? মেয়েমানুষের কিসের এত অক্ষমতা দেখলে বলো তো? মেয়েমানুষ যা সহ্য করতে পারে, তোমরা তার এক আনা সইতে পার কি? তোমাদের পান হ'তে চুণটি খস্‌লেই তোমরা একেবারে অস্থির হয়ে ওঠো, কিন্তু মেয়েমানুষ কত অন্যায়-অত্যাচার, কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নিঃশব্দে মাথা পেতে নেয়, তাদের বুকের উপর দিয়ে কত ঝড়-ঝাপটা চ'লে যায়, তার খবর রাখ কি?"

ঈষৎ হাসিয়া বেহারী বলিল, "খবর এক আধটু রাখি বৈকি। এই মামা তুচ্ছ কথায় রাগ ক'রে কাশী চ'লে গেলেন।"

তর্জ্জন সহকারে চারু বলিল, "কে তোমাকে এ কথা বল্লে? মা কি অভিমান নিয়ে, কি ব্যথা বুকে চেপে গিয়েছেন, তা যদি জান্‌তে।"

চারুর চোক দুইটা জলে ভরিয়া আসিল, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঈষৎ করুণ-কণ্ঠে বলিল, "অথচ তোমরা আমাদের মেয়েমানুষ ব'লে উপহাস কর।"

বেহারী মাথাটা একটু নীচু করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা মুহূর্ত্তে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। চারু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই দানপত্রখানা তৈরি হয়েছে?"

বেহারী বলিল, "কোন্‌খানা? যেখানা তুমি মহিমের নামে—"

বাধা দিয়া চারু বলিল, "মহিমের নামে দানপত্র করবার আমার এত মাথাব্যথা নাই।"

বেহারী বলিল, "সেদিন তুমি ঠিক তাই বলেছিলে।"

চারু বলিল, "হয় তো ভুল বলেছিলাম।"

আশান্বিত-কণ্ঠে বেহারী বলিল, "তা হ'লে কি আমার নামেই—"

"হাঁ, আজ সন্ধ্যার মধ্যে একেবারে ষ্ট্যাম্প-কাগজে লেখাপড়া ক'রে আনবে।"

বলিয়া চারু চায়ের সরঞ্জামগুলা লইয়া দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেল। বেহারী আর একটা সিগারেট ধরাইয়া চিন্তিতভাবে তাহাতে মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর বেহারী দানপত্রখানা লিখিয়া আনিয়া চারুর হাতে দিলে চারু তাহাতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া বেহারীর হাতে দিয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "তোমার বিয়ের যৌতুক।"

বেহারীর মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য লাল হইয়া আসিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সহাস্যে বলিল, "বিয়ের আগেই যৌতুক? রাম না হ'তেই রামায়ণ?"

চারু বলিল, "শুভ কাজে দেরী কত্তে নাই।"

বেহারী স্তব্ধ-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। চারু ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখচো?"

বেহা। দেখছি, তুমি কি সেই চারু?

চারু। কোন্‌ চারুর কথা বল্‌ছ?

বেহা। যে চারু দিন কত আগে স্বামীকে ঘৃণা কত্তো।

চারু। স্বামীকে ঘৃণা কোন স্ত্রীলোকেই করে না।

বেহা। ঘৃণা না করলেও অন্ততঃ ভালবাস্‌তো না।

স্বামীর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চারু বলিল, "তুমিই কি তাকে ভালবাস্‌তে?"

বেহারী মাথাটা একটু নীচু করিয়া বলিল, "এখনকার মত চারুকে পেলে বোধ হয় ভালবাসতাম।"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া চারু বলিল, "এখন সে দানপত্রে সই দিয়েছে ব'লে বুঝি?"

তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া বেহারী দানপত্রখানাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিবার উদ্যোগ করিতেই চারু খপ করিয়া সেখানা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল,

মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিল, "এত টাকার কাগজখানা ছিঁড়ে নষ্ট করে ?"

বেহারী তাহার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। চারু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সাধে কি বলি, তোমাদের পান হ'তে চুণটি খস্‌বার জো নাই। এক কথাতেই রেগে আগুন।"

বেহারী দাঁতে দাঁত চাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। চারু কাগজখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "যাক্‌, বিয়ের তো আর চারদিন মাত্র বাকী। যোগাড় পত্র যা সব কত্তে হবে তো ?"

গম্ভীরভাবে বেহারী বলিল, "এর আবার যোগাড় কি ?"

চারু বলিল, "ও মা, বিয়ে ব'লে কথা। তার যোগাড় নাই ?"

বেহারী মুখটা ফিরাইয়া লইল। চারু বলিল "আচ্ছা, বামুনঠাকরুণ তো গিন্নীবান্নী. তাকে জিগ্যেস ক'রে আমি সে সব ঠিক ক'রে নেব। তুমি কিছু টাকা দিয়ে যাবে।"

বেহারী বসিয়া ছিল, বালিসটা ঠেলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। চারু জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সময় শুলে যে ?"

বেহারী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "আচ্ছা, মা বোধ হয়, খুব রাগ ক'রেই গিয়েছেন ?"

চারু উত্তর করিল, "হাঁ. কতকটা রাগ ক'রেই গিয়েছেন বৈ কি।"

বেহারী। কিন্তু কেন তাঁর এত রাগ হ'লো বল্‌তে পার ?

চারু। তা ঠিক কেমন ক'রে বল্‌বো। তবে বোধ হয় তুমি আবার বিয়ে কর্‌বে শুনে—"

বেহারী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, বিরক্তি-পূর্ণস্বরে বলিল, "তাতে তাঁর রাগ হবার মানে কি ? রাগ হতে পারে বরং তোমার।"

চারু নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "তিনি আমাকে বড্ড ভালবাসেন কি না।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বেহারী বলিল, "তাই তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে, তোমাকে একা ফেলে স্বচ্ছন্দে চ'লে গেলেন।"

চারু ইহার কোন উত্তর দিল না। বেহারী পুনরায় শুইয়া পড়িল, এবং খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, মা বোধ হয় আর ফিরে আস্‌বেন না ?"

চারু বলিল, "তুমি ফিরিয়ে আন্‌তে গেলে বোধ হয় আস্‌তে পারেন।"

ঈষৎ রুষ্টস্বরে বেহারী বলিল, "কিন্তু কাজকর্ম্ম সব ফেলে আমি কাশী যাব কি রকমে ?"

চারু বলিল, "তিনি তো আজই কাশী যাবেন না। দু'চার দিন কলকাতায় থেকে ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে কাশী যাবেন।"

বেহারী বলিল, "কিন্তু দু'চার দিনের ভিতর আমি কলকাতাতেই বা কি ক'রে যাই ? হাতে একটা কাজ।"

ইহার উত্তর চারু দিতে পারিল না। সে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার আন্‌তে বল্‌বো ?'

বেহারী পাশ ফিরিয়া শুইয়া উত্তর দিল, "না।"

চারু বলিল, "তবে এখন একটু জল খাবে ?"

বেহারী বলিল, 'কিছু না। মাথাটা কেমন কচ্চে।"

চারু ধীরে ধীরে গিয়া বিছানার কাছে দাঁড়াইল, এবং পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, 'ক'টা বাজে ?"

চারু দেওয়ালের ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আটটা। আজ আর বাইরে নাই বা গেলে ? শরীর খারাপ।"

বেহারী চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। হঠাৎ একবার মুখটা ফিরাইয়া বলিল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ বাতাস কর্‌বে ?"

চারু খাটের পাশে পা ঝুলাইয়া বসিল, এবং ডান হাত দিয়া বেহারীর কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাঁ হাতে পাখা নাড়িতে লাগিল। বেহারী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শান্ত-কোমল-স্বরে ডাকিল, "চারু!"

সে সম্বোধনে চারুর সর্ব্বশরীর যেন বিদ্যুৎস্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। সে কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল, "কি ?"

"তুমি এমনভাবে স্বামিসেবা কত্তে পার, তা আমি জান্‌তাম না।"

"জান্‌বার চেষ্টা কোন দিন কর নি।"

"আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় পরাণ ঘরামীর উঠানের পেয়ারাগাছে প্রায়ই পেয়ারা খেতে যেতাম। তারা খুব গরীব ছিল। একখানি মেটে ঘর, তাও ভাঙ্গাচুরা। একটি ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে পরাণ সেই ঘরে বাস কর্‌তো। পরাণ দিনমজুরী

ক'রে দিন চালাতো', সংসার খুব কষ্টেই চল্‌তো। কতদিন পরাণের স্ত্রীকে ফেনে ভাতে খেতে দেখেছি, কিন্তু তাদের স্ত্রীপুরুষে ঝগড়া একদিনও শুনেছি ব'লে মনে হয় না"

বেহারী পাশ ফিরিয়া শুইয়া, চারুর হাতের উপর আপনার হাতখানা রাখিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "একদিন দুপুরবেলা গিয়ে দেখলাম, পরাণ মজুরী খেটে ফিরে আস্‌তেই তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি একখানা ছেঁড়া মাদুর পেতে তাকে বসালে, এক ঘটী জল এনে স্বামীর পা ধুইয়ে দিয়ে পাখার বাতাস দিতে লাগলো। পরাণ পাখাখানা তার হাত হ'তে কেড়ে নেবার চেষ্টা কত্তেই সে হাস্‌তে হাস্‌তে পেছিয়ে গিয়ে জোরে বাতাস কত্তে লাগলো। পরাণ হা হা ক'রে হেসে উঠলো। তার পর বৌটা পাখা রেখে ভাত বেড়ে দিলে। মোটা মোটা ভাত, তরকারীর মধ্যে কতক-গুলা কলমীশাক সিদ্ধ। পরাণ যে রকম হাসিমুখে ভাতগুলো খেতে লাগলো, তাতে মনে হলো, সে যেন শাকসিদ্ধ দিয়ে সেই মোটা ভাতগুলা খাচ্চে না, কি একটা স্বর্গের সুধা মাখিয়ে সেই কদর্য্য অন্নগুলার মধ্যে রাজভোগের আস্বাদ পাচ্চে।"

বেহারী চাহিয়া দেখিল, চারুর মুখখানা আবেগে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, হাতখানা যেন একটু একটু কাঁপিতেছে। বেহারী বলিল, "আচ্ছা চারু সেই পরাণ বরামী সুখী, না আমি সুখী?"

ঈষৎ চঞ্চলকণ্ঠে চারু উত্তর করিল, "পরাণ বরা-মীকেই সুখী বল্‌তে হবে।"

"কিন্তু সে গরীব।"

"সুখ টাকা পয়সায় নাই, সুখ মনে

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবেগপীড়িতকণ্ঠে বেহারী বলিল, "ঠিক কথা। আমারও মনে হয় চারু, সুখের কণ্টক এই বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে সেই রকম একটা ভাঙ্গা ঘরের ভিতর কি সুখ আছে, তাই একবার খুঁজে দেখি। কিন্তু তুমি—"

বলিয়া সে চারুর মুখের উপর বিহ্বলদৃষ্টি স্থাপিত করিল। স্বামীর দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চারু উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিল, "আমি? তোমার সঙ্গে গাছতলায় থাকিলেও তাই আমার স্বর্গ।"

বেহারী বলিল, "বাস্তবিকই স্বর্গ। চুলোয় যাক বিষয়-সম্পত্তি। এই সম্পত্তি নিয়ে আমি কি অধঃ-পাতে গিয়েছি চারু? শেষে তোমার মত সাধ্বী স্ত্রীর প্রাণে আঘাত দিয়ে আবার—না চারু, বিষয়ের উপর আমার ঘৃণা জন্মে গিয়েছে। আমি চাকরী ক'রে দশ বিশ টাকা আন্‌বো, আর তুমি দরিদ্রের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হয়ে সুখের সমুদ্রে আমাকে ডুবিয়ে রাখবে।"

প্রগাঢ় আনন্দের উচ্ছ্বাসে বেহারীর স্বরটা যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। চারুর মুখখানা প্রেমে ভক্তিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে হর্ষগদগদকণ্ঠে বলিল, "তাই চল, তার চেয়ে সুখ জগতে আর নাই। আমি দাসী হয়ে—"

চারু স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল; তাহার আনন্দাশ্রুধারায় বেহারীর পদদ্বয় সিক্ত হইল।

সহসা বেহারী তীরবেগে উঠিয়া বসিয়া হা হা করিয়া এমনই হাসিয়া উঠিল যে, তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে চারু চমকিত হইল। হাসিতে হাসিতে বেহারী বলিল, "তুমি পাগল হয়েছ চারু, এই মান-সম্ভ্রম, এই রাজভোগ ছেড়ে তোমাকে নিয়ে ভাঙ্গা ঘরে শাকসিদ্ধ খেতে যাব? তোমরা নির্ব্বোধ মেয়ে-মানুষ, সব পার, কিন্তু আমি পারি না।"

চারুর মুখখানা লজ্জায় ক্ষোভে লাল হইয়া উঠিল তাহার চোখ দুইটা দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। বেহারী কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিল না। সে উপহাসের তীব্র হাসিতে ঘরখানাকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। চারু বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া বেহারী বৈঠক-খানায় উপস্থিত হইল। বৈঠকখানার নীচের ঘরে তখন অনেক বন্ধুবান্ধব সমাগত হইয়া তর্কে, গল্পে ও তাম্রকূটধূমে স্থানটাকে কোলাহলময় করিয়া তুলিয়া-ছিল। বেহারী লুকাইয়া করিয়া তাহাদের দেখা না দিয়াই উপরের ঘরে চলিয়া গেল। বাবুকে উপরে যাইতে দেখিয়া একজন ভৃত্য বিনা আহ্বানেও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। বেহারী ধমক দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। তাহার জোর কমাইয়া বেহারী জানালাগুলা খুলিয়া দিল। সে দিন আকাশে মেঘ ছিল না, নির্ম্মল জ্যোৎস্নার সমুদ্রে আকাশ পৃথিবী যেন ভাসিয়া যাইতেছিল। জানালার নীচে একটা যুঁইফুলের গাছ ছিল, বাতাসের সঙ্গে

তাহার গন্ধ আসিয়া ঘরখানাকে যেন মাতাইয়া তুলিল। একখান চৌকী আস্তে আস্তে টানিয়া আনিয়া বেহারী জানালার পাশে আসিয়া বসিল।

প্রকৃতি শান্ত, প্রফুল্ল, স্থির। আকাশে কোথাও একটু মেঘ নাই, পৃথিবীতে কোথাও একটু শব্দ নাই, শান্ত প্রকৃতির বক্ষে কর্ম্ম-ক্লান্ত সারা জগৎটা যেন এলাইয়া পড়িয়াছে। সেই সুপ্তিমগ্ন অলস জগতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বেহারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন মনে পড়িল, বাল্যের দুঃখ, কৈশোরের আশা, যৌবনের সাফল্য, সব একে একে মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু এই সাফল্যের ভিতর দিয়া একটা নিদারুণ ব্যর্থতা কিরূপে যে তাহার জীবনটাকে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে, যাহার বিন্দুমাত্র অন্তরাল দিয়া সফলতার তৃপ্তি তাহার তৃষিত প্রাণটাকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, তাহা বেহারী ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। এত বড় সংসার, এখানে এত অর্থের, এত বড় জমীদারীর মালিক সে, গর্ব্বে, প্রভুত্বে সে কত উন্নত। কিন্তু ইহাদের পার্শ্বে যাহা সংসারের সার, জীবনে প্রার্থনীয়, সে স্নেহ কৈ, প্রীতি কৈ, মমতা কৈ? মা তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, স্ত্রী—এমন সুন্দরী সুরূপা স্ত্রী, তাহাকে সে আপন ভাবিতে পারে না, সংসারে প্রার্থিরূপে অনেকে তাহার মুখের দিকে চাহিবার আছে, কিন্তু তাহার প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিবার কেহই নাই। উঃ, সফলতার মধ্যে এ কি নিদারুণ নিষ্ফলতা!

বেহারী অস্থির-চিত্তে উঠিয়া গিয়া আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিল, এবং শেল্‌ফের ভিতর হইতে মদের বোতল গ্লাস পাড়িয়া লইল। বোতলের মুখ খুলিতেই স্পিরিটের তীব্র গন্ধ অনুভব করিয়া সে মুখ ফিরাইয়া লইল। তার পর কম্পিতহস্তে গ্লাস পূর্ণ করিল। আলোকের প্রতিবিম্বনে রক্তবর্ণ সুরা গ্লাসের ভিতর যেন জ্বলিতে লাগিল। বেহারী তাহার দিকে চাহিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এক পা পিছাইয়া আসিল। কিন্তু আবার অগ্রসর হইয়া অবশ হস্তে গ্লাসটা তুলিয়া ধরিল। আবার সেই তীব্র গন্ধ! বেহারী গ্লাসটা আবার রাখিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর আস্তে আস্তে বোতল ও গ্লাস তুলিয়া লইয়া জানালার ধারে আসিয়া তাহাদিগকে পিছনের বাগানে ফেলিয়া দিল। ধুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। ধড়াস্ করিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বেহারী ঘরের বাহির হইল, এবং কোন দিকে না চাহিয়া ছুটিয়া ভিতরবাড়ীর দিকে চলিল।

ঘরের দরজাটা ধড়াস করিয়া খুলিয়া চীৎকার করিয়া বেহারী ডাকিল, "চারু।"

চারু তখনও বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল। স্বামীর চীৎকারে চমকিত হইয়া মুখ তুলিল। বেহারী ঘরের ভিতর ঢুকিয়া, গভীর আর্ত্তচীৎকারে ঘরখানাকে যেন প্রকম্পিত করিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশি, ছেলেবেলা হ'তে তোমাকে ধর্‌বার চেষ্টা কচ্ছি, আর তুমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাচ্ছো। তাই বুঝি ধরা প'ড়ে শেষে এমন প্রতিশোধ দিলে।"

চারু উঠিয়া বসিয়া বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল। বেহারী বলিতে লাগিল, "আমার কি সর্ব্বনাশ তুমি কর্‌লে? আমার মা গেল, ধর্ম্ম গেল, সংসারে আমার মাথা তুলে দাঁড়াবার কিছু রইলো না।"

বেহারীর কণ্ঠস্বরে নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া যে গভীর বেদনার সুর বাজিয়া উঠিল, তাহা চারুর প্রাণে গিয়া আঘাত করিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া স্বামীর হাতখানা চাপিয়া ধরিল, স্নেহতরলকণ্ঠে বলিল, "স্থির হও, সকলি আছে। আমি আবার তোমাকে সব ফিরে দেব।"

বেহারী তাহার মুখে উপর একবার তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু পরক্ষণেই উন্মাদের ন্যায় তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিপিন বাবু মহিমকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "না মহিম, এটা তোমার ভয়ানক অন্যায়। তোমার খুড়ীমার জন্য তুমি আলাদা বাড়ী ভাড়া কত্তে গেলে? এটা কিন্তু তোমার নেহাৎ ছেলেমানুষি হয়েছে।"

মহিম লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "তা ভাড়া করেছ করেছ।

তাঁকে কিন্তু এখানে নিয়ে এস। তুমিই বা আন্‌বে কেন, ওরা গিয়ে নিয়ে আসবে। কি বল?"

মহিম বলিল, "তিনি ক'দিনই বা থাকবেন।"

বিপিন বাবু গ্রীবা আন্দোলন করিয়া বলিলেন, "যে ক'দিনই থাকুন। আমার এত বড় বাড়ীটা প'ড়ে থাক্‌তে তিনি যে ভাড়াটে বাড়ীতে থাকবেন, সেটা আমি পছন্দ করি না। ছি ছি, আগে ইঙ্গিতেও যদি তুমি একটু বল্‌তে।"

মহিম চুপ করিয়া বসিয়া মাথার চুলের ভিতর অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিল। বিপিন বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া সহসা বেশ সচকিতভাবে বলিলেন, "ভাল কথা, তিনি যখন এসেছেন, তখন এই ক'টা দিন থেকেই যান না?"

মহিম ধীরে ধীরে বলিল, "তিনি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।"

একটু ভাবিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "তা হ'লে আর কথাই নাই। কিন্তু তুমি ফিরে আস্‌চো কবে?"

মহিম এ প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বিপিন বাবু কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন, "তোমার কিন্তু দেরী করলে চল্‌বে না, তৎপর ফিরে আসা চাই। যেতে আসতে চার দিন ধর, সেখানে দু'দিন থাক্‌বে। সাত দিনের দিন কিন্তু তোমার আসা চাই-ই। কেবল এই অনুরোধেই আমাকে এক সপ্তা পিছিয়ে যেতে হ'লো।"

বলিয়া বিপিন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নতি আবার তোমার খুড়ীমাকে দেখতে যেতে চাইছে। তা যাক্, পারে তো তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বে। আমাকে এখনি একবার বাইরে যেতে হবে। যদি যায়, তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেও।"

বলিয়া তিনি দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। মহিম একা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বিপিন বাবু তাহার উপর যেরূপ নির্ভর করিয়া রাখিয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহাকে আর আশায় আশায় রাখা সঙ্গত নহে। কিন্তু সে নৈরাশ্যের কথাটা তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া যাইবে, অথবা কাশীতে গিয়া সেখান হইতে পত্র দ্বারা জানাইবে? মুখামুখি বলা অপেক্ষা পত্র দ্বারা জানানই ভাল। তবে সে সংবাদ শুনিয়া হেমলতা কতটা উল্লাসিত বা ব্যথিত হইবে, সতীশের মুখখানা কেমন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, তাহা সে দেখিতে পাইবে না। এইটুকুই যা দুঃখ। কিন্তু এই কৌতূহলটাকে নিবারণ করিতে হইলে যেরূপ নির্ম্মমভাবে বিপিন বাবুর ম্লান মুখের করুণ দৃশ্যটা দেখিতে হইবে, কল্পনায় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মহিম ব্যথিতচিত্তে সে সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইল।

... ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহার আগমনে মহিম শুধু চমকিত হইল না, তাহার সমগ্র মুখে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া যারপরনাই বিস্ময় অনুভব করিল। হেমলতা ধীরগম্ভীর পদে অগ্রসর হইয়া মহিমের ঠিক সম্মুখে টেবিলের অপর পাশে চেয়ারের হাতলটা ধরিয়া দাঁড়াইল, এবং দৃষ্টিটা বিভিন্ন দিকে রাখিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি না কাশী যাচ্ছেন?"

মহিম গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল, "হাঁ।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হেমলতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "শীগ্‌গীর বোধ হয় ফিরবেন না?"

বলিয়া হেমলতা মহিমের মুখের উপর জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মহিম নতমুখে উত্তর করিল, "ঠিক নাই।"

মৃদু হাসিয়া হেমলতা বলিল, "তা হ'লে কাশীবাসটাই বোধ হয় ঠিক করেছেন।"

সে হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে মহিম যেন নিতান্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল। হেমলতা কিন্তু পূর্ব্ববৎ মৃদুহাস্যসহকারে বলিল, "সতীশ বাবু বল্‌ছিলেন, এটা আপনার উদ্ভট খেয়াল মাত্র।"

বিরক্তিব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া মহিম উত্তর দিল, 'তা হ'তে পারে।"

"কিন্তু এমন একটা অস্বাভাবিক খেয়ালকে প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত?"

"আমি চিরদিনই খেয়ালের বশে চ'লে আস্‌ছি?"

"তাতে অবশ্য ক্ষতি ছাড়া আপনার লাভ কিছু হয় নি?"

"সংসারে শুধু নিজের লাভ বা ক্ষতির হিসাব করলে চলে না, সেই সঙ্গে অপরের লাভ-লোকসানের হিসাব রাখতে হয়।"

"তা হ'লে আপনি বল্‌তে চান, অপরের লাভের জন্যই আপনি এই ক্ষতিগুলা সহ্য ক'রে যাচ্ছেন?"

হেমলতার মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া মহিম মুখ ফিরাইয়া লইল। হেমলতা কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, "আচ্ছা, আপনি বিধবাবিবাহে রাজি আছেন?"

মহিম চমকিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিতেই হেমলতা ত্রস্তভাবে মুখ নীচু করিল, এবং নতমুখেই ধীরে ধীরে বলিল, "মনে করুন, বেশ সুন্দরী সুরূপা, আপনাকে খুব ভালবাসে। এমন কোন বিধবা—"

টেবিলের উপর জোরে একটা চাপড় মারিয়া মহিম উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কক্ষণো না।"

হেমলতা ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইল। মহিম নীরবে বসিয়া নতমুখে টেবিলের উপর অঙ্গুলির আঘাত দিতে লাগিল।

রাস্তার দিকে চাহিয়া হেমলতা বলিল, "সতীশ বাবু চারটার সময় এসে আপনার খুড়ীমার কাছে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। চারটা তো প্রায় বাজে।"

মহিম এ কথার কোন উত্তর দিল না। হেমলতা আর একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীর-মন্থর-পদে বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই মহিম শুনিতে পাইল, ও-পাশের ঘরে বসিয়া হেমলতা ধীর মৃদুকণ্ঠে গাহিতেছে—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য কিরণে দিয়ে যাক্ মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।"

মহিম উঠিয়া নীচে নামিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে শুনিতে পাইল, হেমলতা বিহ্বলকণ্ঠে গাহিতেছে—

"লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
কে জানে কখন ডুবে যাবে কোন্,
অকূল গরল-পাথারে।"

মহিম একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে সোপানে পা দিতেই দেখিতে পাইল, সম্মুখে সতীশ। সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। সতীশ তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "মহিম যে, কতক্ষণ?"

মহিম তাহার দিকে না চাহিয়াই পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"তোর মনের কথাটা কি খুলে বল্ দেখি মহিম?"

মহিম একটু হাসিয়া বলিল "মনের কথা আমার কিছু নাই খুড়ীমা।"

কালীতারা বলিলেন, "না মহিম, তুই নিশ্চয়ই আমার কাছে কথা লুকুচ্চিস্। সতীশের কাছে আমি সব শুনেছি।"

মহিম চুপ করিয়া রহিল, কালীতারা বলিলেন, "এখনও ঠিক ক'রে বল্, আমি না হয় আর পাঁচদিন থেকে বিয়েটা দিয়ে তবে কাশী যাব।"

ম্লান হাসি হাসিয়া মহিম বলিল, "তোমার অদৃষ্টে কাশীবাস হবে না দেখছি খুড়ীমা।"

কালীতারাও একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা না হ[illegible] না হবে। এখন আমি যা বল্‌চি, তার উত্তর দে দেখি।"

মহিম উত্তর দিল না। ম্লানমুখে বসিয়া খুড়ীমা[illegible] পায়ের আঙ্গুলগুলা টানিতে লাগিল। কালীতা[illegible] কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সত্যি মহিম, কাশীবাসের সুখ আমার অদৃষ্টে নাই। চারুর ভাবনা আর তোর ভাবনা আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্বনাথের পায়ে ফুল দিতে দেবে না। চারু তবু নিজের যা হয় আছে, কিন্তু তুই—তোকে সংসারী ক'রে না যেতে পাল্লে, স্বর্গে গিয়েও আমি সুখী হ'তে পারব না মহিম।"

কালীতারার চোখ দুইটা জলে ভাসিয়া আসিল, তাঁহার সেই ব্যথিত সকাতর দৃষ্টি মহিমের প্রাণে [illegible] আঘাত করিল, সে আঘাতটাকে যেন সামলাইবার জন্যই মহিম জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা খুড়ীমা, আমার জন্য তুমি এতটা ভাবছ কেন ব[illegible] তো? আমি কি সত্যি সত্যি সন্ন্যাসী উদাসীন হ'তে যাচ্ছি? আমি তো বলেছি, কাশীতে গিয়ে একটা [illegible] হয় চাকরীর যোগাড় ক'রে নেব। ধর, অন্ততঃ যদি কুড়িটে টাকা মাইনে হয়, তোমার আমার দু'জনের বেশ চ'লে যাবে। কেমন, ঠিক কি না?"

কালীতারা আঁচলে চোখ মুছিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন, "দেখ মহিম, তুই আমাকে এমনই খুকী পেয়েছিস্ যে, এই শক্ত কথাটা এত সোজা ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দিবি। আমি যে তোকে মানুষ করেছি, মহিম।"

বলিয়া তিনি মহিমের মুখের উপর স্নেহ-সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে মহিমকে মাথা নীচু করিতে হইল। কালীতারা বলিলেন, "তোর মনের কথা বুঝতে আমার বাকী নাই মহিম, আর যেটুকু বাকী ছিল, সতীশ তা আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে।"

মহিম একবার মুখ তুলিয়া যেন নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, "তুমিও যেমন পাগল খুড়ীমা। সতীশ—সতীশের কথায় তুমি বিশ্বাস কর?"

কালীতারা বলিলেন, "কেন মহিম, সতীশ তো তেমন ছেলে নয়। সে আমার কাছে কখনও মিছে বলবে না।"

মহিম চুপ করিয়া রহিল। কালীতারা তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোদের কি বিয়ের কথাবার্ত্তা হয় নি?"

যেন নিতান্ত উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গি করিয়া মহিম বলিল, "সে অমন হয়।"

কালীতারা বলিলেন, "অমন কেন, তুই তো মত দিয়েছিলি।"

মহিম মাথা নীচু করিয়া নিরুত্তর রহিল। কালীতারা বলিলেন, "তবে তোর এখন অমত কেন বল তো? মেয়েটিও তো মন্দ নয়, দিব্যি মেয়ে। দু'দিন আমার কাছে এসেছিল, কথায় বার্ত্তায় সকল দিকে সুন্দর। না মহিম, আমি তোকে অমত কত্তে দেব না। সতীশ আজ এলেই তাকে সব ঠিক কত্তে ব'লে দেব।

মহিম একটু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা খুড়ীমা, তুমি কি রকম মেয়ে বল দেখি।"

কালীতারাও মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ঠিক তোর খুড়ীমার মত।"

মহিম মুখ ভার করিয়া বলিল, "কিন্তু আমার খুড়ীমা হয়ে এত শক্ত অপমানটাকে কি রকমে এমন সহজে ভুলে যেতে পার, তাই আমি বুঝতে পাচ্ছি না।"

স্নেহপ্রদীপ্ত কণ্ঠে কালীতারা বলিলেন, "তুই কেমন ক'রে বুঝবি মহিম, ছেলে রাগ ক'রে মাকে আঁচড়ায় কামড়ায়, পা ছুড়ে বুকের উপর লাথি মারে, কিন্তু সে আঘাতে মা অপমানের চাইতে আনন্দটা যে কত বেশী পায়, সেটা বুঝবার ক্ষমতা তুই কোথা হ'তে পাবি?"

খুড়ীমার স্নেহের উচ্ছ্বাসে সমুজ্জ্বল মুখখানার দিকে স্তব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া মহিম বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে বসিয়া রহিল।

কালীতারা একটু থামিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এতক্ষণ আমি সব বুঝতে পেরেছি মহিম। আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে নিজের মতে তুই বিয়ে করবি, এইটাই তোর আমার কাছে সব চেয়ে লজ্জা হয়ে দাঁড়িয়েচে। কিন্তু তোর যেখানে সুখ, সেখানে যে আমার মান অপমান কিছুই নাই, এটাও তোর বুঝা উচিত।"

অতঃপর তিনি মহিমের লজ্জারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা হ'লে কা'ল আর আমার যাওয়ায় হচ্ছে না। কি বলিস্?"

মহিম মুখ তুলিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এ বিয়ে কিছুতেই যে হ'তে পারে না খুড়ীমা।"

কালীতারা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হ'তে পারে না?"

মহিম একটু থামিয়া বলিল, "আমি সতীশের প্রাণে ব্যথা দিতে পারব না।"

কালীতারা শিহরিয়া উঠিলেন, চমৎকৃতভাবে বলিলেন, "সতীশ!"

মহিম বলিল, "হাঁ সতীশের ইচ্ছা, সে হেমলতাকে বিয়ে করে।"

অত্যমাত্র বিস্ময়ের সহিত কালীতারা বলিলেন, "কিন্তু সেই তো তোর কথা বল্লে?"

মহিম হাসিয়া উঠিল, বলিল, "সে একটা মস্ত স্বার্থত্যাগ দেখাতে চায় খুড়ীমা। কিন্তু বন্ধুর জন্য সে যা কত্তে পারে, আমি কি তা পারি না? আমি কি এতই হীন যে, তার জন্য এই স্বার্থটুকু ত্যাগ কত্তে পারবো না?"

তাহার কথা শেষ না হইতেই বেহারী ঠিক একটা দমকার বাতাসের মত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং কালীতারা বা মহিমকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর না দিয়াই ক্রোধসমুচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মহাপুরুষ হে মহিম, তুমি মহাপুরুষ। তুমি চমৎকার স্বার্থত্যাগ কত্তে পার। স্বার্থত্যাগের ভাণে প্রতিহিংসা নিয়ে মানুষকে বেশ জানোয়ার ক'রে তুলতে পার।"

মহিম হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। কালীতারা বিস্ময়স্তব্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বেহারি!"

উত্তেজিত কণ্ঠে বেহারী বলিল, "হাঁ, আমি। আচ্ছা, তোমরা কি মনে করেছ বল দেখি? আমি মানুষ না, জানোয়ার? আমি তো খুব স্বার্থপর, কিন্তু তোমরা এমন চমৎকার আপনার লোক যে, আমাকে

দিব্য অধঃপতনের পথে ঠেলে দিয়ে নিজেরা স'রে দাঁড়াতে পার। আমার সঙ্গে তোমাদের এতটা শত্রুতা কেন বল তো ?"

বেহারীর ভাব দেখিয়া কালীতারার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বেহারী তখন মহিমের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আচ্ছা আক্কেল তোমাদের যা হোক, পরশু বিয়ে, আর আজ এখনো তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে আছ। দেখ মহিম, এবার আর ভাল কথায় চল্‌বে না, বাধ্য হয়ে আমাকে দাদাগিরি দেখাতে হবে। সোজা কথায় না যাস্, কানে ধ'রে নিয়ে গিয়ে পিঁড়িতে বসাব।"

বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে কালীতারা বলিলেন, "সরলার কথা বল্‌ছিস্ বেহারি ? কিন্তু সে তো—"

বেহারী চড়া গলায় বলিল, "কিন্তু তাকে আমি বিয়ে কত্তে যাব, কেমন ? তাই তুমি রাগ ক'রে কাশী চলেছ, মহিম স্বার্থত্যাগ ক'রে তোমার সঙ্গী হচ্চে, আর চারু তার বিষয়টা আমাকে লিখে দিচ্চে। চমৎকার! তোমরাই যত সেয়ানা, আর বোকা শুধু একা আমি, না ? কিন্তু তা হচ্চে না, মহিমকে যেতেই হবে, চারু সেখানে বরণডালা সাজাচ্চে।"

কালীতারার মুখখানা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাহা যেন নৈরাশ্যের ছায়ায় ঢাকিয়া গেল। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু তা যে হবে না বেহারি।"

ক্রোধগম্ভীর স্বরে বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হবে না শুনি ?"

কালীতারা বলিলেন, "মহিমের এখানে বিয়ের সব ঠিক—"

দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই কালীতারা থামিয়া গেলেন। দেখিলেন, সতীশ দরজার উপর দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কালীতারাকে থামিতে দেখিয়া সতীশ হাসিতে হাসিতে বলিল,' সেটা কথার কথা হয়েই রইলো খুড়ীমা, মহিমের বিয়ে বা স্বার্থত্যাগ, দুটোর একটাও হ'লো না। বিপিন বাবুর মেয়ে বিধবা।"

মহিম কাঁপিয়া উঠিল, দৃষ্টিটাকে বিস্ময়ে বিস্ফ-রিত করিয়া সে সতীশের দিকে চাহিল। সতীশ বলিল, "বিধবাই হোক্ বা কুমারীই হোক্, হেমলতাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য আমার একটুও আগ্রহ ছিল না মহিম, আমি শুধু মেয়েটার উপর তোমার ভালবাসার দৃঢ়তা যাচাই করে নিতেছিলাম। যাক্, তোমার একটা মস্ত স্বার্থত্যাগের দাঁও ফস্কে গেল।"

বলিয়া সে মহিমের মুখের উপর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এবং কালীতারার দিকে চাহিয়া বলিল, "আসল কথাটা কি জান খুড়ীমা, আট বছর বয়সে হেমলতার বিয়ে হয়েছিল, বছরখানেক পরেই বিধবা হয়। তার মাস কয়েক পরেই ওর মা মারা যায়। এখন যিনি হেম-লতার মাতৃপরিচয়ে বিপিন বাবুর বাড়ীতে বাস কচ্চেন, আসলে উনি হেমলতার বিধবা মাসী। এ সকল সন্ধানই আমি নিয়েছি। মেয়েটিকে বড্ড ভালবাসেন ব'লে বিপিন বাবু পুনর্ব্বার তার বিবাহ দেবার চেষ্টা কচ্চেন। হেমলতা কিন্তু তাতে আগাগোড়াই নারাজ।"

বিস্ময়ে মহিমের বাক্‌শক্তি যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। কালীতারা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "আহা, এমন মেয়েটার এ রকম কপাল!"

দৃপ্তকণ্ঠে সতীশ বলিল, "বাস্তবিক চমৎকার মেয়ে খুড়ীমা। সে যে মহিমকে কতটা ভালবাসে,তা বোধ হয় মহিমও জানে না। তবু সে বিয়ে কত্তে নারাজ। কি বল্‌বো বিধবা-বিবাহের চলন নাই, নইলে আমি জোর ক'রে মহিমের সঙ্গে তার বিয়ে দিতাম।"

একবার কাসিয়া, রুদ্ধ স্বরটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া সতীশ বলিল, "আজ সে আমার সাম্‌নে বাপের মুখের উপর সব স্পষ্ট ব'লে দিয়েছে। সেখান হ'তে বেরিয়ে মেসে ঢুকেছি, এমন সময় বেহারী বাবু উপস্থিত। এখন মহিম, হেমলতার আশা ছেড়ে দাও, বেহারী বাবুর সঙ্গে আস্তে আস্তে গিয়ে সুবোধ বালকের মত বিয়েটা ক'রে ফেল।"

বেহারী জোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যাবে না কি ? যেতেই হবে ওকে।"

বলিয়া সে পকেট হইতে দুইখানা কাগজ বাহির করিয়া মহিমের সম্মুখে ছুড়িয়া দিল, বলিল, "এই নে তোর বিষয়। একখানা দলিলে চারু তার সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছে, আর ঐখানায় চারুর আমার সব বিষয় আমি তোর নামে লিখে দিয়েছি। ব্যস, আমি এবার নিশ্চিন্ত।"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কালীতারা ডাকিলেন, "বেহারি!"

বেহারী মুখ উঁচু করিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "যে বিষয়ের তরে মা পর্য্যন্ত পর হয়ে যায়, তেমন বিষয়ের মাথায় মারি পয়জার। এখন সব উঠবে কি না বল তো ? সাড়ে চারটায় ট্রেণ, তিনটা বেজে গিয়েছে। বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে।"

মহিম দানপত্র দুইখানা তুলিয়া লইল এবং তাহা

বেহারীর পায়ের কাছে রাখিয়া তাহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "বিয়ে আমি করবো দাদা, কিন্তু তুমি থাকতে আমি বিষয়ের মালিক হ'তে পারবো না। আমি বাপের ত্যাজ্যপুত্র।"

"কিন্তু আমার ত্যাজ্য ভ্রাতা নও।" বলিয়া বেহারী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং মহিমের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া গাড়ীতে তুলিল

গাড়ীখানা যখন বিপিন বাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তখন মহিম শুনিতে পাইল, উপরের ঘরে বসিয়া হেমলতা গাহিতেছে—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য-কিরণে দিয়ে যাক্ মোরে
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।"

গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া মহিম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল

সম্পূর্ণ

মানরক্ষা

১

বলরাম পাল ছেলের বিবাহের সময় যখন মহেশ আকুলির নিকট সাড়ে এগার গণ্ডা টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল, তখন একবারও ভাবে নাই, এই টাকার জন্য এক দিন তার ঘর-ভিটা নীলাম হইয়া যাইবে। কিন্তু তিন বৎসরেও যখন সে সুদের একটি পয়সাও দিতে পারিল না, তখন মহেশ আকুলি তামাদীর ভয়ে অগত্যা সুদের সুদ হিসাব করিয়া এক শত একুশ টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করিয়া দিলেন, এবং মায় খরচা এক শত সাড়ে বত্রিশ টাকার ডিক্রী পাইয়া বলরামের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিলেন। বলরাম আসন লইয়া অব্যাহতি দিবার জন্য কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। আকুলি মহাশয় কিন্তু তাহার এই কাঁদাকাটায় বিচলিত হইলেন না, তিনি তমশুকের মুসাবিদাটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বুড়া হয়ে সত্যের অপলাপ ক'রো না পালের পো, তুমি নিজেই লিখে দিয়েছ, 'এক বৎসরের মধ্যে এই টাকা মায় সুদ শোধ দিতে না পারিলে বৎসরান্তে ইহার সুদ আসলমধ্যে গণ্য হইবে, এবং যাবৎ টাকা শোধ দিতে না পারি, তাবৎ এই হারে টাকাপ্রতি অর্দ্ধ আনা সুদ চলিতে থাকিবে।' এখন নিজের কথায় নিজে খেলাপ ক'রো না। মহাভারতে লেখা আছে, সত্যের উপরেই এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত।"

মূর্খ বলরাম মহাভারতের কথার উপর কথা কহিতে পারিল না, এবং সত্যের অপলাপ করিতেও সাহসী হইল না। সে ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সত্যের অপলাপ করিতে গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় মনে মনে একটু দুঃখও অনুভব করিল।

বুড়া হইলেও বলরামের বয়স এত বেশী হয় নাই, যাহাতে নিজের ঘর-ভিটার উপর তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু বয়সের গুণে যাহা হয় নাই, অবস্থার প্রভাবে তাহা হইয়াছিল। এক-মাত্র উপযুক্ত পুত্র কেনারাম বৃদ্ধ পিতার বুকফাটা চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া যে দিন ইহলোকের পরপারে চলিয়া গেল, সেই দিনই বলরামের সংসার-বন্ধনটা এমনই শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, কেনারামের চিতা-নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে রূপনারায়ণের গর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সংসারের সহিত জীবনের অবশিষ্ট আকর্ষণটুকুকে ভাসাইয়া দিবে কি না, তাহা চিতার পার্শ্ববর্ত্তী বটগাছের তলায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিয়াছিল। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিল না, সদ্যোবিধবা অনাথা বধূ সুখদা তাহাকে আবার সংসারের বন্ধনের মধ্যে টানিয়া আনিল।

কেনারাম এক বৎসর বয়সে মাতৃহীন হইলে অনেকেই বলরামকে দ্বিতীয়বার সংসারধর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিল। কিন্তু সেই এক বছরের ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া সে তাহার উপদেশগুলা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিল। তার পর কত কষ্টে সেই এক বছরের মা-মরা ছেলেকে একুশ বছরের করিয়াছিল, তাহা বলরাম ছাড়া আর কেহ জানে না। ছেলে উপযুক্ত হইলে বলরাম পাঁচ গাঁ খুঁজিয়া ভাল মেয়ে পছন্দ করিয়া ছেলের বিবাহ দিল। বিবাহে একটু জাঁক-জমক করিয়া, পাঁচ গাঁয়ের কুটুম্বের পায়ের ধুলা লইল। পুরোহিতকে গরদের জোড় কিনিয়া দিল। এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে কেবল সঞ্চিত টাকায় কুলাইল না, মহেশ আকুলির নিকট তমশুক লিখিয়া দিয়া সাড়ে এগার গণ্ডা টাকা লইল।

টাকাটা লইবার সময় বলরাম একবারও ভাবে নাই যে, এই কয় গণ্ডা টাকার জন্য মহেশ আকুলি ঢোল বাজাইয়া তাহার সম্পত্তিতে ক্রোক দিবে। কেনারামের গতর বজায় থাকিলে তিন বিঘা জমীর ধানে এক বৎসরেই সুদ আসল টাকা শোধ হইয়া যাইবে।

কিন্তু সে বৎসর ভাদ্রের শেষে রূপনারায়ণের জোয়ারে ফসলগুলা যখন ভাসিয়া গেল, তখনও বলরাম দমিল না। পুত্রের চিন্তিতভাব লক্ষ্য করিয়া

জোর গলায় তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় কি, না হয় আর একটা বছরের সুদ দিতে হবে।"

পুত্রের চিন্তাভার লঘু করিবার জন্য বলরাম অগ্রহায়ণ মাসে ভাল দিন দেখাইয়া বধূ সুখদাকে ঘরে আনিল। বধূকে আনিয়া বিশ বৎসরের শ্রীভ্রষ্ট সংসারের মধ্যে যে লক্ষ্মীশ্রীর আবির্ভাব দেখিতে পাইল, তাহাতে বৃদ্ধ এত কষ্ট ও পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মানিয়া লইল, এবং সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকাকে আপনার মাতৃপদে অভিষিক্ত করিয়া সে যেন পুনরায় নিশ্চিন্ত বাল্য-জীবনকে ফিরাইয়া আনিতে উদ্যত হইল।

পর বৎসর আষাঢ় মাসের নূতন জলের সঙ্গে ম্যালেরিয়া আসিয়া এমনই জোরে চাপিয়া বসিল যে, প্রবল ভূকম্পনে অট্টালিকার ন্যায় অনেক বড় বড় জোয়ানকেও শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। তাহাদের সঙ্গে কেনারামও বিছানায় পড়িল। সুতরাং চাষ ভাল হইল না, বুড়া যতটা পারিল, আবাদ করিল. বাকী জমী পড়িয়া রহিল। কেনারাম অসুস্থ অবস্থাতেই উঠিয়া চাষের কাজে লাগিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু বলরাম তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিল, 'ফসল লক্ষ্মী, কিন্তু স লক্ষ্মীকেও চাই না কিনু, তুই সেরে উঠলে আমার সব হবে।'

কেনারাম কিন্তু সারিয়া উঠিতে পারিল না। ম্যালেরিয়ার সহচর প্লীহা আসিয়া উদরের অধিকাংশ ভাগ অধিকার করিল। বলরাম ধান বেচিয়া সুধা-সিন্ধু, ডি গুপ্তর বোতল আনিয়া ঘর পূর্ণ করিল, কিন্তু কেনারামের প্লীহার আয়তন কিছুমাত্র কমিল না। এইরূপে একবৎসর ভোগের পর অবশেষে একবার নিউমোনিয়া আসিয়া এমনই জোরে চাপিয়া ধরিল যে, কেনারামের বাঁচিয়া উঠিবার এবং বলরামের তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া মৃত্যু আপনার বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া দিল।

"বাবা।"

"কেন গা বৌমা?"

"ঘর-বাড়ী গেলে থাকবে কোথায়?"

"চুলোয়।"

শ্বশুরের উগ্র কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া সুখদা বিস্ময়-বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল। বলরাম উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "কেনা হতভাগা যাদের পথে বসিয়ে গেছে, তাদের আবার থাকাথাকি কি বল তো?"

একটা দীর্ঘশ্বাসে সুখদার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল; সে মাথা নীচু করিয়া নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। বলরাম ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি এক কাজ কর বৌমা, বাপের বাড়ী যাও।"

সুখদা নতমুখেই বলিল, 'তাই না হয় যাব, কিন্তু তুমি থাকবে কোথায়?"

বলরাম যেন অতিমাত্র বিস্ময়পূর্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি? কথাটা বলতে তোমার লজ্জা হ'ল না বৌমা? আমি থাকবো কোথায়? আমাকে কি আবার সংসারে থাকতে হয়?"

বৃদ্ধের স্বরটা জড়াইয়া আসিল। সুখদা বলিল, "কিন্তু থাকতে তো হচ্ছে বাবা।"

বাষ্পজড়িতস্বরে যেন ক্রোধের একটু তীব্রতা আনিয়া বলরাম বলিল, "থাকতে হচ্ছে সে শুধু তোমার তরে। কেনা ছোঁড়া তো শুধু চ'লে যায় নি, আমার পায়ে বেড়ী দিয়ে গেল। উঃ, আমার বিশ বছরের কষ্টের শোধ বেশ দিয়ে গিয়েছে। কি নিষ্ঠুর! নরকেও তার ঠাঁই হবে না।"

পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে শ্বশুরের এই তীব্র অভিসম্পাত সুখদার বড়ই কঠোর বোধ হইল। সে অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তা আমিই যদি তোমার এত ভার হয়ে থাকি বাবা—"

সুখদা আঁচলে মুখ ঢাকিল। বলরাম মাথা নীচু করিয়া গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, তার পর শোক-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "আমি কি ভারের কথাই বলছি বৌমা, তুমি আছ ব'লেই আমাকে এখনও সংসারে বদ্ধ হয়ে থাকতে হয়েছে। নয় তো—"

নয় তো বৃদ্ধ যে কি করিত, তাহার কোনও স্থিরতা না থাকায় নিঃশব্দে কয়েকবার মস্তক সঞ্চালন করিয়া, তার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি বুঝছো না বৌমা, কেনা আমার বুকে কি বাজ মেরে গেছে। তোমার শাশুড়ী যখন মারা যায়, লোকে বল্লে—বলরাম, বিয়ে কর। কিন্তু ছিঃ, আমার কিনু বেঁচে থাক। এক বছরের ছেলে, সারা রাত বুকে শুয়ে ঘুমাত, একবার পাশ ফেরবার যো ছিল না। এমনি বিশ বছর। উঃ ভগবান্! এততেও মানুষ বেঁচে থাকে!"

...রাম দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হা-হা করিয়া ...া উঠিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া বাড়ীর ... হইল।

...র-ভিটাটুকু রাখার সম্বন্ধে সুখদারই জেদ বেশী ... "এটুকু যদি যায়, তাহা হইলে বুড়া শ্বশুরকে ...সে কোথায় দাঁড়াইবে? তাহার বাপের বাড়ী ...সত্য, এবং বাপও তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত ...টে, কিন্তু বুড়া শ্বশুরকে ফেলিয়া সে তো যাইতে ...া। সে গেলে বুড়া যে একটা দিনও বাঁচিবে ...া তো রূপনারায়ণের জলেই ঝাঁপাইয়া পড়িবে, ... আর কোন সন্দেহ ছিল না। সুতরাং শুধু ...ও যদি মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার পায়, ...হইলেও সে গতর খাটাইয়া কোনরূপে শ্বশুরের ...এক মুঠা অন্ন দিতে পারিবে।

...রাম পালের এই ঘর-ভিটাটুকু লইবার জন্য মহেশ ...রও যে তেমন জেদ ছিল, তাহা নহে, তবে ... বিশ্বাস, বুড়ার হাতে লুকান টাকা আছে, ...টা ধরিয়া টান দিতে না পারিলে বুড়া সহজে ... বাহির করিবে না। এই জন্য বলরাম যখন ...র পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ...টাটুকু ছাড়িয়া দিবার জন্ত অনুরোধ করিল, ...আকুলি মহাশয় বেশ নিশ্চিন্তভাবেই মৃদু হাসিয়া ...ন, "লোককে বাসচ্যুত করার চেয়ে আর অধর্ম্ম ...ালের পো, তোমার ঘরভিটে নিয়ে আমি ধুয়ে ...। আমার হকের টাকা, ফেলে দিলেই সব ...দিচ্ছি।"

...মন অনেক লোক থাকে, যাহাদের ক্রুদ্ধভাব ...া হাসিটা বেশী ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। ...ল মহাশয়ের মুখে সেই হাসি দেখিয়া বলরাম ...চিত্তে ফিরিয়া আসিল, এবং ঘর-ভিটা রাখিবার ...নও উপায় নাই, ইহা বধূকে জানাইয়া দিল।

...লরাম হতাশ হইলেও সুখদা কিন্তু হতাশ ...না। জমার জমী তিন বিঘা ছিল, তাহা শ্বশুরকে ...ত বলিল। জমী বেচিয়া বার গণ্ডা টাকা পাওয়া ... সুখদার পিতৃপ্রদত্ত রূপার তাবিজ এক জোড়া, ...চারিগাছা ছিল, তাহা সাড়ে তের গণ্ডা টাকায় ...করিল। বাকী আর ত্রিশ টাকা। এই টাকাটা ...ার মহাজন ছাড়িবে না? আকুলি মহাশয় কিন্তু ...টাকা ছাড়িতে পারিলেন না; তিনি স্পষ্ট ...ন, "পালের পো, আমার এত টাকা ছাড়লে চল্‌বে কি রকমে? আমার বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে; এই হাতে হাতে অন্নপূর্ণাপূজা আস্‌ছে। তাতে দশ জন ব্রাহ্মণ-সজ্জন খাওয়াতেই হবে। আমার তো অন্য জমীদারী নাই, এই সুদই আমার জমীদারীই বল, বেটা-পুত্রই বল, সব।"

কিন্তু বলরাম কিছুতেই ছাড়ে না। তখন আকুলি মহাশয় অনেক ভাবিয়া দাবীর এক শত সাড়ে বত্রিশ টাকার মধ্যে খুরচা আট আনা ছাড়িতে রাজি হইলেন, এবং এই আটআনা ছাড়িয়া দেওয়ায় তাঁহাকে যে দুই দিনের বাজারখরচ কম করিতে হইবে, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন। বলরাম শুনিয়া অবাক্ হইল, এবং হাতে না থাকায় এই আট আনা সমেত টাকাগুলা ব্রাহ্মণের মুখের উপর ফেলিয়া দিতে না পারিয়া সে যেন মনে মনে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া সংগৃহীত টাকা সমেত তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

সুখদা তখন শ্রীদাম মাইতির মাকে ধরিল। শ্রীদামের অবস্থা একটু সচ্ছল হইলেও মহাজনী করিবার মত অবস্থা তাহার ছিল না। তথাপি সে ধান বেচিয়া টাকাটা দিল। বলরাম টাকা লইয়া আকুলি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল। আকুলি মহাশয় টাকাগুলি গণিয়া ও নগদ টাকা বেশ করিয়া বাজাইয়া লইয়া বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাকী টাকাটা কোথায় পেলে হে পালের পো?"

বলরাম বলিল, "আজ্ঞে ছিদাম ধার দিয়েছে।"

আকুলি বলিলেন, "ছিদাম মাইতি? ছিদামও মহাজনী কারবার কচ্ছে না কি?"

বলরাম বলিল, "আজ্ঞে না, বৌমার কাঁদাকাটায় দিয়েছে।"

ঈষৎ হাসিয়া আকুলি বলিলেন, "বেশ। সুদ কত?"

বলরাম বলিল, "সুদ নেবে না।"

বিস্ময়ে চমকিত হইয়া আকুলি বলিলেন, "সুদ নেবে না?"

বলরাম বলিল, "বলে—সুদ খাওয়া মহাপাপ।"

আকুলি মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বটে, জগা মাইতি, যে চিরকাল পাঁচ দোরে মজুর খেটে ম'রে গেল, তার ছেলে ছিদাম মাইতি, সে হলো ধার্ম্মিক, সুদ খাওয়া মহাপাপ! অধার্ম্মিক রয়ে গেলাম শুধু আমি!"

বলিয়া তিনি তীব্র রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে বলরামের

মুখের দিকে চাহিলেন। বলরাম কিন্তু ইহার কোনও উত্তর দিল না। তখন আকুলি মহাশয় টাকা বাক্সে তুলিয়া রসীদ লিখিয়া দিলেন। বলরাম রসীদ লইয়া ঘরে ফিরিল।

ঘর ভিটা রহিল, কিন্তু খাওয়া-পরার কোনও সংস্থান থাকিল না। যে তিন বিঘা জমী ছিল, তাহা বিক্রয় করা হইয়াছে। বৃদ্ধ বড় ভাবনায় পড়িল। কিন্তু সুখদা বলিল, "তুমি ধান এনে দাও বাবা, আমি ধান ভেনে যে লাভ পাব, তাইতেই দু'টো পেট বেশ চ'লে যাবে।"

বলরামকে অগত্যা এই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইল। ইহা ছাড়া বাড়ীর আশেপাশে যে জায়গা ছিল, সুখদা সেখানে শাক-পাত তরিতরকারির গাছ বসাইল। তাহা বেচিয়াও কিছু কিছু পাওয়া যাইত। এইরূপে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিতে লাগিল।



"তামাক খেয়ে যাও হে পালের পো।"

বলরাম তখন মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া হাট হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, এ সময়ে তামাক খাইবার আদৌ ইচ্ছা না থাকিলেও আকুলি মহাশয়ের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে মাথার ঝুড়িটা নামাইয়া রাখিয়া আকুলি মহাশয়কে প্রণাম করিল, তার পর আকুলি মহাশয়ের হাত হইতে প্রসাদী কলিকা লইয়া তাহাতে টান দিল। কলিকায় তখন একটু আগুন ছাড়া তামাকের অস্তিত্ব আদৌ ছিল না সুতরাং তাহার মুখবিকৃতি লক্ষ্য করিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "কিছু নাই বুঝি? একটু তৈরী কর না।"

নিকটেই তামাক কয়লা ছিল, বলরাম কলিকার আগুন ঢালিয়া পুনরায় তামাক সাজিতে বসিল। আকুলি মহাশয় হাতের হুঁকাটা পাশে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে? হাটে বুঝি?"

বলরাম ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে।"

"কি নিয়ে গিয়েছিলে?"

"চাট্টি শাক, আর দু'টো কুমড়ে।"

"কত হ'লো?"

"সাড়ে দশ পয়সা।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "এই পয়সায় দু'জনের চলে?"

কয়লায় 'ফু' দিতে দিতে বলরাম বলিল, রকমে চালিয়ে দিতে হয়।"

বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া আকুলি মহাশয় লেন, "বল কি হে, এক সের চালের দামই তো পয়সা। তার পর—"

বলরাম বলিল, "চালের দাম, ডালের দাম নে বাবাঠাকুর, সব জানে বৌমা।"

'তা হ'লে বৌটিই সংসার চালায়?'

"তা বৈ কি।"

"বৌটিকে তো লক্ষ্মী বল্‌তে হয় তা হ'লে?"

বলরাম একবার মস্তক-সঞ্চালন করিয়া গর্ব্ব কণ্ঠে বলিল, "সে কথা আবার দু'বার বল্‌তে। কালের বাজারে এমনটি তো দেখা যায় না।"

আকুলি মহাশয় বলিলেন, "ভাগ্যে বৌ ছি নইলে তোমার—"

বলরাম বলিল, "তা নইলে কোন্ দিন হাড়ে দুব্বো গজাত।"

আকুলি মহাশয় বলিলেন, "বটে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্যরেখা দেখা দিল, তাহা বলরাম লক্ষ্য ক সে কলিকায় দুইটা টান দিয়া সেটা আকুলি মহ হাতে দিল। আকুলি হুঁকার মাথায় কলিকা বসাইতে গম্ভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন করিয়া ব "তাই তো বলি, এক পয়সা আয় নাই, অথচ সংস কিসে। তোমার যে উপযুক্ত বৌ আছে, সেটা খেয়ালেই ছিল না। বেশ বেশ।"

শেষের প্রশংসাসূচক 'বেশ' কথাটা এমনই জোর দিয়া উচ্চারিত হইল যে, তাহাতে চমকিয়া উঠিল। সে আর আকুলি মহাশয়ের দিকে চাহিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আকুলি বসিয়া গম্ভীর ভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন।

বলরাম ঘরে পৌঁছিয়া ঝুড়িটা দাবার আছড়াইয়া ফেলিয়া মাথা ধরিয়া বসিয়া দাবায়ই একপাশে সুখদা রাঁধিতেছিল; এমন অবসন্নভাবে বসিতে দেখিয়া সে তা কাছে ছুটিয়া আসিল, এবং ব্যগ্রভাবে ডাকিল, "

বলরাম মাথা তুলিয়া তীব্রদৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিল; রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, আমার ছরাদ্দি।

সুখদা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলরাম কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা বৌমা, আমারই না হয় কোনও চুলোয় ঠাঁই নাই, কিন্তু তোমার তো আছে। তোমার বাপের গোলা-ভরা ধান, সেখানে গেলে কি এক মুঠো খেতে পাও না? অথচ এক বেলা এক সন্ধ্যে আধপেটা খেয়ে এখানে কেন প'ড়ে আছ বল তো?"

সুখদা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বলরাম মাথা নাড়িয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি বল্বে, আমারে তরেই প'ড়ে আছ। কিন্তু আমি কি তোমায় থাক্‌তে বলেছি? নাঃ আমি কাউকে থাকতে বলি না। যখন নিজের ছেলে এই বয়সে ফেলে পালাল, তখন পরের মেয়ে তুমি, তুমি থেকে আমার কি কর্‌বে? না, আমি কাউকে চাই না।"

তাহার স্বরে ক্রোধের তীব্রতা থাকিলেও চোখ দুইটা এমনই জলে ভরিয়া আসিয়াছিল যে, বলরাম তাহা গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করিয়া বসিল। খানিক এইভাবে থাকিয়া যখন মাথা তুলিল, তখন দেখিল, সুখদার চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল গড়াইতেছে। বলরাম তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া গাঢস্বরে বলিল, "এই দেখ, মেয়েমানুষ কি না, এক কথায় কেঁদে ফেল্‌লে? ভাল বাছা, আমি তোমাকে কি কিছু বলেছি? আমি বল্‌ছি, ভগবান্ যাকে মেরেছে,—না, আর বেশী কথায় কাজ নাই, তেলের বাটিটা দাও।"

তেল মাখিতে মাখিতে বলরাম রন্ধননিরতা বধূর দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে বলিল, "আমি মনে কচ্ছি—কি জান বৌমা, আর এ সব ভাল লাগে না। এই বয়সে ঝাঁকা-মাথায় হাটে যাওয়া আর কি ভাল দেখায়? তুমি দিন কতক বাপের বাড়ী গিয়ে থাক, আমি একবার ঘুরে ফিরে আসি।"

সুখদা বলিল, "আচ্ছা, সে যুক্তি পরে হবে, এখন ডুবটা দিয়ে এস। বেলা কি আর আছে?"

হাসিতে হাসিতে বলরাম বলিল, "বেলা—এখনও অনেক বেলা আছে বৌমা, সন্ধ্যার এখনও ঢের দেরী। ভাল কথা, এই নাও তোমার হাটের পয়সা।"

কাপড়ের খুঁট হইতে পয়সা খুলিয়া বলরাম বধূর হাতে দিল। সুখদা তাহা গণিতে গণিতে বলিল, "সাড়ে দশ পয়সা? কুমড়ো দু'টোর দামই তো চার গণ্ডা পয়সা হবে।"

বলরাম উঠিয়া দাঁড়াইয়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া বলিল, "তুমি বল্‌লে চার গণ্ডা পয়সা, কিন্তু ঝাঁকা নামাতেই আকুলি ঠাকুর এসে বড় কুমড়োটা ধর্‌লে। কি করি, বামুন, কাজেই তিন পয়সাতেই দিলাম।"

সুখদা বলিল, "আর ছোটটা দিলে আড়াই পয়সায়?"

হাসিতে হাসিতে বলরাম বলিল, "ঠিক ধরেছ বৌমা, সেটা নিলে মদন চক্কোত্তি। যাক্, ব্রাহ্মণ-ভোজন তো হবে। তোমার গাছ পোঁতা সার্থক হ'ল বৌমা।"

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে ডুব দিতে গেল। সুখদা পয়সা কয়টা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। রাধুর মা চাউলের এক টাকা পাইবে। আজ তাহাকে অন্ততঃ আট আনা না দিলেই নয়। সুখদা চারি আনা সংগ্রহ করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল বাকী চারি আনা কুমড়া দুইটা হইতে পাওয়া যাইবে। আর শাকের পয়সায় তেল-নুনের খরচ চলিবে। কিন্তু শ্বশুর যে হাটে গিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া আসিবে, তাহা সে জানিত না। এখন রাধুর মাকে কি বলিবে, তাহাই তাহার চিন্তার বিষয় হইল।

৪

খানিক রাত্রে একটা খস্‌খস্ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বলরাম চাহিয়া দেখিল, উঠানে একটা লোক। বলরাম উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "কে?"

লোকটা যন একটু থতমত খাইয়া উত্তর দিল, "আমি রাখাল—রাখাল আকুলি।"

মহেশ আকুলির ছেলে রাখালকে বলরাম চিনিত এবং সে যে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে অবসর লইয়া গ্রামের যাত্রাপার্টিতে যোগ দিয়া আবগারী বিভাগের আয়বৃদ্ধির চেষ্টায় ছিল, তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। বলরাম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং রুক্ষস্বরে বলিল, "এত রাত্রে এখানে কেন গা দাদাঠাকুর?'

রাখাল বাঁ হাত দিয়া মাথা চুলকাইতে চুল-কাইতে বলিল, "না, এই এলাম। বলি তোমাদের ঘরে কুমড়ো আছে?"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত তর্জ্জন করিয়া বলরাম বলিল, "এমন সময় কুমড়ো ?"

রাখাল যেন থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভভাবে বলিয়া উঠিল, "আমাদের পার্টির একটা ফীষ্ট আছে, তাই বলি—"

বাধা দিয়া গর্জ্জন করিয়া বলরাম বলিল, "না, কুমড়ো নাই, যাও।"

হঠাৎ ধড়াস্ করিয়া ঘরের খিল খুলিয়া সুখদা বাহির হইল, এবং রাখালকে লক্ষ্য করিয়া বেশ সহজ স্বরেই বলিল, "কুমড়ো আছে একটা, কি দাম দেবে ?"

বৃদ্ধের তর্জ্জন-গর্জ্জনের মধ্যে সহসা সুখদার আবির্ভাবদর্শনে রাখালের ভীতি-চকিত মনটা যেন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "দাম, তা যা বল।"

সুখদা বলিল, "আচ্ছা, এস।"

এই আহ্বানে রাখাল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, এবং অগ্রসর হইয়া দাবার উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। বসিবামাত্র সুখদা হাত বাড়াইয়া তাহার পৈতাটা ধরিয়া ফেলিল, এবং এমন ত্বরিত-হস্তে সেটা তাহার গলা হইতে খুলিয়া লইল যে, রাখাল বাধা দিবার বিন্দুমাত্র অবসর পাইল না। সে শুধু বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে সুখদার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই সুখদা অদূরপতিত সম্মার্জ্জনীর দিকে হস্ত-প্রসারণ করিতেছে দেখিয়া সে আর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না, এক দৌড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বলরাম এতক্ষণ অবাক্ হইয়া সুখদার কাণ্ড দেখিতেছিল, এক্ষণে বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এ কি কল্লে বৌমা ?"

সুখদা বলিল, "বামুনের ঘরের গরুটা জ্বালিয়ে মেরেছে বাবা, নাছে ঘাটে বের হ'বার যো নাই।"

বলরাম একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "কিন্তু বামুনের পৈতা—"

সুখদা হাসিয়া বলিল, "বামুনের পৈতা নয় বাবা ঢোঁড়া সাপের খোলস।"

সুখদা ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল, বলরাম গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

৩

রাখাল পলায়ন করিয়া যাত্রার আড্ডায় উপস্থিত হইল। অধিকাংশ দিন সেইখানেই সে রাত্রিযাপন করিত। সে দিনও গিয়া এক পাশে পড়িয়া রহিল। ভাবিয়াছিল, আর সকলের উঠিবার আগে খুব ভোরে উঠিয়া বাড়ী পলাইবে, এবং পৈতার একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা হইল না, তাহার ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই অন্য দুই একটা ছেলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তাহারা রাখালের উপবীতশূন্য স্কন্ধ দেখিয়া হৈ-চৈ বাধাইয়া দিল। তখন রাখাল তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য একটা অদ্ভুত ভূতের গল্পের অবতারণা করিল, কিন্তু সে আষাঢ়ে গল্পে কেহই বিশ্বাস করিল না। ক্রমে সংবাদটা সমস্ত পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

আকুলি মহাশয়ও শুনিলেন। তিনি ছেলেকে ডাকিয়া, ধমক দিয়া উপবীতহরণের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। অগত্যা রাখালকে আসল কথা প্রকাশ করিতে হইল। সে কথা শুনিয়া আকুলি মহাশয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কি, একটা শূদ্রের মেয়ের এত সাহস, সে ব্রাহ্মণ তনয়ের অঙ্গে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তাহার যজ্ঞোপবীত হরণ করে! আকুলি মহাশয় তখন গ্রামের পাঁচ জন প্রধানকে ডাকিয়া ইহার বিহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি যে অভিযোগ করিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—তাঁহার পুত্র যাত্রার দলে ঘুরিয়া বেড়াইলেও এখনও বালক, এবং তাহার স্বভাব-চরিত্রও যে নির্ম্মল, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিতে পারেন। কিন্তু বলরাম পালের বিধবা পুত্রবধূ তাঁহার এই সচ্চরিত্র পুত্রকে অসৎপথে লইয়া যাইবার জন্য নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু রাখাল তাঁহার পুত্র, সুতরাং সে কুচরিত্রার এই প্রলোভন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে থাকে। এ সকল কথা তিনি কিছুমাত্র জানিতেন না। পরিশেষে গত কল্য রাত্রে তিনি রাখালকে একটি কুমড়া সংগ্রহ করিতে বলেন। রাখাল কুমড়া কিনিবার জন্য বলরামের বাড়ীতে যায়। তখন এই দুষ্টা রমণী স্বীয় অসদভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য রাখালের অঙ্গে হস্তার্পণ করে, এবং রাখাল তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পলায়নের চেষ্টা করিতে থাকে। এই চেষ্টার ফলে রাখাল তাহার হস্তচ্যুত হইলে দুষ্টা তাহার উপবীত চাপিয়া ধরে। পরিশেষে টানাটানিতে পৈতাটা তাহার হাতে থাকিয়া যায়, রাখাল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া এই কুচরিত্রা রমণীর হস্ত হইতে রক্ষা পায়।

এই অভিযোগ-শ্রবণে সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। একে স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষ, তাহার উপর ব্রাহ্মণের উপবীত-হরণ। এই গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তি দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ বলরামকে আহ্বান করা হইল, এবং আকুলি মহাশয়ের অভিযোগ তাহাকে শুনাইয়া তাহার দুশ্চরিত্রা পুত্রবধূকে অচিরে দূর করিয়া দিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। বলরাম এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করিল, কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ আকুলি মহাশয়ের উক্তিকে অসত্য জ্ঞান করিয়া বুড়া বলরামের কল্পিত প্রতিবাদ গ্রাহ্য করিতে কেহই সাহসী হইল না। প্রধানগণ একবাক্যে আদেশ দিল, হয় সুখদাকে দূর করিয়া দাও, নয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এবং সামাজিক দণ্ড দিয়া শুদ্ধ হও। যতদিন বলরাম এই উভয় আদেশের একতম পালন না করিবে, তত দিন বধূর সহিত সে নিজেও সমাজচ্যুত হইয়া থাকিবে। যে কোনও কারণেই হউক, ব্রাহ্মণের অপমান হিন্দু হইয়া কেহ সহ্য করিতে পারিবে না।

বলরাম কিন্তু বধূকে ত্যাগ করিতে পারিল না; প্রায়শ্চিত্তও করিল না। সুতরাং সমাজচ্যুত হইয়া রহিল। ইহাতে শোকার্ত্ত বলরামের রুক্ষ মেজাজটা আরও বেশী রুক্ষ হইয়া উঠিল, এবং তাহার মত
হতভাগী বুড়াকে ত্যাগ করিয়া না যাওয়াতেই যে
এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে, ইহা
বৌটাকে দিন-রাত নিজের মৃত্যু কামনা করিতে
বুঝিয়া বলরা
লাগিল।

৬

রাস্তার পাশের বড় গাছটা ঝড়ের বেগে পড়িয়া গেলে পথিক যেমন তাহার দিকে সকরুণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, লোকে তেমনই সমাজচ্যুত বলরাম পালকে করুণার দৃষ্টিতে দেখিয়াও তাহাকে একটু দূরে রাখিয়া চলিতে লাগিল। বলরাম লোকের এই করুণাটুকুর মধ্যে উপহাসের তীব্রতাই প্রবল দেখিত, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করিত না। গাছটা যখন ভূশায়ী হয়, তখন সে আপনার সকল শাখা-পল্লবকে মাটীর দিকেই নত করিয়া দিয়া যেন সম্পূর্ণভাবেই মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চায়, প্রকৃতির নিকট উত্তাপ বা আলোক পাইবার আশায় একটি পল্লবকেও উন্নত করিয়া রাখে না। লোকে যদি সহানুভূতি দেখাইয়া বলিত, "আহা, পা... শেষবয়সে এই লাঞ্ছনা!" তাহা হইলে ... হাসিয়া বেশ সহজ স্বরেই উত্তর দিত, ... থাকতে হ'লে সুখ-দুঃখ দু'টোই ভোগ ক... কথাতেই আছে—না পর গাড়ী, গাড়ী পর না।"

এমন লাঞ্ছনার পরও এতটা গর্ব্ব দেখিয়া ... শুধু বিস্মিত হইত না, এই গর্ব্বিত লোক... মনে মনে বিরক্ত হইয়াও উঠিত। বলরাম ... তাহাদের বিরক্তি বা সন্তোষ কোনটাকেই ... আনিত না। সে যেন মানুষের বিচারকে ... করিয়া একমাত্র ভগবানের বিচারের উপরে... নির্ভর করিয়াছিল।

কিন্তু লক্ষ্মীপূজার দিন সুখদা যখন লক্ষ্মী... পুরোহিতের অভাবে লক্ষ্মীর সম্মুখে বসিয়া ... থাকিত, তখন বলরাম ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ি... গ্রামের লোকগুলাকে গালাগালি দিত, বধূকে ...স্কার করিত, এবং শেষে ভগবানের বিচারে... দোষারোপ করিয়া লক্ষ্মীকে রূপনা... ফেলিয়া দিতে চাহিত।

সে দিন চৈত্রমাসের লক্ষ্মী পূজা। সকাল ... সুখদা শ্বশুরকে সকাতরে অনুরোধ করিতে লা... "একজন বামুন দেখ না বাবা, শুধু একটা ফুল ... দিয়ে যাবে? গাঁয়ে এক বামুন আছে, এক... কি আসবে না?'

বলরাম কিন্তু এক জন ব্রাহ্মণও পাইল না। ... শেষে সে গিয়া আকুলি মহাশয়ের পা দুইটা জড়া...ইয়া ধরিল। কিন্তু আকুলি মহাশয় দৃঢ়ভা... জানাইয়া দিলেন যে, যে ব্রাহ্মণের উপবীত ছিন্ন করিয়াছে, বিনা প্রায়শ্চিত্তে তাহার পৌরোহিত্য করিলে ধর্ম্মের অবমাননা হইবে, সুতরাং এরূপ কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না।

রুক্ষ রোষে ফুলিতে ফুলিতে বলরাম ফিরিয়া আসিয়া বধূকে কতকগুলা তিরস্কার করিল। তাহার তিরস্কারে বধূ কাঁদিতে লাগিল। বলরাম মিথ্যাবাদী মহেশ আকুলিকে গালাগালি দিয়া ভগবানের নিকট তাহার বিচার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

৭

সে দিন যখন বলরাম হাট হইতে ফিরিতেছিল, তখন সহসা এমন ঝড়-বৃষ্টি আসিল যে, সে পাশের

থানায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। সেখানে ও এক জন আশ্রয় লইয়াছিল, সে পরাণ ার। তাহারা যে বাড়ীতে আশ্রয় লইল, সে থানা এক পতিতা চণ্ডাল রমণীর। গ্রামপ্রান্তে কয়া সে গণিকাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ত। বিপদের সময় বলরাম সেই পতিতার ঘরের াকে আশ্রয় লইতে ইতস্ততঃ করিল না।

বৃষ্টি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। কিন্তু এই অল্প-য়র মধ্যেই পরাণ কামার বলরামকে এমন একটা দেখাইল—যাহাতে বলরাম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া ল। ঘরের রোয়াকের দিকে একটা জানালা । জানালাটা বন্ধ থাকিলেও যে একটু ফাঁক , সেই ফাঁকে চোখ রাখিয়া পরাণ তাহাকে াইল যে, ঘরের ভিতর যিনি আছেন, তিনি শ আকুলি। বলরাম যেন আকাশ হইতে ল। ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া সে তীব্রদৃষ্টিতে অভ্যন্তর ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। বলিল, "দেখলে পালের পো, বামুনটার কেল।

বলরাম কোনও উত্তর করিল না, শুধু ঘৃণায় ার নাসা কুঞ্চিত হইল। আর পরাণের চোখে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল। জাগিবার কারণও । আকুলি মহাশয় ত্রিশ টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদের তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত ও ভিটাছাড়া করিয়াছিলেন। জন্য আকুলি মহাশয়ের উপর তাহার দারুণ রাগ কিলেও এ পর্য্যন্ত পরাণ তাহার প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি তার্থ করিবার সুযোগ পায় নাই, আজ সহসা সে যোগ পাওয়ায় তাহার জিঘাংসাবৃত্তি যেন ফণা করিয়া দাঁড়াইল। বৃষ্টি থামিলে সে গ্রামে গ্রামের ঘরে ঘরে আকুলি মহাশয়ের এই কলঙ্ক-নী প্রচার করিতে লাগিল।

পিপাসু বাঘকে লোকে যে শুধু ভয় করে, তাহা তাহার রক্তপানের জন্য এমনই লালায়িত হইয়া যে, সুযোগ পাইলেই তাহার উপর নির্দ্দয়তার ষ্টা দেখাইতে কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং রক্ত-কাতী শার্দ্দুলের ন্যায় মহেশ আকুলিকে শাসন করিবার জন্য গ্রামের এত লোক উদ্যত হইয়া উঠিল যে, আকুলি মহাশয় কখনও কল্পনাতেও ভাবিতে পারেন নাই যে, গ্রামের এত লোক তাঁহার শত্রু।

গ্রামে ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। পরি-শেষে সমাজ-প্রধানগণ সমবেত হইয়া আকুলি মহা-শয়ের বিচার আরম্ভ করিলেন। পরাণের সাক্ষ্য গৃহীত হইল। কিন্তু কেবল তাহার একার সাক্ষ্য প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং বলরাম পালকে দ্বিতীয় সাক্ষিরূপে উপস্থিত করা হইল। বলরামকে দেখিয়া আকুলি মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল, বৃদ্ধের নিকট যে কিছুমাত্র করুণা-লাভের প্রত্যাশা নাই, সে আজ তাঁহাকে সমাজে লাঞ্ছিত করিয়া সকল অত্যাচার, সকল লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবে, ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি শুধু বিবর্ণ-মুখে সকাতর-দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু বলরাম যে সাক্ষ্য দিল, তাহা শুনিয়া সক-লেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে বলিল, পতিতা রমণীর ঘরের ভিতর যাহাকে দেখিয়াছিল, সে দেখিতে কতকটা আকুলি মহাশয়ের মত হইলেও সে যে আকুলি মহাশয় নহে, ইহা সে শপথ করিয়া বলিতে পারে। কেন না, সে খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াও সে লোকটার গলায় পৈতা দেখিতে পায় নাই।

বলরামের সাক্ষ্যে আকুলি মহাশয় নিষ্কৃতি পাইয়া সগর্ব্বে ঘরে ফিরিলেন। পথে পরাণ কামার সক্ষোভে বলরামকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো পালের পো, এমন ডাহা মিথ্যেটা তুমি বল্‌লে কেমন ক'রে?"

মৃদু হাসিয়া বলরাম উত্তর করিল, "আমার মত লোককে জব্দ করতে যদি এক জন বামুন তাহা মিথ্যে বলতে পারে, তবে এক জন বামুনের মান রাখতে আমি কি এই মিথ্যেটুকু বলতে পারি না?"

ইহার উত্তর পরাণ দিতে পারিল না। আকুলি মহাশয় কিন্তু দিয়াছিলেন। তিনি ইহার পর কোনও কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে বলিয়াছিলেন, "বলা পালের মত মিথ্যাবাদী দুনিয়ায় নাই। ও বুড়ো গঙ্গার এপারে ডুবে ও পারে উঠতে পারে।"

সম্পূর্ণ।